হেইয়া চাষ করছিল। আশে-পাশে কেউ নেই! অদূরে বেশ ঘন ঝোপ। ঝোপটা পেরিয়েই একটা জলা। তারপর বন। অপর দিকে খোলা মাঠ। চাষের ক্ষেত, কোনটা 'আমকেষ্ট'র কোনটা আবিহুল্লার, কোনটা বা এই হেইয়ার।

আপন মনেই কাজ করে যাচ্ছিল হেইয়া। হঠাৎ দূরে একটা কলরব শুনে উঠে দাঁড়াল। দুজন লোক ছুটতে ছুটতে আসছে—ধরণী আর রমণী। 'কিক্—কিরে, কি হইসে?' হেইয়া শুধোল; বেজায় তোৎলা সে। হাঁপাতে হাঁপাতে রমণী জানাল, 'আরে, উইঠা আয়রে হেইয়া, উইঠা আয়।'

'কেন?'

'ফাগ বাড়াইসে।'

ওদের ব্যস্ততা দেখে হেইয়া যাবার জন্যে পা বাড়ায়। কিন্তু পরক্ষণেই ওর মনে হয়—ধরণী-রমণী ওকে বোকা বানাবার তালে নেই ত? সেটাই স্বাভাবিক। এই দিনে-দুপুরে বাঘ বেরোবে কোত্থেকে? হেইয়া ওদের এমনি করে বুদ্ধু বানিয়ে দিয়েছিল কিছুদিন আগে। নিশ্চয়ই তার শোধ নিতে চায়।

সে অবিশ্বাসের হাসি হেসে বললে, 'কো-কো-ক্-উন্-ঠে ফাগ?' ধরণী সামনের ঝোপটার দিকে আঙুল দেখাল।

'এঃ, ফা-ফাগ।' হেইয়া তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে লাঠিটা নিয়ে জোর এক ঘা লাগাল ঝোপটার মধ্যে। 'ঝো-ঝোঠে ফাগ?'

আরে এ যে সত্যি সত্যি—! কালো ডোরা দাগ জন্তুটা হেইয়াকে বিস্মিত এবং ততোধিক ভীত করে ওর ওপর লাফিয়ে পড়ল।

ব্যাপার দেখে বাকি দু'জন ভোঁ-দৌড়।

হেইয়া কিন্তু প্রাথমিক বিস্ময় ও ভীতি কাটিয়ে উঠেছে অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে। এ অঞ্চলের বাঘ বেশী বড় নয়, তবু তার সঙ্গেও খালি হাতে লড়া কি খেলা-র কথা? লাঠিটা পর্যন্ত হঠাৎ আক্রমণে হাত থেকে ছিটকে গেছে।

কিন্তু হেইয়া ছিল ভিন্ন ধাতুতে গড়া। তার শরীর রীতিমত তাগড়া। শুধু চওড়ায় নয়, লম্বাতেও সে বড় কম ছিল না, প্রায় ছ'ফুট—যা নাকি রাজবংশীদের মধ্যে লাখে একটা মেলে না। অতএব, সেও বা ছাড়বে কেন?

দু হাতে সমস্ত শরীরের শক্তি এক করে বাঘের গলার নালীটা চেপে ধরল হেইয়া। আর দুহাতের ফাঁকে আড়াল করে মুখটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগল। সে জানে চোখটা গেলে বাঁচবার চেষ্টা বৃথা।

বাঘটা প্রাণপণ শক্তিতে থাবড়িয়ে চলেছে হেইয়ার কাঁধে-পিঠে। হেইয়াও কিছু কম যায় না। থেকে থেকে চড় এক এক খানা যা হাঁকাচ্ছে, বাঘের শক্ত চোয়ালও কটাৎ করে উঠছে।

একবার জোরে একটা ঝটকা মেরে অসুরের শক্তিতে সে বাঘটাকে ছিটকে ফেলে সাড়ে তিন ডিগবাজী খাইয়ে দিল।

একটুও দেরী না করে বুলেটের গতিতে তেড়ে গিয়ে এক লাথি—লাথি ত নয়, বজ্রের বাড়া—বাঘটা উঠতে যায় আর তার পরই আরেকখানা কড়া রকম লাথি খেয়ে ঘুরে গড়িয়ে পড়ে কুমড়োর মত। সে আঘাতটা ঠিকমত পরিপাক করবার আগেই আবার—ভ্যালা ল্যাঠা বাধালে দেখছি মনিষ্যির পো!

কিন্তু ধোলাই খাওয়া বাঘের মূর্তি, সে বড় সাংঘাতিক। ক্ষণে-ক্ষণে বাঘটা দারুণ হাঁক ছেড়ে চার

কালো ডোরা কাটা জন্তটা লাফিয়ে পড়ল

দিক কাঁপিয়ে তুলতে লাগল। (অবশ্য তার প্রতিদ্বন্দ্বী তাতে কাঁপবার পাত্র নয়।)

লাফাতে লাফাতে হেইয়াও যেন একটু ক্লান্ত হয়ে পড়ল। সেই সুযোগেই আমাদের বাঘমামা ধুলিশয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। আর কথা নেই। একলাফে হেইয়ার ঘাড়ে, ওকে একেবারে সরাসর ভুঁয়ে পেড়ে ফেলে চিৎপটাং করে দিয়েছে।

গেল বুঝি হেইয়াটা গুঁড়ো হয়ে। খোঁচা খাওয়া বাঘ যমের চেয়ে কম কিসে?

কিন্তু একথা বাঘ সম্বন্ধে যতটা প্রযোজ্য, ছফুটী চাষী হেইয়া সম্বন্ধেও ততটাই। অতএব, আবার জড়াজড়ি ধস্তাধস্তি ; সুযোগ পেলেই পালোয়ানী চাপড়, জো লুই-মার্কা ঘুঁসি। সমানে সমানে যুদ্ধ চলতে লাগল—দারা সিং ভার্সাস কিংকং। একবার বাঘ ওপরে, হেইয়া নিচে ; আবার বাঘ নিচে, হেইয়া ওপরে।

কিন্তু কিংকং বাছাধনেরও দম শেষ হয়ে আসছিল। একবার বাঘটা নিচে পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে হেইয়া একেবারে তার ওপর চেপে বসল। হাতে তার বাঘের গলা।

বাঘটা প্রচণ্ড শক্তিতে একবার ওকে ছিটকে ফেলতে চেষ্টা করল। বৃথা, তখন আর তার উপায় ছিল না। সে তখন হেইয়ার আয়ত্তের মধ্যে এসে পড়েছে।

সামনেই মস্ত এক পাথর। তার উপর বার বার ভীষণ জোরে বাঘের মাথাটা ঠুকে দিতে লাগল হেইয়া। 'এহন কেমন নাগে?'

তারপরই তার আওয়াজে একেবারে পাকাপাকি রকম দাঁড়ি পড়ে গেল।

'ব্যাটা ফাগের পো, কেমন ঠ্যালা?'

ফাগের পো সে কথা শুনতে পায় নি বলাই বাহুল্য। কিন্তু ধরণী-রমণী আড়াল থেকে শুনেছিল হেইয়ার কথা। হেইয়া এখনও বেঁচে আছে! ওরা অবাক হয়ে গিয়েছিল। বাঘটারও ত কোন সাড়াশব্দ মিলছে না। তাহলে?

ধরণী বললে, 'চল কেনে, দেইহা আসি।' তবু ভীতভাবে এগোতে লাগল।

রমণীর হাতে একটা গাদা বন্দুক। বাঘ দেখে পালিয়ে বাড়ি গিয়ে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু ভয়ে বাঘের সামনা সামনি হতে সাহস করে নি।

ওরা রণাঙ্গনে এসে দেখল, হেইয়া বাঘের গলা টিপে ধরে তখনও মাথাটা ঠুকে চলেছে। আর জায়গাটা দিয়ে রক্তপ্লাবন বয়ে যাচ্ছে। বাঘ আর মানুষের রক্ত মিলে-মিশে একাকার।

ওদের বন্ধুবর বাঘের নাকটাকে বেশ করে আদা-ছেঁচা করে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'ফ-য়ার করি দে।'

জন্তুটা তখন একটা মাংস পিণ্ড ছাড়া কিছুই নয়। রাম পিট্টির চোটে হেইয়া সেটাকে একদম তুলো বানিয়ে দিয়েছে। তবু 'ফয়ার' (ফায়ার) নামক মূল্যবান কর্মটি না করা পর্যন্ত তার শান্তি নেই।

যাহোক, তখনই এই মামুলী ফয়-পর্ব সাঙ্গ হল। ইতিমধ্যে লোকজন আরও জুটেছিল। বাঘটার ওপর ধরণীর ভীষণ রাগ তখনও একটুও কমে নি। সে সক্রোধে বললে, 'গুরা ব্যাটাকা।'

তৎক্ষণাৎ নির্দেশ প্রতিপালিত হল। সকলে মিলে একযোগে লাথি মারল বাঘটাকে।

তারপর হেইয়াকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া। প্রচুর রক্তক্ষরণে তার অবস্থা তখন সঙ্গীন। পিঠের প্রায় কিছু ছিল না বলতে গেলে। খাবলা খাবলা মাংস নেই এখানে সেখানে। মুখ ফুলে চারগুণ।

'তবু লোকটা বেঁচে গিয়েছিল।' মণিমামা বললেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখনও বেঁচে আছে?'

'না মরে গেছে অনেকদিন হল। বাঘ মারবার দু তিন বছর পরই মরে গেছে।' বলে একটু থামলেন মামা। তারপর বললেন, 'মনে আছে, আমরা সব হাসপাতালে গিয়েছিলাম হেইয়াকে দেখতে। তখনও তার কি তেজী ভাব, অত চোটেও অজ্ঞান হয় নি!'*

* সত্যি ঘটনা অবলম্বনে
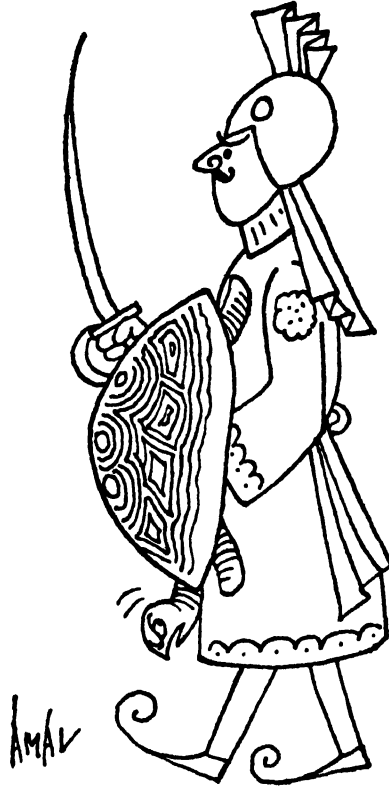
(পূর্বপ্রকাশিত অংশের চুম্বক)

১৮৬৫ খৃস্টাব্দে আমেরিকার গৃহযুদ্ধে অবরুদ্ধ রিচমণ্ড সহর হইতে বেলুনে চড়িয়া পলায়ন করিতে গিয়া পাঁচটি অসমসাহসী ব্যক্তি প্রচণ্ড ঝটিকার প্রকোপে একবস্ত্রে ও শূন্যহস্তে এক সুদূর ভূখণ্ডে পরিত্যক্ত হন। তাঁহারা হইলেন এঞ্জিনিয়ার সাইরাস্ হার্ডিং, তাঁহার ভৃত্য নেব্, সাংবাদিক গিডিয়ন স্পিলেট, নাবিক পেন্‌ক্রফ্‌ট ও বালক হার্বার্ট। হার্ডিং এর কুকুর টপ্‌ও সঙ্গে ছিল।

মৃত একটি আগ্নেয় পর্বতের শিখরে উঠিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে চতুর্দিকেই সমুদ্র, সুদূর দিগন্তেও কোনও তটরেখা দেখা যায় না। ভূখণ্ডের পরিধি প্রায় একশত মাইল, তাহার দুই তৃতীয়াংশ স্থান জুড়িয়া গভীর বন। কোনও দিকে কোনও ঘর, বাড়ি, গ্রাম, ধোঁয়া, কিছুই দেখা গেল না। সুতরাং তাঁহারা মনে করিলেন যে এটি একটি জনমানবহীন দ্বীপ এবং নিকটে অন্য কোনও ভূখণ্ড নাই। এখানেই উপনিবেশ স্থাপন করিয়া তাঁহাদের বাস করিতে হবে।

তাঁহারা সকলেই আমেরিকার লোক, সুতরাং আমেরিকার প্রসিদ্ধ নাম সকল লইয়াই দ্বীপের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের নামকরণ করা হইল। দ্বীপটির নাম হইল লিঙ্কন আইল্যাণ্ড।

॥ চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ॥

নামকরণ কার্য শেষ হইলে, যাত্রীদল ফ্রাঙ্কলিন্ পাহাড় হইতে নামিতে আরম্ভ করিলেন। হার্ডিং বলিলেন—পুরাতন পথে না গিয়ে আমরা নূতন পথে চিম্‌নীতে ফিরব।—তাঁহার ইচ্ছা ফিরিবার পথে লেক্ গ্রাণ্টটিকে ভাল

করিয়া দেখিয়া যান। দল বাঁধিয়া চলিবার কোন দরকার নাই, কিন্তু তাহা হইলেও সকলকে কাছাকাছি থাকিতে হইবে—বনের মধ্যে হিংস্র জন্তু নিশ্চয়ই আছে। একটু সাবধান হইয়া চলা ভাল।

সকলের আগে টপ্, তাহার পর নেব্, হারবার্ট ও পেন্‌ক্রফ্‌ট, হার্ডিং আর স্পিলেট সকলের পিছনে। স্পিলেট, প্রত্যেক বিষয় তাঁহার নোটবুকে লিখিতেছেন। হার্ডিং মাঝে মাঝে পথের ধারে পদার্থ যাহা কিছু দেখিতে পান, পকেটে পুরিয়া রাখেন।

এই ভাবে চলিতে চলিতে, বেলা দশটার সময় সকলে ফ্রাঙ্কলিন পর্বতের গোড়ায় নামিলেন। এমন সময় হারবার্ট তাঁহাদের দিকে ছুটিয়া আসিল, পেন্‌ক্রফ্‌ট ও নেব একটা বড় পাথরের আড়ালে লুকাইয়াছে। ব্যাপার কি? হারবার্ট ছুটিয়া আসিয়া বলিল—ধোঁয়া দেখতে পেয়েছি। একটু আগেই পাহাড়ের ভিতর থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

সাইরাস হার্ডিং বলিলেন—তাই নাকি। তবে ত সাবধান হয়ে লুকিয়ে চলতে হবে। কে জানে দ্বীপে অন্য লোক যদি থেকে থাকে? ওদেরই আমি সব চেয়ে ভয় করি। টপ কোথায়?—টপ এগিয়ে গিয়েছে।

তবে কেন সে চেঁচামেচি করছে না? এ ত বড় আশ্চর্য। টপ্‌কে ডেকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

ততক্ষণে হার্ডিং হারবার্ট এবং স্পিলেটও পাথরের আড়ালে লুকাইলেন। সেখান হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন—ঝলকে ঝলকে হরিদ্রা রংএর ধোঁয়া আকাশে উঠিতেছে।

হার্ডিং শিষ দিয়া টপ্‌কে ডাকিয়া আনিলেন। খানিক পরেই একটা বিশ্রী গন্ধ সকলের নাকে ঢুকিল।

গন্ধ শুঁকিয়াই হার্ডিং বুঝিতে পারিলেন ওটা গন্ধকের গন্ধ—ওখানে নিশ্চয়ই গন্ধকের কুণ্ড আছে। তখন সকলেই সেই ধোঁয়ার দিকে অগ্রসর হইলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন পাহাড়ের মধ্যে গন্ধকের কুণ্ড—তাহা হইতে গলিত গন্ধক স্রোতের মত চলিয়াছে। হার্ডিং সেই গন্ধকের স্রোতে আঙ্গুল ডুবাইয়া বুঝিতে পারিলেন উহা মানুষের শরীরের উত্তাপের মত গরম। যাহা হউক, কুণ্ডটি দ্বীপবাসিগণের কোনও কাজে লাগিবে না। তখন সকলে গভীর বনের দিকে চলিলেন। বনের প্রান্তে গিয়া দেখিলেন লাল মাটির উঁচু পাড়ের মধ্য দিয়া একটি নদী বহিয়া চলিয়াছে, তাহার জল পরিষ্কার টলটলে। মাটির সঙ্গে লোহা মিশান আছে বলিয়াই তাহার রং লাল। তখনই নদীর নাম দেওয়া হইল "রেড ক্রীক্"—লাল নদী।

নদীটি গভীর, পাহাড়ের ঝরণার পরিষ্কার জলে তাহার উৎপত্তি। প্রায় দেড় মাইল বহিয়া গিয়া সেটা হ্রদের জলে পড়িয়াছে। এই হ্রদের ধারে যদি চিম্‌নীর চাইতে ভাল থাকিবার জায়গা পাওয়া যায় তবে ত চমৎকার। রেড্‌ক্রীকের ধারে, যে পথে যাত্রীদল চলিয়াছিল, তাহারা প্রায় একশত ফুট নীচে, বড় বড় দেবদারু, ইউকেলিপ্‌টাস্ প্রভৃতি গাছ নদীর পাড়ে ছায়া বিস্তৃত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ সকলে নারিকেল গাছ খুবই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ দ্বীপে একটিও নারিকেল গাছ নাই। থাকিলে নারিকেল একটি উত্তম খাদ্য হইত। নদীর পাড়ে মাছরাঙা, সাদা কালো ধূসর প্রভৃতি কাকাতুয়া, টকটকে উজ্জ্বল রংএর টিয়াপাখি এবং অন্য অনেক রকমের পাখি গাছের ডালে বসিয়া চিৎকার চেঁচামেচি করিতেছে। এমন সময় হঠাৎ একটা ঝোপের মধ্য হইতে পাখি জন্তু প্রভৃতি একসঙ্গে ভীষণ ডাকিয়া উঠিল। নেব্ ও হারবার্ট তখনই ছুটিল ঝোপের দিকে। গিয়া দেখিল, কতকগুলি 'মকিংবার্ড' (বিদ্রূপকারী পাখি) মিলিয়া এই বিদ্‌ঘুটে গোলমাল আরম্ভ করিয়াছে। সেই পাহাড়ে মোরগও কতকগুলি ছিল, নেব্ ও হারবার্ট লাঠির আঘাতে কতকগুলি মারিয়া, বিকালের খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া লইল। এই সময়ে বন্দুকের অভাবটা খুবই বোধ হইয়াছিল। তাহার পর দেখা গেল, দূরে একটু উঁচুতে কতকগুলি জন্তু খুব লাফাইয়া পলায়ন করিতেছে। হারবার্ট চেঁচাইয়া

উঠিল—'ক্যাঙ্গারু। ক্যাঙ্গারু।' পেনক্রফ্‌ট জিজ্ঞাসা করিল—এ জন্তু খেতে কেমন?

স্পিলেট, বলিলেন—এদের মাংসে খাসা স্টু হয়—হরিণের মাংসের চাইতে ভাল।

পেন্‌ক্রফ্‌ট, হারবার্ট ও নেব্‌ তখনই ক্যাঙ্গারুর পিছনে ছুটিল, হার্ডিং কত ডাকিলেন, কেহই ফিরিলেন না। মিনিট পাঁচেক পরেই হাঁপাইতে হাঁপাইতে সকলে ফিরিয়া আসিল—ক্যাঙ্গারুকে ছুটিয়া ধরা কি মানুষের কর্ম? টপ্‌কেও নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল।

পেন্‌ক্রফ্‌ট হার্ডিংকে বলিল—ক্যাপটেন্‌। দেখছেন ত বন্দুক না হলে সবই পণ্ড। আচ্ছা, বন্দুকের ব্যবস্থা করতে পারেন না?

হার্ডিং বলিলেন—হয়ত, ভবিষ্যতে পারা যেতে পারে, কিন্তু সম্প্রতি তীর ধনুকের ব্যবস্থা করা চাই। আমার খুব বিশ্বাস, অল্প দিনের মধ্যেই তোমরা তীর ধনুক বানিয়ে নিতে পারবে।

পেন্‌ক্রফ্‌ট তুচ্ছ করিয়া বলিল—তীর ধনুক ওসব ত ছেলেখেলা।

স্পিলেট্‌ বলিলেন—জাঁক করোনা, পেন্‌ক্রফ্‌ট। বন্দুক ত সেদিন হয়েছে, এতকাল তীর ধনুকই ত যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র ছিল, তীর ধনুক দিয়ে রক্তপাতটা কি কম হয়েছে?

বেলা প্রায় তিনটার সময় টপ্‌ বনের মধ্যে গিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝোপের মধ্যে হইতে ঘেঁৎ ঘেঁৎ শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। নেব্‌ ছুটিয়া গিয়া দেখিল—টপ্‌ ছোট একটা জন্তুকে ধরিয়া চিবাইয়া খাইতেছে—তাহার পাশে দুইটা মরা জন্তু পড়িয়া রহিয়াছে। সেই জন্তু দুইটি লইয়া নেব্‌ ফিরিয়া আসিল, দেখা গেল—জন্তু দুইটি আমেরিকান্‌ খরগোস জাতীয়, তাহার নাম 'অ্যাগুটি'।

পেন্‌ক্রফ্‌ট মহা খুসি হইয়া বলিল—'বাহবা রোস্টের মাংস পাওয়া গিয়েছে—এখন বাড়ি গেলেই হয়।

আবার সকলে চলিল। নদীটি ক্রমেই চওড়া হইয়াছে, হার্ডিং অনুমান করিলেন শীঘ্রই নদীর মুখের কাছে পৌঁছিবেন। তাঁহার অনুমান সত্য হইল, ঘন গাছের আড়াল হইতে বাহির হইলেই নদীর মুখ দেখা গেল।

যাত্রীদল ততক্ষণে লেক্ গ্রান্টের পশ্চিম তীরে আসিয়াছে। জায়গাটি দেখিতে বড়ই সুন্দর। নদীর তীরে এবং নদীর মুখের কাছে ছোট ছোট দ্বীপগুলিতে বুনোহাঁস পেলিকান্, জল-মোরগ প্রভৃতি পাখি চরিয়া বেড়াইতেছে। নদীর জল খুব পরিষ্কার এবং মিষ্টি, দেখিয়া মনে হইল জলে মাছও আছে যথেষ্ট। স্পিলেট বলিলেন—চমৎকার লেকটি। এটার ধারে আমাদের বাড়ি হলে খুব ভাল হতো।

হার্ডিং বলিলেন—এখানে আমরা বাড়ি তৈরি করে নিব।

হার্ডিং-এর ইচ্ছা, লেকের অতিরিক্ত জল কোনস্থানে সমুদ্রে গিয়া পড়িতেছে, সেটা সন্ধান করিয়া দেখেন। এই প্রপাতের জলে অনেক কাজ করা যাইতে পারিবে। তাঁহারা লেক্ গ্রান্টের ধার ধরিয়াই চলিলেন, কিন্তু এই পথে প্রায় মাইল খানেক গিয়াও জল-প্রপাতের কোনও সন্ধান পাইলেন না।

তখন বেলা প্রায় সাড়ে চারটা। সময় মত রাত্রের খাদ্য প্রস্তুত করিতে হইলে, তখনই চিম্‌নীতে ফিরিয়া যাওয়া উচিত। যাত্রীদল ফিরিয়া চলিল, এবং মার্সি নদীর বাঁ তীর ধরিয়া, অবশেষে সকলে চিম্‌নীতে ফিরিয়া আসিল। পেন্‌ক্রফ্‌ট ও নেব্ রান্নাবান্না শেষ করিলে, খাওয়া দাওয়ার পর সকলে ঘুমাইতে যাইবে—এমন সময় হার্ডিং তাঁহার পকেট হইতে খনিজ-জিনিসগুলি বাহির করিয়া একে একে দেখাইয়া বলিলেন—বন্ধুগণ, এই দেখ—এটা খনিজ লোহা, এটা কাদামাটি, এটা চুণ, আর এটা হচ্ছে কয়লা। ভগবান এসব জিনিস মিলিয়ে দিয়েছেন। এগুলো ব্যবহারে লাগানো হচ্ছে এখন আমাদের কাজ। কাল থেকেই আমরা কাজ আরম্ভ করে দেব।'

॥ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ॥

পরদিন সকালে পেন্‌ক্রফ্‌ট জিজ্ঞাসা করিল—ক্যাপটেন্, এখন তাহলে কোথা থেকে কাজ আরম্ভ করা হবে?

হার্ডিং বলিলেন—একেবারে গোড়া থেকে আরম্ভ করতে হবে।

হার্ডিং একথাটা বলিলেন সত্যই। সব কাজই আরম্ভ করিতে হইবে একেবারে প্রথম অবস্থা হইতে। অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিবার সরঞ্জাম কিছুই নাই। খনিজ জিনিসগুলিও, যেরূপ অবস্থায় কাজে লাগে সেরূপ অবস্থায় নয়। যাত্রীদের কতকগুলি জিনিসের এতই প্রয়োজন যে অপেক্ষা করিয়া থাকিলে চলিবে না। যাহা হউক, হার্ডিং অসাধারণ গুণী লোক, তাঁহার সঙ্গীরাও এক একজন মানুষের মত মানুষ—সকলেই তাঁহাকে প্রাণপণ সাহায্য করিবে। এখন দেখা যাক, কতদূর কি হয়। ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিবার পক্ষে, এই পাঁচটি লোকের চাইতে উপযুক্ত অন্য কেহ আছে কিনা সন্দেহ।

সাইরাস হার্ডিং বলিলেন—দ্বীপে কাঠকয়লার অভাব নাই, এখন আমাদের একটা তুন্দুর বানিয়ে নিতে হবে—সেই তুন্দুরে কাদামাটি দিয়ে বাসনপত্র তৈরি করে পুড়িয়ে নেব।'

পেন্‌ক্রফট বলিল—তুন্দুর কেমন করে হবে?

হার্ডিং বলিলেন—ইঁট দিয়ে।

ইঁট কোথায়?

ইঁট কাদামাটি দিয়ে বানিয়ে নেব, তারপর তুন্দুরে পোড়াব। তখন সাইরাস হার্ডিং কাজ আরম্ভ করিবার

জন্য সকলকে প্রস্তুত হইতে বলিলেন। সরঞ্জামগুলি যেখানে পাওয়া যায়, সেই জায়গায় কারখানা করিলে অনেক পরিশ্রম বাঁচিয়া যাইবে। নেব্ চিমনী হইতে খাদ্যসামগ্রী লইয়া আসিবে। আগুন জ্বালিয়া রাঁধিয়া লইতে মুস্কিল হইবে না।'

স্পিলেট বলিলেন—অস্ত্রের অভাবে যদি খাদ্য জোগাড় করিতে বাধা পড়ে?

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিলেন—একটা ছুরিও যদি কারো কাছে থাকৃত তাহলে তাদিয়ে তীরধনু বানিয়ে নিয়ে খাদ্যের ব্যবস্থা করা যেত।'

হার্ডিং তখন নিজে নিজেই বিড় বিড় করিয়া বলিতে লাগিলেন—'ঠিক ঠিক। একটা ধারাল ছুরি হলে খুব ভালোই হতো।' এমন সময় হঠাৎ টপের উপর তাঁহার নজর প'ড়ল। আর তখনই উৎসাহ জাগিয়া উঠিল তাঁহার মুখে। তিনি টপ্‌কে ডাকিয়া আনিয়া, তাহার গলার ষ্টিলের কলারটি খুলিয়া দুই টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তারপর টুক্‌রা দুটি লইয়া বলিলেন—পেন্‌ক্রফ্‌ট। এই দেখ দুটি ছুবির ব্যবস্থা হয়েছে।'

পেন্‌ক্রফ্‌টের আনন্দ দেখে কে। চতুর লোক না জানে এমন কার্য নাই। বেলে পাথরে ঘষিয়া মাজিয়া, দেখিতে দেখিতে চমৎকার ধারাল দুখানি ছুরির ফলা বানাইয়া ফেলিল। তারপর উহাতে বাঁট পরাইতে আর কতক্ষণ লাগে।'

পূর্বদিনে হ্রদের পশ্চিম তীরে যেখানে হার্ডিং কাদামাটি দেখিয়া ছিলেন সেইখানে সকলে রওয়ানা হইলেন। মার্সি নদীর তীর ধরিয়া প্রসপেক্ট হাইট পার হইয়া প্রায় পাঁচ মাইল গেলে পর, সকলে বনের মধ্যে একটা খোলা জায়গায় উপস্থিত হইলেন। এই স্থানটি লেক্ গ্রাণ্ট, হইতে একশত ফুটের মধ্যে।

পথে হারবাট একরকম গাছ দেখিয়াছিল, তাহার ডাল দিয়া দক্ষিণ আমেরিকার ইণ্ডিয়ানেরা (Red Indians) ধনুক বানায়। এই গাছের সরু লম্বা ডাল দিয়া পেনক্রফ্‌ট, চমৎকার ধনুক বানাইল। ধনুকের গুণ বানাইল একরকম গাছের ছাল দিয়া—মজবুত তাঁতের গুণের চাইতেও শক্ত। এখন তীর চাই। সেই গাছের গাঁটশূন্য সরু লম্বা ডাল দিয়া পেনক্রফ্‌ট তীর ও বানাইল। এখন তীরের ডগায় লাগাইবার জন্য লোহা কোথায় পাওয়া যাইবে? পেন্‌ক্রফট বলিল—এতদুর যখন করেছি তখন, লোহার ব্যবস্থা ভগবান করে দিবেন।

দ্বীপবাসীরা কাদামাটির জমিতে আসিয়া পৌঁছিল। সাধারণতঃ কাঠের ছাচে ফেলিয়া ইঁট গড়িতে হয়। ছাচ আর কোথায় পাওয়া যাইবে হাত দিয়াই কাজ আরম্ভ হইল। দুই দিন খাটিয়া তিন হাজারের বেশী ইঁট বানান গেল না। তুন্দুর প্রস্তুত হইলে সেগুলিকে পোড়াইতে হইবে সম্প্রতি মাটিতে শুকাইতে দেওয়া হইল। ওভেন্ (তুন্দুর) তৈরী করিবার পূর্বে দুইদিন পর্যন্ত কাঠ সংগ্রহ করা হইল। এখন দ্বীপবাসীরা শিকারের জন্য আর ভাবনা করে না। একদিন টপ একটা সজারু মারিল। সেই সজারুর কাঁটা তীরের ডগায় লাগাইয়া পেন্‌ক্রফট সুন্দর তীর বানাইয়াছে। তীরের নীচে টিয়া পাখীর পালক বাঁধিয়াছে। হারবার্ট ও স্পিলেট উভয়েই সুন্দর তীর ছুড়িতে পারেন—চিম্‌নীর ভাঁড়ারে বন্ মোরগ ক্যাপিবারা, পায়রা, য়্যাগুটি প্রভৃতির আর অভাব নাই। এই সকলের বেশীর ভাগ জন্তুই মার্সি নদীর বাঁ পাড়ের বনে মারা হইয়াছিল। এই বনটির নাম দেওয়া হইল জ্যাকামার উড। দ্বীপে আসিয়া প্রথম দিন শিকার করিবার সময় হারবাট ও পেনক্রফট এখানেই জ্যাকামার পাখী তাড়া করিয়াছিল, তাই এই বনের নামকরণ হইল সেই পাখীর নামে।

শিকার করিবার সময় কেহই ইটের পাঁজা হইতে বেশী দুরে যাইতেন না, একদিন জ্যাকামার বনে খুব বড় নখওয়ালা জন্তুর পায়ের দাগ দেখা গেল, কিন্তু দাগ দেখিয়া বুঝিতে পারা গেল না—কোন জন্তু। হার্ডিং সকলকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিলেন—বনে ভয়ানক হিংস্র জন্তু আছে চলাফেরা খুব সাবধান হয়ে করতে হবে।'

সাবধান করিয়া হার্ডিং ভালই করিয়াছিলেন। একদিন হারবার্ট ও স্পিলেট একটা জন্তু দেখিতে পাইলেন, সেটা আমেরিকার জাগুয়ারের মত। সৌভাগ্য বশতঃ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে নাই। নতুবা বিপদের সীমা থাকিত না। স্পিলেট মনে মনে স্থির করিলেন বন্দুকের ব্যবস্থা হওয়ামাত্র বনের হিংস্র জন্তুগুলিকে মারিয়া শেষ করিবেন।

এদিকে চিম্‌নীর প্রতি কাহারও বড় একটা দৃষ্টি ছিল না। হার্ডিং ভাবিয়াছিলেন ভাল একটা থাকিবার জায়গা খুঁজিয়া কিংবা আবশ্যক হইলে প্রস্তুত করিয়া লইবেন। সম্প্রতি সকলে চিম্‌নীর মেঝেতে শুকনা শেওলা বিছাইয়া শয়নের ব্যবস্থা করিলেন।

লিঙ্কলন দ্বীপের দিনগুলির হিসাব রাখা হইল। তখন হইতে নিয়ম মত দৈনিক কাজের কথা লিখিয়া রাখা হইত।

এপ্রিল মাসের পাঁচ তারিখ, বুধবার দ্বীপ বাসের বারদিন হইল। ৬ই এপ্রিল ইঁটের পাঁজা প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে আগুন দেওয়া হইল। সকলে সারারাত্রি জাগিয়া রহিল, কাঠ যোগাইয়া আগুনটিকে সজীব রাখিতে হইবে।

প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে ইঁট পোড়ান শেষ হইল। এখন ইটগুলি ঠাণ্ডা হওয়া দরকার। হ্রদের এক-স্থানে রাশি রাশি ঘুটিং ছিল, হার্ডিংএর আদেশে নেব ও পেনক্রফট অনেক ঘুটিং আনিয়া আগুনে পোড়াইল। তারপর উহা বালির সঙ্গে মিলাইলে ইট গাঁথিবার চমৎকার মশলা হইল।

ইহার পরেই মাটির বাসনপত্র পোড়াইবার জন্য হার্ডিং কুমারের উনান (Kiln) প্রস্তুত করাইলেন। বাসনের প্রধান উপকরণ কাদামাটি, তাহার সঙ্গে হার্ডিংএর কথামত কিছু চুণ ও বেলে পাথর মিশান হইল। এই উপকরণ দিয়া রান্না ও খাওয়ার বাসন, জলপাত্র প্রভৃতি সমস্তই তৈরী হইল। পাত্রগুলির গড়ন, হাতে করার দরুণ একটু বাঁকাচোরা হইল বটে কিন্তু, তবু, বাসনগুলি পোড়াইয়া লইলে পর দ্বীপবাসীদের নিকট উহাই হইল চিনামাটির বাসনের চাইতেও মূল্যবান্। এই চুণ-কাদা মিশান জিনিসটিকে বলে 'পাইপ'ক্লে অর্থাৎ ইহার দ্বারা চুরুট খাইবার পাইপ তৈরি হয়—খুব মজবুত। পেন্‌ক্রফট কয়েকটি পাইপ বানাইয়া দেখিল সত্য সত্যই এই উপকরণটি পাইপক্লের মত ভাল হইয়াছে কিনা। কিন্তু পাইপ বানাইলে কি হইবে—তামাক কোথায়? হায় বেচারি পেন্‌ক্রফট।

১৫ই এপ্রিল বিকালে মাটির বাসনপত্র লইয়া সকলে চিম্‌নীতে ফিরিয়া আসিল। য্যাগুটির সুপ ক্যাপিবারা রোস্ট প্রভৃতি ছিল রাত্রের খাদ্য—পরম তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া, দ্বীপবাসিগণ সুখে নিদ্রা গেল।

ক্রমশঃ

পূর্ব প্রকাশিত অংশের চুম্বক ঃ—

পৃথিবীর আসন্ন প্রলয়ের সম্ভাবনায় কয়েক লক্ষ লোক মহাকাশ-যানে করে, অন্য এক সূর্যমণ্ডলীতে, অনেকটা পৃথিবীর মতো এক গ্রহে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। এই ঘটনার দু'শ' বছর পরে সেই গ্রহে প্রশান্তকুমার, চিয়েন, মরিশ ও ফিসার নামে চারবন্ধু কলেজের শেষ পরীক্ষার পর সুদূর অঞ্চলে গেল, যেখানে তাদের পূর্বপুরুষেরা পৃথিবী থেকে এসে প্রথম নেমেছিলেন এবং তাদের সেই মহাকাশ-যানগুলি এখনও পড়েছিল। প্রফেসার সোমোরেন ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকেরা সেই বিষয়ে গবেষনায় রত ছিলেন। চিয়েন ও প্রশান্ত পৃথিবীর কয়েকটি ভাষা শিখেছিল, কয়েকটি বই তারা তর্জমা করে দেওয়াতে মহাকাশ-সম্বন্ধে অনেক অজানা তথ্য জানা গেল।

বন্ধুদের মনে হল যে প্রফেসার একবার গিয়ে সেই পুরোনো ছেড়ে আসা পৃথিবীটাকে দেখে আসতে চান। তাদের যদি সঙ্গে নেন তাহলে কি মজাটাই না হয়!)

চিয়েন আর প্রশান্ত আরো বই তর্জমা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে প্রফেসার এসে আমাদের দেখে বললেন—'বাঃ, বেশ, এই তো চাই! আরেকটা কারখানা থেকে জরুরী খবর এসেছে, সেজন্য এক্ষুণি সেখানে চলে যাচ্ছি। যাঁরা ঘুমোতে গেছেন, তাঁরা উঠলেই যেন খেয়ে দেয়ে সেখানে চলে আসেন।'—এই বলেই তিনি বেরিয়ে গেলেন।

ঘণ্টা কয়েক একটানা কাজ করার পর চিয়েন বইটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—'যাক্‌, এটা শেষ হল! এবার চা খেয়ে, একটু ঘুরে এসে, আবার বসা যাক।' এই বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। চিয়েন চায়ের ভারি ভক্ত, যে কোনো সময়ে, যত পেয়ালা চা-ই ওকে দাও না কেন, ও বিনা বাক্যব্যয়ে

সব খেয়ে নেয়। একটুক্ষণ বাদেই ও চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ফিরে এসে আমাদের তুজনকেও চা বিস্কুট খেতে দিল।

তারপর ওর সঙ্গে বাইরে একটু পায়চারি করছি, এমন সময় দেখি যাঁরা ঘুমোতে গিয়েছিলেন, তাঁরা তু' একজন করে বাইরে আসছেন। ওঁদের দেখে প্রফেসারের কথা মনে পড়তে, তাঁর কথাগুলো জানালাম। ভেবেছিলাম সারারাত খাটুনির পর এখুনি আবার কারখানায় যেতে হবে শুনে ওঁরা বিরক্ত হবেন, দেখলাম আমার ধারণাটা একেবারে ভুল। ওঁরা ব্যস্ত হয়ে, বাকিদের ডেকে তুলে, আধঘণ্টার মধ্যেই খেয়েদেয়ে চলে গেলেন। বুঝতে পারলাম প্রফেসারের এই বাছাই করা লোকদের সঙ্গে আমাদের কত তফাৎ!

এই দেখে চিয়েন বলল, চল, এই দৃষ্টান্তের পর, আমাদের আর সময় নষ্ট করাটা ঠিক হবে না,। খাবার সংকেত না শোনা পর্যন্ত আবার একটানা সেই তর্জমার কাজ চলল। আমি যে বইটার তর্জমা শুরু করেছিলাম সেটা একটা ছোট্ট বই, প্রায় অর্ধেকটা শেষ করে ফেলেছি। প্রত্যেকটা কথার প্রতিশব্দ খুঁজে খুঁজে লিখতে গেলে অবিশ্যি এর থেকে অনেকটা কম লেখা হত। অনেক জায়গায় পড়ে নিয়ে মোটামুটি ভাষাটাই লিখে রাখছিলাম। খেতে উঠেছিলাম বটে তবে খাওয়া শেষ করেই আবার সেই লেখা চলল, সেই সন্ধ্যেবেলা প্রফেসারের না ফেরা পর্যন্ত। এখানকার কাজের নমুনা দেখে আমাদের ও যেন কাজের নেশায় ধরেছিল, পাগলের মতন একটানা লিখেই চলেছিলাম।

চমক ভাঙ্গল যখন প্রফেসার এসে পিঠের ওপর হাত রেখে বললেন 'এবার লেখা বন্ধ করে একটু গল্প করতে বস দেখি।' চিয়েন বলল 'স্যার, আর মাত্র তু পাতা বাকি, এ তুটি শেষ করেই উঠছি।' আমার তখনও ১০।১২ পাতা বাকি, চিয়েনের কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রফেসার আমাকে প্রায় টেনে তুলে দিয়ে বললেন 'ও কটা পাতা এখন থাক, পরে হবে।'

ওঁর সঙ্গে বসবার ঘরে গিয়ে দেখি সেখানে প্রায় সকলেই রয়েছেন। আর প্রফেসার হ্যারিশকে ডেকে বললেন 'ভাগ্যিস তোমার ভাই এখানে আসতে চেয়ে চিঠি লিখেছিল, নইলে কি আর আমরা এক বছরে এতটা এগিয়ে যেতে পারতাম!'

আর সকলে সায় দিয়ে বললেন 'চিয়েন আর প্রশান্তর জন্যই আমাদের এতটা এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে, ওরা না থাকলে এই তর্জমাগুলো কতদিনে পেতাম কে বলতে পারে। আর ফিসার আর মরিশ ছেলেমানুষ বলেই তো ওরা ঐ পাহাড়ে চড়েছিল, নইলে কি কেউ আর শখ করে পাহাড়ে চড়ে, আর ওখানে উঠেছিল বলেই তো এই ছোট যন্ত্রটা পাওয়া গেল। কাজেই দেখা যাচ্ছে এবার চারবন্ধুর জয় জয় কার।'

শুনে খুব আনন্দ হল, কিন্তু মরিশ বা ফিসারকে তখনও দেখতে না পেয়ে একটু চিন্তিত হচ্ছিলাম। এমন সময় বাইরে শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম সেই যন্ত্রটা কর্মীদের নিয়ে কারখানা থেকে ফিরেছে। বাইরে এসে দেখি যন্ত্রটা মানমন্দিরের কাছে থেমে রয়েছে। নিকলসন, মরিশ, ফিসার ছাড়া আরও জন কুড়ি সেটা থেকে নেমে ক্যাম্পের দিকে আসছে।

আমাদের দেখে মরিশ "আরে, তোমরা যে ঘরে বসেই এ তুদিন কাটালে আর সেই যেখান থেকে

এই যন্ত্রটা আনা হয়েছে, তার ওপাশে যে পাহাড়টার কথা সেই ভদ্রলোকটি বলেছিলেন, সেইখানে আমাদের মাটি কাটার কাজে লাগতে হয়েছিল"।

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাতে, ও তাড়াতাড়ি যোগ দিল "অবিশ্যি বড় বড় যন্ত্রের সাহায্যে পাহাড় থেকে বড় বড় পাথরের চাঙ্গাড় কেটে, সেগুলোকে আবার যন্ত্রের সাহায্যে কয়েকটা বিশেষ রকম প্যাকিং বাক্সে ভরে কারখানা থেকে কিছুদূরে একটা রসায়ণাগারে নেওয়া হয়েছে। আমাদের এখানে আসবার আগে এই রসায়ণাগারে অল্প অল্প কাজ হত, কিন্তু চিয়েনের এই প্রথম তর্জমাটা পাবার পর থেকেই, সেখানকার কাজের মাত্রা খুব বেড়ে গেছে। দুদিন থেকে দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টাই কাজ হচ্ছে, কর্মীরা আট ঘণ্টার পালা করে কাজ করছেন।'

ফিসার স্বীকার করল যে সেদিনটার বেশির ভাগ সময়ই ওর সেই রসায়ণাগারে কেটেছে আর সেখানকার অন্যান্য বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের কথায় বুঝতে পেরেছে যে আর দিন দুই কাজ করলে, তাঁরা যা চাইছেন সেটা তৈরী হয়ে যাবে।

রাত কেটে গেলে পর প্রায় সকলেই কারখানায় চলে গেলেন। বাকি কটা পাতা তর্জমা শেষ করে যখন অন্য কোনো বই আর নিজের বিদ্যায় কুলাল না, তখন চিয়েনকে সাহায্য করতে লেগে গেলাম। এই ভাবেই কাজ হল দুদিন, তারপর প্রফেসার এসে বললেন, 'আর তর্জমার দরকার নেই, আমাদের যা জানবার ছিল তার সবই পাওয়া গেছে, এবার তোমাদের ছুটি'।

আমরা দু জন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। মরিশ আর ফিসার এ দুদিনও কারখানাতেই রাত কাটিয়েছে। আমাদের কাজ ফুরোল বটে, কিন্তু নজর করে দেখলাম অন্যান্য সকলের কাজের চাপ খুব বেড়ে গেছে। ভোর না হতেই সকলে কারখানায় চলে যান আর একেবারে সেই রাত্রে খেতে আসেন, তাও আবার সকলে আসেন না, অনেকেই রাতটাও ওখানে কাটান। দুপুর বেলাতে কেউ খেতে আসেন না, কারখানাতেই সকলের খাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথম দিনটা মন্দ কাটল না, কাজ কর্ম নেই, খাও দাও, ঘুমোও, বেড়াও, কারোর কেউ নেই!

কিন্তু তারপরদিন থেকেই আর সময় কাটতে চায় না, প্রফেসারের দেখা নেই। সেই যে কদিন থেকে সেখানে আস্তানা নিয়েছেন, ফিরবার নামটি নেই। ফিসার আর মরিশ পালা করে রাত কাটাতে ক্যাম্পে আসে বটে, কিন্তু যে রকম ক্লান্ত হয়ে আসে তাতে ওদের সঙ্গে গল্প করাই হয় না। রাত্রের খাবার পর চোখের অবস্থা দেখলেই বোঝা যেত তাদের কি রকম ঘুম পেয়েছে, কাজেই ওদের জাগিয়ে রেখে গল্প করতে মায়া লাগত।

দিন পাঁচেক বিনা কাজে কাটার পর, একদিন সন্ধ্যে বেলা লেকের ধারে বাবার সেই বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতেই, খবর পেলাম যে সে রাত্রেই প্রফেসার প্রায় সদল বলে ক্যাম্পে ফিরে আসবেন। ওঁদের ওখানকার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে আর সামান্য যেটুকু বাকি সেটুকু এদিককার সব কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে যাবে।

তিনি চিয়েনকে বললেন 'তোমার তর্জমা থেকেই এই যন্ত্রগুলো চালাবার ইন্ধন তৈরী করার প্রণালী

জানতে পারা গেছে আর এই কদিন ধরে রসায়ণাগারে সেই ইন্ধনই তৈয়ারী করা হয়েছে, কাজেই এইবার প্রফেসারের এতদিনের সাধ পূর্ণ হবার পথে।'

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা দুজনের কেউই যখন বিজ্ঞানের ছাত্র নও, তখন চিয়েনের আবিষ্কৃত ঐ গাল ভরা শব্দ 'হেরাক্লোপানাবি'র (Heracloponabe) অর্থ বুঝতেই পার নি। এই কথাটার মধ্যেই ইন্ধন তৈয়ারী করার আসল রহস্যটুকু লুকোন আছে। এটা কতগুলি মৌলিক উপাদানের নাম। কোনটির পর কোনটি কাজে লাগাতে হবে তার সূত্র দেওয়া রয়েছে। আর মৌলিক উপাদান গুলি হচ্ছে He-হেলিয়াম, Ra-রেডিয়াম, Cl-ক্লোরিণ O-অক্সিজেন, Po-পোলোনিয়াম, N-নাইট্রোজেন, A-আরগন আর Be-বেরিলিয়াম।'

আমরা অনেক পিড়াপিড়ি করলাম বটে, কিন্তু উনি আর বেশী বলতে রাজী হলেন না, খালি বললেন, সময় হলে প্রফেসারের মুখেই সব খবর পাবে।' ওঁর সঙ্গে আর কিছু আলোচনা হবার আগেই দেখতে পেলাম সেই যন্ত্রটা ক্যাম্পের দিকে আসছে ; দেখতে দেখতে সেটা মানমন্দিরের পাশে এসে থামল। তাই দেখে উনি বললেন, তোমরা নিশ্চয়ই সব খবর পাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়েছ, তোমরাও যাও বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে আর আমিও বাড়ি চলি।'

(দশ)

রাত্রের খাবার পর প্রফেসারের কাছে এসে জুটলাম। তখন তিনি বললেন, 'আমার অনেক দিনের সাধ হল একবার সেই পুরোনো পৃথিবীটা দেখে আসব। এবার সে সাধ পূর্ণ হবার পথে। মনের মতন শক্তিশালী একটা ছোট যান পাওয়া গেছে, পর্যাপ্তপরিমাণ ইন্ধন তৈয়ারী হয়েছে, প্রায় ৪০ জনের চার বছরের মতন খাবারও যোগাড় হয়েছে। সেখানে যাবার পথের নির্দেশ পাওয়া গেছে : পথে কোথায় কি রকম বিপদের সামনে পড়তে হতে পারে, তারও একটা বিস্তারিত বিবরণী পাওয়া গেছে। এইবার বাছাই করে অভিযানের দল গড়ার পালা আরম্ভ করতে হবে। যন্ত্রটা চালাবার জন্য চাই ইঞ্জিনিয়ার, পথের নানা রকম তথ্যসংগ্রহ করার জন্য চাই বৈজ্ঞানিক। যাত্রা পথের ঠিক হিসাব রাখার জন্য চাই জ্যোতির্বিদ আর চাই অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট (Astro-physicist) অর্থাৎ যেসব পদার্থবিদ্‌রা নক্ষত্র সম্পর্কে চর্চা করেছেন। এ ছাড়াও নানা বিষয়ে পারদর্শী লোক চাই। তার ওপর সকলের স্বাস্থ্য ভালো চাই, নইলে এত লম্বা রাস্তায় এ রকম বদ্ধ যন্ত্রে যাত্রা সহ্য হবে না। নানা রকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে দলটা গড়ে নিতে হবে।'

এই লম্বা ফিরিস্তি শুনে খুব দমে গেলাম আমরা। সদ্য কলেজ থেকে বেরিয়েছি, তার ওপর আবার চিয়েনের আর আমার কাছে বিজ্ঞানের 'ব'ও হল অজানা রহস্য। ধরেই নিলাম যে সব নামকরা বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা প্রফেসরের সঙ্গে কাজ করছেন তাঁরাই যাবেন আর ছোটদের মধ্যে হয়ত বা হ্যারিশ আর নিকলসন যেতে পারে। তবে এই যাত্রার সাফল্যের মূলে আমাদেরও অল্প একটু অবদান আছে এই ভেবেই নিজেদের সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম।

তার পরই প্রফেসার বললেন, ‘কাল সব কথা হবে, আজ অনেক রাত হয়ে গেছে, তার ওপর কটা দিন খুবই খাটুনি গেছে, সবারই বিশ্রাম দরকার।’ সভা ভেঙ্গে গেল, যে যার ঘরে চলে গেল আর আমরা চারজন নিজেদের বাড়িতে চলে এলাম। প্রফেসারের সঙ্গে অভিযানে যাওয়া যে আমাদের পক্ষে অসম্ভব সে বিষয়ে একরকম নিঃসন্দেহ হয়েই শুয়ে পড়লাম।

পর দিন সকালবেলায় নিকলসন এসে আমাদের প্রফেসারের কাছে নিয়ে গেল। তাঁর কাছে যেতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ‘আচ্ছা, আমি যদি তোমাদের আমার সঙ্গে এই অভিযানে নিয়ে যেতে চাই, তাহলে তোমাদের বাড়ির লোকদের কোনো আপত্তি হবে কি?’ আমরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে যখন জানিয়ে দিলাম যে আমরা ওঁর কাছে আসবার আগেই ওঁর সঙ্গে অভিযানে যাবার অনুমতি নিয়ে এসেছি, তখন তিনি বললেন, ‘খুব ভালো কথা, তাহলে তোমরা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য হ্যারিশের কাছে যাও। এই পরীক্ষায় কৃতকার্য হলে তবে তোমরা যেতে পাবে।’

ওঁর কথায় একদিকে যেমন আনন্দ হল, সেই রকম আবার পরীক্ষার কথা শুনে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লাম। বেশ একটু শঙ্কিত মনেই আমরা হ্যারিশের কাছে গেলাম।

হ্যারিশ আমাদের দেখে একটু হেসে বলল, ‘ও বুঝেছি, তোমরা পরীক্ষার খোঁজ নিতে এসেছ। ঐ কারখানাটার পিছন দিকে একটা ঘর দেখতে পাবে, সেখানে যাও।’

সে ঘরে যাবার পর কয়েকজন নামকরা বৈজ্ঞানিক আমাদের নানা রকম কাজ করিয়ে অনেক পরীক্ষা করলেন। প্রায় ঘণ্টা আষ্টেক এই পরীক্ষা চলল, আমাদের দুপুরের খাওয়াও বন্ধ রইল। শেষ পর্যন্ত যখন প্রায় বেদম হয়ে পড়লাম তখন ছাড়া পেলাম। কলেজের খেলার দলে মনোনীত হবার আগে যখন শারীরিক পরীক্ষা হয়েছিল, তখন সেগুলিকে নেহাৎ বাড়াবাড়ি বলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু সে সব এবারের তুলনায় একেবারে নগন্য।

মরিশ আর ফিসার যে এ পরীক্ষাতেও পাশ করবে সে বিষয়ে চিয়েন বা আমার কোনো সন্দেহই ছিল না, যত সন্দেহ সব আমাদের নিজেদের নিয়ে। এ রকম কঠিন পরীক্ষা খুব কম লোকই পাশ করতে পারে বলে মনে হচ্ছিল।

সে'দিন অন্য কোনো কাজ না থাকাতে বিকেল থেকেই হ্যারিশের পিছন পিছন ঘুরতে লাগলাম, যদি কোনো খবর পাওয়া যায় এই আশায়। শেষ পর্যন্ত আমাদের দশা দেখে নিকলসন একটু হেসে বলল, ‘আরে, অত ব্যস্ত হয়ে কোনো লাভ নেই। কাল দুপুরের আগে কোনো খবরই পাওয়া যাবে না। তবে বলি শোন, আমাদের পরীক্ষা অনেকদিন আগেই হয়ে গেছে, আর পরীক্ষার দুদিন পরে আমরা দুজনেই মনোনীত হয়েছি। সে জন্যই বলছিলাম ব্যস্ত হবার কোনো কারণ নেই। জানইত কথায় বলে সবুরে মেওয়া ফলে।’

নিকলসনের কাছ থেকে খবর পেলাম যে বেশ কয়েকজন বড় বৈজ্ঞানিক এই পরীক্ষায় পাশ করতে পারেন নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা এইখানেই আছেন আর দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করে চলেছেন আর নতুন নতুন সব যন্ত্র উদ্ভাবন করছেন।

তাঁদের প্রধান কাজ হবে আমাদের যানটি এখান থেকে রওনা হওয়া থেকে সুরু করে, সেই পৃথিবীতে পৌঁছনো আর সেখান থেকে রওনা হয়ে এখানে ফিরে আসা পর্যন্ত সমস্তক্ষণ যোগসূত্র বজায় রাখা।

এই কাজের জন্য মানমন্দিরের পাশেই প্রচণ্ড শক্তিশালী টেলি-লোকেটার (tele-locator) যন্ত্র বসানো হয়েছে, তার সঙ্গে একটি স্বয়ংক্রিয় ক্যালকুলেটার (automatic calculator) যন্ত্রও যুক্ত করা হয়েছে। এই যন্ত্র দুটির সাহায্যে আমাদের যানটি মহাশূন্যে কখন কোথায় আছে তার খবর রাখা সহজ হবে। সাধারণ রেডিও টেলিস্কোপ যন্ত্রে আমাদের যানটির মত ছোট জিনিসের অস্তিত্ব ঠিকমতো ধরা পড়বে না।

তাছাড়া খুব শক্তিশালী সংবাদবাহী টেলি-ভিসোফোন (tele-visophone) যন্ত্র একটি মানমন্দিরের কাছে ও আরেকটি যানটির মধ্যে বসানো হয়েছে। সাধারণতঃ আমরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় রেডিও ভিসোফোন যন্ত্রের সাহায্যে কথা বলি, এই যন্ত্রে দু পক্ষই পরস্পরের চেহারা স্পষ্ট দেখতে পায়। এই রেডিও ভিসোফোনের খুব উন্নত ধরণের একটি সংস্করণ করা হয়েছে, তারই নাম দেওয়া হয়েছে টেলিভিসোফোন।

এই সমস্ত যন্ত্রগুলির তত্ত্বাবধানের জন্য রইলেন এখানকার শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ ও অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট ডাক্তার ফস্টার নিজে। মানমন্দিরের কর্মীরা ছাড়া অন্যান্য অনেকেই ডাক্তার ফস্টারকে সাহায্য করার জন্য আছেন, এঁরা সকলেই আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানেই থাকবেন।

এঁরা সবাই মিলে আমাদের মহাশূন্যে যাত্রাপথ হিসাব করে সমস্ত পাকা করে, প্রফেসার সোমোরনের হাতে তাঁদের প্ল্যানটা দিয়েছেন আর প্রফেসারও এই প্ল্যান অনুযায়ী যানটি চালাবেন। ডাক্তার ফস্টার আর প্রফেসার সোমোরেন দুজনেই আশা করছেন যে বিশেষ কোনো অঘটন না ঘটলে, ঐ টেলিভিসন যন্ত্রে এখানকার লোকদের সঙ্গে অভিযাত্রীদের সমস্তক্ষণ সংকেতে খবরাখবর দেওয়া আর নেওয়াতো চলবেই, চাই কি এই দুই দলের মধ্যে সমস্তক্ষণ কথাবার্তাও চালানো যাবে।

এ ছাড়া প্রত্যেক অভিযাত্রীর সঙ্গে একটি করে খুব হাল্কা অথচ বেশ শক্তিশালী দ্বিমুখী রেডিও থাকবে, এগুলির সাহায্যে ১৫০০ মাইল পর্য্যন্ত নিজেদের মধ্যে কিম্বা যানটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা চলবে।

এই টেলিলোকেটার বা টেলিভিসোফোন মানমন্দিরের পাশেই একটু একটু করে বসানো হয়েছে বলে, প্রথমটা নজরে পড়ে নি। কিন্তু দেখতে দেখতে এগুলির জন্য বেশ বিরাট বাড়ি তৈয়ারী হল, নতুন ডাইনামো, জেনারেটার ইত্যাদি কত রকম যন্ত্র বসল। নতুন কর্মীরা এলেন, তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা হল। সবই চোখের সামনে হল, কিন্তু প্রথমটা এদিকে কোনো মনোযোগই দিই নি, নিজেদের চিন্তাতেই মশগুল ছিলাম, কাজেই এগুলির বিশেষ বিবরণ দিতে পারলাম না। শুধু বলতে পারি যেদিন খেয়াল হয়েছিল, সেদিন বেশ অবাক হয়েই ভেবেছিলাম এগুলি হল কবে।

এসব ঘটনাতো আমাদের এই পরীক্ষা হবার আগেই হয়ে গেছে। তখনও আমরা কেউ ভাবতে

পারি নি সত্যিই এ রকম একটা অভিযানে আমরা যোগ দিতে পারি। এবার হয়তো ভাগ্য খুলবে, কিন্তু নিকলসনের উপদেশ মতো সবুর করাটাই যে দেখছি ভয়ানক শক্ত।

আমরা নিকলসনের কাছ থেকে চলে এলাম বটে কিন্তু আমাদের একমাত্র চিন্তা হল পরের দিন দুপুর কখন হবে। টেলিলোকেটার আর টেলিভিসোফোন যন্ত্র দুটি খুব ভালো করে দেখে সন্ধ্যেটা কাটিয়ে ফেললাম, কিন্তু তারপর আবার সেই একই অবস্থা, সময় আর কাটে না। শেষ পর্যন্ত কিছু করার না পেয়ে সামনের পাহাড়টাতেই বার দুই ওঠা নামা করলাম। এতক্ষণে রাতের খাবারের সময় হল আর বাঁশী বেজে উঠল।

খেয়ে দেয়ে শুতে গেলাম বটে, কিন্তু ঘুমের দেখা নেই, ভোরের দিকে একটু তন্দ্রা মতো হয়েছিল, ঐ পর্যন্তই। ভোর না হতেই উঠে মুখ হাত ধুয়ে পায়চারি করে বেড়াচ্ছি আর চিয়েনের কথা মনে করে হিংসা হচ্ছে। সারারাত কেমন অঘোরে ঘুমোল, আগেই বলেছি হাজার উদ্বেগ থাক না কেন, চিয়েন নিশ্চিন্ত মনে অকাতরে ঘুমোবেই। এদিকে বেলা যেন ফুরোতে চায় না, এক এক ঘণ্টা মনে হতে লাগল যেন এক একটা দিন। সব কিছুরই শেষ আছে, কাজেই আমাদের এই ধৈর্য পরীক্ষারও শেষ হল এক সময়, প্রফেসারের কাছ থেকে ডাক এল।

১১

দুরু দুরু বুকে প্রফেসারের ঘরে যেতেই তিনি একগাল হেসে বললেন, 'কি হে, কি ব্যাপার? কাল সারারাত ঘুম হয়নি বুঝি? আরে যাবার নাম শুনেই এই কাণ্ড, তাহলে তোমরা কি করবে বলতো?'

এই সম্ভাষণ শুনে আমাদের যাওয়া হল না মনে করাটাই স্বাভাবিক, তবে প্রফেসারের হাসি মুখ দেখে মনের কোণে আমার একটু ক্ষীণ রেখা জেগে উঠলেও, আমাদের কারো মুখে কোনো কথা ছিল না।

আমাদের চুপ দেখে উনি বললেন, 'আমার সঙ্গে যে ৪৫ জন যাবে বলে মনোনীত হয়েছে তার মধ্যে তোমরা চারজনও আছ। তবে চিয়েন আর প্রশান্ত, তোমরা একেবারে ছেলেমানুষ বলে তোমাদের নিয়ে যাবার ইচ্ছা আমার একেবারেই ছিল না। নেহাৎ তোমরা ঐ পুরোনো পৃথিবীর কটা ভাষা জান, সেজন্যই তোমাদের নেওয়া হচ্ছে। জানো বোধহয়, ওখানকার ভাষা যাঁরা জানেন তাঁরা কেউই এই ক্যাম্প পর্যন্ত আসতে রাজি হন নি। তাঁরা বলেছিলেন যে বইপত্র তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দিলে তাঁরা তর্জমা করে দেবেন। এ ব্যবস্থাটা কোনো কাজেরই বলে মনে হয় নি, ঠিক এমনি সময় মরিশের চিঠি এসে পৌঁছোল। সঙ্গে সঙ্গেই হ্যারিশকে বললাম তোমাদের এখানে আসতে লিখুক। কারণ তোমরা হাতের কাছে থাকলে, আমাদের যখন দরকার তখনই তর্জমা করিয়ে নিতে পারব। এই হল তোমাদের এখানে আসার আসল কারণ।'

যে কারণই হোক না কেন, আমাদের প্রফেসারের সঙ্গে মহাশূন্যে যাত্রা হচ্ছে, এটা সঠিক জেনে

আনন্দের সীমা রইল না। আমি তো মনে মনে সেই পৃথিবীতে পৌঁছে কত লোকের সঙ্গে আলাপ করতে পারব তাই ভাবতে লাগলাম।

প্রফেসার অন্য একটা কাজে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই, আমরা চারজনে হৈ হৈ করে বেরিয়ে এলাম মনের আনন্দে। নিজেদের ঘরে ফিরে এসে আমাদের কি নাচ আর গলা ছেড়ে গান সে আর কি বলব! যদিও আগে থেকেই স্বীকার করে রাখি যে সাধারণতঃ স্নানের ঘরেও আমাদের কারো গুনগুন করে গান করারও সাহস নেই।

গান আর বেশীক্ষণ গাইতে হল না, মিনিট ছুয়েকের মধ্যেই হ্যারিশ এসে হাজির আর আমাদের কি বকুনিটাই না লাগাল! আমাদের হল্লার চোটে নাকি সবার কাজকর্ম বন্ধ হবার দাখিল—!

কি আর করব, গানের আসর ভাঙ্গতে হল। ঘর থেকে বেরিয়ে নিকলসনের কাছ থেকে যখন জানতে পারলাম যে প্রফেসার এ বেলাও অন্য কাজে ব্যস্ত থাকবেন আর আমাদের কোনো কাজ দেন নি, তখন আমরা চারজন সেই লেকের ধারে গিয়ে আবার মনের আনন্দে গান শুরু করে দিলাম। কোথা দিয়ে যে সময় কেটে গেল বুঝতে পারার আগেই ছুপুরের খাবারের বাঁশীর শব্দ কানে এল। শব্দ শুনেই ছুটলাম খাবার ঘরে।

ঘর ভরা লোক, খাওয়া শেষ হলে প্রফেসার বললেন, 'অভিযানে যারা যাবে, তাদের সকলের সঙ্গে বিশেষ কথা আছে। কাল সকালেই খাবার পর সকলে যেন আমার ঘরে এসে জমায়েত হয়।'

এর পর আর কে ঘরে বসে থাকে? সোজা আবার সেই লেকের পার আর আবার সেই হৈ চৈ। একেবারে রাত্রের খাওয়া শেষ করে ঘরে ফিরলাম। এসে শুয়ে পড়লাম বটে, কিন্তু অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করেই কাটল, উত্তেজনায় ঘুম আসছিল না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়লাম, পরের দিন সকাল বেলায় হ্যারিশ এসে না ডাকা পর্যন্ত ঘুম ভাঙ্গল না।

খাবার পর সকলে প্রফেসারের ঘরে এসে হাজির হলাম। শুধু নামই শুনেছি এমন কত প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সেখানে ছিলেন। নিকলসন আমাদের পাশে বসে এক একজনকে দেখিয়ে দিতে লাগল। প্রফেসার হ্যারড, ডাক্তার ফস্টার, ডাক্তার ফন প্যাপেন, ডাক্তার রোমানভ, প্রফেসার ধর ইত্যাদি কত নামই শুনলাম আর নিজেদের চোখে তাঁদের প্রথমবার দেখলাম। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারী, কত রকম বিষয়ে অদ্বিতীয় পণ্ডিত এঁরা।

আমাদের মতো জনকয়েক চুনোপুঁটিও যে এইসব রাঘববোয়ালদের সঙ্গে একই অভিযানে একসঙ্গে যাচ্ছে ভাবতেও অবাক লাগছিল। খালি মনে হচ্ছিল স্বপ্ন দেখছি, ঘুম ভাঙ্গলেই আসল ব্যাপারটা টের পাব। কেমন করে এ রকম একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটতে পারে, তা শুধু ছু একটা গল্পের বইয়ে পড়েছিলাম, তখন কি একবারও ভেবেছিলাম যে আমাদেরও ঐ রকম নাটকীয় অবস্থায় পড়তে হবে?

প্রফেসার সকলকে ডেকে বললেন, যাদের ট্রেনিং নেওয়া হয়ে গেছে তাদের আরেকবার সমস্ত বিষয়টা ঝালিয়ে নিতে হবে। প্রশান্তরা চারজন আরও ছু তিন জনের ট্রেনিং বাকি, এদের ট্রেনিং আলাদা

করে হবে। প্রফেসর হ্যারড, ডাক্তার ফস্টার, ডাক্তার রোমানভ আর প্রফেসার ধর, এঁরা চারজন আমাদের যাত্রাপথের নিশানা আরেকবার হিসাব করে দেখতে চান, কাজেই ওঁরা তাঁদের সহকারীদের নিয়ে আবার কাজে লেগে যাবেন।'

এর পরই সকলের ট্রেনিংএর ব্যবস্থা শুরু হয়ে গেল। অন্যদের কথা বলতে পারব না, নিজেদের-টারই একটু আভাস দিচ্ছি। মহাকাশে যাত্রার সময় কি রকম পোষাক পরতে হবে, কি রকম করে রওনা হবার সময় যানটিতে বসতে হবে, পথে কি রকম করে বসবাস করতে হবে, নতুন কোনো গ্রহে নামবার আগে আর সেখানে নেমে কি কি অবশ্যকরনীয়, এই রকম নানান্ বিষয়ে তালিম দেওয়া শুরু হল। কখনো কখনো মনে হত যে এত ঘটা, এত সাবধানতা যেন বড় বেশী বাড়াবাড়ি ; কিন্তু পরে যখন কি রকম বিপদের সামনে পড়তে হতে পারে তার বর্ণনা দিয়ে, প্রত্যেক অবস্থায় কি করনীয় তা বলা হতে লাগল, তখন বুঝতে পারলাম কেন এত ঘটা করে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। সত্যি কথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে এই সব বিপদ আপদের কথা আমার মাথায় কোনোদিনও আসে নি।

আমাদের প্রত্যেকের ওজন নেওয়া হয়েছে, প্রত্যেকের রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছে, প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে কতটা বাতাস দরকার তার হিসাব নেওয়া হয়েছে, এমন ধারা হাজার রকম পরীক্ষা করা হয়েছে আর তার ফলাফল ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করাও হয়েছে।

প্রত্যেকের জন্য এক জোড়া পোষাক বিশেষভাবে তৈরী হয়েছে। এতে মাথা থেকে পা পর্যন্ত সবটা ঢাকা থাকবে আর যখন যানটির বাইরে বেরোব তখন এইটাই হবে আমাদের বহিবাস। এই জামা, ঠাণ্ডা গরম যে কোনো অবস্থাতে শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত থাকবে। এটা জলে ভিজবে না, আগুনে পুড়বে না বা কোনো রাসায়নিক প্রভাবে এর ক্ষতি হবে না। এর প্রত্যেকটির সঙ্গে খুব শক্তিশালী একটি ছোট্ট হাল্কা রেডিও লাগানো আছে, তাই দিয়ে ১৫০০।২০০০ মাইল দুরে থেকেও নিজেদের মধ্যে কিম্বা যানটির সঙ্গে, অনায়াসে কথাবার্তা বলতে পারা যাবে। তার ওপর আবার জামার পিঠের দিকে ছোট একটা যন্ত্র লাগান রয়েছে, সেটার সাহায্যে দরকার হলে, ঘণ্টায় ১০০ মাইল বেগে প্রায় ২৫০০ মাইল পর্যন্ত শূন্যপথে ঘোরা ফেরা করা যেতে পারবে। এই জামা পরে রোজ কয়েক ঘণ্টা ঘোরা ফেরা অভ্যাস করতে হল।

এবার মহাশূন্যে যাত্রাপথে যে রকম খাবার খেতে হবে সেই রকম খাওয়া আরম্ভ হল। নানা রকম বড়ি, শরীর পুষ্টির জন্য যে যে রকম উপাদান দরকার সেগুলি দিয়ে তৈরী, তবে বেশ মুখরোচক, নইলে কিছুদিন ধরে এই বড়ি খাবার পর, কারো কারো খিদে নষ্ট হয়ে যায়, কিম্বা খাওয়া এত কমে যায় যে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। এই ভাবে দিনকয়েক কাটল। টিউবে ভরা কিছু খাবারও ছিল, মুখের মধ্যে টিপে টিপে খেতে হয়।

মহাশূন্যে যাত্রার জন্য আমাদের যানটিতে অভিযানের প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্র নেওয়া হয়েছে। যথেষ্ট পরিমাণে ইন্ধন নেওয়া হয়েছে, যন্ত্রটির আগাগোড়া খোল নলচে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখা

হচ্ছে, সব ঠিক আছে কি না।

ডাক্তার ফস্টার আগেই যাত্রাপথের পুরো নির্দেশ দিয়ে দিয়েছিলেন, সেটা আবার সকলে মিলে হিসাব করে দেখছেন ঠিক আছে কিনা। যাঁরা যানটি চালাবেন, তাঁদের এ সম্বন্ধে ডাক্তার ফস্টার নিজে ভাল করে বার বার বুঝিয়ে দিচ্ছেন। সমস্ত হিসাব বার বার করে দেখা হচ্ছে, যাতে কোনো ভুল না থেকে যায়।

যাত্রা করার দিন যতই কাছে আসতে লাগল, ততই কর্মব্যস্ততা বাড়তে লাগল। চারদিক থেকে অনেক গণ্যমান্য লোকেরা এসেছেন, আমাদের শুভেচ্ছা জানাবার জন্য। সবাই নাম করা লোক, তাঁদের কেউ কেউ আমাদের ডেকে বলছেন যে আমাদের ওপর তাঁদের খুব হিংসা হচ্ছে, এমন একটা অভিযানে আমরা চলেছি আর তাঁরা যেতে পেলেন না, কারণ তাঁদের বেশী বয়স হয়ে গেছে, নয়তো এমন সব কাজের ভার নিয়ে আছেন যা ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। চুপ করে শুনে যাই সব কথা আর এই রকম একটা অভিযানে যেতে পারছি ভেবে মনে মনে গর্ব অনুভব করি।

ক্রমশঃ
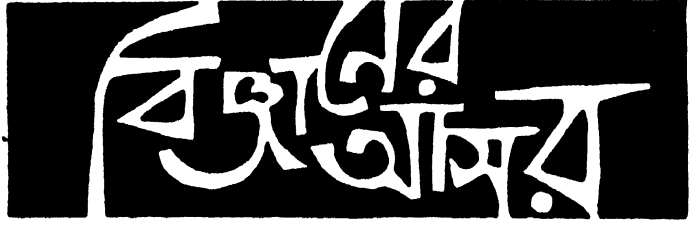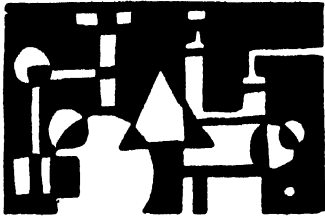
পৃথিবীর প্রথম পাখি

নির্মলজ্যোতি দেব

প্রাচীনকালে পৃথিবীতে যে সমস্ত অদ্ভুত প্রাণীদের দেখা গিয়েছিল তাদের বর্তমানে আর দেখা যায় না, পৃথিবী থেকে তারা ক্রমশঃ এক এক করে লোপ পেয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর স্থানে স্থানে সেকালের নানা জাতীয় প্রাণীর চিহ্ন আজও দেখা যায়। পণ্ডিতরা এই সমস্ত প্রাণীর কঙ্কাল দেখে গবেষণা করে তাদের সম্বন্ধে বহু অজানা বিষয় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এই ভাবে পণ্ডিতদের গবেষণার সাহায্যে পৃথিবীর প্রথম পাখির সম্বন্ধেও সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানা গিয়েছে।

পৃথিবীর প্রথম পাখির হাড় ও পালক পাওয়া গিয়েছে জার্মানীর 'সোলেনহ্‌ফেন' নামক স্থানে। সোলেনহফেনের একটি পাথরের খনিতে এই পাখির চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল বলে এই পাখিকে বলা হয়ে থাকে 'সোলেনহফেনের পাখি'। কিন্তু এই পাখির বৈজ্ঞানিক নাম হল আর্কিঅপ্টেরিক্স্‌। এই শব্দটি গ্রীক। এর অর্থ পুরাতন পাখি।

এই পাখির মাথাটি ছিল বেশ বড়; চোখ দুটিও ছিল বড় বড়। এই বড় চোখের সাহায্যে এরা অনেক দূরের জিনিস সহজেই দেখতে পেত।

এখনকার কোন পাখিদের মধ্যে আমরা দাঁত দেখতে পাই না। স্তন্যপায়ী জীব এবং পক্ষিজাতির মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে দাঁত নিয়ে। যাদের পাখা থাকে তাদের মুখে দাঁত দেখা যায় না। কিন্তু সেকালের এই আর্কিঅপ্টেরিক্স পাখির মুখে দাঁত দেখা গিয়েছিল পাখিদের মুখে দাঁত! এ ভাবনা আজ-কাল আমরা আর ভাবতেও পারি না।

এদের ডানা আজকালকার পাখিদের ডানার মত ছিল না এই আর্কিঅপ্টেরিক্স পাখির ডানায় ছোট ছোট আঙুল ছিল। ডানাগুলি আকারে বেশ বড় ছিল। এই ডানার সাহায্যে এই পাখিরা খুব দ্রুত বেগে উডতে পারত।

এদের লেজ ছিল সরীসৃপের লেজের মত লম্বা, হাড় ও মাংস দিয়ে গড়া ও পালক দিয়ে ঢাকা। আর্কিঅপ্টেরিক্স-এর লেজটি এ যুগের সাধারণ পাখির লেজের মত ছিল না, খানিকটা গোসাপের লেজের মত ছিল। ওই গোসাপের লেজে জোড়া জোড়া করে পালক পরালে যেমন আকার হয় এই পাখিদের লেজ ছিল ঠিক সেই রকম।

এই পাখির দুটি লম্বা লম্বা পা ছিল এক গাছ থেকে অন্য গাছে লম্বা পা দিয়ে হেঁটে বেড়াত।

হাতের মতো এদের আরও দুটি অঙ্গ ছিল। এই অঙ্গ দুটির সাহায্যেও এ গাছে ও গাছে ঘুরে বেড়াত।

এই আর্কিঅপ্টেরিক্স পাখিরা অত্যন্ত সাহসী ছিল। সেকালের পাখিরা যখন এই পাখিদের আক্রমণ করতে আসত, তখন এই পাখিরা নিজেদের শক্ত ডানা ও পায়ের আঙ্গুলের ধারাল নখ অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করত, অনেক সময় দাঁত দিয়ে অন্য পাখিদের গলা কামড়ে ধরে তাদের আক্রমণ করত।
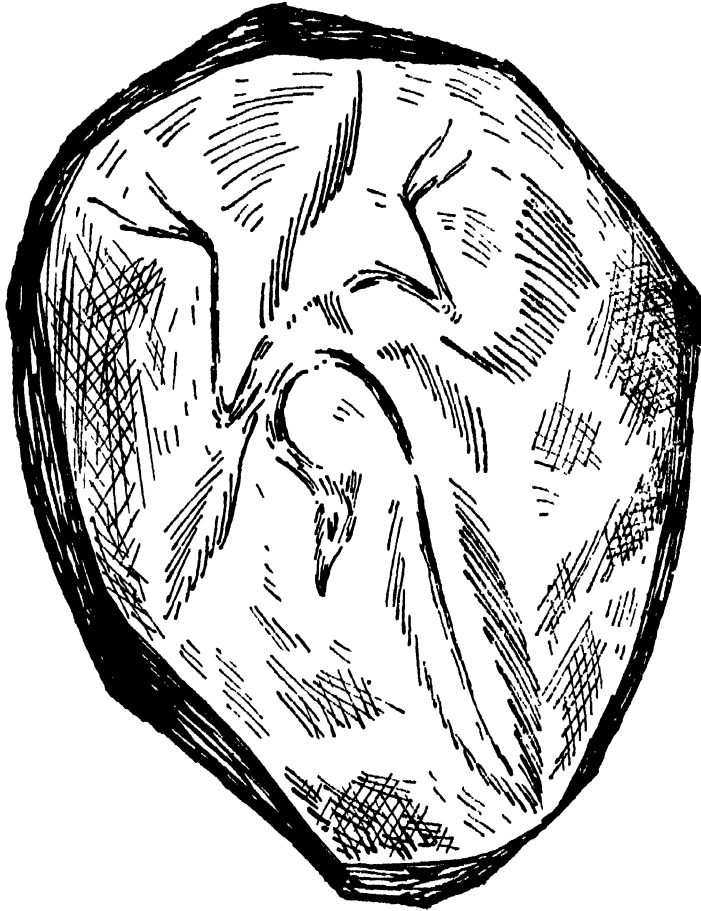
পৃথিবীর প্রথম পাখি

এই পাখিদের দেহের গঠন অনেকটা একালের কাকের মত ছিল, তবে কাকের চাইতে এই পাখিরা ছিল আকারে অনেক বড়। সেকালের ছোট ছোট পোকামাকড় গাছের ফল ও মাছ ছিল এই 'আর্কি-অপ্টেরিক্স' পাখিদের প্রধান খাদ্য।

বিজ্ঞানে উপেন্দ্র কিশোর

শ্রীশিলাদিত্য

তোমরা সকলেই জান যে উপেন্দ্রকিশোর মজার কবিতা আর গল্প লিখেছেন ছোটদের জন্য, আ রামায়ণ মহাভারতের গল্প লিখেছেন এমন করে যাতে ছোটরা পড়ে আনন্দ পায়। কিন্তু তোমরা হয় অনেকেই জান না যে উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন 'কথায় ও কাজে' একজন পুরো বৈজ্ঞানিক। আ তোমাদের সেই বৈজ্ঞানিক উপেন্দ্রকিশোরের কাছে নিয়ে যাব।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রমদাচরণ সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় 'সখা' পত্রিকাটি প্রথ প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় উপেন্দ্রকিশোর বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন বৈজ্ঞানিক লেখা, এর ভাষা ছিল খুব সোজা। যাতে করে তোমাদের মত ছোটরাও বুঝতে পারে পড়বার সময় মনে হত বোধহয় গল্প পড়ছি, অথচ পড়া শেষ হলে দেখা গেল বিজ্ঞানের অনেক খব জানা হয়ে গেছে। এই পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রবন্ধগুলোর মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে জীববিজ্ঞান সম্বে লেখা ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যায় 'মশা'। পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে 'মূলবর্ণ' নামে এক প্রবন্ধ লিখে শুরু করলেন ১৮৮৫র আগস্ট মাস থেকে ধারাবাহিক ভাবে। পরের বছর ডিসেম্বর থেকে ধারাবাহি ভাবে লিখলেন 'দীপশিখা' নামে এক প্রবন্ধ, এটি ছিল রসায়ন বিদ্যা বিষয়ে।

এখানে তোমাদের বলে রাখি যে জীববিদ্যা হল প্রধানতঃ জন্তুজানোয়ার আর গাছপালার কথা।

পদার্থ বিদ্যায় আছে তাপ, আলো, বিদ্যুৎ প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তি আর তাদের কাণ্ডকারখানা রহস্য।

রসায়ন বিদ্যায় আছে কোন জিনিস তেতো, কোনটা মিষ্টি, লেবুর রসের সঙ্গে চুণ মেশালে কি হয়, এমনি সব জিনিস আর তেল জল বাতাস এমনি আরো অনেক রকম জিনিসের ভেতরের খবর তোমাদের মধ্যে যারা বিজ্ঞান নিয়ে পড়ছ তারা নিশ্চয়ই এগুলো জানো।

এখন তোমাদের যে 'সখা' পত্রিকার কথা বলছিলাম তাতে 'নানাপ্রসঙ্গ' বলে বিজ্ঞানের একটা দপ্ত থাকত, এই তোমাদের যেমন থাকে প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর, তেমনি। ঐ বিভাগটিতে উপেন্দ্রকিশো বিজ্ঞানের হেন জিনিষ নেই যা নিয়ে লেখেননি।

এছাড়া ভুবনমোহন রায় সম্পাদিত 'সাথী' (প্রথম প্রকাশ ১৩০০) ও শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদি 'মুকুল' (প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩০২) পত্রিকায়ও উপেন্দ্রকিশোর নিয়মিত লিখতেন।

এই 'মুকুল' পত্রিকাতেই উপেন্দ্রকিশোর 'সেকালের কথা' নাম দিয়ে, হাজার হাজার বছর আগে এই পৃথিবীতে যে সব জন্তু জানোয়ার থাকত তাদের কথা এবং কিভাবে বৈজ্ঞানিকরা তাদের কথা জানতে পেরেছেন সে সম্বন্ধে লিখেছিলেন।

১৯০৩ সালে তিনি এই লেখাগুলোকে একসঙ্গে করে একটু আধটু পাল্টিয়ে আর অনেকগুলো নতুন ছবি এঁকে 'সেকালের কথা' নাম দিয়ে বই বার করেন।

এই বইএর ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, 'ছেলেদিগকে যেরূপ করিয়া জানোয়ারের গল্প শুনাইলে তাহারা আমোদ পায় সেইরূপ সহজ কথায় সহজ ভাষায় পুস্তকখানি লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি।'

তিনি অবশ্য লিখেছেন, 'সকল কথাই বিজ্ঞানের তুলাদণ্ডে মাপিয়া বলা সম্ভব হয় নাই' কিন্তু তখনকার বাংলা দেশে শিক্ষা-অধিকর্তা এবং বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক আলেকজাণ্ডার পেডলার এফ. আর. এস. এই বইটির প্রশংসা করে লিখেছিলেন' I have to thank you very much for the book you have sent to me. It seems very interesting and is got up extremely well. I had no idea such good illustration, printing etc could be done in Bengali.' কাজেই বইটা যে কত ভালো হয়েছিল বুঝতেই পারছো।

এই বই থেকে একটু উদাহরণ দিচ্ছি 'মোটামুটি একথা বলা যায় যে নীচের মাটি অথবা পাথর আগেকার, আর উপরের মাটি অথবা পাথর পরের। যদি এইরূপ দেখা যায় যে কোনো এক প্রকার মৃত্তিকা সর্বদাই অন্য একপ্রকার মৃত্তিকার উপরে থাকে, নীচে কখনও থাকে না, তবে একথা মনে করা অসঙ্গত হয় না যে ঐ নীচেকার মাটি উপরকার মাটির চেয়ে পুরাতন। এইরূপ করিয়া নানা রকম মাটি এবং পাথরের বয়স স্থির হইয়া থাকে এবং ঐ সকল মাটিতে অথবা পাথরে যে জন্তুর চিহ্ন পাওয়া যায় তাহারও ঐরূপ বয়স সাব্যস্ত হয়।'

এ একেবারে পাকা ভূতত্ত্ববিদের মতো কথা। আবার যখন তিনি জীবজন্তুর কথা বলেছেন তখন একেবারে অন্য মানুষ।

তোমাদের কৌতূহল মেটাতে পুরো লেখাটাই সন্দেশে প্রকাশের জন্য এর পরে পাঠাব।

এ ছাড়া তিনি সরযূবালা দত্ত সম্পাদিত 'ভারত মহিলা' (প্রথম প্রকাশ ১৩১২) এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৩০৮ সালের বৈশাখ থেকে প্রকাশিত 'প্রবাসীতে' বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছেন।

উপেন্দ্রকিশোর যে জ্যোতির্বিজ্ঞান অর্থাৎ আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের কথাও ভালভাবে জানতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাঁর আত্মীয় যতীন্দ্রনাথ মজুমদারের লেখা 'আকাশের গল্প' নামক বইতে। এই বইতে লেখক উপেন্দ্রকিশোরের ঐ বিষয়ের প্রবন্ধ থেকে সাহায্য নেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। কাজেই তিনি যে 'কথায়' বৈজ্ঞানিক ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে আজ থেকে প্রায় ৮০ বছর আগে আর মাত্র ২০ বছর বয়সে তিনি বাংলা ভাষায় এমন সুন্দরভাবে বিজ্ঞানের কথা লিখে গেছেন, অথচ আজও আমরা সর্বস্তরে বাংলায় বিজ্ঞান লিখতে ও পড়তে কুণ্ঠা বোধ করছি।

কিন্তু তিনি যে খালি কথায়ই নয় কাজেও ছিলেন বিজ্ঞানের সাধক সেটা একবার দেখা যাক।

বিজ্ঞানে তাঁর কাজ প্রধানতঃ রং বেরংএর ছবি বইএ ছাপার ব্যাপারে। তাঁর আবিষ্কারের কথা

বলতে গেলে 'ব্লক' তৈরীর কথা বলতে হয়। তোমাদের 'সন্দেশে' বা অন্যান্য বইতে যে সব ছবি ছা হয় তার জন্য ব্লক তৈরী করতে হয়। এক খণ্ড কাঠের উপরে দস্তা বা তামার পাত লাগানো হয় বই এ যে ছবি ছাপানো হবে তা যেন এই পাতে উল্টো ভাবে খোদাই করা থাকে। আসলে খোদাই করে, এরকম উঁচু নীচু করা হয় রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে, যার ফলে কতগুলো জায়গা খ'য়ে য আর অন্য জায়গা ঠিক থাকে।

উপেন্দ্রকিশোরের আবিষ্কারের মধ্যে প্রধান হ'ল নানারকম ডায়াগ্রাম সৃষ্টি যার ফলে হাফটো ব্লক (এক রকম বিশেষ ব্লক) আগের চেয়ে আরও পরিষ্কার আর মসৃণভাবে ছাপা সম্ভব হয়েছে। অ 'রে স্ক্রীন এ্যাডজাস্টার' নামক যন্ত্র তৈরী যা দিয়ে স্ক্রীন অর্থাৎ পর্দাকে যন্ত্রের সাহায্যে নিখুঁতভা ক্যামেরায় ঠিক জায়গায় ফেলা যায়। আগে এই কাজ হাতে করা হোত। এর জন্য ধৈর্য আর প্র সময় লাগত আর যে লোক যত ভাল পারত ছবিও তত ভাল হোত, কাজেই সব লোকের সাহায্যে কাজ ভালভাবে করা যেত না।

উপেন্দ্রকিশোরের আবিষ্কারের ফলে খুব সহজেই নিখুঁত ভাবে এই কাজ হতে লাগলো।

বিলাতের হাফটোন মুদ্রক আর হাফটোন প্রস্তুতের যন্ত্রপাতি নির্মাতা 'পেনরোজ' কোম্পানী তাঁ অনুমতি নিয়ে এই দুটো জিনিষের পেটেন্ট নিয়ে তৈরী ও বিক্রির একমাত্র অধিকারী হন। একজ ভারতীয়ের আবিষ্কারকে পরিচিত করবার ও তাদের দেশে চালাবার এই উৎসাহ থেকে তাঁর আবিষ্কারে দাম বোঝা যায়। ব্লক তৈরীতে 'ডুয়োটাইপ' ও রেটিণ্ট প্রণালীও তিনিই আবিষ্কার করেন।

এইজন্যে ইউরোপে পরিচিত বৈজ্ঞানিক মহলে উপেন্দ্রকিশোরের নাম অনেকেই জানেন। তাঁ আবিষ্কারের বিশদ বিবরণ পেনরোজ কোম্পানী 'পেনরোজ এ্যানুয়াল' নামক পত্রিকায় নিয়মিত প্রক করতেন।

উপেন্দ্রকিশোরের আবিষ্কারের উচ্চ প্রশংসা করে তার কার্যকারিতার কথা বিখ্যাত বিজ্ঞানী ইউলিয় গ্যাম্বেল বার বার বলেছেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর উক্ত পত্রিকায় শোকপ্রকাশ করেন।

কলেজে তিনি বিজ্ঞান পড়েছিলেন। আলোক-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর এই আবিষ্কারে সেই পড়াশু কাজে লাগে তাছাড়াও তাঁকে ঐ বিষয়ে বিদেশী বই পড়ে নিতে হয়।

বাদ্যযন্ত্র বিজ্ঞানেও তিনি দক্ষ ছিলেন। সেজন্য প্রসিদ্ধ বাদ্যযন্ত্র নির্মাতা 'ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্সে প্রতিষ্ঠাতা ও মালিক দ্বারকানাথ ঘোষ যন্ত্র নির্মাণে তাঁর উপদেশ নিতেন। 'বেহালা শিক্ষা' ও 'হারমোনিয় শিক্ষা' নামে তাঁর লেখা বইদুটো এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞানে উপেন্দ্রকিশোরের এই দান উল্লেখ করে আমি তাঁকে প্রণাম জানালাম।

যেমন কর্ম তেমনি ফল

স্মরণ দাশগুপ্ত। জলপাইগুড়ি। গ্রাহক নং ৮৪৯।

হঠাৎ আমার ঘুমটা ভেঙে গেল। সেই রাত্রে আমি একটা স্বপ্ন দেখলাম। আমি দেখলাম যে পৃথিবীর বড় বড় শহরগুলো যেমন—লণ্ডন, ইয়র্কশায়ার, টোকিও প্রভৃতি শহরগুলি গ্রামে পরিণত হয়েছে ও গ্রামগুলি বড় বড় শহরে পরিণত হয়েছে। যে শহরগুলি গ্রামে পরিণত হয়েছে সে যায়গার লোকগুলো হায় হায় বলে চিৎকার করছে ও যে গ্রামগুলি শহরে পরিণত হয়েছে সে জায়গার লোকেরা আনন্দে নাচছে। আমি ভাবলাম বড় বড় শহরগুলি যেমন বড়াই করত তাই ভগবান তাদের এমন দুর্দশায় ফেলে দিয়েছেন অর্থাৎ যেমন কর্ম তেমন ফল। তখন আমি খুব আনন্দিত হলাম! ভারতের প্রচুর গ্রাম-গুলি শহরে পরিণত হয়েছে দেখে আরও আনন্দিত হলাম। হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল তখন আমি দেখলাম যা ছিল তা ঠিকই আছে।

সর্বনাশ

উদয়ন মুখোপাধ্যায়। ৮৬৯। বয়স —১০।

একটা বাড়ীতে মাষ্টারমশাই এসেছেন। মাষ্টার বেশ ভাল। গোলগাল মুখখানা, নাম শ্রীসুদীপ বসু। ছাত্র আজ পড়ছে না, খালি ছট্‌ফট্ করছে। তাই দেখে সুদীপ তাঁর ছাত্রকে বল্‌লেন, তুমি আজ ভাল ভাবে পড়ছ না কেন? ছাত্র বল্‌ল আমার ভাল লাগছেনা। সুদীপ বল্‌লেন, আমি সিঁড়ি ভেঙ্গে কত কষ্ট করে তিনতলায় উঠেছি, আর তুমি বল্‌ছ তোমার ভাল লাগছেনা এ ত ভারী অন্যায় কথা! তাই শুনে ছাত্র দৌড়ে গিয়ে তার মাকে বল্‌ল, সর্বনাশ হয়েছে! মাষ্টারমশাই সিঁড়ি ভেঙ্গে ফেলেছেন।

মা—সে কিরে!

ছাত্র :—হাঁ মা মাষ্টারমশাই বলছেন আমি এত কষ্ট করে সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠেছি, আর তুমি বলছ আমার ভাল লাগছেনা॥

সন্দেশ

শুভ্রা বন্দ্যোপাধ্যায় বয়স ১০—গ্রাহক নং ১৫৪২

বিকেলবেলা স্কুল থেকে ফিরে সোজা ওপরে উঠেছি। মা মা ভীষণ খিদে পেয়েছে শীগগির খেতে দাও।

যেমন রোজ রোজ টিফিন ফেলে যাওয়া—মা বকতে বকতে বেরিয়ে এলেন।

'বুনু, ও বুনু', বাবার সাড়া পেলাম। ছুটতে ছুটতে শুনতে পাচ্ছি বাবা বলছেন—তোমার জন্য আমি 'সন্দেশ' এনেছি।

দাও দাও আগে দাও আমি বললাম।

বাবা বললেন—'না আগে হাত মুখ ধুয়ে স্কুলের জামা কাপড় ছেড়ে এস।'

আমার অত তর সয় না। বাবার পিঠের কাছে ঝুলে বায়না করতে লাগলাম—না না আগে দাও। বাবা বললেন আগে তুমি আমার কথা শোন তখন। তখন খিদেতে আমার পেট জ্বলছে কই কতগুলো এনেছ দেখি না দেখি না।

ন টাকার সন্দেশ—এখন পাবে না আগে তৈরি হয়ে এস তারপর দেব।

হাতমুখ ধুয়ে এসে দেখি বাবা নিচে চলে গেছেন। ইতিমধ্যে কেকা শ্বেতা রাণু সবাই খেলতে এসে গেল। তাদের বললাম—আজ শুধু খেলা না তোদের পেট ভরে সন্দেশও খাওয়াব।

সন্দেশ খেতে কার না ভাল লাগে? আমি এক ছুটে লক্ষ্মীদির কাছে গেলাম—আজ খুকুদিকে নিয়ে আমাদের বাড়ি যেতেই হবে।

—'কেন রে?'

—তা বলব না—যদিও আমার খুব বলতে ইচ্ছা করছিল তবু চেপে গিয়ে লাফাতে লাফাতে ফিরে এলাম।

আজ আর খেলা জমছে না। সবাইকার মনেই তখন সন্দেশ খাবার লোভ।

আমি কতগুল প্লেট নামিয়ে টেবিলে রাখলাম। প্রত্যেকটায় চামচ দিলাম। কয়েকটা গেলাসে জল গড়িয়ে রাখলাম। তবুও বাবা আসছেন না দেখে নীচে গেলাম। কেকারাও আমার সঙ্গ ছাড়ল না।

বাবা তখন বন্ধুদের সঙ্গে জমিয়ে গল্প করছেন। গল্প আর ফুরোয় না। আমার ধৈর্য থাকছে না। বন্ধুরাও বাড়ি যেতে চাইছে। ওদিকে আবার লক্ষ্মীদিদের ওপরে বসিয়ে এসেছি। মা গেছেন মহিলা সমিতিতে। শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে বাবার কাছে গেলাম। চুপি চুপি বললাম—শিগগির করে দাওনা বাবা ওরা থাকতে চাইছে না।

—'ওরা কারা?'

—বারে কেকাদের আটকে রেখেছি যে ন'টাকার সন্দেশ কি আমি একলা খাব নাকি?

বাবা তখন হো হো করে হাসতে লেগেছেন। কি বোকা মেয়ে তুমি! আমি কি খাবার সন্দেশ এনেছি নাকি? ও তো 'সন্দেশ' পত্রিকা! আজই কলেজের ঠিকানায় এসে গেছে। বাবার বন্ধুরাও খুব হাসছেন। আমি তখন লজ্জার চোটে কেঁদে ওপরে দৌড়। লক্ষ্মীদি তখন বলছেন—বোকা মেয়ে এত মজাই হল। খাবার হলে তো খেলেই ফুরিয়ে যেত। এ কেমন আমরা সবাই এক বছর ধরে পড়তে পাব। তখন কেঁদে ফেললে কি হয় এখন যখনই ঘটনাটা মনে পড়ে তখন মজাই লাগে। সত্যি 'সন্দেশের' গল্পগুলি এতই মিষ্টি যে খাবার সন্দেশের চেয়েও ভাল লাগে।

"জহরলাল নেহরু"

গোপা পাল—বয়স ১২ গ্রাহক নং ২৭৭৫

বুধবারদিন সকাল সাড়ে পাঁচটার সময় আমরা তিনজন শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে গিয়েছিলাম। অবশ্য বেড়াতে না বা অন্য কোন মজার জিনিস দেখতে না, সারা ভারতে দুঃখের ছায়া নেমেছে। আমাদের বিশিষ্ট নেতার পরোলোকগমনে তাঁর শেষ চিহ্ন দেখতে পৃথিবীর মাটির বুকের উপর হাজার হাজার মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। বড় বাড়ীর বারান্দায় লোক ভরতি। তাদের সবার মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন, কি হবে আমাদের!

আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম—

জলের গাড়ি, গানের শিল্পীদের গাড়ি প্রভৃতি অনেক কিছু যাচ্ছিলো। আমিও আমার দুই দিদি হাজার হাজার লোকের মাঝে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ আমার জামাইবাবু এসে বললেন, বারাকপুর যাবার স্পেশাল বাস দাঁড়িয়ে আছে। তখন আমি বলে উঠলাম, আমার সবাই যাব। আমরা চার জনে বাসে উঠলাম। বাসে উঠে মনে হয়েছিলো যে বাসটা আমাদেরই জন্যে অপেক্ষা করছিলো। আমরা চার জনেই শুধু বাসে তখন।

বাসের টিকিটগুলো রেখে দিয়েছি তাদের উল্টোপিঠে লাল গোলাপের ছবি। আরতো কোনোদিন এমন টিকিট পাবনা। চারিদিক দেখতে দেখতে আমরা যাচ্ছি। রাস্তার দুইপাশে হাজার হাজার লোক ব্যাকুল হয়ে আছে, তাদের পরোলোকগত নেতার চিতাভস্ম কখন আসবে। চারিদিকে পুলিশ তাদের ঠেকাতে পারছে না।

আমরা বারাকপুরে গিয়ে দেখতে পেলাম—জনতার জন্য আলাদা রাস্তা। সেখান দিয়ে হাজার হাজার নর-নারী যাচ্ছে। আমরাও গেলাম, গিয়ে দেখি হাজার হাজার লোক দাঁড়িয়ে আছে।

সবাই চিঁড়ে-চ্যাপটা হয়ে যাচ্ছে।

হাজার হাজার লোকের মাথাগুলো দেখে আমার মনে হয়েছিল, যেন গাদা গাদা কালো জাম। ছেলেরা সব গাছপালা ছিঁড়ে একাকার করছে। পুলিশ তাদের কিছুই করতে পারছে না।

ট্রাক চিতাভস্ম নিয়ে ঠিক আটটার সময় এসে হাজির হল। তারমধ্যে ছিলেন, আমাদের গভর্ণর শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু ও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন।

অনেক মন্ত্রীরাও এসেছেন সঙ্গে। ট্রাক থামতে লোকজন তাদের নেতার চিতাভস্ম দেখতে উঠে দাঁড়ালো।

অমনি গোলমাল আরম্ভ হল। ঠেলাঠেলি, হৈ হৈ।

গাড়ী থেকে চিতাভস্মের পাত্রটা একটা বেদীর উপর রাখা হল। তারপর ধুপ ও ফুলের মালা সেই বেদীর উপর ভরতি হয়ে গেলো। দেখে মনে হয় যে ছোট্ট একটা মন্দির।

আশ্রম থেকে একজন স্বামীজী এসেছেন তিনি মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে স্তবপাঠ করছেন।

আরও অনেক বিদেশী লোক মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের পরলোকষত নেতা "জহরলাল নেহরু" সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। সেগুলো ভাল করে বোঝা গেল না। খুব গোলমাল হচ্ছিল। তার মধ্যে শিল্পীরা—"রঘুপতি রাঘব রাজারাম"—এই গানটি গাইছিলেন।

সাড়ে আটটার সময়ে চিতাভস্ম বিসর্জন দেওয়া হল। মিলিটারীরা সবাই একই রকমের পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে জাহাজের উপর। ছোট একটী জাহাজে আমাদের গভর্ণর ও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন চিতাভস্ম বিসর্জন দিলেন। তখন ওপারে মিলিটারীরা মাথা হেঁট করে তাদের বিশিষ্ট পরলোকগত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলো।

চিতাভস্ম ফেলবার সময় শিল্পীরা একটী রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইলেন—

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলরে"

বিসর্জন দেওয়া হয়ে গেলে সব জনতা আস্তে আস্তে চলে গেল।

"তোতাপাখী"

রত্নাবলী চক্রবর্ত্তী—বয়স ১৩। গ্রাহক সংখ্যা ১৬৬৫।

তোতা পাখী
উড়বি নাকি?
নীল আকাশে
ভেসে ভেসে
নিত্য নতুন রঙের দেশে?
তোতা পাখী মোরে নেবে?
দুইয়ে মিলে উড়ে তবে;

ফুলের বনে, মেঘের মাঝে
দূর আকাশে ভেসে ভেসে—
(যাব) মোরা মেঘের দেশে।

আমাদের নৈহাটী ভ্রমণ

অমিতাভ ভট্টাচার্য—গ্রাহক নং ৬৯১

কু ঝিক্ ঝিক্ করে ছেড়ে দিল গাড়ি হাওড়া স্টেশন থেকে। গাড়িটা বর্দ্ধমান লোকাল ইলেকট্রিক ট্রেণ। পরীক্ষা শেষে বেরিয়েছি আমরা চারবন্ধু—আমি, হাবলা, মণ্টে আর নালু। আমরা যাব নৈহাটী; ব্যাণ্ডেলে নামব। অন্তঃত ঘণ্টাখানেকের পথ। গল্প শুরু করা গেল। হাবলাটা একটা গল্প ফেঁদে বসল। নালুটা বরাবরই তোতলা আর ওর গল্পটা ঠিক আসে না। ওকে ভার দিলাম স্টেশন-গুলোর উপর লক্ষ্য রাখতে।

হাবলা বলল—'জানিস্ আমার কাকা একবার সিংহের সঙ্গে আফ্রিকায় হাতাহাতি করে এসেছেন ?'

মণ্টে ফোড়ন কাটলে—তাহলে সত্যিকারের টার্জান বল ?

হাবলা বললে 'দূর টার্জান কোথায় ঠেকে। সে ভয়ঙ্কর লড়াই। সে একবার চিৎ হয় আর একবার সিংহ চিৎ হয়।'

আমি তখন বললাম যে এ রকম লড়াইটা হোলো কেন ?

হাবলা গল্পটা গুছিয়ে শুরু করলে—'আমার কাকা একটা চাকরি নিয়ে আফ্রিকা গিয়েছিলেন। একদিন বেড়াতে বেড়াতে ঢুকলেন এক গভীর জঙ্গলে। হাতে নেই হাতিয়ার। আম খেতে কাকা খুব ভাল বাসতেন। পকেটে ছিল কাঁচা আম। খেতে খেতে বাংলাদেশের চিন্তায় মশগুল্—এমন সময়' ……মণ্টে বাধা দিল—'তা আমগুলো কি আফ্রিকার গাছের ?'

হাবলা বলল 'দূর তা কেন হবে ? আমার ঠাকুমা বাড়ির গাছের আম পাঠিয়েছিলেন কাকাকে। তারপর কি হল জানিস ? এক সিংহ আক্রমণ করল কাকাকে।'

নীলু এবার চেঁচাল—'এই উত্ উত্ র র-র-টে-টে………?'

আমরা সবাই চমকে উঠলাম। ভাবলাম ও বোধ হয় নামতে বলছে। স্টেশনের দিকে চোখ পড়ল দেখি সবে উত্তরপাড়া !

হাবলা বিরক্ত হয়ে বলল—'বড় Mood নষ্ট করিস্ নীলে।'

আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—'তারপর' ?

হাবলা আবার শুরু করলে—তারপর সেই ভীষণ হাতাহাতি কেউ কাউতে হারাতে পারে না। হঠাৎ কাকার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি শুনেছিলেন যে টক্ আমের গুণে বাঘ পালায়। তাদের গাছের

আমগুলো একেবারে বাঘাটক্। তিনি স্থির করলেন ওর গুণটা সিংহের ওপরই টেস্ট্ করবেন। পকেট থেকে বার করলেন আম। টিপ্ করে ছুঁড়লেন সোজা সিংহের মুখে। ব্যাস্ আমটা তার দাঁতে আটকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে পড়ল। কাকা ছিলেন সিংহের পিঠে। সিংহটা কাকাকে নিয়ে মারল চোঁচা দৌড়। অন্ধকার হয়ে এসেছে তবুও ছুটেছে সিংহটা। হঠাৎ কাকা দেখলেন জঙ্গল পেরিয়ে এসেছেন। দূরে আলো দেখা যাচ্ছে। সিংহটা ছুটে সোজা শহরে ঢুকল। কাকাতো তার পিঠে ঘোড়সওয়ারের মত বসে। সেই দেখে অনেক লোক মূর্চ্ছা গেল। কয়েকজন পুলিশে খবর দিল। পুলিশরা এসে সিংহটাকে ধরল। কাকা সগর্বে নামলেন পিঠ থেকে।'

মণ্টে বলল—পুলিশগুলোকে কামড়ালো না সিংহটা ?

হাবলা বলল—'দূর, একে সেই বাঘা আম তারওপর ওরকম ম্যারাথন দৌড়।'

আমি বললাম—'তারপর কী হল ?'

হাবলা বলল—'তারপর আফ্রিকায় সাড়া পড়ে গেল। কাকা হলেন বিখ্যাত, সেই সঙ্গে বাংলা-দেশের আমও।'

আরও বলতে যাচ্ছিল কিন্তু আর বলা হল না।

নীলে হাত পা ছুঁড়ে জানালার বাইরে উচিয়ে চেঁচাল—'য্ য্-আ-আ ব্যা-ব্যা-ব্যা'

জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি ভেড়া চরছে মাঠে। কিন্তু নীলে তখনও চীৎকার করায় হঠাৎ মনে হল ব্যাণ্ডেল স্টেশন বোধহয় ছাড়িয়ে গেছি। ওকে বলতে ও জোরে সম্মতি জানাল। চেন টেনে লাফ দিলাম সকলে ট্রেণের বাইরে ! গার্ডের ভয়ে ছুট্ দিলাম সোজা স্টেশনের দিকে।

নীলু আমাদের মধ্যে জোরে ছোটে। ও বলল—'আমরা ভ্-ভাই সেই সিং সিং··· ··।'

বুঝলাম যে ও বলছে আমরা সেই সিংহের থেকেও জোরে ছুটছি। ওকে বললাম যে ও যেন স্টেশনে পৌছিয়েই নৈহাটীর টিকিট কাটে। ও সম্মতি জানিয়ে আমাদের ফেলে অনেক দূরে চলে গেল। পিছনে আসছেন গার্ড। কিছু লোকও জড় হয়েছে। আমরা স্টেশনে পৌছিয়ে দেখি নীলে টিকিট ঘরে হাত পা ছুঁড়ে কি সব বলছে। আমাদের প্রতি তখন সকলেরই একটা সন্দেহ। আমরা জিজ্ঞেস করলাম—'কীরে টিকিট কেটেছিস্ ?'

সে কথার ভ্রূক্ষেপ না করে বলছে—'না মশ্-মশ্ আয়-আ-ম্-মি নৈ-নৈ-নৈ।

টিকিট ঘরের ভদ্রলোক বলছেন—'তুমি কি কিছু চুরি টুরি করেছ নাকি খোকা ?'

নীলে বলে চলেছে—'ন্-ন্-আ ব্-ব্-ল-ছি-আ-ম্-মি নৈ-নৈ-·······।'

এদিকে নৈহাটী লোকাল হুশ্ হুশ্ করে ছেড়ে গেল। পরের ট্রেণ বিকেলে। আমরা তিনজন হতাশ হয়ে বসে পড়লাম।

রেলগাড়ী

অনুরাধা নাগ । বয়স ১১ । গ্রাহক নং ২১২৮

কু—ঝিক্ কু—ঝিক্ চলে রেল গাড়ি
চারিদিকে ধানক্ষেত, আর কুঁড়ে বাড়ি
সরু পথ আঁকা বাঁকা
গেছে সে কোন গাঁয়ে,
আম জাম গাছ ভরে,
আছে ডাইনে বাঁয়ে।
খাল বিল পেরিয়ে গেল
কত স্টেশন ছাড়িয়ে গেল
গাছ পালা বাড়ি ঘর সব গেল ছাড়ি,
কু—ঝিক কু—ঝিক চলে রেলগাড়ি ॥

মজার ছড়া

শঙ্কর ঘটক । বয়স ১৪ । গ্রাহক নং ২৭৮১ ।

(১)
গান' 'গান' 'গান'
শুনে জুড়ায় নাকি প্রাণ
তবে গাধার গান শুনলে,
কেন প্রাণ করে আন্‌চান্‌ ?

(২)
'ঘেউ' 'ঘেউ' 'ঘেউ',—
পিছে লাগল নাকি কেউ ?
ফিরে দেখি ভুলো ছাড়া—
আর কোথা নেই কেউ।

(৩)
'ঘ্যাঁচা' 'ঘ্যাঁচা' 'ঘ্যাচা।
দেখি ডাকছে হাড়িচাঁচা ;

ফুড়ুৎ করে পালাল হায়!
যেই খুলেছি খাঁচা।

(৪)
'ঘ্যাঙর' 'ঘ্যাঙর' 'ঘ্যাঙ',
কোথাও ডাকছে বোধ হয় ব্যাঙ;
চাইতে ফিরে দেখছি,
কারে মারছে যেন ল্যাঙ

(৫)
'হেঁস', 'হেঁস', 'হেঁস',
দেখি পড়ছে সে 'সন্দেশ'।
কেঁদে কেঁদে হাপিয়ে গেলাম্—
হাসছে সেত বেশ!

পেটুকের বাজার ফর্দ

অসিত মিত্র বয়স—১৫

আরে আরে মোর পাতে
দাও কেন ছ্যাঁচড়া?
এই সব খাবে ওই ওপাড়ার চ্যাংড়া॥
মোর পাতে দাও সব
যত রুই কাৎলা,
পরমান্ন করিবে না
একেবারে পাৎলা॥
চিংড়ির কাটলেট
গোটা কুড়ি চপ চাই,
মাংসটা হয় যেন
ঘন ঘন কাই কাই॥
পোনা মাছের কালিয়া
যায় যেন শুকিয়ে
সরভাজা হয় যেন
ভয়সা ঘি দিয়ে।

রাতা রাতি চলে যাও
হরিণঘাটাতে
না পারলে, বলে দিও
মুরগী পাঠাতে
কি বললে ? পারবে না
এত সব আনিতে
কি করে এত খাই
তাই চাও জানিতে ॥
সিধে পথ খোলা আছে
গোল্লায় যাইবার
সেইখানে চলে যাও
জ্বালিওনা বার বার ॥

দুই ভাই

শিখর রায়

বয়স ১০ বৎসর—গ্রাহক নং ২৭০৬

পাত্রগণ : কার্তিক গণেশ—দুই যমজ ভাই। একই রকম দেখতে—একই রকম জামা কাপড় পরে বেড়ায়।

দইওয়ালা—বুড়ো মানুষ। ঝোলানো সাদা গোঁফ, মাথায় পাগড়ী, কাঁধে দইয়ের ভার।

প্রথম দৃশ্য

[কার্তিক দরজায় বসে রয়েছে, এমন সময় একজন দইওয়ালার প্রবেশ]

দইওয়ালা—দই চাই দই। খোকাবাবু দই নেবে ?

কার্তিক—হ্যাঁ। ভারী তো ওইটুকু দই। কি নেব।

দইওয়ালা—জানো এতে চার সের দই আছে।

কার্তিক—মোটে চার সের দই। ওতো আমি একাই খেয়ে নিতে পারি।

দইওয়ালা—তাই নাকি ! আমি বাজি রাখছি—যদি তুমি খেতে পার তাহলে দইয়ের দাম তো নেবই না, উপরন্তু ১টা টাকা দেব।

কার্তিক—১ টাকায় কি হবে !

দইওয়ালা—বেশ ৫টা টাকা দেব। বাজী হারলে কী দেবে ?

কার্তিক—তোমাকেও ৫টা টাকা দেব। তুমি ঠিক দেবে ত ?

দইওয়ালা—আচ্ছা খাও দেখি।

[দই প্রদান। কার্তিক অর্ধেকটা দই খেয়ে]

কার্তিক—(স্বগত) ও বাবা। আর যে পারা যায় না। একটা মতলব আঁটতে হচ্ছে। (দইওয়ালার প্রতি) ওই রে মা ডাকছে। একটু ঘুরে আসি তুমি বস।

দইওয়ালা—তাড়াতাড়ি এসো কিন্তু।

[কার্তিকের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বাড়ীর ভেতরে]

কার্তিক—এই গণেশ।

গণেশ—কি রে ?

কার্তিক—একটা কথা শোন।

গণেশ—কি কথা ?

কার্তিক—শোন না [গণেশ কাছে এল] তুই বাইরে গিয়ে দেখবি একটা দইওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে। তার কাছে বাজি রেখে এসেছি যে আমি তার সমস্ত দই খেয়ে ফেলব। অর্ধেকটা খেয়ে নিয়েছি, তুই বাকীটা খেয়ে আসতে পারিস্।

গণেশ—সে আর এমন কথা কি।

কার্তিক—বেশ। খেয়ে নিয়ে দইওয়ালার কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে আসবি।

গণেশ—আচ্ছা যাচ্ছি।

[গণেশের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

[গণেশের প্রবেশ]

দইওয়ালা—এসেছ ! কই তাড়াতাড়ি শেষ কর।

গণেশ—আরে ও তো সামান্য বাকী আছে। দাও এক্ষুণি শেষ করে ফেলছি।

দইওয়ালা—কথা রেখে বাকী দইটা শেষ কর দেখি তবে বুঝব বাহাদুর !

[গণেশ বাকী দইটা খেয়ে নিল। দইওয়ালা হতভম্ব হয়ে মাথা চুলকোতে লাগল]

গণেশ—বাজিতে জিতে গেছি—কই দাও টাকা দাও !

দইওয়ালা—(হতাশভাবে) দিচ্ছি।

[দইওয়ালা টাকা বের করে দিয়ে টলতে টলতে চলে গেল। আর গণেশের নাচতে নাচতে বাড়ীর ভেতরে প্রস্থান]

পার্থসারথি রায় চৌধুরী

গ্রাহক নং—৬

পরিবর্তন

রামবাবু মেকানিক, জোড়া, তার মেলা ভার,
গ্রামফোন রেডিও বানাতেন এন্তার।
বানাতে বানাতে হায়,
চেহারা পাল্টে যায়,
দেখি রামবাবু নেই ; আছে এক গাদা তার।

আজব মিষ্টি

ভোলা বাবু বসে বসে পড়লেন 'সন্দেশ'
পড়ে টড়ে বল্লেন 'বাহবা বাহবা বেশ।'
এই সব মিষ্টি,
কারা করে সৃষ্টি ?
কাগজের তৈরী সন্দেশও কি সরেস!

'বিভ্রাট'

বেচারাম মণ্ডল, মেয়ে তার মিষ্টি
জন্মদিনেতে তার হয়েছিল ফিষ্টি।
মাংস পোলাও খেয়ে,
মিঠাই খাইতে গিয়ে,
খেয়ে ফেলি মিষ্টিরে, একি অনাসৃষ্টি।

অবাক কাণ্ড

ভোলারাম দারোয়ান লোক ব্যোমভোলা।
কিছুই থাকে না মনে মিছে তারে বলা।
সবই ঘুলিয়ে ফেলে,
কান দিয়ে কথা বলে,
কিছুই শোনে না তাই ; লোকে বলে কালা।

গ্রাহকের পাঠান ধাঁধা

১

দেবব্রত মণ্ডল

গ্রাহক নং—২৫০৭

লেজ কাট, যাহা ছিল তাই থেকে যাবে,
পেট কাট, শুধু তার ছালখানি পাবে
মাথা কাট, গলা ছাড়া আর কিছু নাই
কিবা এর পরিচয় ভেবে বল ভাই।

২

সৌম্যজিৎ সিংহ

গ্রাহক নং—১০২৪

কোন কোন জায়গার কথা বলা হয়েছে বুঝতে পারে কে?

(ক) কোথাকার গরু পালাতে পারে না?
(খ) কোন জায়গার আগাটা শক্ত
(৩) কোথাকার কপাট মেরামত করতে হবে?
(৪) কোন জায়গা আজ কিম্বা পরশু?
(৫) কোন দ্বীপ তরকারিতে দেয়?

'মারি সেলেস্টের দুর্ভেদ্য রহস্য'

পণ্ডিতরা বলে থাকেন যে পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে, তার প্রত্যেকটির একটা সঙ্গত কারণ থাকতে বাধ্য, অকারণে কিছু হয় না। কথাটা সত্যি হলেও, মাঝে মাঝে এমন একেকটি ব্যাপারের কথা শোনা যায়, হাজার চেষ্টা করেও যার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এই ধরণের ব্যাপারকে 'রহস্য' বলা হয়। সব রহস্যেরই নিশ্চয় একটা কারণ থাকে, কিন্তু সেটি সব সময় জানা যায় না; জানা গেলেই রহস্য আর 'রহস্য' থাকে না। উনিশ শতকের 'মারি সেলেষ্ট' জাহাজের ব্যাপারটিও এইরকম রহস্য-জালে জড়িত। আজ পর্যন্ত তার মানে খুঁজে পাওয়া যায় নি।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে, 'দেই-গ্রাসিয়া' নামের একটা ইংলিশ জাহাজ স্পেনের উপকূল থেকে ছয় শো মাইল পশ্চিমে, আটলাণ্টিক মহাসাগরের মধ্যে একটা জাহাজ দেখতে পেল। ক্যাপটেন মোর হাউস্ তাঁর দূরবীণের সাহায্যে লক্ষ্য করলেন যে জাহাজের পাল মাস্তুল বেঁকে ঝুলে পড়েছে, দড়িদড়া সব এলোমেলো।

তিনি ভাবলেন ঝড়ঝাপটায় পড়ে, কিম্বা অন্য কোনো কারণে জাহাজটা হয়তো বিপদে পড়েছে, তাকে সাহায্য করা দরকার। অনেক চেষ্টা করেও কিন্তু জাহাজের ডেকে, কিম্বা অন্য কোনো জায়গায় জনমানুষের চিহ্ন দেখা গেল না। সমুদ্রগামী জাহাজরা সেকালে সর্বদা নিশানের বা আলোর সাহায্যে পরস্পরের সঙ্গে সাঙ্কেতিক ভাষায় কথা বলত, তাকে 'সিগনেল' করা বলত; এ জাহাজটিকে সিগনেল করেও কোনো উত্তর পাওয়া গেল না।

তখন ক্যাপ্টেন মোরহাউস নিজের জাহাজটিকে আরো কাছে নিয়ে গিয়ে দেখেন অন্য জাহাজের নাম 'মারি সেলেষ্ট'। কয়েক মাস আগে 'মারি সেলেষ্ট' খোল ভরা মাদক দ্রব্য নিয়ে নিউ ইয়র্ক থেকে ইটালির জেনোয়া বন্দরের অভিমুখে রওনা হয়েছিল, কিন্তু তারপর তার যে কি হয়েছিল ক্যাপ্টেনের তা জানা ছিল না। এখন মাঝ সমুদ্রে জাহাজটিকে এই অবস্থায় দেখতে পেয়ে, ভারি আশ্চর্য হয়ে, তিনি দুজন অফিসারের সঙ্গে কয়েকজন নাবিককে পাঠালেন, ব্যাপারটা কি অনুসন্ধান করে আসতে।

নৌকো করে মাঝখানের জলটুকু পার হয়ে, নাবিকরা হাঁচড় পাঁচড় করে 'মারি সেলেষ্ট'র ডেকের উপর চড়ল। চড়েই তো তাদের চক্ষুস্থির, এ আবার কি ভুতুড়ে ব্যাপার, কোথাও একটা মানুষ, কি জন্তু, কি পোষা পাখির পর্যন্ত নামগন্ধ নেই! মহা হাঁকডাক করে তারা সমস্ত জাহাজটাকে খুঁজে দেখল, বাস্তবিকই কেউ কোথাও নেই!

সব চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হল, জনমানুষ নেই, অথচ জিনিসপত্র সব যেমনকে তেমন রয়েছে, কেউ কিছু ছোঁয় নি, নষ্ট করে নি। রান্নাঘরের বাসনপত্র গোছানো খাবারদাবার পরিপাটি সাজানো। খাবার ঘরের টেবিলে খাবার তো পরিবেশন করা রয়েছেই, কফির পেয়ালাতে কফি পর্যন্ত ঢালা রয়েছে, অথচ খাবার মানুষ ত্রিসীমানায় কোথাও নেই। দেখে মনে হয় খেতে খেতে এই মাত্র সবাই উঠে গেছে।

ক্যাপ্টেনের সঙ্গে নাকি তাঁর স্ত্রী ও ছোট ছেলে গিয়েছিল বলে পরে শোনা গেল, অথচ তারাও নিখোঁজ। শুধু একটা জামা সেলাই হচ্ছিল, তাতে ছুঁচটি পর্যন্ত বেঁধানো রয়েছে; ছেলের খেলনা পড়ে আছে; ক্যাপ্টেনের চেয়ারটি এমন করে সরানো যে মনে হয় এইমাত্র তাড়াতাড়িতে কোথাও উঠে গেছেন।

কোথাও একটি জিনিস কেউ নড়ায় নি, সরায় নি। দেরাজ ভরা কাপড় চোপড় আলমারিতে টাকা কড়ি, গয়নাগাঁটি, সব আছে; হারানোর মধ্যে ক্যাপ্টেনের গতি নির্ণয়ের যন্ত্রপাতিগুলোকে কোথাও পাওয়া যায় নি। মানুষগুলো সব্বাই যেন কর্পূরের মতো উবে গেছে! বিদ্রোহ হলে, মারামারি রক্তপাতের চিহ্ন থাকত; সে সব কিছু নেই! জাহাজডুবির ভয়ে সবাই পালিয়েছে, এমনও নয়; কারণ তা হলে জাহাজের তলায় কোথাও ফুটো থাকত, খোলের মধ্যে জল থাকত; কিছুই নেই!

লোকগুলো তবে গেল কোথায়? এ রহস্যের উত্তর আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারে নি। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর, 'দেই-গ্রাসিয়ার' কয়েকজন অফিসারও নাবিক 'মারি সেলেষ্ট'কে নিরাপদে জিব্রলটার বন্দরে পৌঁছে দিল।

এমন একটা রহস্যময় ব্যাপার অবিশ্যি তখুনি শেষ হয়ে যায় নি। ইংল্যাণ্ডে তখন রাণী ভিক্টোরিয়া রাজত্ব করছেন। তাঁর হুকুমে জিব্রলটারেই তদন্ত বসল; উকীল এডভোকেট, জজ্‌ লাগানো হল; কিন্তু কিছুতেই কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা গেল না।

এক জাহাজ লোকের যে এভাবে কি হতে পারে, তাই নিয়ে নানান্ জল্পনা কল্পনা চলতে লাগল। কেউ বলল, খোলে অত মদ ছিল, তাই খেয়ে ক্ষেপে গিয়ে ভীষণ মারামারি করে সবাই মরে গেছে। কিন্তু তা হলে জিনিসপত্র ভাঙেনি কেন, রক্তপাত হয় নি কেন, খালি বোতল নেই কেন, মৃতদেহ নেই কেন? কেউ বললে, কোনো বিকট সামুদ্রিক জীব সবাইকে খেয়ে ফেলেছে। তা হলে খোলের ভেতরেও তো লুকিয়ে দুচারজন প্রাণ বাঁচাতে পারত। কেউ বলল শত্রুরা কিম্বা জলদস্যুরা আক্রমণ করে সবাইকে হয় মেরে জলে ভাসিয়ে দিয়েছে, নয়তো ধরে নিয়ে গেছে। কিন্তু তা হলে পয়সাকড়ি, দামি দামি জিনিসপত্র কি তারা ছেড়ে দিত? কেউ বললে ঝড়ে মরেছে সব, কিম্বা প্রকাণ্ড ঢেউ এসে সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু তা হলে একটা জিনিসও নড়ে নি কেন, পেয়ালা থেকে টেবিলে এক ফোঁটা কফি পর্যন্ত পড়ে নি কেন?

আজব কাণ্ড

অধীর সর্বজ্ঞ

ঘুম ভেঙে শেষরাতে দেখলাম চাঁদটা—
হামাগুড়ি দিয়ে ছুঁলো টুনুদের ছাদটা।
আমি 'হেঁই' করতেই হুট করে গড়িয়ে,
টুকরো টুকরো হ'য়ে ছাদে গেল ছড়িয়ে।
ফোঁক্‌লা চাঁদের বুড়ি হেসে বলে, 'লেবু নে,'
অমনি ঝাপিয়ে পড়ে একপাল বেবুনে।
আমি 'হেঁই' করতেই দুম্‌দাম্‌ লাফিয়ে—
কোথা দিয়ে কে যে গেল ছাদটাকে কাঁপিয়ে!

বুনুদের নিমগাছ টুনুদের ছাদে যে!
হাড়গিলে দাঁড়কাকে জড়াজড়ি বাধে যে!
আমি 'হেঁই' করতেই ওরা হক্‌চকিয়ে
কোথা দিয়ে কে যে গেল কক্‌ কক্‌ ককিয়ে!

ঘুম আসে চোখ ভেঙে, আকাশের আড়ালে
চাঁদটা কোথায় গেল, পাই হাত বাড়ালে?
হাতদুটো ছুঁলো সেই মশারির ছাদটা—
আজব কাণ্ড দেখি, মা যে সেই চাঁদটা!

ডাকের বহর

জনার্দন ভট্টাচার্য

বেড়াল ডাকে মিঁউ মিঁউ, ইঁদুর করে খুট খুট
শুঁয়োপোকা লাগলে গায়ে বেজায় করে কুট কুট
গাভী ডাকে হাম্বা রবে, ছাগল বলে ব্যা
ছিচকাঁদুনে বাচ্চা ছেলে সদাই করে ভ্যা।
কাক ডাকে কা-কা করে, কোকিল বলে কুহু,
মেজমামার মন পাওয়া ভার সদাই বলে 'উঁহু'।
শেয়াল বলে হুক্কা হুয়া, ব্যাঘ্র বলে হালুম
সেই সময়ে সামনে গেলে পাবে জবর মালুম।
মাছি ওড়ে ভনভনিয়ে, মশায় ডাকে পোঁ,
শূয়োর ছোটে ঘোঁত ঘোঁত—বেজায় রকম গোঁ।
অশ্ব ডাকে চিঁহি চিঁহি, হাঁসে প্যাঁক প্যাঁক
আমার নাক যে কেমন ডাকে তোরা সবাই ছ্যাখ্।

জীবন সর্দার
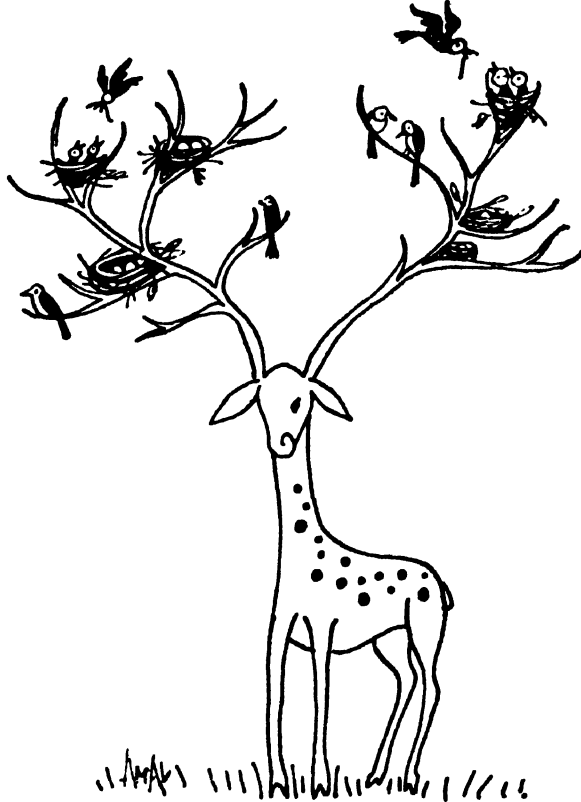
[দিন দিন আমাদের জীবনটা কাজের তাড়ায় এমন হয়ে উঠছে যে, নিজের নিজের পরিবেশটার দিকে নজর দেবার অবসরও করে উঠতে পারছি না। ছোট থেকে বয়সে আমরা যতই বড় হয়ে উঠছি, আমাদের 'বিশ্বটা'. আমাদেরই দোষে, বড় থেকে ততই ছোট হয়ে যাচ্ছে। যদিও প্রকৃতি তার শব্দ রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ নিয়ে, 'প্রথম-প্রভাত' থেকে ঠিক তেমনি ইশারায় তার কাছে আমাদের ডাকছে। সুখের কথা, সন্দেশের পাঠক-পাঠিকাদের মনে প্রকৃতিকে জানার আগ্রহ এমনি প্রবল যে, তাদেরই চেষ্টায়, এই দেশে, দু'বছর আগে, ছোটদের প্রথম প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর গড়ে ওঠে।

'দপ্তরের' নিয়ম কানুন জানতে চেয়ে আমার কাছে রোজই অনেক চিঠি আসে। এই ব্যাপারে উৎসাহী সকলের জন্যে দপ্তরের সব খবর আর একবার জানালাম। জীঃ সঃ]

প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর—কী ও কেন ?

সংঘ। 'প্রকৃতি-পড়ুয়ার দপ্তর' 'সন্দেশ' এর পাঠক পাঠিকাদের একটি সংঘ।

সভ্য। এই সংঘের সভ্যদের বলা হয় 'প্রকৃতি-পড়ুয়া'। সাত বছর বয়সের কম কেউ সভ্য হতে পারে না।

কাজ। পড়ুয়াদের কাজ মাঠে মাঠে বনে-বনে, জলা ও জংগলে ঘুরে ঘুরে পশুপাখি, পোকা মাকড় গাছপালা এদের সম্বন্ধে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানান খবর নেয়া।

পাঠশালা। পড়ুয়ারা যেখানেই দল বেঁধে এইভাবে কাজ করবে সেখানেই গড়ে উঠবে 'প্রকৃতি-পড়ুয়ার পাঠশালা'। কম করে চারজন সভ্য হলেই 'পাঠশালা' গড়া যায়।

অভিভাবক। 'পাঠশালার' পড়ুয়ারাই তাদের মনের মত বয়স্ক কাউকে—যিনি এই ব্যাপারে উৎসাহী, তাকে তাদের 'স্থানীয় অভিভাবক বা পরিচালক' নির্বাচন করে নেবে।

যোগাযোগ। পড়ুয়াদের দেখা সকল খবর সব শেষে অবশ্যই সন্দেশে পাঠাতে হবে। সকল বিষয়ে বিশেষ করে উপদেশ ও পরামর্শ পড়ুয়াদের প্রয়োজন মত পাঠাতে হবে।

উদ্দেশ্য। পড়ুয়াদের কাজের উদ্দেশ্য হবে :

(১) **প্রকৃতির মধ্যে আত্মীয়তা খোঁজা।** প্রাণী ও উদ্ভিদ পরস্পরের ওপর নির্ভর করে আছে। সাধারণ কীটপতংগ আর অসাধারণ মানুষ পৃথিবীর একই পরিবারের সভ্য। প্রকৃতি পড়ুয়াকে সেই আত্মীয়তা ও তার কারণ খুঁজে বার করতে হবে।

(২) **প্রকৃতির রূপগুণের কারণ খোঁজা।** প্রকৃতির সকল রূপেরই একটি না একটি কারণ আছে। পাতার আকার, ফুল-ফলের রং ও গড়ন, প্রাণীদের দেহের গড়ন, লোমের ও পালকের বাহার, এই সব কিছুরই বিশেষ উপযোগিতা আর কারণ রয়েছে। পড়ুয়াদের উদ্দেশ্য হবে সেই 'কারণ গুলি'

খুঁজে বার করা।

(৩) **প্রকৃতির প্রভাব ও অনুভূতির প্রকাশ**। প্রাণীদের উপর প্রকৃতির শব্দ, বর্ণ, গন্ধ আলো আর বাতাসের প্রভাব কি পড়ুয়াদের তা খুঁজতে হবে। যেমন--ঋতু বদলের কালে, দিনের আলো বাড়া কমায়, গ্রহণের সময়, ঝড় বইলে, বাজ পড়লে, বা বন্যা এলে প্রাণীদের ভাব বা অবস্থা কি হয় পড়ুয়াদের তা' লক্ষ্য করতে হবে।

এইভাবে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বাইরে ছড়িয়ে গিয়ে আবার ঘরে ফেরার সময় সারা পৃথিবীর রহস্যকে কৌতূহলের ঝাঁপিতে ভরে নিয়ে আসবে।

দেখার বিষয় আর খোঁজার নিয়ম

ফর্দ। ঘরের কাছাকাছি সহজে যাদের খবর নিতে পারা যাবে তাদের মোটামুটি একটা ফর্দ—

গাছপালা

(১) শ্যাওলা ও জলের উদ্ভিদ, ব্যাঙের ছাতা, ফার্ন ইত্যাদি।

(২) অন্য যে কোন গাছ, ফুল, পাতা, বীজ, ঘাস ইত্যাদি।

পোকামাকড় ও পশুপাখি

(১) কেঁচো। (২) পিঁপড়ে, মৌমাছি আর বোলতা, শুঁয়োপোকা, প্রজাপতি ও মথ, জোনাকি, মাছি, ঘাসফড়িং, মাকড়সা ও বিছা ইত্যাদি কীট পতংগ। (৩) শামুক, ঝিনুক। (৪) মাছ। (৫) ব্যাং। (৬) গিরগিটি, টিকটিকি, কচ্ছপ ও সাপ। (৭) পাখি। (৮) বাদুড়। (৯) গরু, ঘোড়া, বেড়াল, কুকুর শেয়াল ইত্যাদি স্তন্যপায়ী প্রাণী। এবং (১০) ইঁদুর, কাঠবিড়াল ও খরগোস।

• আগ্রহ। উপরের ফর্দের যে কোন একটি বা অনেকগুলিই পড়ুয়াদের জানবার আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে।

একটা বিষয়ে দেখা শেষ না করে অন্যটাতে মনোযোগ দেওয়া ভুল হবে। কোন একটার পুরো জীবনটা জানাই হবে ঠিক জানা। 'পড়ুয়ার' কোন্ বিষয়ে আগ্রহ দপ্তরে তা' জানিয়ে সেই বিষয়ে নির্দেশ নিতে হবে।

• যন্ত্রপাতি। চোখ কান হাত মাথা,
আর চাই দুটো খাতা।

এই ছড়াটাতেই পড়ুয়ারা সকল যন্ত্রের নির্দেশ পাবে। পড়ুয়াদের দলে একটি আতস কাঁচ ও একটি দূরবিন থাকলে ভাল। দুটো খাতা—একটার নাম '**মেঠোখসড়া**', যেটাতে পথ চলতে গিয়ে সব সংগ্রহের খবর টুকে রাখা হবে। প্রকৃতি পড়ুয়াদের চোখে দেখা সকল বিবরণ সারা দিনের শেষে গুছিয়ে লিখে রাখতে হবে অন্য খাতাটা বা '**রোজনামচায়**'।

• অভিযান ও অভিযাত্রি। অভিভাবকের সাথে পড়ুয়ারা দলবেঁধে মাঝে মাঝে ঝোপঝাড়, জল-জংগলে অভিযানে বেরোবে। ভ্রমণ বা অভিযানের প্রয়োজনীয় সকল খবরাখবর চাইলে দপ্তর থেকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

চিঠিপত্র

(১) হাওড়া সর্বোদয় মণিমেলা (এন্ ১০৩৫),

শ্রাবণের সন্দেশের বিশেষ বিজ্ঞপ্তি থেকে তোমরা বুঝতেই পারছ যে সম্ভবতঃ পুরোনো আপিশের ঠিকানায় নতুন বছরের চাঁদা পাঠানোর জন্যে অথবা চাঁদা পাঠাবার সময়ে গ্রাহক নং না লেখার জন্য তোমরা পুরোনো গ্রাহক হয়েও নতুন সংখ্যা পেয়েছো। তোমরা বরং আমাদের আপিশে চিঠি লিখে দাও যে নতুন সংখ্যাটি বাতিল করে দিয়ে, পুরোনোটিই রাখতে চাও।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল প্রতিষ্ঠান যদি গ্রাহক হয়, সভ্যরা নিজেদের নামে রচনা ইত্যাদি পাঠাতে পারে কি না। আলাদা ভাবে গ্রাহক না হলে, প্রতিষ্ঠানের নামেই লেখা ধাঁধার উত্তর ইত্যাদি পাঠাতে হবে। সেই ভালো নয় কি?

(২) ব্রততী ও প্রকৃতি বিশ্বাস (৫২১)

খুব ভালো চিঠি লিখেছ; পত্রিকা সম্পর্কে তোমাদের মতামত সর্বদাই চাই। 'হাত পাকাবার আসরে' তোমরা যত ভালো লেখা পাঠাবে, আসরও তত বলিষ্ঠ হয়ে উঠবে। যাঁদের যাঁদের লেখা চেয়েছো, তাঁদের অনেকের লেখা মাঝে মাঝে বেরিয়েছে এবং আরো বেরুবে নিঃসন্দেহ। 'সন্দেশ' আজকাল নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে না? এত পেছিয়ে পড়েছিল যে একটু সময় লাগল। কিন্তু একটা কথা ভুল লিখেছ; 'সন্দেশ' সরু হয়ে যাওয়া দূরে থাকুক, অনেক কলেবর বৃদ্ধি হয়েছে। 'বিজ্ঞাপন' বাড়াতে হয়, কমালে যে ছাপার খরচ তোলা দায় হয়।

(৩) গৌতম রায়

প্রথম চিঠির উত্তর দেখলেই তোমার প্রশ্নের উত্তর পাবে। পত্রবন্ধু হতে পারো বৈকি। তোমার বয়স, কি কি শখ ইত্যাদি জানিও।

(৪) শুক্লা চট্টোপাধ্যায় (১০৯০)

হাত পাকাবার আসরে ভালো ছবি এলেই ছাপানো হবে। চাইনিজ ইঙ্ক দিয়ে এঁকে পাঠিও। টেব্‌ল্ টেনিসের কথা খেলাধুলা বিভাগকে বলব।

(৫) ইন্দ্রজিৎ দাশগুপ্ত বাগনান, চন্দ্রপুর, হাওড়া।

বয়স এগারো, শখ—ডাকটিকিট জমানো, খেলাধুলা, গল্প লেখা। পত্রবন্ধু চাই। হাত পাকাবার আসরে গল্প পাঠিও, কেমন?

(৬) করবী, জবা ও দীপালি গুপ্ত (২৪২৩)

তোমাদের ঐ একই ব্যাপার। সম্ভবতঃ পুরোনো ঠিকানায় চাঁদা পাঠিয়েছিলে; টানা হ্যাঁচড়ায় গোলমাল হয়ে গেছে। সন্দেশ কার্যালয়ে চিঠি লিখো যেন পুরোনো সংখ্যাটাই রাখা হয়। চলন্তিকায় দীপালি বানান দেখে নিও, 'দিপালী' লিখো না। পত্রিকা আরো বাড়াবার মতো আমাদের অবস্থা হলেই, হাত-পাকাবার আসরও বাড়ানো হবে। কিন্তু দস্তুর মতো ভালো লেখা না হলে কি ছাপানো উচিত?

(৭) মণিদীপা সেনগুপ্ত (১৩৪)

আমরা চাই যে তোমরা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ পাঠাও। কিন্তু সেগুলি খুব যত্ন করে লিখো। কবিতার কথাই ধর ; অমিত্রাক্ষর বা গদ্য ছন্দ যদি লেখো, ভাব ও ভাষা এবং ছন্দ ভালো হওয়া চাই। আর যদি মিল দাও, উপযুক্ত মিল দিও। খাব'র সঙ্গে 'দেব' আর 'হাতে'র সঙ্গে 'খেত' কিন্তু ঠিক মিল হল না।

(৮) সমীর কুমার আধিকারী (এন্ ৮১৩) বয়স ১৬। শখ, পত্রিকার ছবি সংগ্রহ, সংবাদ ও উদ্ধৃতি সংগ্রহ, খেলাধুলা। পত্রবন্ধু চাই। ঠিকানা, মেজিয়া হাসপাতাল, পোঃ মেজিয়া, জেলা বাঁকুড়া।

ধাঁধার উত্তর।

আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের ধাঁধার উত্তর যারা পাঠিয়েছ তাদের সকলেরই একটি বা দুটি উত্তর ঠিক হয়েছে। কেউ কেউ একটি বা দুটি উত্তরই পাঠিয়েছ। দু এক জন প্রশ্ন করেছ যে একটি উত্তর ঠিক হলে তার নাম ছাপা হয় না কেন। এর জবাবে আমি বলব যে প্রথমতঃ এত বেশি সংখ্যক গ্রাহক একটি ধাঁধার অন্ততঃ সঠিক উত্তর দেয় যে সকলের নাম ছাপতে হলে অনেক পৃষ্ঠা লেগে যাবে। তার চেয়ে বড় কথা হল এই যে তোমরা যাতে আরো ভাল করে চেষ্টা কর যেন সবগুলো উত্তর ঠিক দিতে পার তাই জন্য যারা সবগুলো ঠিক লেখে কেবল তাদের নামই ছাপা হয়।

কিন্তু কখনও যদি খুব অল্প সংখ্যক গ্রাহকই সব উত্তর ঠিক দেয়, তাহলে যাদের সামান্য ভুল থাকে, তাদের নামও ছাপা হয়।

আষাঢ় ১৩৭১—জুলাই ১৯৬৪

(১)

সংখ্যা চারটি হল ৮, ১২, ৫ এবং ২০।

(২)

(গুপ্ত সংবাদটি প্রত্যেক শব্দের প্রথম অক্ষরগুলি পড়ে গেলেই পাওয়া যাবে)

"চোরাই মাল শিবপুর পাঠাইবে। দেরী হইলে সমূহ বিপদ। খুব সাবধানে চলিবে।"

(৩)

বর্ষাতি হাজার ঘায় খোস দাদ পাঁচ ড়ায়
লাগাইলে এ চারু মলম,
মিশিয়া আঠার সহ নিবারণ করে দাহ
ক্ষতের সাক্ষাৎ যেন যম।

কুইনিনে আটক রয় জ্বরের লক্ষণ চয়
এ পাঁচন সমূলে জ্বর নাশে।
রোগী ভাবে ভাল নয় একাশি কেমনে সয়
সে দশাও সারে ত্রিবাকসে
দশন ধাবক চূর্ণ শোধিত নয় নাঞ্জন
ক একটি রোগের প্রতিকার।
শুনি লোকে মুর ছয় কিন্তু জেনো মিথ্যা নয়
অদ্ভুত ঔষধ সমাচার।

উত্তর দাতাদের নাম

যাদের সব কটি উত্তর ঠিক হয়েছে ঃ—

১৮৩ তপতি ও নীপা গোস্বামী, ৭০৭ মন্দিরা দেব, ৮৫৩ তপন কুমার দত্ত, ২৪৭৩ সুনীরা সেন।

যাদের প্রথম দুইটি ঠিক হয়েছে কিন্তু তৃতীয় উত্তর দু একটি ভুল আছে ঃ—

৩২ মধুচ্ছন্দা ফৌজদার, সুমিত কুমার ঘোষ, ১৮১ মিষ্টি ও বাসবেন্দু গুপ্ত, ৩৯১ অমিতাভ নিয়োগী ৪২৪ অশোক ও অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, ৪২৭ শমিতা মুখার্জি, ৮২৬ বাসব মুখার্জি, ১০২১ মন্দিরা, মীনাক্ষী ও কল্যাণকুমার সরকার, ১০৬০ শৈবাল দত্ত, ১০৯৭ ঝুমকা সেন, ১৩৬১ রীতা রায়, ১৪৫৩ জগদীশ ভট্টাচার্য ও সুধাংশু বন্দোপাধ্যায়, ১৮২১ জয়ন্তিকা সেন, ২১৬২ কাজল দত্ত, ২২৮০ নালাঞ্জন ও শুভান্বিত চট্টোপাধ্যায়, গৌতম কুমার দত্ত, ২৬২১ শুভা বিশ্বাস, ২৬৪৩ তাপস কুমার বসু, ২৬৪৭ দেবাশীষ তরফদার ও নীলাঞ্জন চৌধুরী, ২৭৩৭ রীতা ও রীণা বসু, ২৭৭৩ মৌসুমী সেন।

শ্রাবণ ১৩৭১—আগস্ট ১৯৬৪

(১)

রাখাল বালক এক মেষের পালক
কুড়ায়ে রাখিত নানা পাখীর পালক।
একদিন ঘরে খুঁজে না পেয়ে সে-গুলি
বলে চোর ধরে এনে মারিবে সে গুলি
না ধরিতে পেরে চোর রাগে সেই ছোঁড়া
ভুঁয়ে পড়ে সুরু করে হাত পা দি ছোঁড়া
মা দিলেন দেখাইয়া ছিল তা মা চানে
তেল মেখে তারপর গেলেন মা চানে
রেখেছিল নিজে সব কাগজেতে মুড়ি
পেয়ে শেষে খুসি হয়ে খাইল সে মুড়ি

(ক) বর্ধমান	(চ) বেহালা
(খ) ঢাকা	(ছ) বৈদ্যবাটি
(গ) খানা	(জ) ধলা
(ঘ) চন্দ্র ভাগা	(ঝ) সুকনা
(ঙ) শোন	(ঞ) বৈকাল

এছাড়াও গ্রাহকেরা আরো কয়েক রকমের উত্তর ভেবে বার করেছে—যথা :—

(গ) মুড়ি, খাইবার (পাস) কুলপি, চিনি, রম্ভা (জ) ধবলগিরি, শ্বেতদ্বীপ, শ্বেত রাশিয়া ইত্যাদি ;

যাদের সব কটি উত্তর ঠিক হয়েছে ঃ—

দীপংকর মজুমদার, ৩৫৮ নন্দিনী সেন, ১৮১৪ কাবেরী ভট্টাচার্য, ২৪৬৭ পার্থমিত্রা ঘোষ, ১৫৪ সিদ্ধার্থ পুরকায়স্থ, ২৬৬৯ চয়ন স্যান্যাল, দিলীপ গোস্বামী, অঞ্জন মুখার্জি।

যাদের একটি ভুল হয়েছে

৩২ মধুচ্ছন্দা ফৌজদার, ১৮১ মিষ্টি ও বাসবেন্দু গুপ্ত, ৪২৪ অশোক ও অমিতাভ চ্যাটার্জি, ৪৯ রাণা মৈত্র ১০৯৭ ঝুমকা সেন, ১৫৭২ কঙ্কা ও শঙ্খ রায়চৌধুরী, ১৭৩৪ তাপস, ভাস্কর ও গৌতম মল্লিক ১৮২৪ স্মৃতিলেখা গুহ, ২১৬২ কাজল দত্ত, সুমিত্রা দাস, ২৩৪২ কল্পনা ব্যানার্জি, ২৩৭০ মাল্যশ্রী চক্রবর্ত্তী ২৬০০ মঞ্জু স্যান্যাল, ২৬৪৭ দেবাশীষ তরফদার ও নীলাঞ্জন চৌধুরী, ২৭০১ মধুশ্রী ব্যানার্জি, ২৭০২ অঞ্জন প্রকাশ সেনগুপ্ত, ২৭৩৭ রীতা ও রীণা বসু, ২৭৯৬ শর্মিলা সেনগুপ্ত, ২৮৮৯ রণজিৎ দে, স্বপনকুমার দে অমলকুমার ব্যানার্জি, গড়বেতা লীলাবতী সব পেয়েছির আসর।

নতুন ধাঁধা

বাগাড়ম্বর বাবু বেশি কথা বলতে চান না। কিছু জিজ্ঞাসা করলে তিনি এককথায় উত্তর দেন; কখনও বা দুই তিনটি আলাদা প্রশ্নের জবাব ও এক-কথায় সারেন।

নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর তিনি একটি কথায় দিয়েছিলেন—তোমরা কি বলতে পার শব্দগুলি কি কি ছিল ?

(১)

(ক) স্নানের আগে রোজ কি করেন ?

(খ) চাকরটিকে তাড়ালেন কি দোষে ?

(২)

(ক) নতুন কাপড়খানা ছিঁড়ল কে ?

(খ) পায় বড় কাদা লেগেছে কি করি ?

(৩)

(ক) রান্নাগুলি হল কিনা কি করে বোঝেন ?

(খ) রোজ সকালে আগে কি করেন ?

(৪)

(ক) টেঁপি স্লেট-পেনসিল নিয়ে কি করছে ?

(খ) নৌকাটা কি দিয়ে চলছে ?

(গ) পাঁচুকে কি দেখে পছন্দ করলেন ?

(ঘ) ধন্নুকে কি পরাচ্ছেন ?

(৫)

(ক) দোকান থেকে কি কিনব ?

(খ) ঝড়ে ঘরের কি ভাঙল ?

(গ) লুডোর ছক্কা নিলাম—এবার কি করি ?

(ঘ) ছেলেটা এত বেশি কথা বলে কেন ?

৩০ শে নভেম্বরের মধ্যে উত্তরটি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে ভুলো না কিন্তু। পাঠাবার সময়ে নিজের নাম, ঠিকানা আর গ্রাহক নম্বর পরিষ্কার করে লিখো।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(১)

১৩৬৮ সনের আষাঢ়-শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যা, ১৩৬৯ সনের বৈশাখ সংখ্যা সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়ে গেছে। তাই আমরা সেই সকল বৎসরের সন্দেশের দাম আরো কমিয়ে দিলাম।

প্রত্যেক নতুন গ্রাহক, স্কুল, ক্লাব ও লাইব্রেরি বাকি সংখ্যাগুলি অবিলম্বে সংগ্রহ করে রাখুন।

		নগদ ক্রয় মূল্য		রেজেস্ট্রি ডাকে
১৩৬৮ (নয়টি সংখ্যা)	—	পাঁচ টাকা	—	ছয় টাকা
১৩৬৯ (এগারোটি সংখ্যা)	—	ছয় টাকা	—	সাত টাকা
১৩৭০ (সম্পূর্ণ বৎসর)	—	সাত টাকা	—	আট টাকা
১৩৬৮ ও ১৩৬৯	—	দশ টাকা	—	এগারো টাকা
১৩৬৮, ১৩৬৯ ও ১৩৭০	—	ষোল টাকা	—	সতের টাকা
শারদীয়া সংখ্যা ১৩৬৮	—	দেড় টাকা	—	২·২০
১৩৬৯	—	দেড় টাকা	—	২·২০
১৩৭০	—	এক টাকা	—	১·৭০
যে কোনও একটি সাধারণ সংখ্যা	—	·৬০	—	১·২০

(২)

অনেক পুরনো গ্রাহক চাঁদা পাঠাবার সময়ে পুরনো গ্রাহক সংখ্যা না লেখার দরুণ তাদের নাম নতুন গ্রাহকের তালিকায় চলে গেছে ও নতুন নম্বর দেওয়া হয়েছে তাই জন্য গ্রাহক কার্ড দেওয়া যাচ্ছে না।

যারা যারা গ্রাহক-কার্ড পাওনি তারা অবিলম্বে লিখে জানাও—(১) তুমি নতুন গ্রাহক না পুরাতন (২) তোমার গ্রাহক সংখ্যা কত। যদি ভুল ক্রমে দুটি সংখ্যা পেয়ে গিয়ে থাক, তাহলে নতুন, পুরাতন, দুটি সংখ্যাই জানাবে।

২৫শে নভেম্বরের মধ্যে যাদের চিঠি পাওয়া যাবে, তাদের গ্রাহক কার্ড ডিসেম্বরের সন্দেশের সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

দিলীপের দলবল
মার্বেল খেলায় মশগুল
কী বাদলাই নেমেছে ! কি করা যায় বল দেখিনি ?
সত্যি, বৃষ্টির দিনে ভারি বিশ্রী লাগে !
কুছ পরোয়া নেই ! আয় মার্বেল খেলা যাক্ !
আঃ কী মজা !
মাথা বটে তোর !
এই নে অশোক, তোর চারটে মার্বেল । সবাইকেই সমান সমান দেওয়া হোলো !
এখানটায় অন্ধকার লাগছে !
আলো ? আচ্ছা সবুর কর, আমি একটা টেবিল ল্যাম্প নিয়ে আসছি।
হ্যাঁ ভাই. আলো না হলে চলছে না !
এই যাঃ সব আলো নিভে গেল !
দিলীপ !
ঐ তোর বাবার গলারে ! ভীষণ রেগে গেছেন মনে হচ্ছে !
এই দিলীপ, কি কচ্ছিস্ তোরা ? ফিউজ সুদ্ধ কেটে গেছে !
আমারই দোষ, বাবা ! আমাদের 'এভারেডী' টর্চের আলোয় ফিউজ বকসটা দেখবে চল !
যাক্, ফিউজ লাগানো হোলো ! হাতের কাছে টর্চটা থাকায় খুবই সুবিধে হয়েছে !
এবার আমাদের খেলা জমবে !
সাবাস্ দিলীপ !
FUSE BOX
বাড়ীতে একটা 'এভারেডী' টর্চ না থাকলে চলে ?
IWTUC 1819

বুদ্ধিমান চাকর

৪র্থ বর্ষ অষ্টম সংখ্যা ডিসেম্বর ১৯৬৪। অগ্রহায়ণ ১৩৭১

(পূর্বপ্রকাশিত অংশের চুম্বক)

পৃথিবীর আসন্ন প্রলয়ের সম্ভাবনায় কয়েক লক্ষ লোক মহাকাশ যান করে অন্য এক সূর্য-মণ্ডলীতে অনেকটা পৃথিবীর মতো এক গ্রহে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। এই ঘটনার দুশ বছর পরে সেই গ্রহে প্রশান্ত কুমার, চিয়েন, মরিশ ও ফিসার নামে চার বন্ধু কলেজের শেষে পরীক্ষার পর সুদূর অঞ্চলে গেল, যেখানে তাদের পূর্বপুরুষেরা পৃথিবী থেকে এসে প্রথম নেমেছিলেন। পুরোনো পৃথিবীর কয়েকটি ভাষা চিয়েন ও প্রশান্ত জানত। পৃথিবীর কতগুলি বই তারা তর্জমা করল। এবং মহাকাশ যান সম্বন্ধে নানা তথ্য জানা গেল।

প্রফেসর সোমোরেন পুরোনো পৃথিবীতে যাবার জন্য এক অভিযানের ব্যবস্থা করলেন, চার বন্ধুও তার মধ্যে নির্বাচিত হল। মহাকাশ যাত্রার প্রস্তুতি দ্রুত লয়ে অগ্রসর হতে লাগল।

(বারো)

কারখানা বা মানমন্দির কোনোটির কাছে কোনো ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ড নেই, অথচ যানটিত সেই মানমন্দিরের কাছেই রয়েছে। আর সেখানেই বোঝাই হচ্ছে সব মালপত্র। তাহলে কোথা থেকে আমাদের যাত্রা সুরু হবে এই চিন্তাটাই মাথায় কদিন থেকে ঘুরছিল, শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে একেবারে ডাঃ ভন প্যাপেনকেই জিজ্ঞাসা করে ফেললাম।

তিনি তখন বুঝিয়ে বললেন 'মানমন্দিরের কাছে যেখানে আছো সেখান থেকেই যাত্রা সুরু হবে। প্রথমে বিকর্ষণী শক্তির সাহায্যে যানটি চালানো হবে। নিঃশব্দে সোজা খাড়াভাবে ওটা উঠে পড়বে কাজে কাজেই কোনো ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ড বা রাণওয়ের দরকার নেই। প্রথম ১০ মাইল ঘন বায়ুস্তর, এটুকু এই বিকর্ষণীশক্তির সাহায্যেই উঠবে আর গতিবেগ ঘণ্টায় ১৫০০ মাইল মতন রাখা হবে, যাতে বাতাসের সঙ্গে ঘষা খেয়েও যানটি বেশী গরম না হয়। তারপরের ১০০ মাইলও এই শক্তিতেই চালান হবে, তবে গতিবেগ বাড়িয়ে ঘণ্টায় ৩০০০ মাইল করা হবে। এরপর বাতাসের ঘনত্ব প্রায় কিছুই থাকবে না, তখন এই বিকর্ষণী শক্তির সঙ্গে জেট-রকেট ইঞ্জিনও চালানো হবে আর গতিবেগ ক্রমশঃ বেড়ে ঘণ্টায় ১৫০০০ মাইল হবে। যখন আমরা ইরসের চাঁদগুলোর কক্ষপথ পার হয়ে যাব তখন এ ছুটিই বন্ধ করে এ্যাটমিক ইঞ্জিন দিয়ে যানটি চলবে আর গতিবেগ তখন আলোর গতিবেগের অর্ধেক হবে। আমাদের এই সৌরজগতের সীমা ছাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে অ্যাটমিক ইঞ্জিন পুরোদমে চালানো হবে আর যানটির গতিবেগ আলোর গতিবেগকেও তখন হার মানিয়ে দেবে।'

ডাক্তার প্যাপেনের কথায় অনেকটা আশ্বস্ত হলাম বটে, কিন্তু সময় কাটানোর তবু কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অন্যদের নানা রকম কাজ রয়েছে, সবাই ব্যস্ত, কিন্তু আমার যে কোন কাজই নেই। এদিক ওদিক ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছি, কবে রওনা হব এই চিন্তাতেই ভরপুর। প্রথম প্রথম, 'যাচ্ছি' এই ভেবেই আনন্দে মগ্ন ছিলাম; কিন্তু যত দিন যেতে লাগল, এই যাওয়ার চিন্তাটাই যেন দুশ্চিন্তায় দাঁড়িয়ে গেল—সময় আর কাটে না।

শেষ পর্যন্ত যাত্রার দিন এসে গেল, যানটিতে উঠবার সময় হয়ে আসছে, এমন সময় দেখি আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ আর দুচারজন অধ্যাপক এসেছেন তাঁদের শুভাশিস জানাতে। বাড়ির কেউ আসেন নি, আমরাই বারণ করেছিলাম। তাঁদের সকলের সঙ্গে শেষ বারের মতন দেখা সাক্ষাৎ আর কথাবার্তা হয়ে গেছে; অবিশ্যি সবই রেডিও ভিসোফোনের মাধ্যমে।

সকলের আনন্দধ্বনির মধ্যে আমরা একে একে যানটিতে উঠে পড়লাম, দরজা বন্ধ হয়ে গেল—অবিশ্যি টেলিভিসোফোনে বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ ঠিকই রইল। দরজা বন্ধ হবার আগে, শেষবারের মতন চেনা জগতটা নিজের চোখে ভালো করে দেখে নিলাম। না জানি কতদিন পরে আবার এখানে এসে পৌঁছব। সত্যি সত্যিই আবার ফিরে আসতে পারব কি না, সে সন্দেহটাও যেন দরজা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ে চেপে বসল। সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা দম আটকানো ভাবও হল, যদিও আমি খুব ভালো করে জানি যে ছোট বন্ধ জায়গাতে কি করে বাতাসকে নিশ্বাসের যোগ্য তাজা

করে রাখতে হয়, তাই নিয়ে বহু শতাব্দীর গবেষণার পর, আমাদের গন্তব্য স্থান সেই পুরোনো পৃথিবীর অধিবাসীরাই ছ'শো বছর আগেই নানান উপায় আবিষ্কার করেছিল। নইলে তারাই বা কোন সাহসে মহাকাশযান চেপে মহাশূন্যে যাত্রা করতে পেরেছিল। তারপর এই ছশো বছর ধরে ইরসের পণ্ডিতরাও এ বিষয়ে কম গবেষণা—চালান নি। এখন আর এটাকে তাঁরা একটা সমস্যা বলেই মনে করেন না।

হঠাৎ চিয়েনের ধমকে খেয়াল হল যে দরজা বন্ধ হবার পর থেকে আমি সেই যে একটা কোণে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেইখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। তখন সকলের সঙ্গে আগের ব্যবস্থা মতন নিজের জায়গায় গিয়ে বসলাম আর এতদিনের অভ্যাস করা নির্দেশগুলি কাজে লাগালাম।

ঠিক বেলা একটার সময় প্রফেসর সোমোরেন যানটি চালালেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই টেলিভিসোফোনের পর্দায় চারপাশের চেনা মুখগুলো যেন বিন্দুতে পরিণত হয়ে গেল, ক্যাম্পের বাড়ি-ঘর, মানমন্দির, পাহাড় ও শেষ লেকটা পর্যন্ত কেমন আবছায়া হয়ে গিয়ে আশে পাশের জায়গার প্রতিচ্ছবির মধ্যে নিজেদের সত্ত্বা হারিয়ে ফেলল। ক্রমে ক্রমে আমাদের গোটা জগতটাই একটা উজ্জ্বল আকাশ জোড়া চাঁদের আকার নিল, তারপর সেটাও ছোট হতে আরম্ভ করল, শেষ পর্যন্ত ভিসোফোনের পর্দায় একটা ধোঁয়াটে ছায়া আর তার মধ্যে একটি আলোক বিন্দু আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে, এ ছাড়া আর কিছুই বড় একটা নজরে পড়ছিল না। কিন্তু ডাক্তার ফস্টারের সঙ্গে কথাবার্তা ঠিকই চলছিল।

যদিও আমাদের যানটির সব যন্ত্রই স্বয়ংক্রিয়, তবু মহাশূন্যে হঠাৎ কোনো কলকব্জা যাতে বিকল হয়ে না পড়ে এবং কোনো অপ্রত্যাশিত কিছুর সংকেত ভিসোফোনে ধরা পড়ে কি না এদিকে নজর রাখার জন্য, দুজন করে লোক সমস্তক্ষণ ভিসোফোনের কাছে মোতায়েন আছে। প্রতি চার ঘণ্টা পর পর অন্য দুজন এসে এদের ছুটী দেবে। ইঞ্জিন ঘরেও সে রকম ব্যবস্থা, তবে সেখানে ছ'ঘণ্টা পর পর পালা বদল।

নিজেদের ক্যাবিনে কতক্ষণ চুপ করে বসে আছি কোনো খেয়ালই নেই, শুধু মনে পড়ে নিকলসন একবার এসে খবর দিয়ে গেছে যে যানটি আর ঘণ্টা খানেক পরে আমাদের সৌর জগতের মায়া কাটিয়ে বেরিয়ে পড়বে আর পূর্ণবেগে চলতে সুরু করবে।

ক্যাবিনে বসে যানটি যে চলছে তা মোটেই টের পাওয়া যায় না। আমি অবাক হয়ে ভাবছি সত্যিই তাহলে রওনা হয়েছি অনির্দিষ্টের উদ্দেশ্যে। আবার নিজেদের জগতে ফিরে আসতে পারব কি না, এই সন্দেহই মনের কোণে থেকে থেকে উঁকি মারছে। এক একবার ভাবছি আমরাও হয়তো সেই হারিয়ে যাওয়া যানগুলির মতো মহাশূন্যে মিলিয়ে যাব। আবার মনে হচ্ছে তা কেন হবে, সব হিসাব এতবার করে পরখ করা হয়েছে, রাস্তা হারাবার কোনো কারণ নেই। প্রতি মুহূর্তে বুঝতে পারছিলাম লালচে সবুজ গাছপালায় ভরা সুন্দর ইরসকে আমি কতই না ভালোবাসি।

যখন খাবার ঘণ্টা পড়ল, তখনও কিছু করতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। কেমন একটা আলস্যের ভাব

সমস্ত শরীরে ; মনের ভিতরটাও যেন একেবারে ফাঁকা ফাঁকা, কোনো কিছুতেই যেন আগ্রহ নেই। একটা উদাসভাবে মন প্রাণ ভরে আছে।

প্রফেসার সোমোরেণ অবশ্য এই রকম মনের বিকার সম্বন্ধে আমাদের সকলকে বিশেষ করে সাবধান করে দিয়েছিলেন। তখন কিন্তু ভাবতেই পারি নি এটা কি রকম রূপ নেবে। ফিসার আর চিয়েন সুস্থ অবস্থাতেই ছিল। ফিসার আমাকে আর চিয়েন মরিশকে একরকম টেনে হিঁচড়েই খাবার ঘরে নিয়ে গেল।

খাবার ঘরে গিয়ে বসলাম ; সেই বড়ি খাওয়া। অবশ্য রংবেরঙের বড়ি দেখে, দু একটা চেখে দেখতে ইচ্ছা যে হয় না তা নয় আর এক এক রকম বড়ির স্বাদ আর গন্ধ জানা থাকলে, হিসাব করে বড়ি বেছে নিলে, যা খেতে চাও তার স্বাদ গন্ধ দুই-ই পাওয়া যাবে। তবে আসল আর নকলের তফাৎটা থেকেই যায়। তাছাড়া বড়িটা চটপট খাওয়া হয়ে যায়, আসলের মতন তারিয়ে খাওয়া যায় না।

এই সঙ্গে অবশ্যি দুচারটা ওষুধের বড়ি ও খেতে হচ্ছে, নয়তো এই প্রচণ্ড বেগে চলার দরুণ, কতগুলি অদ্ভুত ধরণের শারীরিক ও মানসিক ব্যাধির উৎপত্তি হয়। এই বড়ি খেয়েই এখন অন্ততঃ বছর খানেক কাটাতে হবে, কারণ এঁদের হিসাব মতে পৃথিবীতে পৌঁছাতে আমাদের বছর খানেক লাগবে। একবার সেখানে পৌঁছোতে পারলে, কিছুদিনের জন্য এই বড়ির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

আলোর গতিবেগের থেকেও অনেক গুণ জোরে আমরা চলেছি। এই বেগেই চলবে হিসাব করে, বছর চারেকের খাবার মজুদ করা হয়েছে। সেই পৃথিবী ছেড়ে চলে আসা যাত্রীদের নির্দেশ অনুসারে আমাদের ফেরার যাত্রাপথ ঠিক করা হয়েছে। সে সব তাঁরা খুব ভাল ভাবেই লিখে গিয়েছিলেন বলে, প্রফেসার সোমোরেণের বিশ্বাস যে আমরা ঠিক হিসাব মতোই পৌঁছে যাব।

যেটা এখনও অজানা, সেটা হল সেই প্রলয়ের পর পৃথিবীর অস্তিত্ব আছে কি না ; কিম্বা অস্তিত্ব থাকলেও, সেখানকার অবস্থা কি রকম। সেখানে প্রাণী বেঁচে আছে কি না আর বেঁচে থাকলে কোন জাতীয় জীব বেঁচে আছে। এই দুশো বছরের মধ্যে সেখানটা থেকে তো কোনো খবর পৌঁছয়নি।

এক হিসাবে আমাদের অবস্থা আর সেই পৃথিবী ছেড়ে যখন আমাদের পিতৃপুরুষরা চলে আসেন, তাঁদের অবস্থা প্রায় একরকম। দু দলের লোকেরাই কিসের সামনে গিয়ে পড়বেন তা জানেন না। তবে আমরা এটুকু নিশ্চিত জানি যে একটা শান্ত পরিবেশে, চেনা জায়গায়, ফিরে আসতে পারব আর তাঁরা জানতেন যে যে পৃথিবী ছেড়ে তাঁরা চলে যাচ্ছেন, সেটা একটা অবশ্যম্ভাবী প্রলয়ের সামনে পড়েছে। বাঁচবার আশাতেই তাঁরা সেটা ছেড়ে চলেছেন, ফিরে গেলে নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে দাঁড়াতে হবে।

বছর খানেকের রাস্তা, পথে কোনো বৈচিত্র্যই নেই বলেই জানা গেছে, একমাত্র ভয় সেই ক্রুগার ৬০ (Kruger 60) নক্ষত্র পুঞ্জের চৌম্বক ক্ষেত্র। তবে সেটার প্রভাব যখন আমাদের পূর্বপুরুষরা কাটাতে

পেরেছিলেন, আমরাও পারব বলে ভরসা আছে। তাঁরাতো ঐ চৌম্বক ক্ষেত্রের অস্তিত্বের খবর সঠিক জানতেন আর আমরা ওঁদের বর্ণনা থেকেই কিছু কিছু তথ্য পেয়েছি।

এত বেগে চলার দরুণ শরীরে অনেক রকম প্রতিক্রিয়া হয় সেগুলি অতিক্রম করার জন্য ওষুধ ছাড়াও অন্য ব্যবস্থা থাকাতে আমাদের বিশেষ কোনো কষ্ট হচ্ছিল না। মহাশূন্যে কোনো বস্তুরই ওজন থাকে না, তাতে নানা রকম অসুবিধার সৃষ্টি হয়। আবার মহাবেগে চলার দরুণ, নানা রকম উপসর্গ এসে জোটে কিন্তু আমাদের যানটির ভিতরে কৃত্রিম অভিকর্ষের ব্যবস্থা থাকাতে, এসব উৎপাতের হাত থেকে আমরা রেহাই পেয়েছিলাম।

প্রথম দু মাস কেটে গেল নিরুপদ্রবে, কোনো বিপদের আভাস মাত্রও পাওয়া গেল না। ছেড়ে আসা 'ইরস,' সেই আমাদের বড় প্রিয় জন্মভূমি, তার সঙ্গে প্রতি আধঘণ্টা অন্তর খবরাখবর দেওয়া নেওয়া চলছে। এখানে আমাদের ঘড়ি ধরে সমস্ত কাজ করতে হয়, কারণ মহাশূন্যে দিন বা রাতের কোনো নিজস্ব অস্তিত্ব নেই। সব সময় সেই একটানা অন্ধকার, বাইরে দূরে তারা দেখা যাচ্ছে, তবে ইরসে দেখতাম তারাগুলি মিটমিট করে আর গ্রহগুলির আলো স্থির আর এখানে সব তারার আলোই স্থির, শুধু তারার রং যেন অনেক বেশী উজ্জ্বল।

আকাশে মাঝে মাঝে আলোকচ্ছটা দেখা যায়, রামধনুর সাতরং অনেক সময় ঝলকে খেলে যায়, আবার অন্ধকার হয়ে যায়। দু' এক জায়গা মনে হয় যেন গভীর কালী মাখা। হ্যারিশকে জিজ্ঞাসা করতে ও বলেছিল এর সঠিক কারণ ওর জানা নেই, এসব বিষয় ওর মোটে পড়াশুনো নেই। মহাশূন্যের অনেক কিছুই এখনও অজানা রয়েছে বুঝতে পারছি।

তিন মাস কেটে যাবার কয়েকদিন পরেই, ডাক্তার ফস্টার খবর পাঠালেন যে এবার আমরা সেই চৌম্বক ক্ষেত্রের কাছাকাছি গিয়ে পড়েছি আর দু চারদিনের মধ্যেই সেটার আওতায় গিয়ে পড়ব।

এই খবর পাবার পর নিজেদের মধ্যে একটু জল্পনা কল্পনা শুরু হল, এই চৌম্বক ক্ষেত্রের আকর্ষনী শক্তির প্রভাব না কাটাতে পেরে সেই হারানো দলের মতো আমরাও কক্ষপথ হারিয়ে মহাশূন্যে অন্য কোথাও চলে যাব কিনা। এ সবের তর্কের কোনো মীমাংসাই কোন সময় হত না।

ক্রমশঃ

এই মিঠুয়া, খুব তো দেখি হাতপা মাথা নেড়ে
পড়িস বসে ভূগোলখানা জাপটে, গলা ছেড়ে।
ম্যাপও দেখিস, মাঝে মাঝে কলম উল্টে ধ'রে
কত পাহাড় নদীও দেশ খুঁজিস যত্ন ক'রে।
বল তো শুনি কোন রাজ্যে আছে কাব্যপুরী,
নদীর বুকে ঝিকিমিকি খেলে ছড়ার নুড়ি।
পাখির স্বরে কাব্য ঝরে, 'ব্যালাড' ফোটে ফুলে,
খাঁটি পয়ার হয়ে বাদুড় শাখায় থাকে ঝুলে।
দুষ্টু খোকা তাধিন নেচে শোনায় 'ক্লেরিহিউ',
তাইতে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বেড়াল বলে, 'মিউ'।
ফোকলা বুড়ো বাজিয়ে বগল পড়ে 'লিমেরিক',
ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলায় যদি ছন্দ না হয় ঠিক।
মিলের খোঁজে ছোটে লোকে পাহাড় নদী মাঠে,
ছন্দ পালিশ করে সবার সকালসন্ধ্যা কাটে।

শব্দ গড়ার কারিগরের মাইনে হাজার টাকা,
জেলে পুরবে যদি ভাষা একটু ঠেকে ফাঁকা।
যে সব মেয়ে ভারী ভারী অলঙ্কারের ভারে
হুমড়ি খেয়ে পড়ে তাদের সুখ্যাতি খুব বাড়ে।
বিয়ের সভায় যার 'লিরিকে' বিমুগ্ধ হয় কনে
তারি গলায় মালাটি দেয় দ্বন্দ্ববিহীন মনে।
সাহসীরা 'ব্ল্যাঙ্কভার্সে'র ছন্দে মেরে হাতি
ঝুলিয়ে বাঁশে আনে তাকে ফুলিয়ে বুকের ছাতি।
'সনেট' লিখে লক্ষটাকা ইনাম লোকে পায়,
বল তো দেখি দেশটা কোথায়, কোন পাহাড়ের গায়।
মিলবে না এর দেখা ভূগোল যতই খুঁজিস ঝুঁকে,
হঠাৎ দেখবি এর ঠিকানা লেখা মেঘের বুকে।

সবুজ মনের বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ

সুধাংশু গুপ্ত

ছোটদের গোপনপুরের নানা প্রশ্নের যিনি মিষ্টি জবাব দিয়েছেন তাঁর যাদু-কলমে—তিনি আর নেই।

হাঁ যোগেন্দ্রনাথের কথাই বলছি।

ঢাকা জেলায় বিক্রমপুর পরগণার মুলচর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২২শে মার্চ। বাবা-মা দু'জনের ছেলের ওপর দৃষ্টি ছিলো। কী করে ছেলে দশজনের একজন হয়ে ওঠে সে-দিকে তাঁদের চেষ্টার ত্রুটি ছিলো না। প্রথমে পাঠশালায় ভর্তি করে দেয়া হয়। পণ্ডিত মশায়ের কাছে তিনি অক্ষর পরিচয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তারপরে তিনি টোলে প্রবেশ করেন। দু'জন বিদ্যালঙ্কারের কাছে কলাপ শিক্ষা লাভ করেন। কলাপ পাঠে তিনি পুলক লাভ করেন নি। ইতিহাস ও বাংলা ভাষায় ছিলো পরম অনুরাগ।

ছেলেবেলায় যোগেন্দ্রনাথ ডানপিটে কম ছিলেন না। বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে গাঁয়ের পাড়া ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন—কারো গাছের শশা, কলা নারকেল ইত্যাদি না বলে সঙ্গীরা মিলে বেমালুম হজম করতেন। এ-জন্য দিদিমার বকুনি এবং সাজা ও পেতে হতো।

তিনি যখন স্কুলে পড়তেন তখন রবীন্দ্রনাথের কোনো বই পাঠ্য ছিল না। সে-সময়ে পাঠ্য বইয়ের মধ্যে ছিলো মনোমোহন বসুর পদ্যমালা, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের পদ্য পাঠ। তাঁর প্রিয় পাঠ্য বাংলা বই ছিলো শিশু বোধক। ও-বইর ছবি, গল্প, স্তোত্র শিশু-মনের ওপর অসীম প্রভাব বিস্তার করেছিলো। সন্দীপন মুনির পাঠশালা ও দাতা কর্ণের গল্প তাঁর খুবই ভাল লাগতো।

পঞ্চাশ বছর আগে বাংলা দেশের সমাজের নিয়ম কানুন ছিলো অদ্ভুত। মেয়েদের চোখে চশমা এবং পায়ে জুতো পরা সে-সময় নিষিদ্ধ ছিলো। একবার এক মজার কাণ্ড ঘটেছিলো যা নিয়ে সারা গাঁয়ে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিলো। গাঁয়ের চৌধুরী বাড়ির এক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণীর পায়ে ঘা হওয়াতে চিকিৎসকের পরামর্শে এক জোড়া রবারের জুতো পরে স্বামীকে নিয়ে দেশে আসেন। যখন তাঁরা দেশের ঘাটে উপস্থিত হলেন, তখন একদল গোঁড়া ব্রাহ্মণ তা দেখতে পেয়ে বিদ্যালঙ্কারের কাছে নালিশ জানালেন। স্বামী স্ত্রীর দু'জনের তলব পড়লো। বিচার-সভা বসলো। বিদ্যালঙ্কার সভায় সবার সমক্ষে বললেন: ইসে ইকরণ দেখলেন আপনারা—চৌধুরী ব্রাহ্মণী কিনা উপানৎ পরে গাঁয়ে এসেছেন। ইসে ইকরণ কি করি বলুন। একদল নীতি বাগিশ দল হুঙ্কার দিয়ে উঠলো—সমাজ রসাতলে গেল—এদের দু'জনের প্রায়শ্চিত্ত না করলে এক ঘরে করতে হবে।

গাঁয়ের তরুণের দল রুখে দাঁড়ালো তথাকথিত বামুনদের অন্যায়ের প্রতিবাদে। যোগেন্দ্রনাথও

সে দলে ছিলেন। চৌধুরী মশায় নানা তর্কের জাল বিস্তার করে বললেন: শাস্ত্রে এরূপ কোনো বি
নেই। বিদ্যালঙ্কার মশায় হার মানলেন। নরম সুরে তিনি বললেন: ইসে-ই করণ, শাস্ত্রের বিধান ও
ঔষধার্থে সুরা পেয়, কাজেই চৌধুরী মশায়ের ব্রাহ্মণীর ইসে-ইকরণ মার্জনীয়……চিকিৎসকের বিধান

বিদ্যালঙ্কার মশায়ের একটি মুদ্রা দোষ ছিলো প্রতি কথায় ই সে ই করণ শব্দটি ব্যবহার করতে

যোগেন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রতিভা অতি ছোট বেলা থেকেই বিকশিত হয়েছিলো। প্রথমে f
কবিতা লিখে নানা মাসিক পত্রিকায় পাঠিয়ে দিতেন। প্রসিদ্ধ সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যা
দাসী পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। ক্রমান্বয়ে জাহ্নবী, নব্যভারত, প্রবাসী ভারতবর্ষে
প্রবন্ধ ও কবিতা আত্ম প্রকাশ করে। 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' তাঁর নবীন বয়সের রচনা—তখন যো
নাথের বয়স ২৩।২৪ বছরের বেশি হবে না। এ বইটি লিখে তিনি সাহিত্যিক হিসেবে স্বীকৃতিলাভ ক
এ ইতিহাসের বইটি রচনা করতে তাঁকে প্রভূত শ্রম স্বীকার করতে হয়েছিলো বিক্রমপুরের বিভিন্ন
ঘুরে তিনি উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। কত বিগ্রহ, দেবালয়, মসজিদ, ধর্মস্থান, বৃক্ষরাজির ছবি
প্রতিকূল অবস্থায় তুলেছিলেন। স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, জজ সারদা মিত্র, দেশের মনীষীদের
মাসিক পত্রের সমালোচনায় অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভে ধন্য হইয়াছিলেন, লেখক এই তথ্য-নির্ভর ইতি
বইটি রচনা করে।

স্বদেশীযুগের আন্দোলনে যোগেন্দ্রনাথ নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি সে সময় অ
দেশাত্মবোধক সংগীত রচনা করেন। পরে সব গান একত্রিত করে 'মায়ের পুজো' নামে পুস্তকাক
প্রকাশিত হয়। একটি গান সে-সময় গাঁয়ে সবার মুখে মুখে ঘুরে বেড়াত—তার দুটি লাইন ছিলো।

দেশের লাগি সর্বত্যাগী কে বিলাবি প্রাণ
সে আয়রে ছুটে মায়ের ডাকে নিশি অবসান।

যোগেন্দ্রনাথের কিশোর সাহিত্য রচনায় হাত ছিলো অসামান্য। প্রথম বয়সে তিনি ধ্রুব, প্রহ্লা
অর্জুন, ভীমসেন ইত্যাদি রচনা করেন। ছোটদের উপযোগী করে ইতিহাসের মাল-মশলা থেকে
ঐতিহাসিক কাহিনী লিখেছিলেন তার তুলনা হয় না। এতকাল ছেলেমেয়েরা ইতিহাসকে নীরস বি
বলে মনে করতো কিন্তু যোগেন্দ্রনাথের লেখার মায়াজালে তাদের মনে এক নতুন সৌন্দর্যের তোরণ
খুলে দেয়। 'যারা ছিলো দিগ্বিজয়ী', 'মরণ-বিজয়ী বীর' তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

'বাংলার ডাকাতের' গল্পগুলি তার শিশু-সাহিত্যে অপূর্ব দান। নানা জেলার গেজেটিয়ার এ
সরকারি নথি পত্র থেকে তিনি গল্পগুলির উপাদান সংগ্রহ করে তাঁর নিজস্ব লেখনভংগিতে ছোটদে
পরিবেশন করেছেন। ছোটদের কাছে সে-সব বিচিত্র ঘটনার দৃশ্যাবলী অপরূপ হোয়ে ফুটে উঠতো।

একবার যোগেন্দ্রনাথ একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যেকের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ঘ
ঢোকার সঙ্গে সাহিত্যিক মশায় সম্ভাষণ জানালেন। তিনি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ডাকলে
সবাই এগিয়ে এসে যোগেন্দ্রনাথকে প্রণাম করলো। সাহিত্যিক মশায় তাঁর পরিচয় দিলেন। এক
ছেলে ত বলেই উঠলো—এখানে আর থাকিসনি…ডাকাত এসেছে চলরে আমরা পালিয়ে যাই।

হো হো করে যোগেন্দ্রনাথ হেসে উঠলেন। ফেরার সময় সেই সাহিত্যিক বন্ধুটি বললেন—জানেন ত আমার ছেলেমেয়েরা আপনার নাম দিয়েছে ডাকাত। এখন থেকে আপনি ছোটদের কাছে 'ডাকাত' নামে পরিচিত হলেন।

'সন্দেশ' পত্রিকা যখন স্বর্গত সুবিনয় রায়চৌধুরী মশায়ের সম্পাদনায় বার হতো তখন তাঁর বিশেষ আগ্রহাতিশয্যে তিনি কয়েকটি সুন্দর ইতিহাসের গল্প লিখে দিয়েছিলেন।

সেগুলো সন্দেশের পাঠক মহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিলো। উপেন্দ্রকিশোরের কনিষ্ঠ পুত্র সুবিমল রায় যোগেন্দ্রনাথের একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। দু'জন নানা ধর্মমূলক আলোচনা করতেন। সুবিমলবাবুর অনুরোধে তিনি উপেন্দ্রকিশোর সম্বন্ধে একটি নানা তথ্যপূর্ণ জীবনী সন্দেশ পত্রিকার জন্য লিখে দিয়েছিলেন।

যোগেন্দ্রনাথ নিজে 'বিক্রমপুর' নামে একখানা মাসিকপত্র প্রকাশ করেছিলেন। নিজে সম্পাদক এবং সহকারীর পদে নিযুক্ত ছিলেন সুখ্যাত লেখক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

বারো বছর ধরে 'কৈশোরক' নামে একখানা কিশোরদের মাসিক পত্র দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদনা করে গেছেন। বর্তমান প্রবন্ধের লেখক ছিলো সহঃ সম্পাদক। পত্রিকাটির নামকরণ করেছিলেন স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। ওই পত্রিকাটিতে নানা শিক্ষামূলক রচনাবলী প্রকাশিত হতো। হিমালয়ের পারে কৈলাস ও মানস সরোবরের লেখক প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়, সুকবি মোহিতলাল মজুমদার, মনোজিৎ বসু ইত্যাদি লেখকেরা যোগেন্দ্রনাথের 'কৈশোরক' পত্রিকায় প্রথমে ছোটদের জন্য লেখেন।

তিনি ছোটদের কল্যাণমূলক সৃষ্টির জন্য লেখনী চালনা করে গেছেন। আমাদের দেশের নানা অনাবিষ্কৃত তথ্য থেকে এবং পুরোনো হাতে লেখা পুঁথি থেকে পাঠোদ্ধার করে ছোটদের উপহার দিয়েছেন রকমারি কাহিনী। তাঁর স্বপ্ন ছিলো সুদূরপ্রসারী, শিশুমনের এক সম্ভাবনা পূর্ণ ভবিষ্যতের ও সার্থক বিকাশের।

সব চেয়ে বিস্ময়কর সৃষ্টি যোগেন্দ্রনাথের সম্পাদিত দশখণ্ডে সম্পূর্ণ ছোটদের বিশ্বজ্ঞান-ভাণ্ডার 'শিশু-ভারতী।' ছোটদের এ ধরণের সিরিজ বাংলাভাষায় ছাড়া আর কোনো প্রাদেশিক ভাষায় নেই। শিশু-ভারতী জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক মণি মঞ্জুসা।

শিশু-সাহিত্য পরিষদ নামে শিশু-সাহিত্যিকদের গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের মূলে যোগেন্দ্রনাথের দান অনেকখানি। তিনি উক্ত পরিষদের প্রথম সভাপতি ছিলেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহঃ সভাপতি পদেও ছিলেন তিনি কয়েক বছর। তা ছাড়া শিশু-কল্যাণকর নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিলো।

শিশু-সাহিত্যে অমূল্য ও বিচিত্র গ্রন্থরাজির সৃষ্টির জন্য যোগেন্দ্রনাথ ভুবনেশ্বরী পদক, লীলা পুরস্কার লাভ করেছিলেন। 'মৌচাক' পত্রিকা প্রদত্ত 'মৌচাক' পুরস্কার ও তিনি পেয়েছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির গুণীজন সম্বর্ধনায় তাঁকে সম্বর্ধিত করা হয়েছিলো।

তিনি কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষার পরীক্ষকও ছিলেন। কলকাতা বিশ্ব-

বিদ্যালয় তাঁকে গিরিশ লেকচারার নিযুক্ত করেছিলেন। সে-সব বক্তৃতাবলী একত্র করে মহাকবি গিরিশচন্দ্র নামে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে শিশুভারতী সংযোজনী খণ্ড সম্পাদনা শেষ করে গেলেন। তাঁর রচিত ধর্মমূলক জীবনী গ্রন্থ সাধক রামপ্রসাদ, মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ, সাধক কমলাকান্ত বই তিনটি বিশেষ প্রসিদ্ধ। 'বঙ্গের মহিলা কবি', 'ভারত মহিলা' বই দুটি নানা তথ্যে পূর্ণ এবং গবেষকদের কাছে মূল্যবান রেফারেন্স বই হিসেবে সাদৃত।

ছোটদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য বই প্রণয়ন করে গেছেন।

যোগেন্দ্রনাথ সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করেছেন গত ৩১শে মে বেলা একটায়। তাঁর মৃত্যুতে ছোটরা তাদের সবুজ মনের বন্ধু, প্রতিভাধর সাহিত্যিকের নব নব সৃষ্টির আস্বাদন থেকে বঞ্চিত হলো।
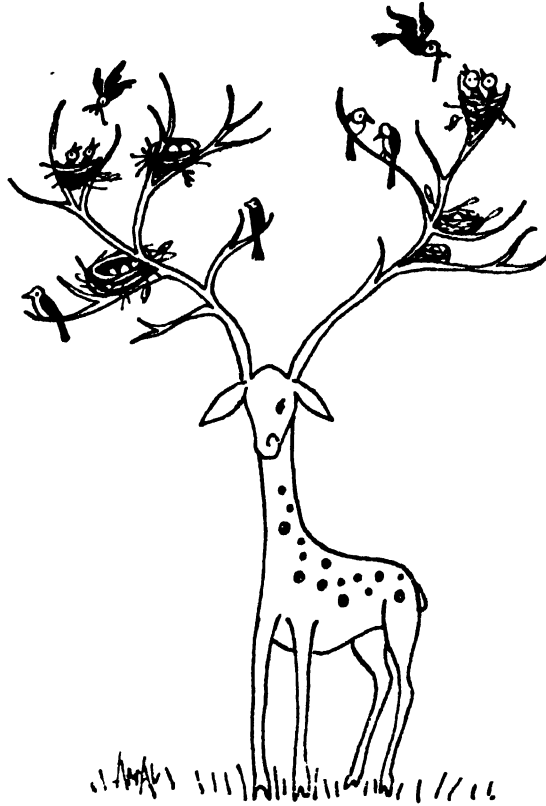
(দক্ষিণা রঞ্জন মিত্র মজুমদারের রচিত রূপকথা-কাহিনী শীতবসন্ত অবলম্বনে)

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

(রাজপ্রাসাদ। আনন্দ কোলাহল মুখরিত। তারই এককোণে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর দুটি ভাই)

বসন্ত : দাদারে! আর তো পারি না,
কষ্ট এত তবু কাছে কেউ তো আসে না,
দারুণ খিদের জ্বালা আমি সইতে পারি না,
আননা খাবার, কোথায় আছে, যানা ছুটে যা।

শীত : কোথায় পাব খাবার লক্ষ্মী আমার ভাই,
কেবা আছে আপন, আহা, মা যে মোদের নাই।

বসন্ত : দিচ্ছে জ্বালা ওই আমাদের সুয়োরানী মা
বকছে কত, মারছে তবু, কাঁদতে পারি না।
উহুহু আর পারি নে, খিদের জ্বালা যে,
দাদারে তোর পায়ে ধরি, খাবার এনে দে।

শীত : চুপ, চুপ, চুপ, শিগ্গিরী চল, আসছে রানীমা

শুনলে পরে আর আমাদের রক্ষা রবে না।

(প্রস্থান—সুয়োরানীর প্রবেশ)

সুয়োরানী : কত ভাল মানুষ আমি দেশের সুয়োরানী,
মন্দ কথা, মন্দ কাজ, তাকি আমি জানি?
মায়ায় ভরা মন যে আমার বুঝবে কি তা লোকে,
দুঃখ কারো দেখলে পরে জল আসে দুই চোখে।
ঐ যে দুটো হ্যাংলা পাজি দুয়োরানীর ছা,
কত আদর করি তবু কান্না থামে না।
আর যে আছে সোনা মাণিক তিনটি আমার ছেলে,
তিনভুবনে খুঁজলে পরে এমন কি আর মেলে?

(তিন ছেলের প্রবেশ)

এই তো আমার মাণিক এল সোনা যাদুমণি,
খাওনি বুঝি, আহা বাছা, কি হয়েছে শুনি?

প্রথম : অতি ঘিয়ের পোলাউ আমি কেমন করে খাই?

মা : আহা মরে যাই!

দ্বিতীয় : ক্ষীর সন্দেশ খেলেই মুখে লাগে দারুণ মিষ্টি।

মা : এ কি অনাসৃষ্টি!

তৃতীয় : জল না দিয়ে দুধ দিয়ে রোজ মুখ ধোয়াবে ঝি,
বল দেখি একি!

মা : বাছারে তোর কষ্ট দেখে দুঃখে ভাঙ্গে বুক,
এমনি পোড়া কপাল তোদের একটুও নেই সুখ,
ঐ দুয়োরানীর ছেলে দুটো ডাইনী মায়ার চর,
এতদিনে ওরাই বুঝি করল তোদের ভর।
হায়রে কপাল কি ভয়ানক, কোথায় আছিস কে,
জল্লাদকে এক্ষুণি সব খবর দিয়ে দে।

(জল্লাদের প্রবেশ)

সুয়োরানী : বসন্ত শীত শয়তানদের রক্ত আমি চাই,
তা না হোলে কোন মতে রক্ষা কারো নাই।

জল্লাদ : রানীমাগো, দুঃখী ওরা, নেই যে ওদের মা।

সুয়োরানা : কোনো কথা শুনব না আর, এক্ষুনি তুই যা।

(জল্লাদের প্রস্থান)

সুয়োরানী : সব জ্বালিয়ে দেব, পুড়িয়ে দেব, করবো ছারখার,
জাহান্নমে পাঠিয়ে দেব, এই পোড়া সংসার।
সোনাচাঁদে মেরে তোরা কোথায় পাবি পার,
রক্তে তোদের স্নান করাব, নেই কোনো নিস্তার।

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

(গভীর বন। দুই ভাই, শীত বসন্তকে নিয়ে জল্লাদ চলেছে। বিষম চিন্তায় স্তব্ধ হয়ে গেছে সে, এ যে বড় কঠিন কাজ)

শীত : কি হয়েছে এমন করে, আনলে কেন বনে ?

বসন্ত : চুপটি করে আছ, কিছু ভাবছ বুঝি মনে ?

শীত : উহু লাগছে আমার বড়,
একটু আস্তে করে ধরো।

বসন্ত : আমাদের মারবে বুঝি তুমি
বল, কোন দোষ করেছি আমি ?

শীত : রানীমায়ের দারুণ কোনো হুকুম বুঝি, পেলে,
দুই ভাইকে গভীর বনে তাই কি নিয়ে এলে ?

জল্লাদ : রাক্ষসী ওই সুয়োরানীর সর্বনাশা মন,
(তোমাদের) রক্ত দিয়ে করবে সে স্নান, এই করেছে পণ,
রাজারানীর আদেশ পেলে মানুষ ধরে মারি,
তাই বলে এই সোনামাণিক, এমন কি আর পারি ?
(এমন) কচি মুখের পানে চেয়ে আজকে আমার হার,
ভাবছি আমি কি করে আজ পাই তবে নিস্তার।

বসন্ত : ভাবনা কেন, রাজার ছেলে, মরতে কি ভয় পাই ?

শীত : অস্ত্র দিয়ে মারো তুমি, আর কি তোমার চাই ?

জল্লাদ : না না না সে হবে না, কখনো তা পারবো না,
মরবো, তবু এমন সোনা, অস্ত্র দিয়ে মারবো না।
বনের পশু কেটে আমি রক্ত নেবো তার,
(সেই) রক্ত দিয়ে সাধ মেটাব, ডাইনী রানী মার।
(আ হা হা), ঐ তো দেখি বনের পশু গভীর বনে চরে
যাচ্ছি আমি যে করে হোক আনবো ওকে ধরে।

(শিকার ধরে এনে)

রাজার কুমার যাচ্ছি আমি দোষ নিও না কোনো,
ভগবানের আশিষ পাবে, বন্ধু তাঁকেই জেনো৷

(জল্লাদের চলে যাবার পথে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে দুভাই, তারপর তারা বনের পথে পথে চলতে থাকে)

আমরা ছোট্ট দুটি ভাই, যতদূরেই চাই, আপন যে কেউ নাই,
ফাঁকি দিয়ে সেই যে কবে পালিয়ে গেল মা, আর তো এলো না।

আমরা ছোট্ট দুটি ভাই

বসন্ত : দাদারে একটুখানি জল,
বুক যে আমার শুকিয়ে গেল কোথায় পাব বল।
আর পারি নে, কোথায় আছে, একটুখানি জল।

শীত :	তোমরা সবে বনের পাখি, বনের ফুল ও ফল,
বলতে পারো কোথায় গেলে একটু পাবো জল,
বলো বলো বলো শুনি কোথায় পাবো জল।
(কোনো সাড়া পেল না)
গাছের ছায়ে একটু বোসো লক্ষ্মী সোনা ভাই,
আনবো যে জল এক নিমেষে, যেমন করেই পাই।
(প্রস্থান)

(ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে, এক সময় বসন্ত ঘুমিয়ে পড়ে। এমন সময় এক মুনি এলেন, ধ্যানে বসলেন, ধ্যানভঙ্গ হলে বসন্তকে ঐ অবস্থায় দেখেন তিনি)

মুনি :	আ হা হা কোথায় থেকে এলো এমন ফুল,
আকাশ পারের চাঁদ বুঝি আজ পথ করেছে ভুল,
ঝরাফুলের মতন আহা মুখখানি কি মিষ্টি,
(অমন) মুখের পানে চেয়ে আমার ফিরছে না যে দৃষ্টি।
এমন রতন এমন বনে দিল বিসর্জন,
স্নেহ মায়া কিছুই কি নেই কেমন কঠিন মন।
(মুনি কাছে গিয়ে কোলে তুলে নেবেন)
দৃশ্য শেষ

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

(গভীর বন। শীত জল নিতে আসছে এই বনে। এমন সময় এক দেশের কোটালের প্রবেশ।)

কোটাল :	রাজ্য রয়েছে, রাজা নাই দেশে, শূন্য সিংহাসন,
রাজটিকা আঁকা রাজা চাই তাই সকলে করেছে পণ,
দুটি চোখ মেলে এত লোক দেখি, রাজটিকা কারো নাই।
কে আছে কোথায় এমন মানুষ কোথা তারে খুঁজে পাই।
(দূর থেকে শীতকে দেখতে পেয়ে)
আলোক ছড়ায়ে এই বনপথে দেবশিশু আসে নাকি
একি একি একি কপালে যে তার রাজটিকা আঁকা দেখি!
(কাছে এলে ছুটে গিয়ে তাকে ধরে)
পেয়েছি পেয়েছি আজিকে তোমাকে, কোনো কথা নয় আজ,
যে কোরেই হোক নিয়ে যাব ধরে, তুমি হবে মহারাজ।

গীত : ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও···

(জোর করে ধরে নিয়ে প্রস্থান)

দৃশ্য শেষ

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

(এক রাজবাড়ি, ছোট্ট রাজকুমারী, রূপবতী কোথা থেকে উড়ে আসা, তার পোষা টিয়ের সঙ্গে কথা কইছে। আজকে যে রাজকুমারীর স্বয়ম্বর। ভাল করে সাজতে হবে তো! মনে তার খুশি আর ধরে না। রাজকুমারী নাচবে, গাইবে। তারপর, পাখিকে চুপ করে থাকতে দেখে বলবে···)

রাজকুমারী : পাখি পাখি পাখি আমার
দুষ্টু সোনা, মিষ্টিমনা পাখি,
মন ভুলিয়ে গাইতে পারো,
চোখ জুড়োনো নাচতে পারো,
তাই বলে কি চুপটি করে থাকতে হবে নাকি?
বলো দেখি সোনার পাখি আজ
কেমন আমার স্বয়ম্বরের সাজ

টিয়া : সাজ তো ভাল, রাজকন্যা, সোনার নূপুর কই?

রাজকুমারী : এইতো আমার সোনার নূপুর এই।
(নেচে দেখাল)

টিয়া : বেশ কথা তা কোথায় হীরার হার।

রাজকুমারী : ঝিকিমিকি দেখছ না কি। কি চাই বল আর।

টিয়া : কই সে তোমার কানের সোনার দুল।

রাজকুমারী : এই তো কানে দুলছে যেন মিষ্টি দুটো ফুল।

টিয়া। দেখি কোথায় পান্না মোতি হীরের গড়াচুড়ি।

রাজকুমারী : (রাগ করে) কিচ্ছুই চোখে দেখছো নাকি
একেবারে বুড়ি।

টিয়া : বেশ, বেশ, বেশ, আহা,
আহা, আহা, বেশ,

রাজকুমারী : এবার বলো কেমন আমার স্বয়ম্বরের বেশ।

টিয়া : একটু আবার নাচ দেখাবে আজ,
বলব তবে, কেমন তোমার সাজ।

(রাজকন্যার নাচ ও গান)

রাজকন্যা : এবার বলো সাজটি কেমন তাই।

টিয়া : নাচতো ভাল কন্যা তোমার সাজ না যেন ছাই।
এমনি পোষাক পরলে, গলায় গজমোতি চাই
আছে তোমার, আছে? আছে? নাই, নাই নাই।

(রাজকন্যা খুঁজবে, পাবে না ; কেঁদে, রেগে)

রাজকন্যা : চাইনে নূপুর, পরব না হার চাইনে কানের দুল,
গজমোতি নইলে আমি, ছিঁড়বো মাথার চুল,
সোনার টিয়া বলবে কেন, পোষাক আমার ছাই,
কেন, কেন, কেন আমার গজমোতি নাই!
যে কোরে হোক গজমোতি চাইই আমার চাই,
আদেশ দিলাম, নইলে পরে রক্ষা কারো নাই।

(প্রস্থান)

(সঙ্গে সঙ্গে এ আদেশ প্রচার হল)

টিয়া : এ বাবাগো, কি বোকারে, করলে হোল বায়না?
চাইলে পরেই পাবে সে কি যেমন তেমন গয়না।
হিহি, হিহি, হিহি, আমার পাচ্ছে বড় হাসি,
দেখি কোথায় গেল আমার আহ্লাদিদির মাসী?
হোহো, হোহো, হোহো, হাহা, হাহা, হাহা, হিহি হিহি হিহি
হি হি হি হি।

(প্রস্থান)

॥ পঞ্চম দৃশ্য ॥

(মুনির তপোবন। বসন্ত গাছের পাখির সঙ্গে গজমোতির কথা বলছে। মুনি বসে আছেন প্রার্থনায়। আড়াল থেকে পাখি বলছে)

পাখী : রাজপুত্তুর, রাজপুত্তুর, গজমোতি চাও?
লাল টুক টুক রাজকন্যে—তাও?

বসন্ত : বনের পাখি একটু আমায় বলো দেখি ভাই,
কোথায় গেলে পাব আমি গজমোতি, তাই।

পাখী : গজমোতি আনবে, এত সহজ কথা নয়!
সে দেশে যে অনেক বিপদ, অনেক আছে ভয়।

বসন্ত : চাই, চাই, চাই, আমার গজমোতি চাই,
বল, বল বনের পাখি কোথায় গেলে পাই।

পাখী : মুনির কাছে চাইলে পরে শুনতে পাবে তা,
এর বেশী আর আমি বাবা কিচ্ছু জানি না।

বসন্ত : (মুনির কাছে গিয়ে)
গজমোতি কোথায় পাব, বল ঠাকুর আজ,

মুনি : কি ভয়ানক, সে যে বাছা, দারুণ কঠিন কাজ,
ক্ষীরের সাগর, মায়ার পুরী, রাক্ষসীদের দেশ,
এমন সাধ্য আছে কারো ? গেলেই প্রাণে শেষ।

বসন্ত : মায়া, যাদু, রাক্ষসীদের করবো আমি জয়
রাজার ছেলে মারবো সবে, তাই বলে কি ভয় !
যাবই যাব মায়ার পুরী ভাবনা কিছুই নাই,
আনবো আমি গজমোতি আশিস তোমার চাই।

মুনি : আহা বাছা ! গর্বে তোমার, উঠছে ভরে বুক,
আশিস দিলাম জয় হবে আর জীবনভরা সুখ।

(আশীর্বাদ নিয়ে প্রস্থান)

॥ ষষ্ঠ দৃশ্য ॥

(রাজকন্যা রূপবতীর দেশ। রাজপুরীর একটি ঘর। ঘোড়ায় চড়ে শীত রাজা এল রাজকন্যা এমন আদেশ কেন দিয়েছে ?)

শীত : তোমার আদেশ পেয়ে সবে আনতে গেল হার ?
নইলে কারো প্রাণে বুঝি রক্ষা নাহি আর ?

রাজকন্যা : গজমোতি আনলে পরে ভাবনা কিছুই নাই
কোনো কথা শুনবো না আর, চাইই আমার চাই।

শীত : এমন মানুষ কোথায় আছে আনতে পারে তা,
গেলেই প্রাণে মরবে সে, আর রক্ষা রবে না !

রাজকন্যা : শুনবো না, শুনবো না, শুনবো না, না,
যতই বলো, তোমার কথা,
কোনমতেই শুনবো না।

শীত : চুপটি করে থাকো তুমি,
চলবে না আর ফন্দী,

আজকে থেকে জানবে তুমি,
আমার কাছে বন্দী।
শীত আমি, মস্তবড় রাজা তুমি জানো,
বিপদ হবে, আমায় যদি একটুও না মানো।

(প্রস্থান)

॥ সপ্তম দৃশ্য ॥

(রাজকন্যা রূপবতী বসে আছে। টিয়েপাখি তাকে কি যেন বলছে)

টিয়া : রাজকুমারীর বায়না, গয়না সে আর চায় না,
আয় ছুটে আয় আয় রে, এবার বুঝি চায় রে।

রাজকন্যা : কি হয়েছে সোনার পাখি ?

টিয়া : রাজকুমারীর বায়না
গয়না সে আর চায় না।
নারে নারে নারে,
বারে মজা বারে।

রাজকন্যা : কি হয়েছে, লক্ষ্মী সোনার পাখি ?

টিয়া : তাইরে নারে নারে
পালিয়ে ছুটে যারে।

রাজকন্যা : পাখি, পাখি, পাখি, পাখি, পাখি !!

টিয়া : বলতে পারি একটু আমায় আদর কর দেখি !

রাজকন্যা : বেশ বাবা বেশ ! (আদর করবে)
এবার বল বেশ !

টিয়া : আজই পাবে গজমোতি ভাবনা কিছুই নাই।

রাজকন্যা : সত্যি, সত্যি, সত্যি বুঝি তাই !
সাজবো আমি, সাজবে পাখি, করাব আজ স্নান
শিগ্‌গিরী যা কপিল গাইয়ের দুধ দুয়ে সব আন,

(স্নান করাতে বসলে পাখি হঠাৎ অপরূপ মূর্তি হয়ে গেল। এই সেই দুয়োরানী। কিন্তু রাজকন্যা কি করে জানবে তা !)

রাজকন্যা : একি, একি, এতো আমার সোনার পাখি নয় ?
পরী তুমি ? দেবতা ? আমার পাচ্ছে বড় ভয়।

দুয়োরানী : ভয় করোনা রাজকুমারী, তুমিই আমার প্রাণ,
মায়ের মত করলে তুমি আমার জীবনদান।

সুয়োরানীর দুষ্টামিতে হোলাম আমি টিয়ে,
তোমার কাছে এলাম ফিরে নতুন জীবন নিয়ে,
আয় কাছে আয়, লক্ষ্মী আমার মা।

রাজকন্যা : বাবা, বাবা, কক্ষনো আর তোমার কাছে না।

দুয়োরানী : পাগলি মেয়ে, শোন তবে আজ বলছি তোকে তাই
গজমোতি আনবে যে আজ শীতরাজা তার ভাই।
তারা আমার হারা মাণিক ছেলে
দেখবি কাছে এলে।
আয় কাছে আয় শোন
আজ থেকে তুই সবার প্রাণের ধন।

রাজকন্যা : তবে তুমি বল হবে যা,

দুয়োরানী : যা, যা, যা।

রাজকন্যা : আমায় ছেড়ে কোথাও তুমি পালিয়ে যাবে না!

দুয়োরানী : না, না, না।
(কোলে নিয়ে আদর করতে করতে)
সোনা আমার, মাণিক আমার, লক্ষ্মী আমার ধন,
বুকে করে রাখবো তোমায় ভরবে আমার মন।
সোনা আমার……

॥ অষ্টম দৃশ্য ॥

(শীতরাজার দেশ। বসন্ত জগৎ আলো করে গজমোতি নিয়ে এসেছে, আর এনেছে অবাক করা তিনটে সোনার মাছ। রাজার আদেশ নিয়ে রাজকন্যার কাছে যাবে সে। অবাক কাণ্ড ঘটলো এখানে)

বসন্ত : রূপবতীর দেশে যাব, রাজার হুকুম চাই।
রাজামশাই কোথায় আছেন, বলো আমায় তাই,
তিনটে সোনার মাছ এনেছি, যত্ন করে নাও।
আর দেরা নয়, এক্ষুণি যাও খবর দিয়ে দাও।

ঝি : হাই ভগবান, তাড়াতাড়ি, সে কথা আর বলতে,
ক্ষ্যান্তদাসীর মতন জোরে, কেউ পারে কি চলতে।
উড়োপাখির মতন তোমার ক্ষ্যান্তদাসীর ধাওয়া,
চোখের নিমিষ ফেলে দেখ একেবারে হাওয়া।
(অদ্ভুতভাবে আস্তে হেঁটে গেল সে)

(শীতের প্রবেশ। বসন্ত ভাইকে দেখে সে অবাক)

শীত : আহা স্বপ্ন বুঝি !
এমনি কোরে এ কার পানে চাই !
ধনদৌলত, সোনামানিক, রাজ্যভরা ধন,
বুকের মাঝে কান্না আমার ব্যথায় ভরা মন
বসন্তরে, কোথায় ছিলি ! আয় বুকে আয় ভাই !
আনন্দে আজ ভরেছে মন, আর যে দুঃখ নাই।
আয় কাছে আয় ভাই। (আলিঙ্গন)

ঝি : (ছুটে এসে) হাই ভগবান, বাঁচবোনিকো উরে মাগো মা,
আপনি রাজা, তিনটে সোনার মাছ এনেছ না ?
রাজপুত্তুর হয়েছে যেই কুটতে গেনু তা।
কইচে কতা, তিন জনেতে, কিচির মিচির হাসছে,
এই মরেচে, হাই ভগবান, ইদিকপানে আসছে !

বসন্ত : (তাদের দিকে চেয়ে অবাক হোয়ে)
ভয় কেন পাও, আরে আরে, এযে মোদের ভাই,
সুয়োরানীর ছেলে, দাদা বলতো কিনা তাই ?
(সুয়োরানীর তিনছেলে কাছে এসে প্রণাম করে)

তিনভাই : ভয় পেয়ো না, আমরা দাদা সুয়োমায়ের ছেলে,

বসন্ত : এই দেশেতে তোমরা সবে কেমন করে এলে ?

তিনভাই : রাজ্য গেছে, রাজা গেছে, শ্মশান হোলো দেশ,
নিজের পাপে সুয়োমায়ের জীবন হোলো শেষ।
তিনটে সোনার মাছ হোয়ে সব ছিলাম সাগরতীরে
তোমার দয়ায় আজকে আবার জীবন পেলাম ফিরে,
আজকে থেকে তোমরা ছাড়া, আপন যে কেউ নাই,
দোষ দিও না, ক্ষমা করো আমরা ছোট ভাই।

বসন্ত : ভাইয়ের মতন এমন আপন, আর কে আছে বলো
রাজকন্যা আনতে যাব সবাই মিলে চলো।

তিনভাই : আহা কোথায় আছে আনন্দ আর
এমন মজা ভাই,
চলো, চলো, চলো মোরা,
এক্ষুণি সব যাই।

॥ নবম দৃশ্য ॥

(রাজকন্যা রূপবতীর মহল। পাঁচ ভাই এসেছে। অন্তঃপুরে খবর গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে রাজকন্যাকে নিয়ে চারদিক আলো কোরে দুয়োরানী এলো। শীতবসন্ত বিস্ময়ে আনন্দে আত্মহারা। দুয়োরানী স্থির, সুন্দর স্বপ্নের মত সামনে দাঁড়িয়ে)।

দুজনেই : মা ! মা !!

বসন্ত : বল্ দেখি তুই, বল্ দেখি তুই, সত্যিকারের নয় ?
কষ্ট দিয়ে পালিয়ে গেলি মা কি এমন হয় ?

শীত : তবুও তুমি ডাকছো না যে, বলছো না যে কথা,
প্রাণে কি মা লাগছে না তোর একটুকুও ব্যথা ?

বসন্ত : মা, মা, মা, বল্ দেখি তুই বল্,
তবে কেন দেখছি মা তোর দুচোখ ভরা জল।

দুয়োরানী (কোলে নিয়ে)
প্রাণ যে আমার জুড়িয়ে গেল, জুড়িয়ে গেল প্রাণ,
বাছা আমার, সোনা আমার, আয়রে আমার প্রাণ।

তিনভাই : মা আমাদের ছেড়ে গেছে, কোনওখানে নাই !

দুয়োরানী : আজকে থেকে আমি যে মা, আহা মরে যাই !
(একটু পরে)
আনন্দে আজ মিলেছে সব, জগৎজোড়া ধন
আজকে থেকে রূপবতী তোদের আপন জন।
(কাছে গিয়ে হার নিয়ে)
দেখি দেখি দেখি মায়ের গজমোতি হার,
গজমোতি নইলে কারো রক্ষা আছে আর !
(নাচ, গান, আনন্দ)

* মধু সমাপন *

ছড়া

আশানন্দন চট্টরাজ

বাবার হাতে, খাবার থালা
থালার মাঝে, মটর মালা।
মটর মালা গলায় দিয়ে,
'ভিয়েন্‌পুরে' যায় যে টিয়ে।

টিয়ের দিদি, ঝিয়ের হাতে
খায়না কিছু, আঁধার রাতে।
আঁধার রাতে, 'রতন' মাঝি
মাঝ্ নদীতে, পোড়ায় বাজি।

পোড়ায় বাজি বাঘের ছেলে
ছয়টি নয়া পয়সা পেলে,
পয়সা পেলে পুকুর ঘাটে
বন-পাপিয়া সাঁতার কাটে
সাঁতার কাটে সারস পাখী
পড়ায় দিয়ে রোজই ফাঁকি।
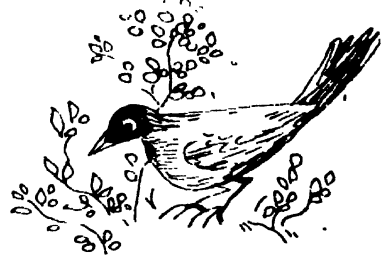
রোজই ফাঁকি দেয়না কাক্,
কাক যে তোলে, কল্‌মী-শাক্
কল্‌মী-ডাঁটে কলম্ কেটে,
'শেঠের বাড়ী' পালায় হেঁটে
হেঁটে হেঁটেই বিড়াল, বেজী
বেগুন কিনে কয়েক 'কে. জি'।

'কে. জি,' মানেই 'কিলোগ্রাম্'
বল্‌লে হাঁদা, ভ্যাবলারাম্।
ভ্যাবলারামের তিন খুড়ি
ভাজ্‌ছে তারাই দিন মুড়ি।
মুড়িই খালি ভেজাল-হীন্
গাছের মাথে, ঘিয়ের টিন্।

মুরগীর বাচ্চা
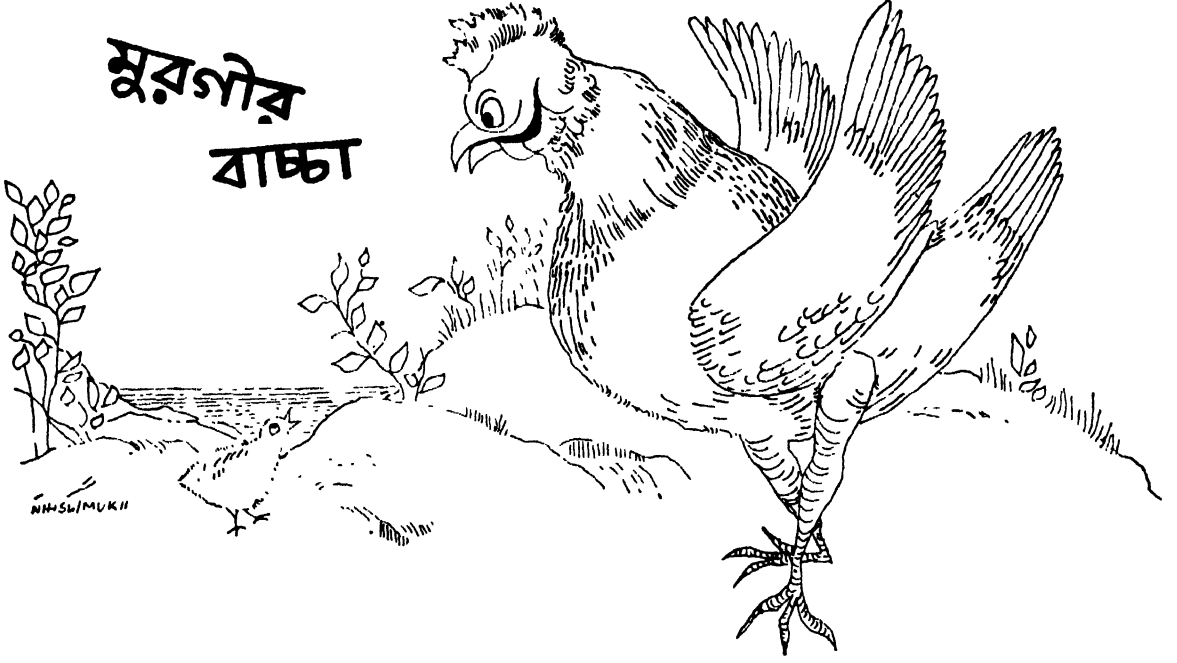
সত্যেন সেন

মুরগী তার বাচ্চাকে ডেকে বলল, 'এই ছোঁড়া, অমন করে খোঁড়াচ্ছিস কেন রে ?'

বাচ্চা বলল, 'একটা কাঁটা ফুটেছে মা !'

'কেন, দেখে পথ হাঁটতে পার না ? কেবল দস্যিপনা !'

'হাঁ দস্যিপনা ! কাঁটাগুলি কেমন করে চোরের মত লুকিয়ে থাকে, আর দেখ্‌নাদেখ্‌ কুটুস করে ফুটে বসে। ওদের দেখা যায় নাকি ?' বাচ্চা নাকীসুরে বলল।

'নাঃ দেখা যায় না ! কই, আমাদের পায়ে তো ফোটে না।'

বাচ্চা এবার সুযোগ পেয়ে মাকে চেপে ধরল, 'তোমকে ক'দিন বলেছি মা,—আমি চোখে ভাল দেখতে পাই না ত আমাকে একটা চশমা এনে দাও। তা তুমি কিছুতেই দেবে না।'

'আহা-হা কি কথার ছিরি ! মুরগার বাচ্চারা আবার চশমা পরে না কি কোন দিন ?'

'তবে ওরা পরে কেন ? ওই যে ও বাড়ীর ছোট্ট বাচ্চাটা তার চোখেও তো এই এত বড় একটা চশমা। আঃ কি সুন্দর দেখতে ! কেন, আমায় তুমি একটা এনে দিতে পার না ?'

মা বলল, 'হারে পাগলা, ও যে মানুষের বাচ্চা। ও তো পরবেই। আর আমরা হচ্ছি মুরগী, আজ আছি, কাল নেই। কথায় বলে মুরগীর প্রাণ ! ওদের যখন খুশী হবে, সাবাড় করে দেবে। আমাদের আবার চশমা ! তোর কথা শুনে হাসব না কাঁদব ?'

কথাটা বলে ফেলেই মুরগী জিভ কাটল। ছি ছি, এইটুকু বাচ্চার কাছে ও কথাটা বলা ঠিক হয়নি। আছে নিশ্চিন্তে, থাকুক! যে কটা দিন না জানে সেই ভালো। আগে থেকে শুনিয়ে লাভ কি?

বাচ্চাটা বাচ্চা হলে কি হয়, বিষম টন্‌টনে। একটা কথাও ওর কান এড়ায় না। কোথায় কি ঘটছে না ঘটছে, চশমা না থাকলে কি হবে, সবই সে খুঁটিয়ে দেখে। মা ভাবে, আহা, অবোধ শিশু কিছুই বোঝে না। কিন্তু সে এরই মধ্যে এই দুনিয়াদারির অনেক কিছুই বুঝে নিয়েছে। সাবাড় করা কাকে বলে পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও মোটামুটি বুঝে নিয়েছে। একদিন যে একটা মোরগকে কাটতে দেখেছে। উ, সে কি চেঁচানি! তারপর কতক্ষণ ঝটপট করে মোরগটা সেই যে পড়ে রইল, আর উঠল না। বাচ্চা পিটপিট করে সবই কিছু দেখছিল। তার বিষম ভয় করছিল। তারপর কদিন সে আর ঠিকমত ঘুমোতে পারে নি। সে হয়ত মনে মনে ভাবছিল, ওর নামই বোধ হয় সাবাড় করে দেওয়া।

মুরগীকে জিভ কাটতে দেখেই বাচ্চা বুঝলে মা যেন কি একটা কথা গোপন করে গেল। ব্যস্, আর তাকে পায় কে সেই থেকে মায়ের পিছন পিছন সে আঠার মত লেগে রইল। বলতেই হবে তাকে, কারা সাবাড় করে, কেমন করে সাবাড় করে আর কেনই বা সাবাড় করে। উঁহু, না বললে কিছুতেই ছাড়বে না। কি ছেলে বাবা, মায়ের কানের পোকা একেবারে খসিয়ে ছাড়ল।

একটু একটু করে বাচ্চাটা কথা আদায় করে নিল। বলব না, বলব না, করতে করতেও মাকে কিছু কিছু বলতে হোল। একবার একটু বেফাঁস কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলে আর কি উপায় আছে! বাচ্চা আগে যা জানত, আর এখন মার মুখে যা শুনল, দুটোতে যোগ করে নিয়ে মোটামুটি ব্যাপারটা বুঝল। আগে মনে করেছিল, ওই মোরগটা বুঝি নিজের কপালদোষে অমন করে সাবাড় হয়ে গেল। আর এখন বুঝল, কপালটপাল কিছু নয়, মোরগ-মুরগী যত আছে, দুদিন আগে আর পরে সবারই এই একই দশা ঘটবে। তার মানে সে আর তার মা তারাও এ থেকে বাদ যাবে না। কি সর্বনেশে কথা! এমন কথা! এমন কথা তো সে কোন দিন ভাবতেও পারেনি।

চিন্তাটা বড় বেশী ভারী হয়ে মাথার মধ্যে ঝুলতে লাগল। এক মুহূর্ত রেহাই দেয় না। এই একটা কথা বড় রকম করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে তার মায়ের কাছে শুধোতে লাগল। মা বলল, 'রাখ্ বাছা, ও সব কথা অত বেশী ভাবতে নেই। ভাবতে গেলেই জ্বালা। অদেষ্টে যা আছে, তাই হবে।'

ভাবতে নেই বললেই কি আর না ভেবে থাকা যায়! বাচ্চার খেতেও ভাল লাগে না, শুতেও ভাল লাগে না, মা বলে, 'হাঁরে, তোর হোল কি অসুখ-বিসুখ করে নি তো?'

অসুখ হোক আর নাই হোক, সুখ কি আর আছে! বাচ্চা জিগ্যেস্ করল, 'আচ্ছা মা, যখন ওরা আমাদের সাবাড় করে, তখন খুব ব্যথা পাওয়া যায় না? তখন সবাই বুঝি খুব চ্যাঁচায়, না গো? আমি তো আমার পায়ের তলায় ছোট একটু কাঁটা ফুটলেই বিষম ব্যথা পাই।'

'হা আমার কপাল! এখনও তুই সেই কথাই ভাবছিস্?'

'না মা, বল না।'

'ব্যথা? ব্যথা কি আর না পেয়ে পারে?'

বাচ্চা কি তা বোঝে না। ভাল করেই বোঝে! তবু জিগ্যেস করে।

'আচ্ছা মা, আমরা যখন ব্যথা পেয়ে চেঁচাই, তখন ওদের মনে একটুও দুঃখু লাগে না?'

'দূর পাগলা, আমরা ব্যথা পেলাম ওদের কি? ওদের দুঃখু লাগে না।'

'তবে ওরা অত আদর করে আমাদের খাওয়ায় কেন?'

মুরগীর মুখ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, 'খাইয়ে খাইয়ে আমাদের মোটা তাজা না করলে ওরা পেটভরে গোশ্‌ত খাবে কি করে? কিন্তু কথাটা বলতে গিয়েও সে কোনমতে সামলে নিল। মুরগী চেয়ে দেখল ভেবে ভেবে ছেলেটা যেন হাড্ডিসার হয়ে গেছে। কদিন ধরেই লক্ষ্য করছে সে। কেনই বা সে এসব কথা তুলতে গিয়েছিল ভাবল, দেখা যাক কথাবার্তা বলে ছেলেটার মনটাকে একটু ভাল করা যায় কিনা!

সে মাথা নাচাতে নাচাতে বলল, 'হ্যাঁরে ছেলে, তুই পোকামাকড় খাস্‌ না?'

ও বলল, 'হ্যাঁ, খাই তো, খুব খাই।'

'কেন খাস্‌?'

'বা রে, খাওয়ার জিনিস খাব না? আল্লাহ্‌ তালাহ্‌ তো আমাদের খাওয়ার জন্যই ওদের পয়দা করেছেন।'

মুরগী একটু হেসে বলল, 'ওরাও যে ঠিক এই কথাই বলে। বলে, মোরগ-মুরগীরা নাকি ওদের খাওয়ার জন্যই পয়দা হয়েছিল।'

বাচ্চা এবার বড়ই মুস্‌কিলে পড়ে গেল। তবু সে বলল, 'ওরা মিছে কথা বলে, না মা?'

'কি জানি বাছা, কেমন করে বলব?'

মাও এ কথা ঠিকমত বলতে পারে না? তবে?

'কিন্তু আমরা যে ব্যথা পাই?'

'পোকামাকড়ও তো ব্যথা পায়।'

বাচ্চা মায়ের কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। মা আবার ও কি কথা বলছে?

'দূর, এইটুকুন পোকামাকড়, ওদের আবার ব্যথা বেদনা কি? এক কামড়েই শেষ।'

মুরগী বলল, 'আমরাও তো মানুষের কাছে এইটুকুনই। সেইজন্যই তো ওরা আমাদের দুঃখু বোঝে না।'

মুরগীর বাচ্চা এর পর আর কি বলবে! এত বড় বক্তা, কিন্তু তার মুখ দিয়ে আর কথা বেরোয় না।

পুষি-পর্ব

অপু মহারাজ

মহাভারতে কটা পর্ব আছে বলত ? তুমি সাথে সাথে বলবে, অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত—মানে আঠারো পর্বে। পর্ব মানে ভাগ—বইয়ের ব্যাপার যখন, অধ্যায় বলতে পার বা পরিচ্ছেদ। কিন্তু মহাভারতে পুষি-পর্ব বলে কিছু আছে কি না, তা আবার তুমি খুঁজতে যেয়ো না। মহাভারতে পুষি-পর্ব বলে কিছু নেই। মহাভারত পড়েই সব জ্ঞান পাওয়া যায় যারা মনে করে তাদের ধারণা খুব ভুল। সব খবর মহাভারতে নেই। তাই পুষি-পর্বের অবতারণা, তোমাদের জন্যে।

তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করি, তোমার পুষি আছে ?

তুমি নিশ্চয় বলবে, পুষি মানে বিড়াল ত, তা আছে বৈকি -

: পুষি মানে বিড়াল, কিন্তু বিড়াল কি বলত !

: বিড়াল, বিড়াল—আবার কি। তোমার উত্তর।

: তা ত নিশ্চয়, বিড়াল বিড়ালই। কিন্তু বিড়ালের দু একটা গুণের খবর দাও দেখি !

: কেন, বিড়াল মাছ খায়, ইঁদুর ধরে।

: ঠিক বলেছ। আমি কিন্তু আরো দু'চারটে বাড়তি খবর জানি। শুনবে ? শোন।

বিড়াল বল আর যাই বল, প্রাণী মাত্রেরই বাঁচার জন্যে খাবার প্রয়োজন। এই খাবারের তফাতের জন্যে আমরা প্রাণীদের সরাসরি দু' ভাগে ভাগ করতে পারি। কেমন করে ? এক নম্বর, যারা শুধু শাক-সব্জি ঘাস, লতা-পাতা, ফল, শিকড় খেয়ে বাঁচে। দু নম্বর, যারা অন্য প্রাণী খায়। মানে, মাছ-মাংস পোকা-মাকড়, পাখি এ-সব।

এই গেল দু-ভাগের কথা। আর তুমি আমি? আমরা তিন নম্বর দলে। সব খাই। শাক ও খাচ্ছি আবার মাছ-মাংস। আমরা মানুষরা না-হয় নানা রকম খাবার তৈরী করতে শিখেছি। অন্যান্য প্রাণীদের কিন্তু এ-জন্যে বেশ কষ্ট পেতে হয়। অনেক সময় দিন তাদের উপোসে কাটে। যেমন, বন্যা, সাইক্লোন, অনাবৃষ্টির সময় আমাদেরও উপোস দিতে হয়—লাখ লাখ লোক না খেয়ে মরে। মানুষের মত খাবার যোগাড়ের জন্যে অন্য প্রাণীদেরও নানা ফন্দী আঁটতে হয়—যেমন মাকড়সার জাল।

এবার তোমার পুষির কথায় আসা যাক। বলত বেড়ালকে কোন দলে ফেলবে, আমরা যে তিন ভাগে ভাগ করেছিলাম সব প্রাণীকে, তার? আসলে বিড়াল মাছ-মাংসের দলে। কিন্তু মানুষের সঙ্গে থেকে থেকে সে-ও মানুষ হয়ে উঠেছে, তার জংলী চরিত্র গেছে বদলে। তাই বেড়াল ভাত খায়। আর দুধ পেলে ত কথাই নেই।

শিকারের সময় তোমার পুষিকে তুমি চিনতেই পারবে না। তার তখন সম্পূর্ণ অন্য রূপ। প্রথম হল তার চুপচাপ-ভাব, দ্বিতীয় তার চোরা-বুদ্ধি। যদি কখনও তোমার পুষির পাখি ধরার কায়দা দেখে থাকো বুঝতে পারবে।

বেড়াল্ প্রথমে কি করে? তার শরীরকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে রাখে। তারপর এমন নিঃশব্দে এগোয় যে পাখির বাপের সাধ্যি নেই টের পায়। পাখি যখন এদিক ওদিক চংমং করে সামনে কোনো বিপদের কল্পনায়, বেড়াল তখন একেবারে পাথরের মূর্তি, নট-নড়নচড়ন। এবার পাখিটা যেই আনমনে ঘাসের উপর দিয়ে এগিয়ে আসে—অমনি ঠকাস। বেড়াল ঝোপের পাশ থেকে লাফিয়ে পড়ে দেয় ঘাড় মটকে। বাবাঃ বাঘের মাসী!

বেড়ালের ইঁদুর ধরা, সেও মজার। ধর তোমার পুষির ইঁদুর খাবার লোভ জাগল। কি করবে, ইঁদুরের গর্তের পাশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চোখ মিটমিটিয়ে বসে থাকবে। অনেকক্ষণ পর ইঁদুর ভাবে বেড়াল এতক্ষণ কি আর আছে! এই ভেবে যেই বেরল, অমনি খপ।

বেড়ালের চোরা-বুদ্ধির জন্যে সে সব সময় একা থাকতে চায়। তা না হলে গণ্ডগোল হবে যে! আর শিকারও পাওয়া যাবে না। তাই বেড়াল এক নম্বরের স্বার্থপর।

তোমার পুষিকে তুমি খুব নিরীহ ভাবতে পার, আসলে কিন্তু সে বাঘ-সিংহের বংশধর। লোকে বলে না বাঘের মাসী! আসলেও তাই।

বেড়ালের সব চেয়ে দেখার হল তার পা। পায়ের নীচে নরম মাংসপিণ্ড। এজন্যেই বেড়ালের চলাফেরার কোন শব্দ হয় না। বেড়ালের থাবায় বঁড়শীর মত বাঁকা পাঁচটা করে নখ। ভীষণ ধার। তার শিকার ধরার সবচেয়ে বড় অস্ত্র নখ। আত্মরক্ষার কাজেও নখ সবার উপরে। তাই নখকে পরিপাটি রাখার জন্যে সব সময় সে থাবার মধ্যে লুকিয়ে রাখে। বের করে শুধু কাজের সময়।

কখনও তুমি হয়ত দেখে থাকবে তোমার পুষি তোমার তক্তাপোষের পায়া আঁচড়াচ্ছে। তুমি ভাবছ এ-বুঝি তার খেয়াল খুসী। আসলে তা নয়। সে তার নখে সান দিচ্ছে। ধারাল করার জন্যে। তুমি চিড়িয়াখানায় গেলে দেখবে বাঘ-সিংহের খাঁচার ভেতর মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি দেওয়া থাকে।

ওগুলো বসার জন্যে নয়, নখ দিয়ে আঁচড় কাটার জন্যে। যদি এই আঁচড়ানোর ব্যবস্থা করে দেওয়া না হত, নখ বড় হতে হতে এমন অসুবিধায় ফেলত, যে চলা-ফেরাই বন্ধ হয়ে যেত।

এক নাগাড়ে বেশী দূর দৌড়ানয় বেড়াল পটু নয়। তাই বলে তাকে দৌড়ে ধরাও সহজ নয়। কেন না গাছে উঠতে পুষি-প্রবর ওস্তাদ। তোমার কোলে চড়ে থাকা পুষিকে দেখে তেমন কিছু আঁচ করতে পার না বটে, অন্য জায়গায় দেখতে পাবে। লং জাম্পেও তুমি তোমার পুষির সঙ্গে পারবে কি না সন্দেহ।

আগেই বলেছি চোরা-বুদ্ধিতে বেড়াল পাকা—তাই বেশীর ভাগ সময় শিকারে বেরয় রাত্রে। আঁধার রাত্রে আমাদের দেখার অসুবিধে হলেও বেড়ালের কোনো অসুবিধে হয় না। বেড়াল কিন্তু সূর্যের আলো সহ্য করতে পারত না, যদিনা ওর চোখে একটা পাতলা পর্দার ব্যবস্থা থাকত। যেই চোখে আলো পড়ে অমনি পর্দাটা চোখ ঢেকে আলো রোধ করে। বিশ্বাস না হলে তুমি একটা পরীক্ষা চালিয়ে দেখতে পার। একটা অন্ধকার ঘরে তোমার পুষিকে টেবিলে বসাও। তারপর চোখে ফেল টর্চের আলো। দেখবে চোখের তারার উপর পাতলা পর্দা সরে এসেছে। পরীক্ষা করতে গিয়ে একটা বিষয়ে কিন্তু সাবধানে থেকো। খবরদার বেশী কাছে গিয়ে টর্চের আলো ফেলো না। তা হলে তোমার পুষি তোমার গায়ে লাফিয়ে পড়ে আঁচড়ে-কামড়ে দিতে পারে। কারণ বেড়াল চোখে আলো সহ্য করতে পারে না। হঠাৎ আঁধার ঘরের মাঝে চোখে আলো এসে পড়লে তার রাগ হওয়া স্বাভাবিক। তাই দূরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

আকারের তফাতে পৃথিবীতে প্রায় পঞ্চাশ রকম বেড়াল বা মার্জার আছে। এদের মধ্যে বাঘ-সিংহ-ই সবচেয়ে বড়। সবচেয়ে ছোট বেড়াল আছে দক্ষিণ-ভারতের জঙ্গলে। সেগুলো তোমার পুষির চেয়ে অনেক ছোট। তাছাড়া বনবিড়াল নামে খ্যাত 'খটাস' ত তোমরা নিশ্চয় চেনো। রাত্রে হাঁক পাড়ে খটাস…খটাস…এরা চেহারায় বেশ কুঁদো।

বাঘকে না হয় বেড়ালের দলে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সিংহকে নেওয়ায় খুব আশ্চর্য হচ্ছ, না! আশ্চর্যের কিছু নেই। দেহের গড়নে বেড়ালের সঙ্গে সিংহের যথেষ্ট মিল। সেই মিল দেখেই প্রাণী-বিজ্ঞানীগণ পশুরাজকে রাজধানী দিল্লীর বিল্লীদের গোত্রভুক্ত করে দিয়েছে। বেড়ালের সঙ্গে সিংহের বেশ কিছু পার্থক্যও আছে, প্রাণীবিজ্ঞানীরা যাই বলুন না কেন! যেমন, পুরুষ সিংহের কেশর আছে, পুরুষ বেড়ালের তা নেই। সিংহ দল বেঁধে থাকতেই ভালোবাসে, কিন্তু বেড়াল তার বিপরীত. সিংহ খিদে না পেলে অযথা প্রাণী হত্যা করে না। কিন্তু বেড়ালরা খেলার ছলেই ছোট ছোট পাখি মেরে ফেলে।

তোমার পুষি যখন ছোট ছিল তুমি নিশ্চয় তাকে বল নিয়ে খেলতে দেখেছ। ও আর কিছু না ছেলেবেলা থেকেই শিকার ধরার কৌশল মহড়া দেয়।

তুমি তোমার পুষিকে নিয়ে ভালো করে খেয়াল করলে আরো অনেক খবর জানতে পারবে—যা হয়ত আমরা এখনও কেউ জানিনা। তখন তোমরা নিজেরাই পুষি-পর্ব নতুন করে লিখো।

সাতবছরের মেয়ে

শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব

হাড় জ্বালিয়ে খেল আমার সাতবছরের মেয়ে
সারাটা দিন টো টো করে বেড়ায় নেচে গেয়ে।
ঘুম থেকে সে ওঠে যখন বেলা আটটা বাজে
আমিতো সেই সাতসকালে বেরিয়ে পড়ি কাজে।
এগারোটায় ফিরে এসে পাইনে তাকে ঘরে
দাঁতে দাঁতে আগুন জ্বালাই ভীষণ রাগের ভরে।
তেল মাখা হয়, স্নান সারা হয়, ভাত খাওয়া হয় শেষে
সাতবছরের কন্যা তখন দরজা ঠেলেন এসে।
ভাতের গরাস মুখের ভিতর চক্ষু বড় বড়
ভূতে পাওয়ার মতো আমি কাঁপছি থর থর।
বলি, আজকে তোকে আমি আস্ত রাখবো না কি
সার করেছিস্ খেলাধুলো পড়ায় দিয়ে ফাঁকি!'
চালাক মেয়ে বইখানি তার আনে তড়াক করে
'কংসরতন বংশী বাজায়' পড়ে গলার জোরে!
শিরশিরিয়ে উঠছিল গা তবু নিলাম সামলে
যা হোক করে রাগটা তখন একটুখানি নামলে
আঁচিয়ে এসে মুখটা মুছে লম্বা হলাম বুঝি
এরই মধ্যে বেরল তার খেলাঘরের পুঁজি!
বইখানিকে ঘুম পাড়িয়ে জাগায় পুতুলপুরী
চুপি চুপি দেখছি আমি দিয়ে চাদরমুড়ি।
গালবকা সে হজম করে কাঁদে না মার খেয়ে
জগৎটাকে ভুলতে পারে একটি পুতুল পেয়ে!

প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর

পড়ুয়াদের মেঠো খসড়া থেকে

প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তরের পরিচয় জানিয়েছিলাম। এবার পড়ুয়াদের মেঠো খসড়া থেকে তুলে তুলে তাদের কাজের কিছু পরিচয় দিচ্ছি :

বাঁশরি চক্রবর্তী, কোলকাতা। ঘাসে ঘাসে চলতে গিয়ে একদিন দেখল—'ঘাসের মধ্যে লম্বা একটা ডাঁটি। ডাটির রং সবুজ, তার মাথায় কাশফুলের মত ফুল। ফুলগুলি দু'ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়।' সে আরও দেখল, 'এক ধরনের বেগুনী ফুল। গন্ধ নেই। চারটে পাপড়ির ধারের রং গাঢ়, ভেতর দিকে ক্রমশ সাদা। এমনি আর এক ধরনের ফুল দেখলাম, এক থোকে পাঁচছটা করে পাপড়ি, পাপড়িগুলোর মুখ জোড়া। ডাটি লাল এবং সবুজে মেশানো। সবুজ ঘাসের মধ্যে কত যে সুন্দর ফুল লুকিয়ে থাকে আমি তার খোঁজ করে যাচ্ছি।'

গৌতম তালুকদার, শান্তিনিকেতন। তার মেঠো খসড়ায় (১৯।৪।৬৪) লেখা, 'আজ বেড়াতে বেড়াতে একটা গাছে অনেকগুলো পিপড়েকে দেখলাম। এক জাতের পোকাকে তাদের পিঠে শুঁড় দিয়ে শুরশুরি দিচ্ছে। ঐ বোকা পোকাগুলো চুপচাপ গাছের গায়ে লেপ্টে আছে। পোকাগুলো কি পিপড়েদের গরু?' সে জানতে চাইছে।

চন্দ্রচূড় সরকার, শান্তিনিকেতন। বর্ষার এক দুপুরে বারন্দায় বসেছিল। হঠাৎ সে দেখতে পেল, 'একদল চড়ুই খেলা সেরে উড়ে যাচ্ছে আর একটা কাক একটা চড়ুইকে মুখে নিয়ে পালাল। (চড়ুইটা ভাল উড়তে পারছিল না)। সঙ্গে সঙ্গে তার পেছনে চড়ুইগুলোও ছুটলো। কাকটার মুখ থেকে চড়ুইটা একটু বাদেই পড়ে গেল।'

ভাস্কর গুপ্ত, কোলকাতা। অনেকদিন ধরেই সে টিকটিকিদের হাবভাব লক্ষ্য করছে। একদিন, 'একটা টিকটিকিকে দেখলাম পোকা ধরতে। পোকাটা ছোট না। বেশ বড়। ধরা পড়বার আগে পোকাটা বুঝতেই পারেনি। খপ করে টিকটিকিটা মুখে পুরে দিল। যেটুকু পোকাটার বাইরে ছিল ছটফট করছিল। তারপর, সেটুকু ভেতরে চলে গেল আর অন্য পাশ দিয়ে যেটুকু ভেতরে ছিল তা বাইরে এসে গেল। এই রকম খানিকক্ষণ করার পর পোকাটাকে আর দেখতে পেলাম না। সেটা তখন টিকটিকিটার পেটে।'

অশোক চট্টোপাধ্যায়, কোলকাতা। 'আলিপুর জীব-উদ্যানের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে, পথের পাশের একটা গাছের এক জায়গায় এসে চোখটা গেল থেমে। গাছটার গায়ে অর্দ্ধ-বৃত্তাকারে থাকে থাকে সাজানো এক ধরণের ছাতা। আমার প্রকৃতি পড়ুয়া মন যা দেখেছি তার তথ্যানু-সন্ধানে তৎপর হয়ে উঠল। লাল টুকটুকে সুন্দর একটা ছাতা। ছাতাটাকে তুলতে গিয়ে হাতের চাপে সেটা ভেঙ্গে গেল। এবং হাতটা ভীষণ চুলকোতে সুরু করল।' এমনি কয়েকটি ঘটনা ঘটে যাবার পর থেকে ব্যাঙের ছাতা সম্পর্কে সে আরও কৌতুহলী হয়ে উঠেছে।

গৌতম রায়, কোলকাতা। জুন মাসের (১৯৬৪) মাঝামাঝি পুরী গিয়েছিল বেড়াতে। 'সেখানে সমুদ্রতীরে আমার 'মেঠো খসড়া' আর পেনসিল নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম প্রকৃতি পড়ার কাজে। সমুদ্রের ধারে এক ধরনের পাখি দেখলাম। বর্ণনা দিচ্ছি—পেটের তলাটা সাদা, চোখ কালো। ডানার চারধারে কালো বর্ডার। ডানা লম্বা, একটু বাঁকা আর ছুচলো। লেজটা ছুচলো আর চেরা। ঠোঁট ছুচলো। মাছ খায়। খুব তাড়াতাড়ি আর অনেকক্ষণ উড়তে পারে। পাখিটা পায়রার চেয়ে সামান্য বড়। শুনেছি পাখিগুলি মে মাসেই পুরীর সমুদ্রতীরে আসতে আরম্ভ করে। ওদের আর এক জাতভাই আছে—তাদের কমলা রং এর ঠোঁট আর পা। জানলাম ওদের নাম 'টার্ণ'। পড়ুয়া বন্ধুরা, ওদের সম্বন্ধে আর কিছু জানলে আমাদের দপ্তরের মারফৎ জানিও।'

সন্দীপন দাশগুপ্ত, কোলকাতা। পায়রা পোষার সখ তার। পায়রা উড়তে দেখলেই তার মন তাদের সাথে উড়ে চলে। পাশের বাড়ির পায়রা ছুটো যেদিন 'ভেন্টিলেটারে ঢুকে বক্ বক্‌ম্ করছে, শুনে ভারি কৌতূহল হল। টেবিলের উপর মইটা দাড় করিয়ে উকি মেরে দেখি—একটা পায়রা তখনও ডেকে চলেছে। অন্যটা কোথা থেকে খড়কুটো এনে ভেন্টিলেটারে রাখছে। আমি রোজ ওদের লক্ষ্য করছি।'

অশোক চক্রবর্তী, কোলকাতা। তার মেঠো-খসড়ায় পর পর কয়েকদিন এই লেখা পেলাম। '৪।৮।৬৪, সন্ধ্যা ৬টা। আজ বিকেলে গঙ্গা থেকে অনেকগুলো বাচ্চা কাঁকড়া ধরে আনলাম। বর্ষায়, এই সময়, প্রতি বছর বাচ্চা-কাঁকড়ায় গঙ্গা ভরে যায়। এক একটা ১/২ (আধ) সেঃ মিঃ মত। দেখতে সাদা। চোখ কালো ৪।৮।৬৪, সন্ধ্যা ৮টা। কাঁকড়াগুলো শিশির তলায় কেমন জড়াজড়ি করে পরে আছে, মনে হচ্ছে মরে গেছে। একটা তুলে দেখলাম বেঁচে আছে। ৫।৮।৬৪ সকাল ৮টা। স্কুলে যাবার সময় দেখে মনে হলে ওরা মরে গেছে। ওদের কি করে বাঁচিয়ে রাখা যায় সে পরীক্ষা করে দেখব।'

অলোক ও অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, কোলকাতা। একটা পাহাড়ী মৌমাছির চাক নিয়ে এসেছিল একবার। সেটা কি করে ভেঙ্গে গেল তার বর্ণনা: 'মৌচাকটায় কিছুদিন টাটকা মধুর গন্ধ ছিল। আস্তে আস্তে সেটা কমে গেল। প্রথম প্রথম চাকটা খুব চকচক করত, পরে, ধীরে ধীরে সে ভাবটা রইল না। ধুসর হয়ে গেল। শেষে মাঝ বরাবর ভাঙ্গতে সুরু হল। তারপর চারপাশটা ভেঙ্গে গেল। মৌচাকটার ভেতর দিয়ে একরকম পোকা সাদা সুতোর মত জিনিষ দিয়ে বাসা তৈরী

করেছে। কালো কালো কিসে যেন চাক ভরে গিয়েছে। আমাদের চাকটা এইভাবে একদম নষ্ট হয়ে গেল।'

নতুন পড়ুয়া। (৮১) অঞ্জন প্রকাশ সেনগুপ্ত, যাদবপুর। (৮২) আশিষকুমার দে, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। (৮৩) কমলেশ রায়, কলকাতা। (৮৪) কল্লোল ভট্টাচার্য, কলকাতা। (৮৫) বাঁশরি চক্রবর্তী, কলকাতা। (৮৬) মিতালি দত্ত, কলকাতা। (৮৭) অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, হাওড়া। (৮৮) হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হাওড়া। (৮৯) লোকনাথ মুখোপাধ্যায়, হাওড়া। (৯০) সমর রায়, কলকাতা। (৯১) রূপা মিত্র, কলকাতা। (৯২) গৌতমি ভট্টাচার্য, কলকাতা।
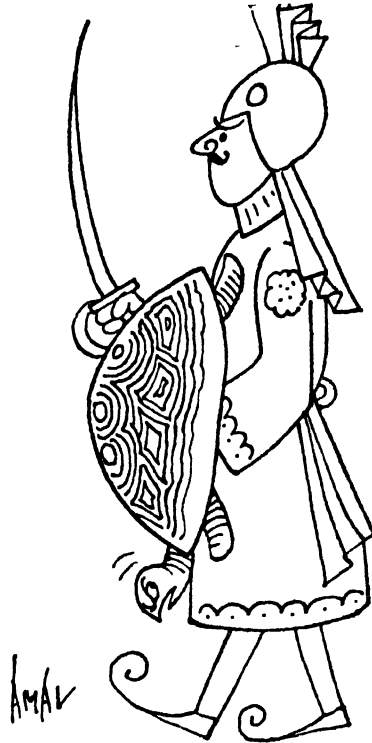
অ্যাটমের ইতিহাস

—এনাক্ষী ও শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়

(২)

আধুনিক বিজ্ঞানের প্রথম পথ-প্রদর্শক ছিলেন ইটালীর গ্যালিলিও। ইনিই প্রথম সাহস করলেন নতুন পথে পা বাড়াতে। দু হাজার বছর ধরে লোকে বিনা দ্বিধায় মেনে আসছিল যে একই উচ্চতা থেকে দুটি ভিন্ন ওজনের বস্তু নীচে ফেললে যেটি বেশী ভারী সেটি আগে পড়বে। এটাই ছিল অ্যারিস্টটলের অনুমান কিন্তু গ্যালিলিও বললেন একথা ঠিক নয়। পরন্তু জিনিসের গতি মোটেই তার ওজনের ওপর নির্ভর করে না শুধু একথা বলেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না। লোকজন ডেকে সকলের সামনে পিসার হেলান মিনার থেকে তাঁর সেই বিখ্যাত এক্সপেরিমেণ্টটি করলেন। সকলের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে একটি বিরাট পাথরের চাঁই আর একটি ছোট নুড়ি একই সঙ্গে এসে মাটীতে ঠেকল। অবশ্য সেই সময়কার পণ্ডিতরা তাঁকে নাস্তিক, অবিশ্বাসী ইত্যাদি নানারকম কটুকথা বলতে ছাড়েন নি। শেষ জীবনে এঁদের হাতে গ্যালিলিওকে বহু অত্যাচারও সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু এঁর গবেষণাকে বলা যেতে পারে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রথম ধাপ। এরই ওপর ভিত্তি করে নিউটনের আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল।

যদিও গ্যালিলিও প্রধানত করেছিলেন জ্যোতিষ বিজ্ঞানের চর্চা, আর তাঁর পদার্থবিজ্ঞানের অনুশীলনে অ্যাটমের কোন উল্লেখ নেই তবু একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পরবর্তী বৈজ্ঞানিকরা সফলকাম হয়েছিলেন সেই দৃষ্টিভঙ্গী আরম্ভ হয়েছিল ইটালীর এই বৈজ্ঞানিকের মনে।

সত্যিকার বিজ্ঞানী মন ছিল প্রায় সমসাময়িক আর একজন ইংরাজ দার্শনিকের। তিনি হলেন ফ্রান্সিস বেকন। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও বিজ্ঞানচর্চায় তাঁর পরোক্ষ দানের পরিমাণ নেহাৎ সামান্য নয়। বেকনও তাঁর পূর্বপুরুষদের আরিস্টটলে অচলা মতি দেখে দেখে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি লিখলেন সেকালে লোকের জ্ঞান সঞ্চয়ের উপায় ছিল কেবল চোখে দেখা আর চিন্তা করা। কিন্তু সেসব দিন গেছে। আগেকার পণ্ডিতরা যা বলে গেছেন সেটা যতক্ষণ না সত্যি বলে যাচাই করে দেখা হচ্ছে ততক্ষণ আমরা সেটা সত্যি বলে মানতে প্রস্তুত নই। বেকন নিজে যদিও এক্সপেরিমেণ্ট করেন নি কিন্তু এর পদ্ধতি কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে বিশদভাবে লিখে গেছেন।

এরপর এলেন আইজ্যাক নিউটন। পদার্থের গতি প্রকৃতি নিয়ে নিউটন যা বল্লেন তাতে দেখা গেল গাছের আপেলটি মাটীতে পড়া থেকে গ্রহ নক্ষত্রের চলার পথ সব একই মাধ্যাকর্ষণের সুত্রে গাঁথা। নিউটন পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণিকাদের অস্তিত্ব স্বীকার করলেন যেমন করেছিলেন ডেমোক্রিটাস খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে। এই পদার্থের কণাগুলি নিউটন বললেন, ভেঙ্গে দুইখণ্ড করা অসম্ভব। এমনই কঠিন এই সব কণিকা যে কোন পার্থিব শক্তি এদের বিনাশ করতেই পারে না। ভগবান সৃষ্টির প্রথম দিনে এদের যে অখণ্ড আকার দিয়েছেন কারো সাধ্য নেই সেই আকারকে চূর্ণ করে। আজকালকার দিনে কোন বিজ্ঞানী ঠিক এমন কথা বলবেন না। বিজ্ঞান এখন এমন জায়গায় পৌঁচেছে যেখানে বিনা প্রমাণে কোন কিছুই মেনে নেওয়া হয় না। কিন্তু নিউটনের যুগে বিজ্ঞানের ঠিক এইরকম মেজাজ তৈরী হয় নি।

জন ডালটন, এর থেকে প্রায় দেড়শো বছর পরে পদার্থের আদি রূপের কথা চিন্তা করলেন। শুধু চিন্তা নয়, ডালটন আরম্ভ করলেন গ্যাস নিয়ে নানারকম পরীক্ষা, আর পরীক্ষা করে কতকগুলি সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন—যা এর আগে আর কেউ করেনি। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের অ্যাটমগুলি পারস্পরিক অনুপাতে ওজন করার পদ্ধতি বার করলেন তিনি। হাইড্রোজেনের অ্যাটমই যাবতীয় মৌলিক পদার্থের মধ্যে সব চেয়ে হাল্কা, অতএব একে এক ধরে ডালটন তাঁর ওজনের হিসেব আরম্ভ করলেন। ইনি অবশ্য কিছু কিছু ভুলও যে করেননি তা নয়—সবচেয়ে মারাত্মক ভুল হল ইনি মনে করেছিলেন হাই-ড্রোজেনের একটি অ্যাটমের সঙ্গে অক্সিজেনের একটি অ্যাটম মিলে তৈরী হয় জল। অর্থাৎ ডালটনের মতে জলের ফরমুলা হল HO, অথচ জল যে H_2O সে কথা আজ আর কারোই অজানা নয়। অ্যাটমের সঙ্গে মলিকিউলের তফাৎটা অনেক সময়েই তাঁর চোখে পড়েনি। অনেক সময় তাঁর সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণিত হয়েছে শুধু একটি জ্ঞানের অভাবে। ডালটন মলিকিউলের রূপ চিনতে না পেরে তাকে অ্যাটম বলে ভুল করেছেন, এই কারণে।

এই ভুলটা সংশোধন করলেন ইটালীর এক অধ্যাপক, তাঁর নাম আভোগাড্রো। তিনি দেখান গ্যাসীয় পদার্থ তৈরী হয়েছে মলিকিউল দিয়ে। কয়েকটি অ্যাটম পারস্পরিক টানে একত্র হয়ে সৃষ্টি করে একটি মলিকিউল। হিলিয়ম, নিয়ন ইত্যাদি কয়েকটি বিশিষ্ট গ্যাস ছাড়া প্রত্যেক গ্যাসের ক্ষুদ্রতম কণা হল মলিকিউল। অবশ্য আভোগাড্রোর এই থিওরী স্বীকৃতি পেতে বেশ কিছুদিন লেগে গিয়েছিল।

ততদিনে আরম্ভ হয়েছে রসায়নে এক নতুন উদ্দীপনার যুগ। বসে বসে কেবল দার্শনিক চিন্তার ধোঁয়াজাল তৈরী করা ছেড়ে বিজ্ঞানীরা তৎপর হয়ে উঠলেন যে যার ল্যাবরেটরীতে। অনেকগুলি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেল এই করে। রাশিয়ার মেণ্ডেলিফ অ্যাটমিক ওজন অনুযায়ী মৌলিক পদার্থগুলি বিরানব্বইটি ভাগে ভাগ করে এক বিরাট চার্ট সাজালেন। দেখা গেল কিছু কিছু পদার্থের সঙ্গে অন্য কতকগুলির বেশ সাদৃশ্য রয়েছে—যেমন সোডিয়মের সঙ্গে লিথিয়ম, অথবা বেরিলিয়মের সঙ্গে ম্যাগনেসিয়ম। মেণ্ডেলিফ যদিও সবগুলি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাননি কিন্তু সম্ভাব্য পদার্থগুলি এবং

তাদের গুণাগুণ সম্বন্ধে তিনি যে সব ভবিষ্যতবাণী করে গিয়েছিলেন উত্তর কালে সেই সব পদার্থের খোঁজ ঠিকই পাওয়া গিয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে মোটের উপর কতকগুলো বিশ্বাস পরীক্ষার ফলে বেশ দৃঢ়ভাবে দানা বাঁধল। সমস্ত মৌলিক পদার্থের উপাদান যে একই শাশ্বত কণা এ সম্বন্ধে কারো কোন সন্দেহই রইল না। এমন সময় হল এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। ১৮৯৫ সালে তিনজন ফরাসী; বেকারেল, মাদাম কুরী ও পিয়ের কুরী সন্ধান পেলেন এক তেজস্ক্রিয় পদার্থ—রেডিয়মের। তেজস্ক্রিয়তা ব্যাপারটা কি? আর অ্যাটমের ইতিহাসে রেডিয়মের ভূমিকা এত গুরুত্বপূর্ণই বা কেন? খুব অল্প কথায় বলতে গেলে রেডিয়ম থেকে যে নীলচে আভা বেরোয়, যে জন্যে এর নাম দেওয়া হল রেডিয়ম, তার রহস্যের মধ্যে লুকিয়ে আছে এই যুগের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার। কুরীরা পরীক্ষা করে দেখলেন যে রেডিয়মের অ্যাটমগুলি ক্রমাগত নিজে থেকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে আর অ্যাটমের কেন্দ্র থেকে আলোক-কণার আকারে বেরিয়ে আসছে তেজ। অর্থাৎ অ্যাটম তাহলে এক ও অবিভাজ্য নয়। এটি বহুদিনকার একটি বদ্ধমূল ধারণাকে দিল রাতা-রাতি একদম পালটে।

এই যুগান্তকারী আবিষ্কার যে কত দিকে কত রকম নতুন চিন্তা ও তথ্যের দ্বার খুলে দিল সেকথা বুঝিয়ে বলতে অনেক জায়গা ও সময়ের দরকার। তবে এই শতাব্দীর গবেষণার ধারা কোনদিকে চলেছিল যদি জানতে চাওয়া হয় তবে উত্তর হবে এটা হল এক্সপেরিমেন্টের যুগ। পদার্থের অতি ছোট কণাগুলির যে সব গুণাগুণের খবর পাওয়া গেল তার সবই হাতে কলমে পরীক্ষা করে, কোনটিই শুধু অনুমানের উপর নির্ভরশীল থাকল না।

বিশ্লেষণ করে দেখে একেবারে স্থিরনিশ্চিত হওয়ার এই যে মনোভাব আরম্ভ হয়েছিল তা ক্রমশ এগিয়ে চলল স্বাভাবিক পরিণতির দিকে। বিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের রাদারফোর্ড ও ডেনমার্কের বোর একেবারে অ্যাটমের একটি মডেল তৈরী করে বসলেন। তাঁদের এই মডেলে ছিল একটি কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস, আর তাকে কেন্দ্র করে ঘুরন্ত সব ইলেকট্রন কণা। সমস্ত জিনিসটা যেন সূর্যকে ঘিরে গ্রহদের প্রায় বৃত্তাকারে ছুটে চলার মত। ইলেকট্রন ও নিউক্লিয়াসের মধ্যে আছে দুই বিপরীত চার্জ—এই টানের জন্য সমস্ত অ্যাটমটি নিটোল ভাবে আছে, ভেতরের কণাগুলি এদিক-ওদিক ছিটকে যাচ্ছে না।

এই যে মানুষের হাতে প্রথম অ্যাটমের ভেতরের সম্পূর্ণ মডেলটি তৈরী হল, এর পর থেকে শুরু হল পরমাণু সম্বন্ধে গভীরতর অনুশীলনের এক নতুন যুগ। নিউক্লিয়াসের সব বিচিত্র লীলা বুঝতে চেষ্টা করার উদ্দেশ্যে। নিউক্লিয়াস কি দিয়ে তৈরী, এর মধ্যে কি ধরনের শক্তি কাজ করছে, সেগুলি নিজেদের মধ্যে বাঁধা আছে কি দিয়ে, এমন কি কোন উপায় আছে যাতে এই নিউক্লিয়াসকেও ভাঙ্গা যেতে পারে—এই রকম সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে শেষ অবধি মানুষ পৌঁছে গেল 'ফিসন'এ—যার প্রথম কার্যকরী রূপ দেখতে পাওয়া গেল গত মহাযুদ্ধের সেই বিধ্বংসী দুটি অ্যাটম বোমায়।

এর পরে বৈজ্ঞানিকদের কাজ কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি। সভ্যতার প্রথম প্রভাত থেকে সেই যে

পদার্থের প্রকৃতি নিয়ে মাথা ঘামানো আরম্ভ হয়েছে তার অন্তিম পরিণতি এখনো বহু দূরে। কেননা এতদিনকার এতজন মনীষির পরিশ্রমের উদ্দেশ্য ছিল কি কেবল মানুষ-মারা কল সৃষ্টি করা? তার জন্য নিশ্চয়ই সভ্যতার বিকাশ হয়নি। এটি কেবল অ্যাটমের ভেতরের আবিষ্কৃত শক্তির একটি প্রকাশ। বিজ্ঞানীর মন চায় অজানা প্রকৃতিকে জানতে—তার সঙ্গে ভালো-মন্দ সৎ-অসতের কোন প্রশ্নই জড়িত থাকতে পারে না। জ্ঞান-পিপাসা সব সময়েই ভাল, নতুন তথ্য আবিস্কার করব, আশার কথা, যে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমরা অচ্ছেদ্য বাঁধনে জড়িত তার রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা অবশ্যই আনন্দের বিষয়। বিজ্ঞানে সফলতার প্রত্যেকটি ধাপ মানুষের বিস্ময়কর উদ্যম আর বুদ্ধির দ্যোতক, অ্যাটমের ভেতরের প্রচণ্ড শক্তির সন্ধানও তাই। কিন্তু সেই শক্তিকে যে যুদ্ধে মারণাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে হয়েছে তার জন্য রাজনীতি চিরকাল দায়ী হয়ে থাকবে।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(পূর্ব প্রকাশিত অংশের চুম্বক)

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় অবরুদ্ধ রিচমণ্ড সহর হইতে বেলুনে চড়িয়া পলায়ন করিতে গিয়া, পাঁচটি অসম সাহসী ব্যক্তি ঝটিকার প্রকোপে এক নির্জন দ্বীপে পরিত্যক্ত হন। তাঁহারা হইলেন ধীমান এঞ্জিনিয়ার ক্যাপটেন সাইরাস হার্ডিং, তাঁহার ভৃত্য নেব, সুদক্ষ নাবিক পেনক্রফ্‌ট, বালক হারবার্ট এবং বিখ্যাত সাংবাদিক গিডিয়ন স্পিলেট। হার্ডিংএর কুকুর টপও সঙ্গে ছিল। সমস্ত কাজই তাঁহাদিগকে একেবারে প্রথম অবস্থা হইতে সুরু করিতে হইল। টপের স্টিলের কলার ভাঙিয়া দুইখানি ছুরি প্রস্তুত হইল। ডাল কাটিয়া তীর-ধনুক বানান হইল। কাদামাটি দিয়া হাতে ইঁট গড়িয়া তুন্দুর বানান হইল এবং মাটির বাসন গড়িয়া তুন্দুরে পোড়াইয়া লওয়া হইল।)

॥ ষোড়শ পরিচ্ছেদ ॥

পরদিন ১৬ই এপ্রিল দ্বীপবাসিগণ সকাল বেলা চিম্‌নী হইতে বাহির হইল—আজ সকলে ধোপার কাজ করিবে। ময়লা পোষাক ধুইয়া পরিষ্কার করা দরকার। সাইরাস হার্ডিং মনে স্থির করিয়াছিলেন সোডা, তেল, কিম্বা চর্বি সংগ্রহ হইলেই সাবান তৈরি করিবেন।

পোষাক পরিচ্ছদ সকলের পরিধানে যাহা ছিল তাহা, সবই বেশ মজবুত, অন্ততঃ আরো পাঁচ ছয় মাস তাহা দ্বারাই চলিবে। কিছু বদলাইবার আবশ্যক হইলে সময়ে তাহার ব্যবস্থা করা যাইবে।

দেখিতে দেখিতে নির্মল আকাশে সূর্য ক্রমেই উপরে উঠিল। মনে হইল সমস্ত দিনটাই উজ্জ্বল এবং পরিষ্কার হইবে। এই সময়ে উচু গ্রেনাইট পাহাড়টির উচ্চতা ঠিক করা দরকার। একাজ হার্ডিং কেমন করিয়া করিবেন?

হারবার্ট জিজ্ঞাসা করিল—পাহাড়ের উচ্চতা মেপে ঠিক করতে যন্ত্রের দরকার হবে না? কোথায় পাবেন?

হার্ডিং বলিলেন, না হারবার্ট। যন্ত্রের প্রয়োজন হবে না। দেখ, আমি সব ঠিক করে নিচ্ছি।

এই বলিয়া হার্ডিং করিলেন কি—বার ফুট লম্বা এবং ঠিক সোজা একটা কাঠের ডাণ্ডা লইলেন। নিজের উচ্চতা তাঁহার খুব ভাল করিয়াই জানা ছিল। সুতরাং বার ফুট মাপিয়া লইতে মুস্কিল হইল না। গাছের ছালের তৈরি দড়ির ডগায় একটুকরা পাথর বাঁধিলেন—এটা হইল প্লাম্ব লাইন। রাজ মিস্ত্রীদের কাছে "ওলন্" নামে যে একটা ওজন-বাঁধা দড়ি থাকে, দেয়াল গাঁথিবার সময় সোজা হইল কিনা দেখিবার জন্য সেটা ব্যবহার করে—তাহাকে প্লাম্বলাইন বলে। এই প্লাম্বলাইন লইয়া হারবার্ট চলিল হার্ডিংএর সঙ্গে।

সমুদ্রতীর হইতে প্রায় কুড়ি ফুট দূরে এবং পর্বত হইতে প্রায় পাঁচশত ফুট দূরে একটা জায়গায় হার্ডিং সেই বারফুট ডাণ্ডাটি পুঁতিলেন, দুই ফুট রহিল মাটির নীচে। প্লাম্বলাইনের সাহায্যে দেখিয়া লইলেন উহা ঠিক সোজা পোঁতা হইল কিনা। ইহার পর মাটিতে শুইয়া পিছনের দিকে ক্রমে সরিয়া যাইতে লাগিলেন—যে পর্যন্ত না দেখিতে পাইলেন যে ডাণ্ডার ডগাটি ও পর্বতের চুড়াটি ঠিক মিশিয়া গিয়াছে। সেই জায়গাটিতে ছোট্ট একটা কাঠি পুঁতিয়া চিহ্ন দিলেন।

তারপর উঠিয়া হারবার্টকে বলিলেন—হারবার্ট জ্যামিতি মনে আছে ত? দুটি ছোট-বড় কিন্তু সমকোন ত্রিভুজের অনুরূপ ভুজগুলি যে সমানুপাতিক হয়, তাত জান?

হারবার্ট বলিলেন—হাঁ, তা জানি।

হার্ডিং বলিলেন—তবেই দেখ—আমি দুটি সমকোণ ত্রিভুজ তৈরী করেছি। প্রথম ত্রিভুজটির এক বাহু হলো এই ডাণ্ডাটি, দ্বিতীয় বাহু হলো এই খুঁটি থেকে ডাণ্ডার গোড়া পর্যন্ত দূরত্বটা, আর তৃতীয় বাহু হলো ডাণ্ডার ডগা ও পাহাড়ের চুড়া পর্যন্ত যে আমার দৃষ্টির লাইন, সেই লাইনের ছোট অংশটি—অর্থাৎ, যেখানে ডাণ্ডার ডগা সেই লাইনকে কেটেছে সেই অংশটুকু। দ্বিতীয় ত্রিভুজের বাহুগুলি হলো খাড়া পাহাড়টা। খোঁটা থেকে পাহাড়ের গোড়া পর্যন্ত দূরত্বটা এবং আমার দৃষ্টির লাইনের সমস্তটা।

তখন হারবার্ট ভারি উৎসাহের সঙ্গে বলিল—হাঁ ক্যাপটেন, আমি বুঝতে পেরেছি। খোঁটা থেকে ডাণ্ডার দূরত্ব, এবং খোঁটা থেকে পাহাড়ের গোড়ার দূরত্ব, এই দুইয়ের মধ্যে যে অনুপাত, ডাণ্ডার উচ্চতার সঙ্গে পাহাড়ের উচ্চতারও সেই অনুপাত।

হার্ডিং বলিলেন—ঠিক বলেছ হারবার্ট। এখন সমান জমির দূরত্ব দুটি মাপলেই, অনুপাত দ্বারা পাহাড়ের উচ্চতা জানতে পারা যাবে। খাড়া ডাণ্ডাটি মাটির উপরে ঠিক দশ ফুট।

তাহার সাহায্যে মাপিয়া দেখা গেল—খোঁটা হইতে ডাণ্ডার দূরত্ব পনর ফুট, এবং খোঁটা হইতে পাহাড়ের দূরত্ব পাঁচশত ফুট।

এই মাপ শেষ করিয়া, হার্ডিং হারবার্টের সহিত চিম্‌নিতে ফিরিয়া আসিলেন। একটা চেটাল পাথরের উপর ঝিনুক দিয়া অনুপাত লিখিলেন :—

$$১৫ : ৫০০ :: ১০ : x$$

$$৫০০ \times ১০ = ৫০০০$$

$$\frac{৫০০০}{১৫} = ৩৩৩\cdot৩$$

এই অনুপাত দ্বারা প্রমাণ হইল যে, পর্বতের উচ্চতা ৩৩৩ ফুট। ইহার পর স্থির হইল, রবিবার দিন সকলে

পুনরায় আবিস্কারের উদ্দেশে বাহির হইবেন। লেকের উত্তর দিক্‌ হইতে সার্ক-সাল্‌ফ্‌ পর্যন্ত অনুসন্ধান করিতে হইবে। সময় থাকিলে কেপ্‌ সাউথ্‌-ম্যাণ্ডিবল পর্যন্তও যাইবেন। মধ্যাহ্নের আহার করিবেন বালির চড়ায়, সন্ধ্যার পূর্বে চিমনীতে ফিরিবেন না।

বেলা সাড়ে আটটার সময় যাত্রীদল প্রণালীর তার ধরিয়া চলিয়াছে, অপর পারে সেফ্‌টি আইলাণ্ড্‌ দেখা গেল, সেফ্‌টি আইলাণ্ডে অনেকগুলি পাখা বুক ফুলাইয়া চলিয়া বেড়াইতেছে। গলার স্বর শুনিয়া বুঝিতে পারা গেল, সেগুলি পেনগুইন্‌ এবং অক্‌ জাতীয় পাখী—ভীষণ দৌড়াইতে পারে। ইহাদের মাংস খাইতে বেশ, সুতরাং পেন্‌ক্রফটের মনে খুবই আনন্দ হইল। দ্বীপে বড় বড় সীল্‌ হামাগুঁড়ি দিতেছে দেখা গেল, খাদ্যের হিসাবে সীল্‌ জঘন্য, কিন্তু এগুলিকে দেখিয়া হার্ডিং খুব খুশী হইলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন—এখানে আর একদিন আসিতে হইবে। এই দ্বীপের বেশী ভাগ জায়গাই অনুর্বর, কেবলি বালি আর শামুক ঝিনুক। গাল্‌, য়্যাল্‌বেট্রাস, এবং বুনো হাঁস উড়িয়া বেড়াইতেছে দেখা গেল। পেন্‌ক্রফ্‌ট তীর ছুড়িয়া মারিতে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু পারিল না—উড়ন্ত পাখি তীর দিয়া মারা কি সহজ। ইহা কম দুঃখের কথা নয়। পেন্‌ক্রফট্‌ হার্ডিংকে বলিল—দেখলেন ত, দু একটা বন্দুক টন্দুক না হলে শিকার করা চল্‌বে না।

স্পিলেট্‌ বলিলেন—বন্দুক তৈরি করা আর মুস্কিলটা কি? নল বানাবার লোহা যোগাড় কর; সোরা, কয়লা আর গন্ধক জোগাড় কর বারুদ বানাবার জন্য, এবং সীসা আন গুলির জন্য—তবেই হার্ডিং বন্দুক বানিয়ে দিবেন।

হার্ডিং বলিলেন—হয়তো বা এসব জিনিসই এই দ্বীপে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তা হলেও বিশেষ যন্ত্র চাই—বন্দুক বানাতে সূক্ষ্ম কারিকুরির দরকার। যা হোক্‌, ক্রমে দেখা যাবে।

পেন্‌ক্রফট্‌ দুঃখ করিয়া বলিল—হায়রে হায়! কেনই বা আমাদের সব অস্ত্রশস্ত্র যন্ত্রপাতি বেলুন থেকে ফেলে দিয়েছিলাম?

হারবার্ট বলিল—পেন্‌ক্রফ্‌ট, ওসব ছুড়ে না ফেলতাম যদি, তবে বেলুনই যে আমাদের সমুদ্রের তলায় বিসর্জন দিত।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—তা ঠিক বলেছ হারবার্ট। কিন্তু ভুলে যেও না—বেলুনে চড়ে পলায়ন করার বুদ্ধিটা কিন্তু আমার মাথায় খেলেছিল। কিন্তু স্পিলেট বলিলেন—খাসা বুদ্ধি খেলিয়েছিলে, পেন্‌ক্রফ্‌ট। তার ফলেই ত আমরা এখন এই মুস্কিলে পড়েছি।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—মুস্কিলটা আর কি? আমাদের অভাব কিসের? হার্ডিং সব অভাবই ত পূরণ করে দিচ্ছেন, আর কোন দিন হয়ত দ্বীপ থেকে উদ্ধার হবার ব্যবস্থাও করতে পারবেন। হার্ডিং বলিলেন—সবুর কর, আমি হিসাব করে দেখি—এই লিঙ্কলন আইলাণ্ড্‌টি সমুদ্রের কোন্‌খানে আছে। কোন মহাদেশ কিংবা অন্য কোন বড় এবং জানাশুনা দ্বীপের কাছে কিনা।

দুই প্রহরের আহারের পর, হার্ডিং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অনেক হিসাব করিয়া স্থির করিলেন—লিঙ্কলন দ্বীপটি 'তাহিটি' এবং পমুটু দ্বীপপুঞ্জ হইতে বারশত মাইল নিউজিলাণ্ড দ্বীপ হইতে আঠারশত মাইল এবং আমেরিকা হইতে চারিশত পাঁচ মাইলেরও বেশী দূরে অবস্থিত।

॥ সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ॥

পরদিন, ১৭ এপ্রিল—সকলে পরামর্শ করিতে লাগিলেন, এখন কর্তব্য কি। এ পর্য্যন্ত ইঁট ও বাসনপত্র তৈরির কাজ হইয়াছে, এখন ধাতুবিদ্যার আশ্রয় লইতে হইবে। অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্য ত দরকারই, তা ভিন্ন, বড় নৌকা বানাইয়া যদি বারশত মাইল দূরে পমুটু দ্বীপে যাইবার চেষ্টা করিতে হয়, তাহা হইলে সেই নৌকা প্রস্তুত করা দরকার। এতবড় নৌকা ত আর শুধু কাঠ পাথরের সাহায্যে বানান সম্ভব নয়। উপযুক্ত যন্ত্রপাতির দরকার—হাতুড়ি, কুড়াল, করাত, রেদা, উকো প্রভৃতি সবই চাই। দ্বীপের নানাস্থানে হার্ডিং দেখিয়াছেন, পূর্বে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে নানারকমের খনিজ পদার্থ রহিয়াছে। হয়ত সন্ধান করিলে, আরও কিছু আবশ্যকীয় জিনিস পাওয়া যাইতে পারে। চিম্‌নী হইতে সাত মাইল দূরে ম্যাণ্ডিবল্ কেপ পর্যন্ত সন্ধান করা হইয়াছে, সেইখানেই বালিপূর্ণ স্থানের (Downs) শেষ; তারপর হইতে জমির দিকে চাহিলেই অগ্ন্যুৎপাতের চিহ্ন চক্ষে পড়ে।

শীতকালটা যখন লিঙ্কলন দ্বীপেই কাটাইতে হইবে, তখন চিম্‌নীর চাইতে ভাল একটা বাসস্থান খুঁজিয়া বাহির করা দরকার—নতুবা দারুণ শীতে মহা কষ্ট পাইতে হইবে।

দ্বীপের উত্তর-পশ্চিম ভাগে হার্ডিং খনিজ অপরিস্কার লোহা দেখিয়াছেন, ঐ লোহা সংগ্রহ করিয়া কাজের উপযুক্ত করিয়া লইতে হইবে এবং উহা হইতে স্টিল্‌ও প্রস্তুত করা চাই। ধাতু ত আর পরিস্কার খাটি অবস্থায় পাওয়া যায় না। উহার সঙ্গে অক্‌সিজেন, গন্ধক প্রভৃতি নানারকম বস্তু মিশান থাকে। পূর্বে হার্ডিং যে লোহার নমুনা পাইছিলেন, তাহা এইরূপ অপরিস্কৃত অবস্থায় ছিল। ভীষণ উত্তাপে সেগুলিকে গলাইতে না পারিলে কোন কাজ হইবে না। উত্তাপের ব্যবস্থা করা চাই—সে ব্যবস্থা কি করিয়া হইবে?

পেন্‌ক্রফট বলিল,—তাহলে ক্যাপটেন হার্ডিং। এখন অপরিস্কার লোহা গলাবার জন্য উত্তাপের ব্যবস্থা কি করে করবেন ?

হার্ডিং বললেন—এই ব্যবস্থার জন্য এখন সেফটি আইল্যাণ্ডে গিয়া সীল শিকার করিতে হবে। তোমার ত সীল্ শিকারে খুব আনন্দ, না ?

পেন্‌ক্রেফট গিডিয়ন স্পিলেটের দিকে সরিয়া বলিল—একি, মিস্টার স্পিলেট। ক্যাপটেন সীল্ শিকারের কথা বলছেন কেন ? লোহা তৈরি করতে কি সীলের দরকার হয় ?

স্পিলেট বলিলেন—হার্ডিং যখন বলেছেন, তখন নিশ্চয়ই দরকার হয়।

একথা হার্ডিং শুনিতে পাইলেন না, কারণ তিনি ইতিপূর্বেই রওয়ানা হইয়াছিলেন। অন্য সকলেও তখন সীল শিকারের জন্য প্রস্তুত হইল।

সাইরাস্ হার্ডিং, স্পিলেট, হারবার্ট, নেব ও পেন্‌ক্রফট—সকলে ক্ষণকাল পরেই সমুদ্রতীরে গিয়া উপস্থিত। তাঁহারা এমন একটি জায়গায় গেলেন, যেখানে ভাটার প্রণালীটি পার হওয়া যায়, যথা সময়ে সকলে প্রণালী পার হইনা সেফটি আইল্যাণ্ডে গিয়া দেখিলেন—অসংখ্য পেঙ্গুইন তাঁহাদিগের দিকে নির্ভয়ে তাকাইয়া আছে। সকলের হাতে মোটা লাঠি ছিল, ইচ্ছা করলেই কতকগুলি বধ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহারা আসিয়াছেন সীল শিকার করিতে, পেঙ্গুইন্ তাড়া করিলে সীল্ পলায়ন করিবে। দ্বীপের শেষ ভাগ দেখা গেল, জলের একটু উপরেই কাল মাথা ভাসিতেছে। এসব সীলের মাথা যেন পাথরের সব চাকা ভাসিয়া বেড়াইতেছে। এগুলিকে ডাঙ্গায় উঠিতে দেওয়া উচিত, নতুবা, জলে থাকিতে ইহাদিগকে ধরা ভারি মুস্কিল—ভীষণ সাঁতার কাটিতে পারে। একবার ডাঙ্গায় উঠিয়া আসিলে চট করিয়া গিয়া জলে নামিবার পথ বন্ধ করিয়া ফেলিলেই হইল। শিকারীরা পাথরের আড়ালে লুকাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরেই সীলের দল, বালিতে খেলা করিবার জন্য উঠিয়া আসিয়াছে। গণনা করিয়া দেখা গেল ছয়টা সীল। পেন্‌ক্রফট ও হারবার্ট ঘুরিয়া অন্য পাশে গিয়া তাহাদিগের জলে নামিবার পথ আটকাইল। সাইরাস্ হার্ডিং, স্পিলেট ও নেব লাঠি হাতে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া জল ও সীল্‌গুলির মধ্যখানে পড়িলেন। ইতিমধ্যে পেনক্রফট ও হারবার্ট লাঠির আঘাতে দুটি সীল্ বধ করিল। কিন্তু বাকিগুলিকে আটকাইতে পারা গেল না—সেগুলি জলে পলায়ন করিল।

হার্ডিং তখন পেন্‌ক্রফটকে খুব বাহবা দিয়া বলিলেন—সাবাস পেন্‌ক্রফট। এখন আর ভাবনা কি, সীলের চামড়া দিয়া খাসা হাপর তৈরি হবে।

নেব ও পেন্‌ক্রফট সীলের চামড়া ছাড়াইতে তখনই লাগিয়া গেল। গোটা সীল্ দুইটা বহিয়া লইয়া যাইবার আবশ্যকতা নাই, শুধু চামড়া দুইটী নিলেই চলিবে। সীলের চামড়া ট্যান করিবার প্রয়োজন হয় না। রৌদ্রে শুকাইয়া লইলেই চমৎকার হাপর হইবে।

চামড়া ছাড়ান হইলেই তাহা লইয়া সকলে চিম্‌নীতে ফিরিয়া আসিল। এখন চামড়া দুটিকে শুকান আবশ্যক।

কাঠের দুটি ফ্রেম তৈরি করিয়া তাহাতে আঁট করিয়া চামড়া দুটিকে লাগাইয়া রৌদ্রে শুকাইতে দেওয়া হইল। শুকাইলে পর গাছের ছালের দড়ি পরাইয়া সেগুলি শেলাই করিল নাবিক পেন্‌ক্রফট। টপের গলায় কলারের তৈরি দুটি ছুরি ভিন্ন আর কোন যন্ত্রপাতি নাই।

তবু হার্ডিংএর উপদেশে এবং অন্য সকলের সমবেত সাহায্যে, তিন দিনের মধ্যে চমৎকার একটি হাপর প্রস্তুত হইয়া গেল।

সাইরাস্ হার্ডিং পূর্বেই স্থির করিয়াছিলেন, যেখানে কয়লা এবং খনিজ ধাতু দেখিয়াছিলেন, সেইখানে গিয়াই কারখানা খুলিবেন। স্থানটি ফ্রাঙ্কলিন পাহাড়ের উত্তর-পূর্ব ধারে, চিমনী হইতে ছয় মাইল দূরে সেই জায়গাতেই লতাপাতার ঘর বানাইয়া থাকিতে হইবে, তাহা না হইলে দিবারাত্র কাজ চালাইবার পক্ষে সুবিধা হইবে না। পরদিন প্রাতঃকালে সকলে হাপরটি লইয়া রওয়ানা হইলেন। রাস্তাটি জ্যাকামার বনের মধ্য দিয়া। ঘন গভীর বন, গাছপালা কাটিয়া পথ করিয়া যাইতে হইল। তাহাতে ভালই হইল, ভবিষ্যতে ফ্রাঙ্কলিন্ পর্বত এবং প্রস্পেক্ট হাইটে, যাইবার সোজা পথ হইল। বনের পথ দীর্ঘ, সারাদিন কাটিয়া গেল বন পার হইতে। বনের পাখি, জানোয়ার লতা, পাতা সমস্তই দেখা গেল। হারবার্ট আর স্পিলেট তীরধনু দিয়া দুটি কেঙ্গারু মারিলেন। আর একটা জন্তু মারিলেন, সেটা দেখিতে কতকটা হেজ্-হগ্ (কাঁটা-চুয়া) এবং কতকটা য়্যাণ্ট্ ইটারের মত। এই বনে বন্য বরাহ ভিন্ন অন্য কোন হিংস্র জন্তু দেখা গেল না। তবে, স্পিলেট্ একটা গাছে ভাল্লুকের মত একটা কি জন্তু দেখিলেন তিনি তখনই সেটার একটা ছবি না আঁকিয়া ছাড়িলেন না। পরে দেখা গেল, সেটা ভাল্লুক নয়—শ্লথ। এই জন্তু দেখিতে বড় একটা কুকুরের মত, গায়ে খাড়া খাড়া লোম, নখগুলি লম্বা—তাহার সাহায্যে গাছের ডালে বেশ আঁকড়াইয়া ধরিয়া, আরামে গাছের পাতা খায়।

বিকাল পাঁচটার সময় বন পার হইলে, সকলে ফ্রাঙ্কলিন্ পর্বতের গোড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রায় একশত গজ দূরে রেড্ ক্রীক্—পানীয় পরিস্কার জল সহজেই পাওয়া যাইবে। এইখানে ডালপালা দিয়া গাছের আড়ালে বনের ধারে সুন্দর একটি ঘর প্রস্তুত হইল। আহারের পর একজনকে আগুনের প্রহরী রাখিয়া, অন্য সকলে নিদ্রা গেল।

পরদিন একুশে এপ্রিল, সাইরাস হার্ডিং হারবার্টকে লইয়া গেলেন, যেখানে খনিজ লোহার নমুনা পাইছিলেন-সেইখানে গিয়া দেখিলেন পাথরের গায়ে, মাটির উপরেই শিরার মত লোহার লাইন চলিয়াছে। কয়লাও সহজেই সংগ্রহ হইল। তখন আর কথা কি? তুন্দুর প্রস্তুত হইল; হাপরের মুখে মাটির চোঙ্গা লাগান হইল। এখন তুন্দুরের আগুনে ফুঁ দিবার ভাবনা নাই, ইচ্ছা মত আগুনের তেজ বাড়ান কমান যাইবে। এইরূপে, দারুন পরিশ্রম করিয়া এবং কত রকমের ফন্দি খাটাইয়া, অবশেষে হার্ডিং পরিস্কার সুন্দর লোহা বাহির করিলেন।

এই লোহা দিয়া ক্রমে কুড়াল, কোদাল, হাতুড়ি, চিমটা প্রভৃতি নানা রকমের আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হইল। তখন পেনক্রফট্ ও নেবের আনন্দের সীমা রইল না।

কিন্তু এখনও স্টিল তৈরী করা বাকি। লোহা এবং কয়লা মিশাইয়া স্টিল তৈরী হয়। লোহার মধ্যে কয়লার ভাগ কম থাকিলে তাহা মিশাইয়া লইতে হইবে আর কয়লা বেশী থাকিলে তাহা দূর করিতে হইবে। নতুবা স্টিল পাওয়া যাইবে না। হার্ডিংএর অক্লান্ত পরিশ্রম ও আশ্চর্য বুদ্ধির ফলে স্টিলও প্রস্তুত হইল। অবশেষে, ৫ই মে, যন্ত্রপাতির কাজ শেষ হইলে পর দ্বীপবাসিগণ চিমনীতে ফিরিয়া আসিলেন, ইহার পর নূতন নূতন কাজে হাত দিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

চৈতন ঠাকুর

সুখরঞ্জন রায়

ছাড়ে ডাক মারে লাফ ডরে নাকো বৈরী
কি ভীষণ সাহসেতে বুক তার তৈরী !
কৈলাস পাহাড়টা নড়ে উঠে ডাকেতে,
মৈনাকে পারে নাকি ধরিতে সে নাকেতে ;
গৈরিকে গাটি ঘেরা গলে দোলে পৈতা,
চৈতন ঐ দিনে কি করিল কই তা ।
দৈবাৎ সৈনিকে দেখিল সে পাছেতে,
মৈ নিয়ে অমনি যে চড়িল সে গাছেতে ।

রূপোর ডিম

সুদীপ্ত দাশগুপ্ত গ্রাহক নং ২৮৯৩ বয়স—৭

আমাদের বাড়ীর বাগানে একটা লাল করবী গাছ আছে, একদিন আমি করবী গাছের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছিলাম। হঠাৎ আমি দেখতে পেলাম করবী গাছের পাতায় একটা রূপোর ডিমের মত কি ঝুলছে। আমি ওই রূপোর ডিমটাকে দেখে ভাবলাম ওটা হয়ত কোন পোকার ডিম, তার পরেরদিন সকালবেলায় উঠে করবী গাছটার পাশে গিয়ে দেখলাম ওখানে একটা বাচ্চা প্রজাপতি বসে রয়েছে। তখন বুঝতে পারলাম ওটা একটা প্রজাপতির ডিম আর দেখতে পেলাম ওখানে মাটিতে খোলাটা পড়ে রয়েছে।

সম্পাদকীয়—প্রজাপতির ডিম খুব ছোট্ট হয়। সেটা ফুটে ছোট্ট শুঁয়োপোকা বেরোয়। শুঁয়ো-পোকারা দিনরাত শুধু পাতাই খেয়ে যায়। কেউ কেউ ফুল, ফুলের কুঁড়িও খায়। এদের শুককীট বলে। তারপর শুঁয়াপোকারা গুটি বেঁধে তার মধ্যে চুপ করে ঘুমিয়ে থাকে। এ সময় তাকে মূককীট বলে। মূক মানে বোবা। দিন কুড়ি বাদে গুটি কেটে প্রজাপতি বেরিয়ে আসে। তুমি হয়তো রূপোলী গুটি থেকে প্রজাপতি বেরিয়েছে তাই দেখেছিলে। গুটি কিন্তু ডিমের খোলার মতো শক্ত হয় না। প্রজাপতি বেরিয়ে গেলেও গাছের পাতায় গুটি ঝোলে।

একটি আশ্চর্য স্বপ্ন

মিতালি দত্ত বয়স—১৩—গ্রাহক নং এন ৮৪৬

পাপ্পা গিয়েছিল সোনা-পাহাড়ে বেড়াতে। সঙ্গে গিয়েছিল ওর বন্ধুরা—টুটু আর তুতু। কয়েক-দিন খুব হৈ চৈ করে কাটল। সোনা-পাহাড়ে সাঁওতাল আছে অনেক। পাপ্পারা তাদের মেলা দেখল, নাচ দেখল, গান শুনল। এমনি করে এগিয়ে এল ফেরবার দিন। ফিরে আসবার আগের দিন ওরা গেল

'মোতিমহল' দেখতে। সোনা-পাহাড় থেকে কিছু দূরে ছিল একটা প্রাসাদ। তার নাম মোতিমহল। ওটা নাকি অনেকদিন আগে কোন এক রাজা তৈরী করেছিলেন। ঐ মোতিমহলে থাকতেন 'মতিবিবি' নামে এক অপূর্ব সুন্দরী নর্তকী। তিনি রাজার খুব প্রিয় ছিলেন বলে রাজা নাকি তাঁকে ঐ প্রাসাদটা তৈরী করে দিয়েছিলেন।

তিন বন্ধু ভাঙা প্রাসাদটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে এল। সোনা-পাহাড় থেকে মোতিমহলে যাবার রাস্তায় একটা বড় গেট আছে। সন্ধ্যা হলেই গেটটা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তিন বন্ধু তাই তাড়াতাড়ি ফিরে চলল, কিন্তু গেটের কাছে এসে ওরা দেখল গেট ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে। নিরুপায় তিনবন্ধু ফিরে এল প্রাসাদে। ওরা ঠিক করল 'মোতিমহলেই' রাত কাটাবে।

মোতিমহলে ছিল বিরাট এক নাচঘর, সেই নাচঘরের পাশে আর একটা ছোট ঘর ছিল। সেই ঘরের একটা কোণ পরিষ্কার করে শুয়ে পড়ল তিনবন্ধু।

মাঝরাত্তিরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল পাপ্পার। মনে হল পাশের নাচঘর থেকে যেন নূপুরের শব্দ আসছে। পাপ্পা, টুটু আর তুতুকে ডেকে তুলল। তারপর তিনজনে দরজা খুলে উঁকি মারল পাশের ঘরে। ওমা—এ কি কাণ্ড? ধুলোয় ভরা ভাঙা নাচঘর রাতারাতি বদলে গেছে। ঘরের মেঝেয় সুন্দর নরম গালচে পাতা। মাথার ওপর জ্বলছে আলোর ঝাড়। প্রতিটি দেওয়ালে একটি করে বিরাট আয়না। গালচের একধারে বসে আছে দুটি বৃদ্ধ। পরণে তাদের চুড়িদার পাঞ্জাবী-পায়জামা, মাথায় পাগড়ী। তাদের পাশে সোনার থালায় গোলাপের আতর আর ফুলের রাশ। তাদের সামনে রত্নখচিত থালায় মোহর রয়েছে রাশি রাশি। তাদের পাশে বসে আর এক বৃদ্ধ বাজাচ্ছে বীণা। আর তাদের সামনে অপূর্ব সুন্দরী এক নর্তকী নাচছে। কি অপূর্ব সে নাচ। হঠাৎ একজন বৃদ্ধ থালা থেকে একমুঠো মোহর তুলে ছড়িয়ে দিল নর্তকীর পায়ের তলায়। নর্তকী একটু হেসে নীচু হয়ে সেলাম করলো বৃদ্ধকে। তারপর আরো দ্রুততালে নাচতে লাগল, নাচতে নাচতে তার মুক্তোর মালা গেল ছিঁড়ে। মাথার ঘোমটা খসে গেল—তবু থামল না সে নাচ।

অবাক হয়ে দেখছিল পাপ্পা—হঠাৎ কার ধাক্কায় চমকে উঠল সে। চোখ মেলে দেখল তুতু তাকে ঠেলছে আর বলছে—'এই পাপ্পা, ওঠ, ওঠ।' চোখ মুছে উঠে বসে পাপ্পা ভাবল—'এ সবই তাহলে স্বপ্ন? কিছুই সত্যি নয়?'

॥ প্রাত্যহিক জীবনক্ষেত্রে বিজ্ঞানের দান ॥

ঊর্মিমালা ঘোষ (এন্ ৩০২) বয়স—১৪

ক্রিং ক্রিং ক'রে বেজে উঠলো অ্যালার্ম ঘড়িটা—জানিয়ে দিল ঘুমিয়ে থাকার আর সময় নেই! যুগ চলেছে এগিয়ে—এক মিনিটের জন্যে এ চলার বিরাম নেই। ঘড়িটার ক্রিং ক্রিং ধ্বনি যেন বলছে—ওঠো, সময় নেই মোটে; তোমরাও যুগের প্রগতির সঙ্গে পা ফেলে চলো।

যাক, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তড়াক ক'রে বিছানা ছেড়ে উঠলাম। তাড়াতাড়ি পেস্ট-বুরুশ নিয়ে স্নানের ঘরে কল খুলে দিলাম। জল এসেছে দেখে আশ্বস্ত হ'লাম। মনে হ'ল কোথায় টালার ট্যাঙ্ক—আর সাত মাইল দূরে তারই জল পাইপ বেয়ে আমার মুখ ধুইয়ে দিচ্ছে। আশ্চর্য বিজ্ঞানের দান বটে। মনে মনে সমস্ত জীবিত মৃত বৈজ্ঞানিকদের উদ্দেশ্যে জানালাম আমার শ্রদ্ধানত প্রণাম।

ঘরে গিয়ে জামাকাপড় বদলে স্টোভ জ্বেলে অনভ্যস্ত হাতে চা তৈরীর কাজে মনোনিবেশ করলাম। আমার পুরোনো চাকর তেওয়ারী আজ ছুটি নিয়েছে—তাই আমারই ঘাড়ে যত ঝামেলা। যাক্ আরাম ক'রে চোখবুজে দুই তিন কাপ চা উদরাসাৎ করলাম। তাক থেকে টোস্টারটা পেড়ে রুটি সেঁকতে যাব—অমনি কলিং বেল বেজে উঠলো-ক্রি-ং-ং। হন্তদন্ত হ'য়ে দরজা খুলেই দেখি কাগজওয়ালা কাগজ হাতে দাঁড়িয়ে। আমার হাতে কাগজটা কোনক্রমে গুঁজে দিয়েই সে নিমেষের মধ্যে সাইকেল নিয়ে উধাও হ'ল।

ঘরে এসে ইকমিক কুকারে খিচুড়ি বসিয়ে, চায়ের বাসনগুলো ধুয়ে একে একে তাকে গুছিয়ে রাখলাম। মনে পড়লো আজ যে আমরা এতরকম বাসন ব্যবহার করছি—এতো সবই বিজ্ঞানের দান। মানুষ কতযুগ আগে মাথা খাটিয়ে জ্যামিতিক অঙ্কনের ফলে এইসব জিনিষের আকৃতি দিয়েছে। ধন্য বিজ্ঞান।

যাক্। পাখাটা চালিয়ে—চশমা বাগিয়ে খবরের কাগজটা নিয়ে রোজকার মত বসলাম পড়তে। কাল, মাত্র গতকাল যেখানে যা ঘটেছে তারই চুম্বক খবর আমার চোখের সামনে। খবর এসেছে বেতারবার্তায়, ছাপা হয়েছে প্রকাণ্ড রোটারী যন্ত্রে—একেবারে ভাঁজ হ'য়ে, তৈরী হ'য়ে বেরিয়ে এসেছে যন্ত্রের মুখ থেকে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার—আর আমি আজ সেই সংবাদের মালিক।

হঠাৎ মনে পড়ল কতগুলো চিঠি লিখতে হবে। বসলাম প্যাড্‌টা বের ক'রে। পেনটা খুলে দেখি কালি নেই। দেরাজ থেকে কালির শিশি আর ড্রপারটা বার ক'রে সবেমাত্র কালি পুরতে যাচ্ছি—টেলিফোনটা বেজে ওঠল কর্কশ কণ্ঠে। কোন রকমে চটি গলিয়ে ছুটলাম।

'হ্যালো'—ওপাশ থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এলো আমার বন্ধু প্রবীরের। বলল—'পার্থ, ছটোয় তৈরী হ'য়ে আমার বাড়ী আসিস। মেট্রোয় ভালো বই এসেছে—Julius Cæsar.'

'ধন্যবাদ' জানিয়ে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলাম। উৎফুল্ল মনে স্নানের শাওয়ার খুলে বেশ স্নানের ঘটা চলল। আজকে বেশ শীত শীত ছিল। গরম জলের কল খুলে স্ফূর্তি সহকারে স্নানটা জমলো আজ। রেফ্রিজারেটর আজ বন্ধ রাখলাম। ঘরে গিয়ে পরিপাটি করে চুলটা আঁচড়ে গুণ গুণ ক'রে গান ভাঁজতে ভাঁজতে গরম গরম খিচুড়ি বেগুনী খেয়ে পেট ভরালাম। যদিও আমারই হাতের রান্না। ভরাপেটে সবেমাত্র বিছানায় একটু গড়িয়ে নেবো—এই সময় টেলিগ্রাম এলো মঙ্গলবার কাকু আসছে গৌহাটি থেকে—দমদম বিমান ঘাঁটিতে উপস্থিত থাকতে হবে। বিছানায় গড়িয়ে গল্পের বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে যেমনি একটু ঘুমের আমেজ এলো দেখি দেয়াল ঘড়িটা ঢং ঢং ক'রে ছটোর সঙ্কেত জানিয়ে দিচ্ছে। তড়াক ক'রে উঠে কোন রকমে জামায় ইস্তিরি বুলিয়ে নিলাম।

তারপর জামাটা গলিয়ে বাসে ঝুলতে ঝুলতে হাজির হলাম বন্ধুবরের প্রকাণ্ড আটতলা ফ্লাটের সামনে। লিফটের খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি মশাই বিগড়ে বসে আছেন। যাক্ বিরক্তিভরা মনে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে অবশেষে হাজির হলাম পঞ্চম তলায় প্রবীরের ডেরায়। হাঁপাতে হাঁপাতে সুইংডোর ঠেলে ঢুকে ওদের বৈঠকখানার ইজিচেয়ারটাতে আমার দেহটাকে এলিয়ে দিলাম।

দেখি প্রবীরের মা নিবিষ্ট মনে 'ঊষা' সেলাইকলে কি সেলাই করছেন—আর বোন পাপিয়া পিয়ানোতে গান তুলছে।

প্রবীরকে দেখে বললাম 'জলদি, হাতে সময় নেই মোটে।' যাইহোক তরতর ক'রে নেমে প্রবীরের নতুন-কেনা ফিয়াটগাড়ির স্পাডোমিটারের কাঁটা একেবারে উর্দ্ধতম ক'রে প্রায় উড়েই হাজির হলাম মেট্রোর সামনে। টিকিট-চেকার টিকিট চেক ক'রে নির্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করতে বলল। একটু পরেই আরম্ভ হ'ল জগতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের অনুপম নাট্যসৃষ্টি Julius Cæsar। রূপোলী পর্দায় বহুযুগ আগেকার রোমের ছবি ভেসে উঠলো। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহ তাই বেশ শীত শীত করছিল। সিনেমা শেষ হ'ল। রাস্তায় নেমে প্রবীর বলল—'এখনই বাড়ি গিয়ে কাজ নেই। অনেক দিন দেখবো দেখবো ক'রে দেখা হয়নি—চল্ আজ গিয়ে জগদ্বিখ্যাত Birla Planetariumটা দেখে আসি—কি বস্তু তিনি।'

গম্বুজাকৃতি ঘরে বসে চোখের সামনে নভোমণ্ডলের ছবি ভেসে উঠলো। মনে হ'ল বিজ্ঞানের দান কি অপরিসীম। এখনও হয়তো তাঁর ঝুলির মধ্যে কত অপার রহস্য লুকিয়ে আছে!

যাক্‌গে অনেক ঘুরে ঘুরে আমরা মিন্টের পাশ দিয়ে, ব্রিজ পেরিয়ে, ট্রাম রাস্তা ডিঙিয়ে, Petrol Pump বাঁহাতি রেখে প্রবীরদের নিউ আলিপুরের প্রাসাদোপম অট্টালিকার সামনে এসে হাজির হলাম। দেখলাম পাপিয়ার ইঞ্জেকসান নিয়ে সামান্য জ্বর হয়েছে, থার্মমিটারে গায়ের উত্তাপ উঠলো ৯৯·৮° ডিগ্রি। মেডিকেল কলেজের ছাত্র হিসাবে বন্ধু মহলে আমার বেশ খাতির আছে। কাজেই ওকে একটা যন্ত্রণা উপশমের জন্য বড়ি দিয়ে বাড়ি এলাম।

এসে দেখি ডাকবাক্সে আমার নামে কতগুলো চিঠি এসেছে। সুইচ টিপে ঘরের আলো জ্বেলে, রেডিওটা খুলে চিঠিগুলো পড়তে বসলাম। প্রবীরের সঙ্গে হোটেল থেকে খেয়ে এসেছি। কাজেই এবেলা রান্নার ঝামেলা নেই। তারপর কখন যে ক্লান্ত দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে গভীর ঘুমে ঢুলে পড়েছি খেয়াল নেই।

মনের সাধ

অরূপ ত্রিপাঠী—বয়স ১৪—গ্রাহক নং ২২৩২

শহর হইতে দূরে,
উড়ে যায় যেথা পাখিদের দল
নীল—মেঘপথ পরে,
আকাশ যেখানে নিয়ত মুখর,
স্নিগ্ধ বাতাস বয়,
বৃক্ষ সকল যেথায় নিয়ত
গ্রামটীকে ঢেকে রয় ;
মন যে আমার উড়ে যেতে চায়
সেই সুমধুর গানে,
সবিতা অস্ত যেইখানটিতে
যায় পশ্চিম ধামে,
অজানার পথ মাঝে
অম্বর পরে শুভ্র অভ্র শরতের শোভা সাজে
ভরা তুপুরেতে ঝকমক করে
দীপ্ত হীরক রাজে,
ভ্রান্ত পথিক ছায়া মাড়াইয়া
চলে যায় নিজ কাজে,
সেই খানে সেই দূরে—
একদিন আমি জন্মেছিলাম
বহু সরলের মাঝে।
ঝিল, পুকুরের পরে—
বর্ষায় যেথা অবিরাম বারি
ঝরঝর করে ঝরে,
গ্রাম পথে পথে মেয়েদের দল
চলে যায় জলা পরে
হাতজাল গুলি লইয়া তাহারা
ছোট ছোট মাছ ধরে,

ধীরে ধীরে যেথা রাঙা নবারুণ
আস্তে আস্তে উঠে—
গানের নবীন সুর উঠে যেথা
পাখিদের মুখ ফুটে ;
চাষীদের দল গান গেয়ে যেথা
মাঠের দিকেতে ছোটে,
রাখালি বাঁশির গানের বেহাগ
গ্রামের পথেতে লোটে,
সেইখানে সেই দিকে
মন যে আমার উড়ে যেতে চায়
প্রকৃতির দরবারে।

মেঘে মেঘে

মধুমিতা ঘটক

গ্রাহক নং—৬৪৪

সকাল থেকে মেঘে মেঘে ভরেছে আকাশ
সোঁদা সোঁদা গন্ধেতে আজ ভরেছে বাতাস
দুপুর বেলায় বৃষ্টি এল ঝাপসা করে গাছ
কে আছিস্ আয় দেখবি যদি ব্যাং বাবাজীর নাচ
মাথায় দিয়ে পাতার টোকা চলে ছেলের দল
ডুবল জলে খেলারি মাঠ বন্ধ খেলা বল।
পাখিরা সব ডালে বসে করছে চেঁচামেচি
ও পাড়াতে দুই বুড়ীতে লাগল খেঁচাখেঁচি ॥

গ্রাহকের চিঠি

নীহারিকা মণ্ডল—গ্রাহক নং—১৮০৩—শ্রাবণ ১৩৭১

সন্দেশ সম্পাদক, প্রণাম তোমায়,
চিনিলে চিনিতে পার, দিলে পরিচয়।

সন্দেশ আসরেতে আমি যে নূতন,
পড়ি আমি সন্দেশ করিয়া যতন।
বৈশাখ থেকে আজ আষাঢ়ে এলাম।
সন্দেশ সভ্যাকার্ড তবু না পেলাম।
প্রতিদিন পথ চাহি কার্ডের আশায়,
আসে না তো কার্ড মোর, ডাক চলে যায়।
সন্দেশ প্রতিমাসে নিয়মিত পাই,
১৮০৩ নম্বর—সভ্যাকার্ড চাই।
কত যে নিয়ম আছে, তোমার খাতায়,
লেখা পাঠাইতে চাই, জানাবে আমায়।
ভালোই লাগে পড়তে এটা, মিষ্টি মধুর সুরে,
জানতে পারি নানা খবর, থেকেও অনেক দূরে।
(এতে) হাসি আছে, দুঃখ আছে, আছে ভবিষ্যৎ
দূরের খবর কাছেতে পাই—এইটুকু তফাৎ।
উঠবো এবার। জবাব দিও। হল যে শেষ লেখা।
(পারিবে কি চিনতে আমায়?) আমি নীহারিকা।

সম্পাদকের উত্তর

'নতুন বছর! নতুন বছর! গ্রাহকেরা পাঠাও চাঁদা!'
'এই যে পাঠাই, এই যে পাঠাই'—আসল চাঁদা গাদা গাদা।
নতুন বছর, নতুন আপিস। কেউ পাঠালে ঠিক ঠিকানায়।
ভুল করে ফের কেউ বা দিলে পুরোন সেই আপিস খানায়।
কেউ পাঠালে নামটি শুধু, গ্রাহক সংখ্যা কেউ জানালে,
নতুন গ্রাহক আর পুরাতন মিশিয়ে দিলে গোলেমালে।
সব জানিয়ে চিঠি লেখো—সংখ্যাটি ঠিক হয়ে যাবে।
পাওনি যারা গ্রাহকের কার্ড এইবারেতে সবাই পাবে।

প্রতিযোগিতার ফলাফল

বাপ রে বাপ! ব-প্রতিযোগিতার কি বাহাদুরি!

একমাস ধরে আসছে উত্তরের পর উত্তর, সন্দেশ-কার্যালয়ের চিঠির বাক্স বোঝাই, ছোট এক স্যুটকেস শেষে ফেটে যাবার জোগাড় ব এর বোঝায়।

সাবাশ গ্রাহক-গ্রাহিকারা! সম্পাদক মহাশয় ৭০ খানা ব-এর একটা তালিকা তৈরী করেছিলে কিন্তু গ্রাহকদের তালিকা দেখছি পৌঁছিল ১৭০এ! ছয় শ'র ওপরে গ্রাহক উত্তর পাঠিয়েছ, তার মে যাদের তালিকায় ১০০র উপরে নাম আছে তাদের সংখ্যাই ৫০এর চেয়ে বেশি আর ৯০র উপরে ন দিয়েছে প্রায় ২০০ জন।

অভিধান ঘেঁটে যারা নাম বার করেছ তাদের বাহাদুরি আছে বটে, প্রায় সব কিছু জিনিষে তো দেখছি 'ব' দিয়ে একটা নাম আছে। আমরা নিজেরাই অনেক নতুন 'ব' শিখলাম তোমাদে তালিকা থেকে। কিন্তু ছোট্ট ছোট্ট গ্রাহক-গ্রাহিকা যারা শুধু চোখে দেখে ৬০।৭০ খানা নাম বার কে তাদের বাহাদুরি কিছু কম নয়, সবগুলো আমাদের চোখেই পড়েনি আগে! আবার দু একজনে 'ব' এ সংখ্যা অন্যদের চেয়ে কিছু কম দিলেও, খুব মজা করে বর্ণনা লিখেছ। তার মধ্যে ব্রততীর বর্ণনা ছাপবার যোগ্য।

বড় বড় অভিধান নিয়ে যখন তোমাদের তালিকায় নম্বর দিতে বসলাম তখন কিন্তু তোমাে অনেকের তালিকা থেকে অনেক নামই বাদ গেল, ১৭০ এসে দাঁড়াল কেবল ৭০এ! কিছু কিছু কাটা গে তোমাদের অসাবধানতার জন্য, বেতের চেয়ার, বাঘের চামড়া, বাগানের মালি এগুলো তো একটা শব্দ ন মুল কথাটা 'ব' দিয়েও নয়। অথচ বেত্রাসন বা বাঘ-ছাল লিখলেই নম্বর দিতে পারতাম। এমন অনে জিনিষ লিখেছ যা ছবিতে নাই, আবার অনেক বস্তুর ভুল নাম দিয়েছ—যেমন বাবুই পাখি, বাদু বুশকোট, বলদ, বুলডগ ইত্যাদি। যেগুলি তোমরা কল্পনা করে নিয়েছে কিন্তু ছবিতে প্রমাণ হয় না তাে নম্বর দিইনি—যথা বোন, বাবা, ব্রেকফাস্ট। যা চোখে দেখা যাচ্ছে না তাও ধরা হয় নি, যেমন বা বাতাস। কেবল বস্তুর নামই ধরা হয়েছে, ক্রিয়াপদ বা বিশেষণে নম্বর দেওয়া হয়নি—বেঁটে, বসা, এ বাতিল হয়ে গেছে। বড় বড় বাংলা অভিধানেও যাকে পাওয়া গেল না এরকম সংস্কৃত শব্দে নম্বর দেও হয়নি আবার অভিধান-ঘাঁটা অপ্রচলিত ইংরাজি শব্দেও নম্বর দেওয়া হয়নি। (আরো একটা ক 'প্রতিযোগিতা' শব্দটি ভুল করে 'প্রতিযোগীতা' লিখলে কিন্তু পরের বার নম্বর কাটব) তবু বলব গ্রাহ গ্রাহিকাদের বাহাদুরি—কাটতে-কাটতে কাটতে-কাটতেও শেষ পর্যন্ত ১০০র উপরে বা প্রায় ১০০ ন বাকি রইল তিনজনের তালিকায়। আরো চারজনের নামও উল্লেখযোগ্য, কারণ, তাদের ঠিক নাে সংখ্যা ঐ তিনজনের চেয়ে সামান্য কিছু কম হলেও তাদের উত্তরগুলি ভারি সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, ভুলের সং

খুবই কম। আর তাছাড়াও যাদের উত্তর ভাল হয়েছে তাদের নাম ছাপতে গেলে সন্দেশের অর্ধেক পৃ তাতেই ভরে যাবে—কারণ অনেকেরই উত্তর খুব ভাল হয়েছে। তোমাদের সবাইকেই অভিনন্দ জানাচ্ছি।

প্রথম—গ্রাহক নং এন্ ১৫—বনশ্রী দাস—(সঠিক 'ব' ১০৭)

দ্বিতীয়—গ্রাহক নং এন্—১৭১২—শুক্লা গাঙ্গুলি—(সঠিক ব ১০১)

তৃতীয়—গ্রাহক নং এন্ ১৭১১—ঈশিতা গাঙ্গুলি (সঠিক ব ৯৭)

ভাল উত্তর—২৭ অমিতাভ সেন, ২০৮ শুক্তিশ্রী চট্টোপাধ্যায়, এন ১৪৯৭ শুভ্রা কুণ্ডু, ২২৩২ অর ত্রিপাঠী।

মজার উত্তর—ব্রততী মুখোপাধ্যায়।

বিশদ বর্ণনায় ব্যক্ত বহু ব-এর বাহার

ব্রততী মুখোপাধ্যায়—গ্রাহক নং ১২৬

বাংলো বাড়িতে বনভোজনের ব্যবস্থা। বাগানে বেতের চেয়ারে বাবু বসেছেন বউকে নি বেতের টেবিলে বদনায় জলের উপর বরফ। বধুর হাতে বোনার কাঠি। ব্লাউজটা—তাঁর বে বেয়ারা ব্রেকফাস্ট বয়ে এনেছে। বয়ের বেশবাসেও বাহার বটে। নিচে বসানো ব্যাগটার দিকে ব্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছে বেড়াল। বালক ও বালিকা বস্ত্র বিছিয়ে বসেছে। বাচ্চাটা বেলুন ওড়াচ্ছে বাটি থেকে সাবানজল নিয়ে বগলকাটা বাহারে ফ্রকপরা বালিকা বুদবুদ বানাচ্ছে। তার বিনুনির ডগ আবার বো বাঁধা। বাবুছেলে বালিশবুকে বই পড়ছে। বুড়ো আঙুলে পাতা ধরেছে চেপে। প্যা তার বেলট দিয়ে বাঁধা। বাঁ ধারের বাসনে বিস্কুট বসানো। অন্যপাশে বয়ম। ব্যাট আছে পড়ে আরও দেখা যায় বাঁশি, বন্দুক, বেতারযন্ত্র। বাণ্ডিলে আর বাস্কেটে কি আছে কে জানে। বৃত্তাক বাগানে বেগুন চারা নাকি? বোঁটায় তার ফুল ধরেছে। বেঁজিটা ছুটছে দেখি। এক বুড়ো, হা তার বাঁশের লাঠি, পায়ে বুটজোড়া, বোতামবন্ধ কোটের ফাঁকে বুক দেখা যায়। সামনে একটা বল পড়ে বুলডগ লাফাচ্ছে—তার গলায় বকলস, ল্যাজটা বেঁটে। ব্যাং লাফাচ্ছে নাকি পাশে?

বেঞ্চের ধারে ব্যস্ত মালী, চুল তার বাবরি করা। ঐ বাঁদিকে বারোটা বাঁধাকপি ফলেছে। বাঁ বেড়ার ওপারে বনঝোপ। বাবলাগাছে বাবুইবাসা। বলাকা ডানা মেলেছে বাতাসে। বাঁশঝাড় বাঁচি বাহক চলেছে বাঁক বয়ে। গোরুটার বাঁট দেখা যায়। বাছুরটা বুঝি বকনা হবে। বটগাছে বাঁদ বসেছে। বায়স বসেছে বাড়ির চালে। বিমানপোত দেখা যায় ব্যোমপথে। তালগাছে বাব ঝুলেছে। ঘরে বিজলীবাতির বন্দোবস্ত। ব্র্যাকেটে বালব দেখছি। আবার বাঘছাল ঝোলানো। বেড় ঠেশ দেওয়া বাইসাইকেল, তার বেলটা দেখা যায়, ব্রেকও রয়েছে। বাউল বোল ফোটাচ্ছে বাজনা চুল তার বিড়ে করে বাঁধা।

নতুন ধাঁধাঁ

(ছয়টি বিখ্যাত ব্যক্তির নাম)

৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে উত্তরটি যেন আমাদের হাতে এসে পৌঁছয়

(১)

প্রথম অক্ষর তার ঘরে আছে, বনে নাই,
দ্বিতীয় সে বীণাযন্ত্রে, সেতারেতে নাহি পাই ;
চন্দ্রকরে তৃতীয়টি, রৌদ্রে নাহি পাবে তাকে ;
চতুর্থটি নাসিকায়, চোখে মুখে নাহি থাকে ;
পঞ্চম প্রথমে থাকে, দ্বিতীয়েতে কিন্তু নেই ;
পাঁচে মিলে যাঁর নাম, জানো তাঁকে সকলেই।

(২)

প্রথম সেগুনে পাবে, নাই শাল-তাল-গাছে ;
দেরাজে দ্বিতীয় নাই, লোহার বাক্সতে আছে ;
পীতবর্ণে তৃতীয়টি সবুজ রঙেতে নাই ;
চতুর্থ বায়সে থাকে, রাজহংসে নাহি পাই ;
পঞ্চম রবির করে, জ্যোৎস্নালোকে নাহি থাকে ;
পাঠক-পাঠিকা ভাই, তোমরা কি জানো তাঁকে ?

(৩)

বিকালে প্রথম আছে, মধ্যরাত্রে কিন্তু নাই ;
দ্বিতীয় সাগরে নাই, বেলাতটে তাকে পাই ;
কেকারবে তৃতীয়টি, নাহি থাকে কুহুডাকে ;
চতুর্থ গহন-বনে, শহরে পাবে না তাকে ;
পঞ্চম অলিন্দে আছে, দুয়ারে-গবাক্ষে নাই ;
যাঁর নাম পাঁচে মিলে, জানো কি তাঁহারে ভাই ?

(৪)

প্রথম লাজেতে নাই, বাস করে সগৌরবে ;
করতলে দ্বিতীয়টি, পদমূলে নাহি রবে ;

তৃতীয় দুঃখেতে নাই, মহানন্দে সে যে থাকে ;
মূর্খেতে চতুর্থ নাই, বুদ্ধিমানে পাবে তাকে ;
পঞ্চম শান্তিতে নাই, যুদ্ধবিগ্রহেতে পাই ;
তোমরা তাঁহার নাম জানো কি সকলে ভাই ?

(৫)

প্রথমটি আনারসে, কালোজামে নাহি পাই ;
দ্বিতীয় বোম্বাই-আমে, কাঁঠালেতে কিন্তু নাই ;
তৃতীয় নতুন-গুড়ে, ইক্ষুরসে নাহি পাবে ;
চতুর্থ কাস্টার্ডে থাকে, পায়সে না দেখা যাবে ;
জুঁইফুলে পঞ্চমটি, শতদলে নাহি থাকে ;
ষষ্ঠ নাই ফুলে-ফলে, নবপত্রে পাবে তাকে।

(৬)

সুমধুরে প্রথমটি, তিক্ত বা কটুতে নাই ;
দ্বিতীয়টি অভাজনে, ধনীগৃহে নাহি পাই ;
চাষবাসে তৃতীয়টি, শিল্পকাজে নাহি পাবে ;
চতুর্থ চতুর্থে থাকে, প্রথমে না দেখা যাবে ;
পঞ্চম সুরেতে নাই, মেঘমন্দ্র-স্বরে থাকে ;
পাঁচে মিলে যাঁর নাম, তোমরা কি জানো তাঁকে ?

বুদ্ধিমান চাকর

উপেন্দ্রকিশোর রায়

এক কাজি সাহেবের এক চাকর ছিল তার নাম বুদ্ধু। চাকরটা একে বিদেশী, তাতে বুদ্ধি শুদ্ধির ধার ধারে না—কাজেই কাজি সাহেবের মহা মুস্কিল। চাকরটা কায়দা কানুন কিছুই জানে না—বাড়ীতে লোক আস্‌লে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। একদিন কাজি সাহেব তাকে বল্‌লেন 'ফের যদি এরকম বেয়াদবী করিস,—কাউকে সেলাম না করিস্ তবে তোকে আমি দেখাব। সকলকে খাতির করবি আর 'সেলাম' বল্‌বি'।

সেই থেকে রাস্তায় বেরিয়ে যাকে দেখে সকলকেই বুদ্ধু সেলাম করে। ছেলে বুড়ো, মানুষ, গরু কাউকে বাদ দেয় না। এক গাধাওয়ালা তার গাধা নিয়ে চলেছে—চাকরটা তাকে সেলাম করল আর গাধাগুলোকেও খুব খাতির ক'রে বল্ল 'সেলাম'। তা শুনে গাধাওয়ালা খুব হাস্‌তে লাগ্‌ল আর বল্ল 'দূর আহাম্মক, ওদের বুঝি সেলাম বল্‌তে হয়; ওদের 'হেই হেই' করে চালাতে হয়।' বুদ্ধু বেচারা কিছুদূর গিয়ে দেখ্‌ল একজন শিকারী ফাঁদ পেতে বসে আছে, আর অনেকগুলো পাখি সেই ফাঁদের কাছে ঘুর্‌ছে। তাই দেখে সে 'হেই হেই' করে এম্‌নি চেঁচিয়ে উঠল, যে পাখি টাখি উড়ে পালাল। শিকারীতো চটে লাল।

আর একদিন এক বড় লোকের বাড়ীতে সাহেবের নেমন্তন্ন। বুদ্ধুও সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছে। তারা নবাব বংশের লোক—আশ্চর্য তাদের আদব-কায়দা। খেতে খেতে নিমন্ত্রণ কর্তার দাড়িতে একটা ভাত পড়্‌ল—অম্নি একজন চাকর যেন গান কর্‌ছে এম্‌নিভাবে গুণ গুণ করে বলতে লাগ্‌ল—

ফুলের তলে বুল্‌বুল ছানা
তারে উড়িয়ে দেনা—উড়িয়ে দেনা—

অম্নি তার মনিব ইসারা বুঝতে পেরে দাড়ি ঝেড়ে ভাত ফেলে দিল। কাজিসাহেব বাড়ী এসে বুদ্ধুকে বল্লেন 'দেখ্‌লি' ত কেমন কায়দা। আমার দাড়িতে যদি খাবার সময় ভাত লাগে তুইও ঠিক তেমনি করে বল্‌বি'। তারপর একদিন কাজি সাহেবের বাড়ীতে খুব ভোজ হচ্ছে কাজি সাহেব চাকরের কেরামতি দেখবার জন্য ইচ্ছা করে তার দাড়িতে একটা ভাত ফেলে দিলেন আর বুদ্ধুকে চোখ টিপে ইসারা করলেন। বুদ্ধু অম্নি চেঁচিয়ে বল্ল 'সেই যে সেদিন অমুকদের বাড়ীতে না কিসের কথা হয়েছিল? আপনার দাড়িতে তাই হয়েছে—তানানা তানা'। শুনে সব লোক হো হো করে হেসে উঠ্‌ল।

একদিন মনিব বল্লেন 'দেখ, তুই বড় বিশ্রী ভাত র'াধিস। তুই এখনও ফেন গাল্‌তেই শিখিস্ নি। আজ যখন ভাত বানাবি, ভাত সিদ্ধ হলেই আমাকে ডাকিস্, আমি দেখিয়ে দেব। আমাকে না দেখিয়ে কিছু করিস্‌নি।'

সেদিন ভাত সিদ্ধ হতেই চাকর মনিবকে ডাক্‌তে গিয়েছে। দরজার বাইরে থেকে উঁকি মেরে একটা আঙুল দিয়ে ইসারা করে সে মনিবকে ডাকতে লাগ্‌ল। কাজি সাহেব তখন দরজার দিকে পিছন ফিরে কি যেন লিখছিলেন। তিনি এ সব কিছুই জানেন না। চাকরটা ঘণ্টাখানেক এই রকম ডেকে শেষটায় হয়রান হয়ে পড়ল। তখন রেগে চীৎকার করে বলল, 'আর কতক্ষণ ডাকব?—এদিকে ভাতটাত সবত পুড়ে ছাই হয়ে গেল।' তখন কাজি সাহেব ফিরে দেখেন চাকর তাঁকে একটা আঙুল দিয়ে ইসারা কর্‌ছে—ওদিকে সত্যি সত্যিই ভাত পুড়ে ছাই।

একদিন রাত্রে কাজি সাহেবের বাড়ীতে চোর ঢুকেছে। বুদ্ধু খচ্‌মচ, শব্দ শুনে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, 'কেরে? চোরটা গম্ভীর ভাবে বলল, 'কেউ নই বাবা, কেউ নই'। তা শুনে বুদ্ধু আবার নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাতে লাগল। সকালে উঠে কাজি সাহেব দেখেন তাঁর সব চুরি হয়ে গেছে। বুদ্ধুকে জিজ্ঞাসা করে যখন রাত্রের কথা সব শুন্‌লেন তিনি খুব রেগে গালাগালি করতে লাগলেন। কিন্তু বুদ্ধু তাতে মুখ বেজায় ভারি করে বলল,—'তা কি কর্‌ব—সে আমায় বারবার করে বললে 'কেউ নই, কেউ নই।' লোকটা ত দেখছি শুধু চোর নয়—ব্যাটা বেজায় মিথ্যাবাদী'।

একদিন কাজি সাহেব সহরের বাইরে কোথায় যাবেন। যাবার সময় বুদ্ধুকে বলে গেলেন, দেখিস, দরজাটার উপর ভাল করে চোখ রাখিস,—দরজা ফেলে কোথাও যাস্‌নে, তাহলে চোরে আমার সব নিয়ে যাবে। কাজি সাহেব চলে গেলেন—চাকর বেচারা এক লাঠি নিয়ে দরজায় পাহারা দিতে লাগল। একদিন গেল, দু দিন গেল, তার পরদিন বুদ্ধু শুন্‌ল এক জায়গায় ভারি তামাসা দেখান হচ্ছে। তাইত, বেচারা কি করে? অনেক ভেবে সে কর্‌ল কি বাড়ীর দরজাখানা খুলে সেটাকে ঘাড়ে নিয়ে তামাসা দেখতে গেল। এদিকে বাড়ীতে চোর ঢুকে যা কাণ্ড করে গেল সে আর কি বল্‌ব। কাজি সাহেব বাড়ীতে এসে দেখলেন—সর্বনাশ, বাড়ীর সিন্দুক আলমারি সব খালি। ওদিকে বুদ্ধু বসে তামাসা দেখছে আর খুব সাবধানে দরজা পাহারা দিচ্ছে!

রাজা গপ্পিদাসের গল্প

সুবিনয় রায়

রাজা গপ্পিদাসের একটি সাধের ঘোড়া ছিল। সেটিকে তিনি সর্বদাই সঙ্গে নিয়ে যেতেন। ঘোড়াটির একটা আশ্চর্য গুণ ছিল ;—দিনরাত খাটলেও সে সহজে ক্লান্ত হত না। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, সব সময়েই সে খাটতে পারত। যুদ্ধের সময় সে কামানের গোলাকে ভয় পেত না। রাজা গপ্পিদাস সর্বদাই তাঁর ঘোড়ার গল্প করতেন।

একদিন গপ্পিদাস বললেন,—একবার আমার সাধের ঘোড়াটিকে নিয়ে যুদ্ধে যাই। শত্রুর সংখ্যা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল ; কিন্তু আমি সহজে দমে যাবার পাত্র নই। বিশ্বাসী ঘোড়া থাকতে আমার সাহস কত! যেখানে যুদ্ধ বাধে, সে সহরটির চারিদিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা। আমি সহরের মধ্যে সটান সৈন্যদল নিয়ে ঢুকে শত্রুদের সঙ্গে তলোয়ার নিয়ে ঘোর যুদ্ধ করলাম। শত্রুদল ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল ; আমি তাদের তাড়া করলাম। কিছুদূর গিয়ে দেখি, সঙ্গের লোকজন সব অনেক পিছনে পড়েছে। তাদের জন্যে অপেক্ষা করা দরকার। কাজেই ঘোড়া বেচারাকে ইতিমধ্যে একটু জল খাওয়াবার জন্য একটা মস্ত চৌবাচ্চার কাছে নিয়ে গেলাম! ঘোড়ার বড্ড পিপাসা পেয়েছিল, তাই সে আগ্রহ করে চোঁ চোঁ শব্দে জল খেতে লাগল। কিন্তু, খাচ্ছে তো খাচ্ছেই! প্রকাণ্ড বড় চৌবাচ্চার জল শেষ হয়ে গেল, তবুও সে খাচ্ছেই! ব্যাপারটা কি? এত জল তার পেটে ধরে কেমন করে? হঠাৎ পিছনে চেয়ে দেখি, ঘোড়ার পিছন দিকটা একেবারে উড়ে গেছে ; পিছনের পাও নেই। কাজেই, বেচারা যত জল খাচ্ছে সবই পিছন দিক দিয়ে আবার বেরিয়ে যাচ্ছে! এখন কি করা যায়? আগেই খুঁজে দেখা দরকার পিছন দিকটা গেল কোথায়। যেখানে প্রথম যুদ্ধ বেধেছিল সেই জায়গায় গেলাম। গিয়ে দেখি ঘোড়ার পিছনের ভাগটা তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে তেজের সঙ্গে পা ছুঁড়ছে। অমি একজন ডাক্তার ডেকে ঘোড়ার দুটো টুকরো বেশ করে জোড়া লাগিয়ে নিলাম। সে ঘোড়ার এমন তেজ, কয়েকদিন পরেই দেখি, আবার ঘোড়া তাজা হয়ে উঠেছে!

এর কিছুদিন বাদে এক শীতের দেশে গেলাম। সেখানে নাকি অসম্ভব রকমের বরফ পড়ে। আমি তো আগে কখনও বরফ পড়া বেশী দেখি নি ; কাজেই তত গ্রাহ্যও করলাম না। একদিন সন্ধ্যায় পথে যেতে বরফ পড়া আরম্ভ হল। অমনি আমি ঘোড়া ছুটিয়ে সহরের দিকে যেতে লাগলাম ; কিন্তু অনেক দূর গিয়েও সহরের কোনও চিহ্নই পাওয়া গেল না। এদিকে রাতও হয়ে হয়ে এসেছে, আন্দাজে পথ চলাও নিরাপদ নয়। কাজেই একটা জায়গায় ঘোড়া থেকে নেমে পড়লাম। জায়গাটা দেখে একটা গোরস্থান বলে মনে হল। কারণ কতগুলো কবরের মতন চুড়ো দেখা যাচ্ছিল। একটা খুঁটির সঙ্গে ঘোড়াটাকে বেঁধে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোর বেলা উঠে দেখি, বরফ-টরফ কোথায় মিলিয়ে গেছে —আমি এক গ্রামের মাঝে রয়েছি।
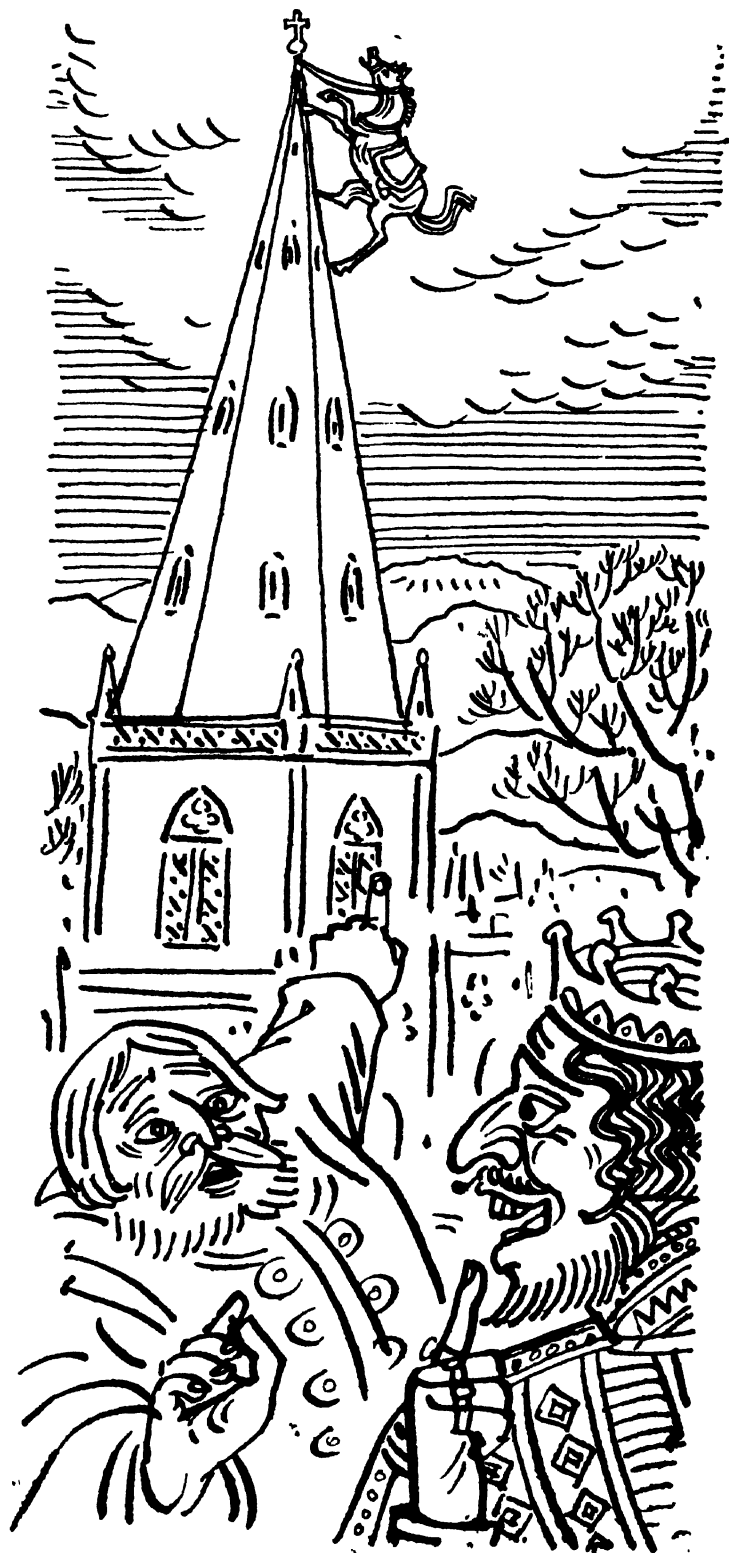
সেখানকার লোকেরা আমায় কত আদর যত্ন করল। কিন্তু আমার মন বড় অস্থির হয়ে ছিল; তাদের আদর যত্ন আমি ভুলেই গেলাম; আমার ঘোড়া কোথায় গেল? তাকে তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না! হঠাৎ শুনি উপর থেকে 'চিঁ হি হি' ঘোড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমি চমকে উপরের দিকে চেয়ে দেখি, আমার ঘোড়া একটা মন্দিরের চুড়ো থেকে ঝুলছে; তার লাগামটা চুড়োর আগার সঙ্গে বাঁধা! অমনি দুড়ুম করে গুলি করে লাগামটা কেটে দিলাম;—ঘোড়াও তড়াক করে একলাফে নীচে এসে পড়ল। তখন আমার আনন্দ দেখে কে?

এই ঘটনা আমার বড়ই আশ্চর্য মনে হল। কি করেই বা ঘোড়া ঐ চুড়োর উপরে গেল আমিই বা এই গ্রামে কেমন করে এলাম! আমার পাশেই একটি বুড়ো ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি বললেন— 'আপনি বুঝি কাল রাত্রে এ গ্রামে এসেছিলেন? তখন চারিদিক বরফ চাপা পড়ে গিয়েছিল, তাই বুঝি আপনি মন্দিরের চুড়োকে খুঁটি মনে করে ঘোড়াটাকে ওখানে বেঁধে রেখেছিলেন? রাতারাতি বরফ গলেছে আর আপনি আস্তে আস্তে নেমে এসেছেন—টের পান নি। কিন্তু, ঘোড়া বেচারি আর করে কি? সে তো ওখানে বাঁধা রয়েছে!' তখন আমি ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম।

মাটির নিচে রেলের গাড়ী

ইউরোপ অ্যামেরিকার অনেক আধুনিক সহরে রাস্তায় ভিড় কমাবার জন্যে ও অসংখ্য লোকের যাতায়াতের সুবিধার জন্যে মাটির নিচে রেলগাড়ি চলে। এমন কি, কলকাতাতেও একদিন মাটির নিচে ঐ একই কারণে রেলগাড়ি চলবে, এ কথা প্রায় শোনা যায়। কিছুকাল আগে সহরের মাটির তলাকার অবস্থাটা পরীক্ষা করবার জন্য নাকি বিদেশী বৈজ্ঞানিকরাও এসেছিলেন। মাটির নিচে রেলের ব্যাপারটা আমাদের কাছে যতই অভিনব ঠেকুক না কেন, লণ্ডনে প্রথম মাটির নিচে ট্রেন চলেছিল এক শো এক বছর আগে, ১৮৬৩ সালে, যখন ঐ সহরের ভিড়ের ঠেলা লোকে প্রথম টের পেতে আরম্ভ করেছিল।

১৮৬৩ সালের এই প্রথম মাটির নিচের রেলপথটি ছিল পৌনে চার মাইল লম্বা, এঞ্জিনগুলি চলত বাষ্পে আর বিকট ধোঁয়া ছাড়ত। ধোঁয়ার ভয়ে গাড়িতে জানালা রাখা হয় নি, অন্ধকার, বাতাসের অভাব, তবু কয়েক মাসের মধ্যেই দিনে প্রায় ২৬ হাজার লোক এই রেলে যাতায়াত করতে আরম্ভ করে দিল।

এই প্রথম মাটির নিচে রেলপথ তৈরীর গল্পটি বেশ মজার। এটি বসাতে নাকি ৯½ লক্ষ পাউণ্ড খরচ হয়েছিল। প্রথমেই কিন্তু এখানকার মতো গভীর নলের মধ্যে লাইন বসাবার ব্যবস্থা হয় নি, সে বেশ এক মজার ব্যাপার। ওপর থেকে রাস্তা বরাবর ২৮½ ফুট গভীর একটা খাল খুঁড়ে ফেলা হল। পথের দু পাশে তোলা মাটির পাহাড় জমে গেল, বাসিন্দাদের চলাফেরা দায় হল, দু ধারের বাড়ির ভিৎ আল্‌গা হয়ে সেগুলো ভেঙ্গে পড়ার জোগাড়। এমন কি একটা গির্জার গাঁথুনি নেড়ে দেবার জন্যে তাকেই ক্ষতিপূরণ দিতে হল ১৫ হাজার পাউণ্ড।

সে যাই হক, নানান্‌ বাধা বিপত্তির মধ্যে নিয়ে কাজ এগুতে লাগল। খাল খোঁড়া শেষ হল; তার মাথার উপর দিয়ে লম্বা খিলানের মতো করে শক্ত ইঁটপাথরের ছাদ হল; তার উপর মাটি ফেলে আবার রাস্তা তৈরী হল; সেই রাস্তা দিয়ে আগের মতো গাড়িঘোড়া মানুষ জানোয়ার চলতে লাগল।

এবার প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়াল রেলের ধোঁয়া বেরুবার কি উপায় হবে! যাত্রীদের তো দম আটকিয়ে মারা যাবার জোগাড়! কত রকম পরীক্ষাই না হল। এঞ্জিনের ভেতর আগে থেকেই খুব খানিকটা বাষ্প ভরে নিয়ে, বিনা আগুনে চালাবার চেষ্টা হল। তাতে ধোঁয়ার বালাই দূর হল বটে, কিন্তু এঞ্জিন ফেটে যায় আর কি! সুড়ঙ্গের ছাদে কিছু দূর দূর রাস্তার মাঝখানে ধোঁয়া বেরুবার জন্য ফুটো কাটা হল! তার মধ্যে থেকে মাঝে মাঝে শব্দ আর ভক্‌ ভক্‌ করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে দেখে তখনকার গাড়ি টানা প্রকাণ্ড ঘোড়াগুলো ভয়ের চোটে লাগাম ছিঁড়ে পালাতে চায়!

শেষ পর্যন্ত ফাউলার নামে একজন বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিক অতি উন্নত ধরণের বাষ্পীয় এঞ্জিন তৈরী করলেন, যেটা 'কোকে' চলে আর ধোঁয়া ছাড়ে যৎসামান্য। যতদিন না বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার শুরু হল, এই এঞ্জিনই ব্যবহার হত।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে, যাকে বলা হয় 'টিউব' বা নলের রেলগাড়ির সৃষ্টি হয়েছিল। (এর জোগাড়যন্ত্র শুরু হয় বহু আগে থেকে) এখন আর ছাদ-ওয়ালা খালের রেলপথ নয়, মাটির অনেক নিচে দিয়ে গাড়ি চলা। কাজটা বড়ই শক্ত, ছাদ ধ্বসে পড়ে, টেম্‌স্‌ নদীর তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ কাটতে গিয়ে, এক জায়গায় নদীর জল ভুস্‌ভুস্‌ করে নেমে এল, কারিগররা পালাবার পথ পায় না, তখনকার মতো কাজ বন্ধ করতে হল। ১৮৪১ সালে একটা টানেল তৈরী হয়েছিল, কিন্তু তখনি সেটাতে আর রেল চলত না, সামান্য লোকজন যাওয়া আসা করত। ১৮৬৯ সাল থেকে এই টানেলে রেলগাড়ি চালাবার ব্যবস্থা হল। তারপর দেখতে দেখতে রেলের জন্যে আরো অনেক টানেল তৈরী হয়ে গেল।

মাটির নিচে ট্রেন চালাতে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রথম ব্যবহার হয় ১৮৯০ সালে। ততদিনে 'টিউব' চড়ার জনপ্রিয়তা দেখে কে! একএকটা ট্রেন টানতে দুটি করে পঞ্চাশ হর্সপাওয়ারের ইলেকট্রিক মোটর লাগত। কটকটে কমলা রঙের গাড়িগুলো মাটির নিচেকার আবহাওয়াতে ভারি বাহার দিত। তিনটি মাত্র গাড়ি একেকটা ট্রেণে, প্রত্যেক গাড়িতে ৩২ জন লোক বসে, একজন কণ্ডাকটর থাকে, সে-ই দরজা, বন্ধ করে।

ধোঁয়ার ভয়ে ফালির মতো সরু জানলা, একটু হাওয়া আসে, কিন্তু কিচ্ছু দেখা যায় না; কত সময় লোকে নিজেদের স্টপ চিনতে না পেরে কত দূর এগিয়ে যেত। গাড়ির ছাদে চেপে যাতে কেউ একটি রক্তাক্ত কাণ্ড না বাধায়, তাই বড় বড় নোটিস ঝোলানো থাকত।

থামবার সময়টুকু ধরেও গড়ে ঘণ্টায় সাড়ে এগার মাইল বেগে এই রেলগাড়ি চলত। দুর্ঘটনার সম্ভাবনা যথাসাধ্য দূর করার ব্যবস্থা ছিল, ইলেকট্রিক সিগ্‌নেল, স্বয়ংক্রিয় সিগনেল—লকিং ইত্যাদি। দেখতে দেখতে জনপ্রিয়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে টিউবের অনেক উন্নতি করা হল। ১৯০১ সালের মধ্যে মাটির নিচের রেলপথের অনেক বিস্তার হল। মাটির তলায় ৬০ থেকে ১১০ ফুট নিচে এই সব সুড়ঙ্গপথ পাথর ফুঁড়ে তৈরী হয়েছিল, যাতে উপরের বাড়িঘর ধ্বসে যাবার কোনো সম্ভাবনাই না থাকে।

১৯০০ সালে নতুন লাইন খোলা হল; এই সব ট্রেনের একেকটিতে সাতটি করে গাড়ি থাকত, চারিদিকে উজ্জ্বল আলো, প্রচুর জানলা, স্টেশনগুলো সাদা টাইল দিয়ে বাঁধানো, এঞ্জিনগুলো লাল টুকটুকে, দুই পেন্সে সর্বত্র যাওয়া চলে—জনপ্রিয় হবে না কেন? এই নতুন লাইন স্যার বেঞ্জামিন বেকারের কৃতিত্ব। পরে চার্লস্‌ টাইসন ইয়ার্কিস্‌ নামে একজন অ্যামেরিকান ব্যবসার খাতিরে লণ্ডনের টিউবের অনেক উন্নতি করেছিলেন। আজকাল যে কি রকম নিরাপদে ও আরামে মাটির নিচের যাত্রীরা যাওয়া আসা করে সে আমরা ভাবতে পারি না।

চিঠিপত্র

কার্তিক মাসের সন্দেশের মলাটের উপর ভুল করে অগ্রহায়ণ লেখা হয়েছে, সেটা বোধহয় তোমরা অনেকেই লক্ষ্য করেছ। তোমাদের নিজের নিজের বইয়ে সেটা কেটে ঠিক করে নিও।

(১) অঞ্জনপ্রকাশ সেনগুপ্ত, ২৭০২

এ্যাঃ! মলাটটা দেখে রাগ হয়ে গেল বুঝি? আসছে বছর পুজো সংখ্যায় নতুন মলাটের চেষ্টা হবে, কিন্তু তাই বলে 'বাসি' বললে কেন? শিল্প কখনো বাসি হয়? কালি দিয়ে ছবি এঁকো। কারো ঠিকানা জানানো সম্ভব নয়, তবে ঐ লেখককে আমাদের আপিসের ঠিকানায় চিঠি দিলে, তাঁকে পাঠাবার ব্যবস্থা করা যায়।

(২) সমীর কুমার অধিকারী, এন্—৮১৩

কেন, বৈশাখ থেকে 'সন্দেশ' মোটামুটি নিয়মিতভাবে পাচ্ছ না? আমরা তো প্রাণপণ চেষ্টা করছি যাতে তোমরা নিরাশ না হও। 'বিজ্ঞানের আসর' প্রত্যেক মাসেই থাকে, প্রত্যেক মাসেই কিছু না কিছু নতুন তথ্য নিশ্চয় জানতে পার। লেখা মনোনীত হলে জানতে পারবে, নইলে নয়; কাজেই কপি রেখে লেখা পাঠিও।

(৩) ইন্দ্রজিৎ দাসগুপ্ত, ১৮৪১

যে সব প্রশ্নের উত্তর যে কোনো বইতে পাওয়া যায়, সেগুলি পাঠিয়ো না, কেমন?

(৪) নীহারিকা মণ্ডল, ১৮০৩

তোমার আসল কবিতাটি চলল না; মনে হচ্ছে যেন একজন হতাশ বুড়ো ছোট ছেলে সেজে কবিতা লিখেছে! ওটিকে বাতিল করে তোমার পরিচয় পত্রটি ছাপালাম; ঐ পত্রটি খাসা হয়েছে। কিন্তু অশুদ্ধ বানান হইতে সাবধান!

(৫) পত্রবন্ধু হতে চাই

(ক) অঞ্জনপ্রকাশ সেনগুপ্ত, ২৭০২

সখ—ভ্রমণ, বোতাম সংগ্রহ, খেলাধুলা।

(খ) প্রসাদকল্প দাস—১১১২

সখ—খেলাধুলো, ডাকটিকিট সংগ্রহ, ডিটেকটিভ বই।

(গ) ইন্দ্রজিৎ দাসগুপ্ত—১৮৪১

সখ—প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর।

ন্যাশনাল ট্যালেণ্ট সার্চ্ স্কীম

সন্দেশের গ্রাহক-গ্রাহিকা ও তাদের অভিভাবকদের অবগতির জন্য 'য়্যুনিয়ন কার্বাইড ইণ্ডিয়া লিমিটেড' জানিয়েছেন যে তাঁরা 'আচার্য জগদীশ বসু ট্যালেণ্ট সার্চ্ স্কীমে' আরো দুটি বৃত্তি দেবার জন্য ১৪,০০০৲ দান করেছেন।

এই অভিনব পরিকল্পনাটি চার বৎসর হল প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর স্মৃতি রক্ষার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতি বৎসর কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছেলেদের বৈজ্ঞানিক বিষয়ে পরীক্ষা করে দশটিকে নির্বাচন করা হয় এবং তাদের প্রত্যেককে পাঁচ বৎসর ধরে মোট ৭০০০৲ টাকা বৃত্তি দেওয়া হয়। দেশকে অর্থনৈতিক উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে এই ধরনের পরিকল্পনা এই প্রথম গ্রহণ করা হল। ফলে দেশের অগ্রগতির পথে বিজ্ঞান ও ফলিত বিজ্ঞানের গুরুত্ব সম্বন্ধে জনসাধারণ আরো সচেতন হবেন আশা করা যেতে পারে।

য়্যুনিয়ন কার্বাইডের কর্তৃপক্ষ আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন যে আজকে যারা তরুণ-তরুণী, তারাই একদিন নানা বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ করে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করবে। জাতির ভবিষ্যৎ যারা গঠন করবে সেই সব প্রতিভাসম্পন্ন তরুণের সাহায্যের জন্যই তাঁরা আরো দুটি বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

এঁদের এই সদিচ্ছাকে আমরা অভিনন্দন জানাই।

ক্রীড়াজগৎ

শ্রীঅরবিন্দ দাশগুপ্ত

টোকিওতে অনুষ্ঠিত এ বৎসরের অলিম্পিক খেলা প্রবল প্রতিযোগিতার মধ্যে শেষ হয়েছে। ২৪শে অক্টোবর যখন পূত অলিম্পিক মশাল নেবান হচ্ছিল, তখন ৭৫০০ দর্শক অশ্রু সম্বরণ করতে পারে নি। এশিয়াতে এই প্রথম অলিম্পিক খেলা।

এ অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় অনেক নূতন নূতন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। সমস্ত প্রতিযোগিতা মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছে। তাদের তুলনায় রাশিয়া অনেক পেছিয়ে। বৃটেন এ বৎসর মোট ৪টী স্বর্ণপদক পেয়েছে আর জাপান পেয়েছে ১৬টি।

ইথিওপিয়ার এবে বেকুলা পর পর দ্বিতীয়বার মারাথন রেসে জয়ী হয়ে, অষ্ট্রেলিয়ার ডন ফ্রেসার পর পর তৃতীয়বার ১০০ মিটার সাঁতার প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে ও নিউজিলাণ্ডের পিটার স্নেল ৮০০ মিটার ও ১৫০০ মিটারে জয়লাভ করে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ডন স্কলাণ্ডার একাই ৪টী স্বর্ণপদক পেয়ে গৌরব অর্জন করেছেন।

ভারতের পক্ষে সুখের বিষয় যে ভারত হকি প্রতিযোগিতায় তার হারানো গৌরব ফিরে পেয়েছে। রোম অলিম্পিকে ভারতের সে গৌরব পাকিস্থান কেড়ে নিয়েছিল। এ বৎসর ফাইনালে পাকিস্থানকে ১—০ গোলে পরাজিত করে ভারত বিশ্ববিজয়ী দল হয়েছে। প্রতিযোগিতার শুরুতে কিন্তু কেউ আশা

করতে পারে নি ভারত শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে। কিন্তু ভারতের সোভাগ্যবশতঃ প্রত্যেক খেলার সঙ্গে ভারতীয় দলের খেলার ক্রমোন্নতি হতে থাকে এবং শেষের হকি খেলায় ভারতের কাছে কোন দল দাঁড়াতে পারে না।

হকি ছাড়া ভারতীয় অলিম্পিক দল অন্য কোন প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করতে পারে নি। জিততে না পারলেও অন্যান্য যারা ভারতের হয়ে ভাল করেছেন তাদের মধ্যে গুরবাচন সিং এর উল্লেখ করা যেতে পারে। উনি ১১০ মিটার ৫ম স্থান অধিকার করেছিলেন। রিলে রেসে ভারতীয় দল মোটামুটী ভাল করেছিল। মিলখা সিংকে ৪০০ মিটার রেসে যোগ দিতে না দেওয়ায় অনেকেই আশ্চর্য হয়েছেন। যোগ দিলে উনি অন্তত: ৫ম হতে পারতেন। একমাত্র ভারতীয় মেয়ে প্রতিযোগী ছিলেন ডিস্যুজা ভাল দৌড়ালেও ফাইনালে পৌঁছুতে পারেন নি।

যে যে রাষ্ট্র স্বর্ণপদক লাভ করেছেন তাদের নামের তালিকা নীচে দেওয়া হোল।

যুক্তরাষ্ট্র—৩৬	রুমানিয়া—২
রাশিয়া—৩০	হল্যাণ্ড—২
জাপান—১৬	তুর্কী—২
জার্মানী—১০	সুইডেন—২
ইটালী—১০	ডেনমার্ক—২
হাঙ্গেরী—১০	যুগোস্লাভিয়া—২
পোলাণ্ড—৭	বেলজিয়াম—২
অষ্ট্রেলিয়া—৬	ফ্রান্স—১
চেকশ্লোভাকিয়া—৫	কেনাডা—১
বৃটেন—৪	সুইজারল্যাণ্ড—১
বুলগারিয়া—৩	ইথিওপিয়া—১
ফিনল্যাণ্ড—৩	বাহামা—১
নিউজিল্যাণ্ড—৩	ভারত—১

আগামী অলিম্পিক প্রতিযোগিতা ৪ বৎসর পর মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হবে।

বালক নেহরু

৪র্থ বর্ষ নবম সংখ্যা

জানুয়ারী ১৯৬৫ | পৌষ ১৩৭১

পৌষ পার্বণে

রঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

চাল কুটছে মাসি পিসি ঢেঁকির শুনি পাড়
পৌষ পার্বণ এলো কাছে বাতাসে বাস তার ;
টিপ্ টিপ টিপ্ ঢেঁকি পড়ে ঢেঁকির ঘরে ঘরে
পিঠে পিঠে গন্ধে আকুল, জিবেতে জল ঝরে।
ভাত খাবোনা খাবো পিঠে: নলেন গুড়ের পিঠে
'ছুঁসূনে এটা, ছুঁসূনে ওটা,' বোলটাও কি মিঠে ;

বড় দিদিটির সকাল থেকে কাজের এতো তাড়া
উপোর নীচে করচে খালি, বলচে, সরে দাঁড়া।
দাঁড়িয়েই তো আছি বাবা, কখন খাবো পিঠে ?
চুষি পিঠে, পায়েস পিঠে, আস্কে পিঠের মিঠে :
বলচে দিদি : বকিসনে ভাই, এখান থেকে সর
পাটিসাপ্টার জোগাড় করি, ভাজবো এরি পর।
মা কাকিরা ও ঘর থেকে পাঠায় ক্ষীরের পুর
চালের গুঁড়ো ধামা ধামা, আরো খেজুর গুড়;
সরুচাকলি, তেলের পিঠে, রাঙা আলুর পিঠে
পোষ পরবের আকাশ বাতাস সবটারে ভাই মিঠে।
টিপ্ টিপ্ টিপ ঢেঁকির পাড় ঢেঁকির ঘরে ঘরে,—
পোষ পরবের গন্ধেরে ভাই আজকে ভুবন ভরে।
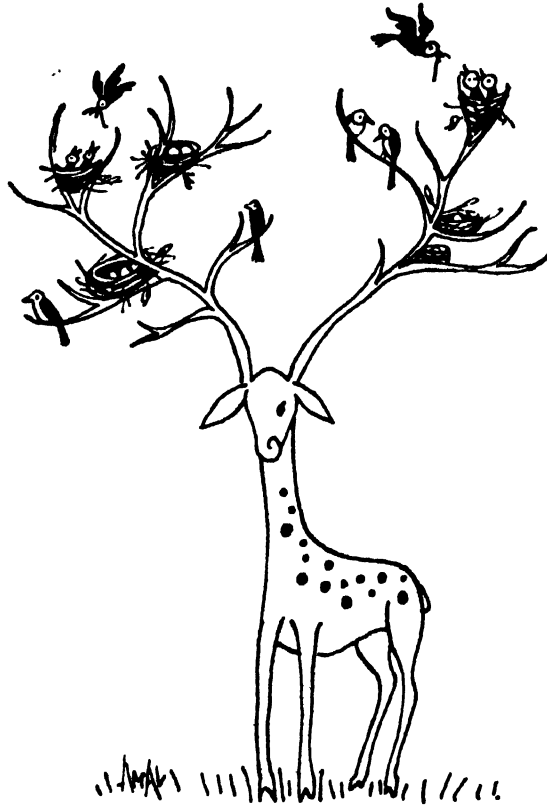
রাবণ

উপেন্দ্রকিশোর রায়

রাবণের কথা তোমরা সকলেই জান। রাবণের পিতার নাম বিশ্রবা, মায়ের নাম কৈকসী। বিশ্রবা পরম ধার্মিক মুনি ছিলেন রাবণ আর তাহার ভাই বোনেরা জন্মিবার পূর্বেই তিনি বলিয়াছিলেন যে, ইহাদের সকলের ছোটটি খুব ধার্মিক হইবে, আর সকলেই ভয়ঙ্কর দুষ্ট রাক্ষস হইবে।

মুনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইল। রাবণ, কুম্ভকর্ণ আর তাহাদের বোন শূর্পনখা, ইহাদের এক একটা এমনি বিকট আর দুষ্ট রাক্ষস হইল, যে কি বলিব। ইহাদের ছোট ভাই বিভীষণ ও রাক্ষস ছিল বটে কিন্তু সে যার পর নাই ভাল লোক ছিল।

রাবণের দশটা মাথা আর কুড়িটা হাত ছিল। দাঁতগুলো ছিল থামের মত বড় বড়। চুলগুলি আগুনের শিখার মত লাল, আর শরীরটা কালো পর্বতের মত বিশাল। তাহার জন্মের সময় পৃথিবী কাঁপিয়াছিল, সূর্য ময়লা হইয়া গিয়াছিল আর সমুদ্রের জল তোলপাড় হইয়া উঠিয়াছিল। দশটা মাথা দেখিয়া তাহার পিতা তাহার নাম রাখিয়াছিলেন 'দশগ্রীব।' উহাই উহার আসল নাম, রাবণ নাম পরে হইয়াছিল।

ছেলেবেলায় রাবণ ভাইদিগকে লইয়া দশ হাজার বৎসর ভয়ঙ্কর তপস্যা করিয়াছিল। এই দশ হাজার বৎসর সে আহার করে নাই। এক এক হাজার বৎসর যাইত, আর নিজের এক একটি মাথা কাটিয়া সে আগুনে আহুতি দিত। নয় হাজার বৎসরে নয়টি মাথা সে এইরূপ করিয়া আগুনে দিল। তারপর দশ হাজার বৎসর পূর্ণ হইলে, যেই সে তাহার বাকি একটি মাথাও কাটিতে যাইবে, অমনি ব্রহ্মা আসিয়া বলিলেন, 'দশগ্রাব, আমি খুসী হইয়াছি, এখন তুমি বর লও।

দশগ্রীব বলিল, 'আমাকে অমর করিয়া দিন। ব্রহ্মা বলিলেন 'সেটি হইবে না, অন্য বর লও।' দশগ্রীব বলিল, তবে এই বর দিন যে, দেব, দানব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ, নাগ, পক্ষী ইহাদের কেহই আমাকে মারিতে পারিবে না। ব্রহ্মা বলিলেন 'আচ্ছা তাহাই হইবে। তাহা ছাড়া তোমার যে মাথাগুলি কাটিয়া দিয়াছ, তাহাও ফিরিয়া পাইবে, ইহার ওপর আবার যখন যে রূপ তোমার ইচ্ছা হয়, তেমনি চেহারা করিতে পারিবে।'

কুম্ভকর্ণ আর বিভীষণ ও এই দশ হাজার বৎসর খুব তপস্যা করিয়াছিল, সুতরাং ব্রহ্মা তাহাদিগকেও বর দিতে গেলেন। বিভীষণ বলিল, আমাকে দয়া করে এই বর দিন, যেন আমার ধর্মে মতি থাকে। এ কথায় ব্রহ্মা অতিশয় তুষ্ট হইয়া তাহাকে সে বর ত দিলেনই, তাহা ছাড়া তাহাকে অমর করিয়া দিলেন।

কুম্ভকর্ণকে বর দিবার সময় দেবতারা ব্রহ্মাকে বলিলেন, 'প্রভু এমন কাজ করিবেন না, এ বেটা বর পাইলে আমাদের সকলকে খাইয়া ফেলিবে। এর মধ্যেই কতজনকে ধরিয়া খাইয়াছে।'

তাইত, এখন তবে কি করা যায়? তপস্যা করিয়াছে কাজেই বর দিতেই হইবে, আবার বর দিলেই বিপদের কথা, তখন ব্রহ্মা বুদ্ধি করিয়া সরস্বতীকে কুম্ভকর্ণের মুখের ভিতরে ঢুকাইয়া দিলেন। সরস্বতী ঢুকিতেই তাহার মাথায় কি যে গোল লাগিয়া গেল, আর বেচারা ঠিক করিয়া কথা কহিতে পারিল না। ব্রহ্মা বলিলেন, 'কুম্ভকর্ণ কি চাই' কুম্ভকর্ণ বলিল, আমি খালি ঘুমাইতে চাই। ছয়মাস ঘুমাইয়া একদিন উঠিয়া খাইব। ব্রহ্মা বলিলেন, বেশ কথা, তাই হোক। এই বলিয়া ব্রহ্মা দেবতাদিগকে লইয়া চলিয়া গেলেন, আর কুম্ভকর্ণ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ভাবিল, তাইত। এটা কি করিলাম? দেবতা বেটারা আমাকে ফাঁকি দিয়া গেল নাকি?'

যা হোক, আমরা দশগ্রীবের কথা বলিতেছি। সে ত বর পাইয়া নিতান্তই ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল; এখন আর কেহ তাহার কোন কথায় 'না' বলিতে ভরসা পায় না। দশগ্রীবের এক দাদা ছিলেন, তাঁহার নাম কুবের। তিনিও বিশ্রবা মুনির পুত্র, তাঁহার মাতা ভরদ্বাজ মুনির কন্যা দেববর্ণিনী। কুবের লঙ্কায় বাস করতেন। দশগ্রীব তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইল, 'দাদা লঙ্কাপুরী খানি আমাকে ছাড়িয়া দাও।'

কাজেই তখন কুবের আর কি করেন? ভালয় ভালয় না দিলে জোর করিয়া কাড়িয়া নিবে। তাহার চেয়ে তিনি কৈলাস পর্বতে বাস করিতে লাগিলেন। দশগ্রীবও তখন পরম আনন্দে রাক্ষসের দল সমেত লঙ্কায় আসিয়া রাজা হইয়া বসিল।

ইহার কিছুদিন পরেই দশগ্রীব বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক দানবের সহিত শূর্পণখার বিবাহ দিল। তাহাদের তিন ভাইয়ের বিবাহ হইতেও আর বেশী বিলম্ব হইল না। কিন্তু হায়, শুভকার্য শেষ হইতে না হইতেই ব্রহ্মার আজ্ঞায় ঘোর নিদ্রা আসিয়া কুম্ভকর্ণকে ধরিয়া বসিল। তাহার চোখ বুজিয়া আসিল, মাথা ঢুলিয়া পড়িল, সে বিকট মুখে ভীষণ হাই তুলিয়া বলিল দাদা, বড়ই ঘুম পাইয়াছে আমার শয়নের জন্য ঘর করিয়া দাও। তখনই রাবণের হুকুমে চমৎকার ঘর প্রস্তুত হইল। তাহার ভিতরে গিয়া সেই যে কুম্ভকর্ণ শুইল, হাজার হাজার বৎসরেও আর উঠিল না।

এদিকে দশগ্রীবের জ্বালায় ত্রিভুবন অস্থির, সে দেবতা গন্ধর্ব, মুনি ঋষি কাহাকেও মানে না, এক ধার হইতে সকলকে মারিয়া তাহাদের বাড়ি, ঘর, বাগান সব চুরমার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কুবের ইহাতে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাহাকে বারণ করিবার জন্য দূত পাঠাইলেন। সে দূতের কথা দশগ্রীব ত শুনিলই না; লাভের মধ্যে বেচারাকে কাটিয়া রাক্ষসদিগকে খাইতে দিল। তার পর রথে চড়িয়া এই বলিয়া সে বাহির হইল যে, 'আমি ত্রিভুবন জয় করিব।"

ক্রমশঃ

প্রসুন মিত্র

হঠাৎ সেদিন দুপুর বেলায় আমড়া তলার মোড়ে
আদ্যিনাথের মেসোমশায় সাম্নে গেলাম প'ড়ে।
পাড়ায় থাকেন একটা মানুষ আর বাকা সব ফাল্তু
সবাই তাঁরে মান্যি করে, হাব্ড়া থেকে হাল্তু।
আদ্যিনাথের সাধ্যি কি তার মেসোর সাম্নে দাঁড়ায়,
ঢাকের বাদ্যি বাজিয়ে মেসো হাকিম-বদ্যি তাড়ায়।
চেৎলা থেকে খাজনা নিতে রোজ তিনি যান মাৎলা
ফাৎনা দিয়ে নিত্যি গাঁথেন মাৎলা নদীর কাৎলা।
হুকুম করেন আরদালীকে, কাৎলা খানা সাঁৎলা—
চক্ষে মেসোর আগুন ঝরে ঝোল যদি হয় পাৎলা,
রাষ্ট্র ভাষায় দাপিয়ে বলেন, 'মছলি কিধর বাৎলা।'
মেসোর দাপে, চেৎলা কাঁপে, আর্দালী হয় তোৎলা ॥
আমায় ডেকে শুধোন মেসো—বল্তো দেখি বাব্লু
অ্যান্টিগোনাস্ বানান করতে কবার লাগে ডাব্লু ?
বর্ণমালার বর্ণেরা সব সব্জে কিম্বা হল্দে
নোবেল প্রাইজ পাইয়ে দেব পারিস্ যদি বল্তে।
মোম্বাসাতে গ্রীষ্মে যখন, মোমের বাসা গলে
পাংশু মুখে, পাম্শু পায়ে কে কোন্ পথে চলে ?

পঞ্চাননকে ডেকে বলেন, তোর নাকি খুব বুদ্ধি
বল্‌তো কটন গোবর খেলে চিত্তে আসে শুদ্ধি!
অকালপক্ক ছোক্‌রা তোরা ব্রেনের করিস্‌ বড়াই
বলতো ক'মন্‌ বরফ ঢেলে চল্‌ছে ঠাণ্ডা লড়াই।
বার্লি খেয়ে কজন মাষ্টার অমর হ'লো বার্লিনে
থ' হয়ে যে রইলি ভোঁদড়, জবাব দিতে পারলি নে?
ছোটে মিয়ার মেসো, মেসোপটেমিয়ার মিস্তিরি
মামার শালার কামার শালায় ক' খানা তার ইস্তিরি!
এমনি যত ভিরমি লাগা নেহাৎ বিতিকিচ্ছি—
প্রশ্ন শুনে ঘাবড়ে পাঁচু বল্লে: জবাব দিচ্ছি।
এই না বলে বাগিয়ে কাছা, পালিয়ে গেল দৌড়ে,
'অন্ধ্রি' থেকে পত্র দেয় সে—ফিরবে না আর গৌড়ে॥
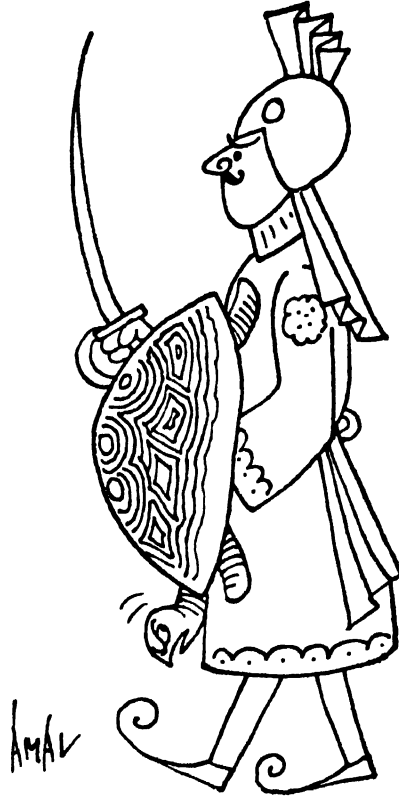
শীতের ফুল

অমিত রায়

বাগানের ফুলগুলো এই শীতে ভাই,
খালি গায়ে দিনে রাতে
একলা বা একসাথে
কী ক'রে যে থাকে ফুটে ভাবি মনে তাই।

মনে হয় দিন রাত জেগে চেয়ে আছে,
সদা খুশি হাসি মুখ,
না অসুখ, শুধু সুখ—
সুবাস-রঙিন রূপ নাচে গাছে গাছে।

মাটি-রস কতটুকু কী যে তারা খায়,
তাপ আলো জল বায়ু
যোগায় তাদের আয়ু,
চায় না তাহার বেশি যাহা নাহি পায়।

কথা নেই মুখে তবু বলে কত কী যে!
কিছু সার, কিছু জল,
—এই পেয়ে ফুলদল
ঋতু সাথে যথাকালে আসে নিজে নিজে।

(রেড্ ইণ্ডিয়ান্ রূপকথা)

ছোট্ট ধুসর রঙের সজারু জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ডালপালা সরিয়ে পথ তৈরী করে করে গুটিগুটি চলছিল, পিছন থেকে ভাল্লুক এসে তাকে এক তাড়া লাগাল—'এই ভুশ্‌কো, পথ ছাড়্—তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি!'

সজারু বলল, 'আমি তো তাড়াতাড়ি করতে পারি না।'

'তা'বলে আমার পথ আট্‌কিয়ে বসে থাকবি নাকি? এক্ষুনি সর্ বল্‌ছি, নইলে তোকে মাড়িয়ে যাব।'

'এটা তো আমার পথ—আমি নিজে তৈরী করেছি।'

'আমার ইচ্ছা, আমি, এই পথেই চলব।'

'বেশ তো, আমাকে পার হবার জন্য একটু সময় দাও!'

'সে হবে না!' আমার সময় মতই আমি চল্‌ব'—এই বলে, ভাল্লুক তার ধারালো বাঁকানো নখগুলো সজারুর নরম পিঠের উপর বিঁধিয়ে দিয়ে, তাকে মাড়িয়ে পার হয়ে গেল। উ-হু-হুঃ করে সজারু চেঁচিয়ে উঠল, ভাল্লুক খ্যাক্ খ্যাক্ করে হাসতে হাসতে চলে গেল।

তখন তো সজারুদের গায়ে কাঁটা ছিল না, তাদের নরম শরীর মোলায়েম লোমে ঢাকা থাকত—সজারু নিজের গা চাট্‌তে চাট্‌তে দুঃখ করে বলল, 'সব্বাই আমার উপর অত্যাচার করে!' আবার কে একটা চার পেয়ে পিছন থেকে আসছে দেখে, বেচারা কেঁদেই ফেলল।

এবারে এল, বন-বেড়াল ফ্যাঁস্ করে বলল,—

'এই ভুশ্‌কো, পথ ছাড়্ শিগগির!'

'আমি তো শিগগির করতে পারিনা!'

'আমার পথ আটকিয়ে চলেছিস কেন?'

'এটা তো আমার পথ—আমিই তৈরী করলাম।' বনবেড়াল নখ বার করে, দাঁত খিঁচিয়ে, বলল, 'পথ আবার আমার-তোমার কী? আমিও এই পথেই যাব।'

'বেশ তো, আমি আগে পার হয়ে নিই?'

'না, আমিই আগে পার হব!' বলে, বনবেড়াল সজারুর টুঁটি ধরে তুলে, ধারালো নখওয়ালা থাবা দিয়ে এক থাপ্পড় মেরে, তাকে একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল। সজারু কেঁদে বলল, 'ওঃ-ওঃ-সবাই আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে!'

এমনি করে একে একে কত জানোয়ার সেই পথে এল, সকলেই সজারুকে ধমকিয়ে, মেরে, আঁচড়িয়ে-কামড়িয়ে, ঠেলে ফেলে দিয়ে গেল। বেচারা নিরীহ প্রাণী, কারো সঙ্গে সে ঝগড়া করতে চায় না; তবে তাড়াহুড়ো করতেও সে চায় না—ধীরেসুস্থে কাজ করতেই ভালবাসে। ইচ্ছা হ'লে সে গাছে চড়তে পারে, ইচ্ছা হ'লে খুব জোরে ছুটতেও পারে, কিন্তু সেই ইচ্ছাটাই কিছুতে হয় না—সে ভাবে, 'অত হুড়মুড় দুড়দাড় করে লাভটা কী হবে?'

বসে বসে সজারু তার গায়ের আঁচড়গুলো জিভ দিয়ে চাটছে আর মনে মনে দুঃখ করছে, এমন সময় শেয়াল ভায়া এসে জিজ্ঞাসা করল 'কী ভাই ভুশ্‌কো, কী খবর?' সজারু নালিশ করল 'এই দেখনা, সবাই আমাকে কি রকম আঁচড়িয়ে-কামড়িয়ে দেয়!'

'আচ্ছা সে কথা এখন থাক্, তুমি আমার একটা উপকার করবে? ঐ পাইন্‌গাছটায় চড়ে আমাকে গোটাকয়েক ফল পেড়ে দিবে?'

তর তর্ ক'রে সেই উঁচু গাছে চড়ে, সজারু পাইনের ফল পেড়ে দিল। শেয়াল বলল 'অনেক ধন্যবাদ! তুমি ভাই বেশ লোক—আমার বন্ধু হবে তুমি?'

'অমনি তুমি আমাকে ধ'রে খেয়ে নিবে তো?'

'না-না, মোটেই না! বুঝলে কি না, বনবিড়ালকে আমি পছন্দ করি না, ভাল্লুককেও না, কুকুরকে দেখলেই তো আমার মাথা গরম হয়ে যায়—মোট কথা, কারো সঙ্গেই আমার সহজে ভাব হয় না—কিন্তু তোমাকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে।'

'আচ্ছা, তাহলে এবার আমাকে কী করতে হবে?'

'ঐ যে ঐখানে অনেক কাদা দেখছ? ওর মধ্যে গিয়ে একটু গড়াগড়ি দাও।'

'আর, আমার গায়ের মোলায়েম পশম একেবারে কাদামাখা হয়ে যাক্?'

'ঠিক্ তাই! যাও, আমি যেমন বলছি তেমনি কর তো!'

'বেশ, যতক্ষণ তুমি আমাকে কামড়িয়ে না দিচ্ছ, কিম্বা নখ দিয়ে আমার চামড়া ফুঁড়ে না দিচ্ছ,

ততক্ষণ তোমার কথা শুনব।'

'আর, তোমার ঐ সাধের চিকন্ চামড়ার কথাটা ভুলে যাও!'

সজারু কাদায় নেমে লুটোপুটি খাচ্ছে, শেয়াল দাঁড়িয়ে দেখছে, খানিক পরে হো-হো করে হেসে শেয়াল বলল, 'আরে তোমাকে যে ঠিক একটা কাদার ডেলার মত দেখাচ্ছে—হো-হো-হো—এই তো আমি চাই! এবার উঠে এস দেখি!'

একটা কাঁটাগাছ থেকে একগোছা লম্বা লম্বা কাঁটা ভেঙ্গে নিয়ে, শেয়াল সেগুলোকে বেশ করে ঘষে ছাল তুলে সাদা করে নিল—সবটুকু ছাল উঠল না, একেক জায়গায় কালো দাগ লেগে রইল—সেই সাদা-কালো কাঁটাগুলোকে একটি একটি করে সে সজারুর গায়ে কাদার মধ্যে বসিয়ে দিল; তারপর চারদিকে ঘুরে বেশ লক্ষ্য করে দেখে, নিজের কাজে খুব খুসী হয়ে গেল—সজারুর চেহারাটা এখন বেশ জাঁদ্রেল্ দেখাচ্ছে।

তখন শেয়াল বলল, 'মনে রেখো, আমি তোমার বন্ধু—আমার কথা শুনবে, আমি যা বলি তাই করবে—আর, খবরদার! আমার বিছানায় যেন উঠো না, আমাকে কোনো দিন তাড়া করো না! এখন ভাল্লুক, বনবিড়াল, এদের সকলের শিকার করে ফিরবার সময় হল, এবার আমি গিয়ে ঐ ঘাসের ঢিবিটার উপর বসে মজা দেখবো!'

সজারু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ওরা যে আবার আসবে—আমি তখন কী করব?'

'কী আর করবে? তোমার নিজের পথে চলবে এবং নিজের সময় মতই চলবে।'

ততক্ষণে সজারুর গায়ের কাদা শুকিয়ে, কাঁটাগুলো বেশ এঁটে বসে গিয়েছে—আর কোনই অস্বস্তি বোধ হচ্ছে না। সে চুপ করে নিজের পথে গিয়ে বসল!

খানিক পরেই ভাল্লুক এল—শিকার ভাল পায় নি, তাই তার মেজাজ আরো খারাপ—ধমক দিয়ে বল্‌ল, 'এইয়ো! পথ ছাড়্ শিগগীর!'

'আমি তো শিগগীর করতে পারি না!'

'তাহ'লে তোকে মাড়িয়ে দিয়ে যাব—আগেই বলেছি না, যে পথ আট্‌কালে চল্‌বে না?'

'এটা তো আমার পথ আমি তৈরী করেছি' বলে, সজারু বেশ গুটিসুটি হয়ে বসল।

ঢিবির উপর থেকে শেয়াল ভাল্লুককে উস্কানি দিল—'দাও, ব্যাটাকে ছুঁড়ে ফেলে দাও! ভারি তো পুঁচকে, তুল্‌তুলে জানোয়ার, তোমার উপরে ও হুকুম চালাবে নাকি?'

ভাল্লুক বলল 'তোমাকে আমি পছন্দ করি না, তবে কথাটা তুমি বলেছ ভালই।' এই না বলে সে সজারুকে খপ করে তুলে ধরল—আর তক্ষুনি ধপ করে ফেলে দিল—'গর্‌র—উফ্! গর্‌র্—উ-ফ্! হাতে কি ফুটল! হাতটা যে ছ্যাঁদা হয়ে গেল!'

সজারু বল্ল, 'আমাকে ছেড়ে দাও!'

'ছেড়েই তো দিয়েছি বাপু!' বলে হাত চাটতে চাটতে ভাল্লুক সরে পড়ল। শেয়াল হেসে বলল 'ধরে খেয়ে ফেল ব্যাটাকে—টপ করে গিলে খাও!'

'তোকেই গিলে খাব !'

'এসো না, ধর দেখি আমাকে !' বলে শেয়াল হেসে গড়িয়ে পড়ল।

এবার এল বন-বেড়াল—চেঁচিয়ে বলল 'পথ ছাড় ভুশকো! সরে যা এখান থেকে।'

সজারু বলল 'না, আমি এখানেই থাকব।'

'ওঃ তাই নাকি ? আচ্ছা, দেখা যাক কেমন থাকবি।'

শেয়াল চেঁচিয়ে বলে উঠল 'কামড়িয়ে দাওনা ব্যাটাকে !'

'তোমাকে আমি পছন্দ করিনা বটে, তবে তোমার কথাটা মন্দ লাগছে না' বলে, সজারুর পিঠের উপর লাফিয়ে পড়ে বনবিড়াল কষে তার ঘাড়ে এক কামড় বসাল—

'ওঁয়াও! ওঁয়াও! ফঁ্যাশ্! ফঁ্যাশ? মুখে কী ফুটল? জিভটা ফুটো হয়ে গেল! সারা গায়ে কাঁটা ফুটে গেল!' ফঁ্যাশ্ ফঁ্যাশ্ করে বনবেড়াল কাঁটা ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু সে কাঁটা কি সহজে ছাড়ে?'

হাসতে হাসতে শেয়ালের পাঁজরে ব্যথা হয়ে গেল; সে বলল 'ধরে খেয়ে ফেল ঐ ক্ষুদে রাক্ষসটাকে !'

'তোকেই ধরে খাব—তুই আমাকে ঠকিয়েছিস !

'এসো না, ধরে খাও—খুব মিষ্টি লাগবে !'

এরপর এল শিকারী কুকুর—খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করে বলল, 'পথ ছাড়। পথ ছাড় বলছি !'

সজারু বলল, 'না আমি এখানেই থাকব।'

'বটে ! আবার ঝাঁকানি খেতে সাধ হয়েছে না ?'

শেয়াল চেঁচিয়ে বলল, 'আচ্ছা করে ঝাঁকিয়ে দাও—ব্যাটার ঘাড় ধরে, হাড়গোড় সব নাড়িয়ে দাও !'

'তোমাকে আমি পছন্দ করি না, কিন্তু তোমার কথাটা আমার পছন্দ হয়েছে'। এই কথা বলে, এক লাফে সজারুর পিঠের উপর পড়ে কুকুর তার ঘাড় কামড়িয়ে ধরল—

'উম্‌ম্‌ম্—ঔ—ঔ—ওয়াও। সারা গায়ে তীরের মত কি বিঁধল?" কাঁটার জ্বালায় অস্থির হয়ে কুকুর কেঁউ কেঁউ করে কাঁদছে, আর শেয়াল বলছে 'ঐতো একরত্তি থল্‌থলে নরম একটা জানোয়ার, ওটাকে খেয়ে ফেললেই পার ?'

'খেয়ে ফেলবো, তোকেই।'

'বেশতো, ধরনা এসে !'

কিন্তু, কুকুর তখন কাঁটা-ছাড়াতেই ব্যস্ত !

আরো মজা দেখবার ইচ্ছায় শেয়াল অন্য জন্তুদের ডেকে আনতে গেল; কিন্তু ততক্ষণে সবাই জেনে গিয়েছে যে সজারুর গায়ে কাঁটা গজিয়েছে, তার সঙ্গে আর চালাকি চলবে না—এখন থেকে তাকে সমীহ করতে হবে।

তখন শেয়াল সজারুকে বলল, 'এইবার তোমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে, মানুষের মত হতে, শিখিয়ে দিলাম—তুমি নিজের ইচ্ছামত চলবে, আর আমার শত্রুদের তোমার নিজেরও শত্রু বলে জানবে। পাইন্‌গাছের ফল খেলে, আমার দৌড়াবার শক্তি ম্যাজিকের মত বেড়ে যায়; তুমি আমাকে পাইনের ফল খেতে দিয়েছ, তার বদলে আমি এই ম্যাজিক কাঁটা বসিয়ে তোমাকে আত্মরক্ষার শক্তি দিলাম—এখন থেকে তুমি নিজের মতে নিজের পথে চলতে পারবে।'

সজারু বলল, 'অনেক ধন্যবাদ! নিজের মতে, নিজের পথে, নিজের সময়মত চলতেই তো আমি চাই!'

সেই থেকে সজারু তার নিজের পথে নিজের মতে ধীরে সুস্থে চলে, কেউ তাকে ঘাঁটাতে সাহস পায় না—ঘাঁটাতে গেলেই হয় সমূহ বিপদ! একেবারে কুটিল, কণ্টকময়, কাহিল অবস্থা!!

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(পূর্ব প্রকাশিত অংশের চুম্বক)

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে, আমেরিকার গৃহযুদ্ধে অবরুদ্ধ রিচমণ্ড সহর হইতে বেলুনে চড়িয়া পলায়ন করিতে গিয়া পাঁচটি অসমসাহসী ব্যক্তি প্রচণ্ড ঝটিকার প্রকোপে একবস্ত্রে ও শূন্যহস্তে একটি নির্জন দ্বীপে পরিত্যক্ত হন, তাঁহারা হইলেন এঞ্জিনিয়ার সাইরাস্ হার্ডিং, তাঁহার ভৃত্য নেব্, সাংবাদিক গিডিয়ন স্পিলেট, নাবিক পেন্‌ক্রফ্‌ট এবং বালক হারবার্ট। হার্ডিংএর কুকুর টপও সঙ্গে ছিল।

আমেরিকার প্রসিদ্ধ নাম সকল লইয়া তাঁহারা দ্বীপের ভিন্নভিন্ন নামকরণ করিলেন। একেবারে প্রথম অবস্থা হইতে তাঁহাদিগকে কাজ সুরু করিতে হইল। মাটির বাসন তৈয়ারী করিয়া পোড়াইয়া লইলেন। হাপর প্রস্তুত করিয়া লোহা গলাইয়া কুড়ুল, কোদাল, হাতুড়ি প্রভৃতি তৈয়ারী হইল। হার্ডিংএর আশ্চর্য বুদ্ধি ও সকলের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ক্রমে 'স্টিল' তৈয়ারী করাও সম্ভব হইল।

মে মাসের প্রথম সপ্তাহ, কয়দিন হইতেই আকাশ ঘোলাটে হইয়া আছে। ক্রমে শীত পড়িবে, এখন তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়ার দরকার। শীত আরম্ভ হইতে দেরি থাকিলেও, বর্ষা প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে। সমুদ্রের মাঝখানে দ্বীপটি অবস্থিত, ঝড় বাদলের সময় আবরণ কিছুই নাই। এখন হইতে ঝড়বৃষ্টি প্রায়ই হইবে এবং যাহা হইবে তাহাই দারুণ সাংঘাতিক। চিমনীর চাইতে নিরাপদ এবং আরামের জায়গা একটা ঠিক করা চাই-ই চাই।

ইতিপূর্বে ঝড়ে চিম্‌নীর কিরূপ দুর্দশা হইয়াছিল, তাহা দ্বীপবাসিগণের খুবই মনে আছে। সুতরাং আর বিলম্ব করিলে চলিবে না।

সাইরাস্ হার্ডিং বলিলেন—ভাল থাকবার জায়গার সন্ধান ত করবই, তাছাড়া এখন থেকে কোন কোন বিষয়ে সাবধান হতে হবে।'

গিডিয়ন স্পিলেট

॥ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ॥

স্পিলেট বলিলেন—সাবধান হতে হবে কেন? দ্বীপে ত অন্য লোকের বসতি নাই?

হার্ডিং বলিলেন—লোকের বসতি নাইবা থাকুল, বনে হিংস্র জন্তু থাকতে পারে ত? দ্বীপের ভিতরে গিয়ে ত খোঁজা হয়নি? তাছাড়া, আমাদের দ্বীপটা প্রশান্ত মহাসাগরের যেইরূপ জায়গায় আছে. এখানে মালয় দস্যুরা প্রায়ই এসে থাকে।

হারবার্ট আশ্চর্য হইয়া বলিল—ডাঙ্গা থেকে এত দূরে লিঙ্কলন্ দ্বীপ, এখানে দস্যু আসে?

হার্ডিং বলিলেন—হাঁ, হারবার্ট, আসে বৈকি। এসব দস্যু অসমসাহসী এদের পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়—আমাদিগকে সাবধান হতেই হবে।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—আমরা দ্বিপদী চতুষ্পদী সব রকম হিংস্রজন্তু সম্বন্ধেই সাবধান হব। কিন্তু ক্যাপটেন্ হার্ডিং, আমার মনে হয় দ্বীপটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখে, তারপর একটা জায়গা ঠিক করাই ভাল।

গিডিয়ন স্পিলেট বলিলেন—ঠিক কথা কে জানে, হয়ত লেকের অন্যধারে আমাদের পছন্দমত গহ্বর পেতে পারি।

হার্ডিং বলিলেন, সবই ঠিক, কিন্তু থাকবার জায়গা করা চাই জলের কাছে। ফ্রাঙ্কলিন, পাহাড়ের উপর থেকে পশ্চিমদিকে, কোন নদী কিংবা জলাশয় কিছু দেখতে পাওয়া যায় না। এখানে আমরা মার্সি নদী এবং লেক্ গ্রাণ্টের মধ্যখানে আছি জলের অভাব হবে না।

পেন্‌ক্রফ্‌ট্‌ বলিল—তাহলে চলুন, আমরা লেকের ধারেই একটা বাড়ি তৈরি করি।

হার্ডিং বলিলেন—তা ঠিকই বলেছ। কিন্তু বাড়ি তৈরি করে নিতে অনেক পরিশ্রম করতে হবে, তার চেয়ে স্বাভাবিক গহ্বর পাওয়া গেলেই সব চেয়ে ভাল হয়। বাইরের শত্রু এবং দ্বীপবাসী শত্রু—উভয়ের হাত থেকেই আত্মরক্ষা করা সহজ হবে।

স্পিলেট্‌ বলিলেন—তাত বুঝলাম্‌ কিন্তু আমরা ত পাহাড়ময় খুঁজতে বাকি রাখি নাই—গহ্বর ত দূরের কথা, একটা ভাল ফাট্‌ল ও ত দেখ্‌তে পাওয়া গেল না।

পেন্‌ক্রফট্‌ বলিল—এই পাহাড়ের উপরে, একটু উঁচুতে, যেখানে কোন বিপদ হবার সম্ভাবনা নাই—এমন একটী জায়গায় যদি পাথর খুঁড়ে একটী বাড়ী করা যেত, তাহলে চমৎকার হতো। সমুদ্রের দিকে চার পাঁচ খানা ঘর—।

হারবার্ট হাসিতে হাসিতে বলিল—আর তাতে জানলা শার্সি দেওয়া থাকবে, তা দিয়ে আলো আসবে।

নেব্‌ বলিল—একটা সিঁড়িও থাকবে, সেই ঘরে চড়বার জন্য।

পেন্‌ক্রফট্‌ বলিল—বটে তোমরা তামাসা করছ? বেশ্‌ আমার প্রস্তাবটা এমন অসম্ভবই বা-কি? এখন আমাদের কোদাল আছে সাবল গাঁইতি আছে, আর হার্ডিং ইচ্ছা করলে বারুদ তৈরি করতে পারেন না? সেই বারুদ দিয়ে পাথর উড়িয়ে দিব।

হার্ডিং সকলের কথাই শুনিলেন। এই দারুণ শক্ত গ্রেনাইট্‌ পাথর বারুদ দিয়ে উড়ান সহজ কথা নয়। তিনি কোন কথারই উত্তর দিলেন না, শুধু প্রস্তাব করিলেন—নদীর মুখ থেকে আরম্ভ করে পাহাড়টিকে খুব ভাল করে দেখ্‌তে হবে।

তখন সকলে খুব মনোযোগ দিয়া, প্রায় দুই মাইল পর্যন্ত সন্ধান করিল, কিন্তু পর্বতের গায়ে কোনখানে গহ্বর দেখিতে পাওয়া গেল না। তীরের এই দিক্‌টায় পেন্‌ক্রফট্‌-আবিষ্কৃত এই চিম্‌নীটি ভিন্ন, বাসের উপযুক্ত দ্বিতীয় স্থান আর নাই। কিন্তু চিম্‌নীটিও এখন পরিত্যাগ করিতে হইবে। পর্বতের উত্তর কোণে গিয়া অনুসন্ধান কার্য শেষ হইল। এখানে পর্বত-গাত্র বিস্তৃতভাবে ঢালু হইয়া সমুদ্রতীরে গিয়া মিশিয়াছে। হার্ডিং ভাবিলেন—লেকের অতিরিক্ত জল পাহাড়ের এই দিক্‌ দিয়াই বহিয়া যায়। রেড্‌ক্রীকের জল আসিয়া এই লেকে পড়ে, সুতরাং অতিরিক্ত জলটাকে কোন না কোন পথে বাহির হইয়া যাইতেই হইবে। নদীর মুখ হইতে প্রস্‌পেক্ট হাইটের পশ্চিম পর্যন্ত, কোন খানেই এই জল নির্গমনের পথ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। যাত্রীদল পাহাড়ের ঢালু গা (slope) বাহিয়া নামিয়া, প্রস্‌পেক্ট হাইট ধরিয়া চিম্‌নীতে ফিরিয়া চলিল। পথে লেকের উত্তর-পূর্ব তীর সন্ধান করিয়া যাইতে হইবে।

গাছের ভিতর দিয়া পরিস্কার টলটলে জল, সূর্যের আলোক পড়িয়া ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে—দৃশ্যটি ভারি চমৎকার। যাত্রীদল মনোযোগের সহিত দেখিয়া চলিয়াছে—এমন সময় হঠাৎ টপ্‌ ভীষণ ডাকিয়া উঠিল। ব্যাপার কি? নেব দেখিল, টপের সম্মুখে ১৪।১৫ ফুট লম্বা একটা সাপ। নেবের হাতে ছিল মোটা একটা লাঠি তাহার এক আঘাতেই সাপের বাছা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

রেড্‌ক্রীকের মুখটী যেখানে লেকের মধ্যে পড়িয়াছে, যাত্রীদল ক্রমে সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত। সাইরাস্‌ হার্ডিং দেখিলেন, নদীর জল প্রচুর পরিমাণে লেকের মধ্যে পড়িতেছে। ভাবিলেন—এই জল বাহির হইবার পথ একটা আছেই এবং ইহাদ্বারা নিশ্চয়ই একটা জলপ্রপাতের সৃষ্টি হইয়াছে—এই প্রপাতের সন্ধান পাইলে, উহা কাজে লাগান যাইতে পারিবে।

যাত্রীদল লেকের উঁচু পাড় ঘুরিয়া চলিল। মনে হইল লেকের জলে অনেক মাছ আছে। পেন্‌ক্রফট্‌ ঠিক করিল, পরে ছিপ তৈরি করিয়া মাছ ধরিবে।

লেকের উত্তর পূর্ব প্রান্তে আসিলে মনে হইল, বুঝি বা এইখানেই জল নির্গমের পথ আছে। কারণ এখানে লেকের ধারটি প্লেটোর (পর্বতের উপরে বিস্তৃত সমান জমি) সঙ্গে প্রায় সমান সমান। কিন্তু এখানেও জল নির্গমের পথের কোন চিহ্ন দেখা গেল না।

এখন যাত্রীদল লেকের পূর্ব তীর ধরিয়া চলিয়াছে। জল নির্গমের পথ দেখিতে না পাইয়া হার্ডিং বিস্মিত হইলেন। এতক্ষণ টপ্‌ চুপ্‌ চাপ ছিল, কিন্তু এখানে আসিতেই চঞ্চল হইয়া উঠিল—একবার পিছনের দিকে হাটিয়া আসে, একবার সম্মুখের দিকে যায় আবার থমকিয়া দাঁড়ায়—জলের দিকে চাহিয়া দেখে, আর দারুণ চীৎকার করে। কেন? সকলে জলের দিকে চাহিয়া ইহার কোন কারণ দেখিতে পাইলেন না। তারপর হঠাৎ টপ্‌ লেকের জলে লাফাইয়া পড়িল। জলের মধ্যে কিনা-কি জন্তু আছে, হার্ডিং টপের জন্য ব্যস্ত হইলেন। হারবার্ট বলিল টপ্‌ বোধ করি কুমীর টুমীরের সন্ধান পেয়েছে।

হার্ডিং বলিলেন—কুমীর এখানে কোথা থেকে আস্‌বে? লিঙ্কলন্‌ দ্বীপের মত জায়গায় কুমীর থাকা অসম্ভব।

এই সময় টপ্‌ জল হইতে উঠিয়া আসিল। উঠিয়াই আবার ছুটাছুটি—যেন জলের নীচে কোন অদৃশ্য জীবকে লক্ষ্য করিয়া ছুটাছুটি করিতেছে জলের উপর কিন্তু কোন চিহ্ন দেখা গেল না, একেবারে চেটাল, মোলায়েম সামান্য ঢেউটি পর্যন্ত নাই। যাহা হউক টপের ব্যবহার বড়ই অদ্ভুত। কিন্তু কেহ কিছু মীমাংসা করিতে পারিলেন না।

আধঘণ্টা পরে সকলে প্রসপেক্ট হাইটের উপরে লেকের দক্ষিণ পূর্ব কোণে উপস্থিত হইলেন। এখানে অনুসন্ধান কার্য শেষ হইল, কিন্তু কোন্‌ পথে লেকের অতিরিক্ত জল বাহির হইয়া যায় হার্ডিং তাহার সন্ধান করিতে পারিলেন না। বলিলেন—এত খুঁজেও যখন দেখা গেল না, তখন নিশ্চয়ই গ্রেনাইট, পর্বতের ভিতর দিয়ে পশ্চিম দিকে জল নির্গমের পথটা আছে।

স্পিলেট বলিলেন—যদি বা থাকেই, কিন্তু সেটা জান্‌বার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছ কেন হার্ডিং?

হার্ডিং বলিলেন ব্যস্ত হয়েছি কেন জান? পাহাড়ের ভিতর দিয়ে যদি জল বেরুবার পথ হয়, তবে নিশ্চয়ই একটা ফুটো আছে। যদি জলের গতিটাকে অন্যদিকে চালিয়ে দেওয়া যায় তবে, এই ফুটোটাকে আমরা সুন্দর একটা বাড়ি করে নিতে পারি। দ্বীপবাসিগণ প্লেটো ঘুরিয়া চিমনীতে ফিরিবার মতলব করিয়াছেন, এমন সময় টপ্‌ আবার চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। চীৎকার চেঁচামেচি এবং দেখিতে দেখিতে আবার লেকের জলে লাফাইয়া পড়িল।

সকলেই ছুটিয়া লেকের ধারে গেলেন, ততক্ষণে টপ্‌ প্রায় কুড়ি ফুট দূরে চলিয়া গিয়াছে। হার্ডিং তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময়, প্রকাণ্ড একটা মাথা জলের উপরে ভাসিয়া উঠিল। সেখানে জল তেমন গভীর ছিল না। হারবার্ট মাথাটা দেখিয়াই চিনিতে পারিল, এটা ডুগং জাতীয় জলজন্তুর মাথা। ততক্ষণে সেই জন্তুটা টপ্‌কে তাড়া করিয়াছে, টপ্‌ও প্রাণের ভয়ে তীরের দিকে সাঁতরাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে জন্তুটা টপ্‌কে ধরিয়া লইয়া জলের নীচে অদৃশ্য হইল। একটু পরেই বুঝিতে পারা গেল জলের নীচে একটা লড়াই আরম্ভ হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে জলটা ফেনাইয়া একটা পাক উঠিল, আর সঙ্গে সঙ্গে টপ্‌ও আবার জলের উপরে আসিয়া উপস্থিত। শুধু উপস্থিত নয়—কি একটা অদৃশ্য শক্তি টপ্‌কে ছিট্‌কাইয়া জলের উপরে প্রায় ফুট দশেক উঁচুতে তুলিয়া ফেলিয়াছে, পর মুহূর্তে টপ্‌ আবার জলের উপর পড়িল, এবং সাঁতরাইয়া একেবারে

ডাঙ্গায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখা গেল, তাহার গায়ে কোন চোট লাগে নাই, আঁচড় কামড়ের দাগটি পর্যন্ত নাই।

এরূপ ঘটনার কোন কারণ কেহই বুঝিতে পারিল না। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে দেখা গেল তখনও জলের নীচে কি একটা মহা তোলপাড় হইতেছে। ডুগংটাকে নিশ্চয়ই অন্য কোন আরও ভীষণ জন্তুতে তাড়া করায় সে টপ্‌কে ছাড়িয়া দিয়া নিজের প্রাণ রক্ষায় ব্যস্ত।

ক্রমে দেখা গেল, জলের রং লাল হইয়া গিয়াছে। খানিক পরেই ডুগং এর মৃত দেহ ভাসিয়া উঠিয়া লেকের দক্ষিণ কোণে তীরে গিয়ে লাগিল। দ্বীপবাসিগণ ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন, মৃত ডুগংএর গলায় ভীষণ একটা ক্ষত চিহ্ন—যেন খুব ধারাল কোন অস্ত্রের কোপ। এত বড় ডুগংটাকে এরূপ সাংঘাতিক আঘাত দিয়া যে বধ করিল—সেটা কোন্ জানোয়ার? ইহার উত্তর কে দিবে? দ্বীপবাসিগণ এই অসাধারণ ব্যাপারের কথা ভাবিতে ভাবিতে চিম্‌নীতে ফিরিয়া আসিলেন।

॥ উনবিংশ পরিচ্ছেদ ॥

পরদিন ৭ই মে হার্ডিং ও স্পিলেট প্রসপেক্ট হাইটে চড়িলেন। হারবার্ট ও পেন্‌ক্রফট নদীর তীর ধরিয়া চলিয়া গেল জ্বালানি কাঠের সন্ধানে, আর নেব চিমনীতে রহিল রান্নার কাজে।

এঞ্জিনীয়ার এবং রিপোর্টার, যেখানে ডুগংএর মৃতদেহ পড়িয়াছিল সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। হার্ডিং কেবলই ভাবিতেছিলেন পূর্ব দিনের ঘটনার কথা—সেই জলের নীচে লড়াইএর কথা। কোন সাংঘাতিক জন্তু ডুগংটাকে এমন দারুণ আঘাত করিয়াছিল?

ডুগংটা যেখানে পড়িয়াছিল, সেখানে জল ছিল কম, তাহার পর হইতে লেকের ঢালু আরম্ভ হইয়াছে, সম্ভবতঃ মধ্যখানে লেকটা খুব গভীর।

স্পিলেট বলিলেন—লেকের জলে সন্দেহজনক কিছু ত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না? হার্ডিং বলিলেন—না, স্পিলেট, আমিও ত দেখছি না। কিন্তু কালকার ঘটনাটা একেবারে বুদ্ধির অগোচরে।

স্পিলেট বলিলেন—বাস্তবিকই তাই। ডুগংএর আঘাতটা একেবারে অদ্ভুত। তাছাড়া টপকেই বা কিসে এমন করে উপরের দিকে ছুড়ে ফেলেছিল?

হার্ডিং বলিলেন—অনেক ঘটনার মধ্যেই এমন কিছু আছে, যা নাকি বাস্তবিকই অত্যাশ্চর্য, আমি কি করে বেঁচেছিলাম? ঢেউ থেকে টেনে বার করে কে আমাকে বালির ঢিপিতে নিয়ে গিয়েছিল? সবই আশ্চর্য, সবই অদ্ভুত। এর মীমাংসা একদিন করবই। লেকের এই জায়গাটায় আসিয়া হার্ডিং দেখিলেন, সেখানে স্রোতের খুব তেজ। কাঠের টুক্‌রা জলে ফেলিয়া দেখিলেন স্রোত দক্ষিণ-কোণের দিকে চলিয়াছে। এই স্রোত ধরিয়া তাঁহারা লেকের দক্ষিণ প্রান্তে গেলেন।

সেখানে গিয়া দেখিলেন, জলের মধ্যে একটা পাকের মত গর্ত হইয়াছে—যেন, নীচের কোন গর্ত দিয়া জলটা বাহির হইয়া যায়। জলের সমানে সমানে মাটিতে কান পাতিয়া হার্ডিং শুনিলেন—জলের নীচে পরিষ্কার একটা ফল্‌স্ এর (প্রপাতের) শব্দ হইতেছে।

তখনই উঠিয়া বলিলেন—স্পিলেট্, এইখানে জল নির্গমের পথ। গ্রেনাইট্ পাহাড়ের ভিতর দিয়ে এইখান থেকে একটা পথ আছে—লেকের বাড়তি জল এই পথে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। এই গহ্বরটাকে কাজে লাগাতে হবে—এটাকে আমি বার করব। গাছের একটা লম্বা ডাল কাটিয়া লইয়া হার্ডিং সেই খানটায় জলে ডুবাইয়া

দেখিলেন, ফুট খানেক নীচেই খুব বড় একটা গর্ত রহিয়াছে সেখানে স্রোতের এমনই তেজ, যে হার্ডিংএর হাত হইতে ডালটাকে ছিনাইয়া লইয়া গেল।

হার্ডিং বলিলেন—আর কোন সন্দেহ নাই, এখানেই জল নির্গমের পথ—এই পথটাকে শুকিয়ে চোখের গোচর করতে হবে।

স্পিলেট বলিলেন—কি করে তা সম্ভব হবে, হার্ডিং ?

হার্ডিং বলিলেন—জলটাকে এখানে ফুট তিনেক নীচু করে ফেলব—তাহলেই তা সম্ভব হবে।

স্পিলেট বলিলে—জলটাকে কি করে নীচু করবে ?

হার্ডিং বলিলেন—এর চেয়ে বড় একটা পথ করে দিয়ে। লেকের পাড়টা যেখানে সব চেয়ে সমুদ্র তীরের কাছে, সেইখানে এই পথ করব।

স্পিলেট্ বলিলেন—কি বলছ, হার্ডিং ? সেখানে যে শুধু গ্রেনাইট পাথরের স্তূপ।

হার্ডিং বলিলেন—গ্রেনাইটের স্তূপ উড়িয়ে দিলেই, সে পথে জল বেরিয়ে গিয়ে, লেকের জল নীচু হয়ে গর্তটা বেরিয়ে পড়তে। হার্ডিংএর ক্ষমতার উপর সকলেরই বিশ্বাস। স্পিলেট বুঝিতে পারিলেন—হার্ডিংএর দ্বারা একাজ অসম্ভব নহে। কিন্তু ভীষণ শক্ত গ্রেনাইট, পাথর, বারুদ ভিন্ন তাহা উড়াইয়া দেওয়া সম্ভব নয়।

হার্ডিং ও স্পিলেট চিমনীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন হারবার্ট ও পেনক্রফট ভেলা হইতে কাঠের বোঝা নামাইতেছে।

পেন্‌ক্রফট হাসিতে হাসিতে বলিল—ক্যাপটেন। কাঠুরিয়ার কাজ ত শেষ হয়েছে, এখন রাজমিস্ত্রীর কাজের দরকার হবে কখন ?

হার্ডিং বলিলেন—না পেনক্রফট। এখন রাজমিস্ত্রীর কাজ নয়, এখন করতে হবে কেমিস্টের (রাসায়নিকের) কাজ। পেন্‌ক্রফট বলিল—কেমিস্টের কাজ কি রকম ?

স্পিলেট বলিলেন—হাঁ, তা নয় ত কি ? আমরা যে এখন দ্বীপটা উড়িয়ে দিতে যাচ্ছি।

পেন্‌ক্রফট চক্ষু বড় করিয়া বলিল—দ্বীপটা উড়িয়ে দিতে।

স্পিলেট বলিলেন—গোটা দ্বীপটা না হোক, অন্ততঃ তার কতক অংশ।

সাইরাস হার্ডিং তখন তাঁহার মতলবের কথা সকলকে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন—শুধু বারুদ দিয়ে এমন শক্ত গ্রেনাইট পাথর উড়ান যাবে না, আরো সাংঘাতিক একটা কিছু একস্‌প্লোসিভ জিনিস (যাহা আঘাত পাইলে ভীষণ শব্দে ফুটিয়া গিয়া, সমস্ত চুরমার করিয়া উড়াইয়া দেয়—যেমন ডিনামাইট) তৈরি করে নিতে হবে। যে সব খনিজ পদার্থে এই একস্‌প্লোসিভ তৈরি হয়, ভগবানের কৃপায় এবং অতীতের অগ্ন্যুৎপাতের কল্যাণে তার নমুনা আমি এই দ্বীপে পেয়েছি। এখন সেই জিনিস তৈরি করে গ্রেনাইট পাথর উড়িয়ে দিব। বুঝতে পারছ না ?

যে গহ্বর দিয়ে লেকের বাড়তি জলটা এখন পাহাড়ের মধ্য দিয়ে গিয়ে সমুদ্রে পড়ছে, সেই গহ্বরটাকে যদি শুকিয়ে ফেলতে পারি, তবে সেখানে কি চমৎকার থাকবার যায়গা হবে ? একেবারে নিরাপদ—কোন কিছুর ভয় থাকবে না। এই গহ্বরটাকে শুকোতে হলে, পাহাড়ের অন্যদিক দিয়ে জল বেরিয়ে যাবার একটা পথ করে দিতে হবে। এখন গ্রেনাইট উড়িয়ে দিয়ে সেই পথ করবার জন্য, আমি একস্‌প্লোসিভ তৈরি করব।

হার্ডিং প্রথমেই নেব্ ও পেনক্রফটকে পাঠাইলেন সেই মৃত ডুগংএর চর্বি বাহির করিয়া আনিতে। তারপর তিনি হারবার্ট ও স্পিলেটকে লইয়া কয়লার স্তরের দিকে চলিলেন—যেখানে পাথরের মধ্যে খনিজ ধাতুর নমুনা দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই পাথর তাঁহার চিম্‌নীতে নিতে আরম্ভ করিলেন, এবং সন্ধ্যার পূর্বে অনেক মণ পাথর সংগ্রহ হইল। এই সকল পাথরে অনেক রকম খনিজ ধাতু আছে, তাহার মধ্যে বেশী ভাগ সাল্‌ফুরেট -অব আয়রণ। পাথরগুলিকে আগুনে পোড়াইয়া হার্ডিং এই জিনিসটি আলাদা করিলেন এবং তাহা হইতে সাল্‌ফেট-অব-আয়রন্ (হারাকষ) প্রস্তুত হইল। এখন এই সাল্‌ফেট-অব-আয়রন্ হইতে সাল্‌ফিউরিক্ য়্যাসিড বাহির করিয়া লইতে হইবে। ভবিষ্যতে এই য়্যাসিডটি বাতি তৈরি, চামড়া ট্যান্ করা প্রভৃতি অনেক কাজে দরকার হইবে। কিন্তু বর্তমানে হার্ডিং এটিকে অন্য কাজে লাগাইবেন। নেব ও পেন্‌ক্রফট, ডুগংএর চর্বি আনিয়া মাটির পাত্রে রাখিল। এই চর্বি হইতে গ্লিসারিন্ বাহির করিতে হইবে। সামুদ্রিক গাছ-পালা পোড়াইয়া সোডা বাহির হইল। এই সোডার সাহায্যে সাবানও হইল, হার্ডিং গ্লিসারিন্‌ও বাহির করিলেন। এখন আর একটি জিনিসের দরকার, সেটি সল্‌টপিটার (সোরা)। সৌভাগ্যক্রমে ইতিপূর্বেই হারবার্ট মাউণ্ট ফ্রাঙ্কলিনের নীচে সল্‌টপিটারের স্তরের সন্ধান পাইয়াছিল। উহা তুলিয়া পরিষ্কার করিয়া লইলেই হইল।

সাল্‌ফেট-অব-আয়রণ, হইতে হার্ডিং সালফিউরিক য়্যাসিড তৈরি করিলেন। এই য়্যাসিড এবং সলটপিটার হইতে য়্যাজোটিক য়্যাসিড প্রস্তুত হইল। য়্যাজোটিক য়্যাসিডের সঙ্গে গ্লিসারিন মিশাইয়া, কয়েক পাইন্‌ট তেলতেলে এবং হলদে রংএর মিক্‌শ্চার প্রস্তুত হইল। তাহার কিছু মাটির বোতলে লইয়া হার্ডিং বন্ধুদিগকে বলিলেন—এই দেখ নাইট্রো-গ্লিসারিন বানিয়েছি—এটার সাহায্যে আমি গ্রেনাইট পাথর চুরমার করে দিব।

পেন্‌ক্রফট বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া বলিল—এই তরল পদার্থটুকু দিয়ে গ্রেনাইট পাথর উড়িয়ে দিবেন। এই ব্যাপার কবে দেখতে পাব ক্যাপটেন ?

হার্ডিং বলিলেন—কালকে আগে একটা গর্ত খুঁড়তে হবে, তারপর কি হয় সব দেখতে পাবে এখন।

পরদিন, ২১এ মে সকাল বেলা, সকলে লেক্ গ্রাণ্টের পূর্ব ধারে সমুদ্র হইতে পাঁচশত ফুট দূরে একটা জায়গায় গেলেন। এখানে গ্রেনাইট পাথরের পাড় জলের পরেই ঢালু হইয়া নামিয়াছে। এই গ্রেনাইটের পাড়টি ভাঙ্গিয়া দিলে, সেই পথে জল বাহির হইয়া, ঢালু আবরণ বাহিয়া গিয়া সমুদ্রতীরে পড়িবে, এবং তাহা হইলেই লেকের জল কমিয়া গিয়া, সেই গহ্বরটি বাহির হইয়া পড়িবে। সাইরাস্ হার্ডিংএর নির্দেশমত পেন্‌ক্রফ্‌ট গাঁইতি দিয়া ঢালু জায়গাতে গর্ত খুঁড়িতে লাগিল। পেন্‌ক্রফ্‌ট ক্লান্ত হইলে নেব খুঁড়িতে থাকে। এইরূপে বিকাল প্রায় চারটার সময় গর্ত প্রস্তুত হইল। এই গর্তে নাইট্রোগ্লিসারিন্ ঢালিয়া গ্রেনাইট উড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

নাইট্রোগ্লিসারিনে খুব জোরে একটা আঘাত দেওয়া দরকার। নতুবা শুধু আগুন ধরাইয়া দিলে, সেটা না ফাটিয়া জ্বলিয়া যায়। এই আঘাত দিবার কথা হার্ডিং জানিতেন। একটা শক্ত জায়গায় নাইট্রোগ্লিসারিন্ ঢালিয়া তাহাতে হাতুরির ঘা দিলেই, দারুণ এক্‌স্‌প্লোসন্ হয় (ফুটিয়া যায়) কিন্তু এরূপ অবস্থায় যে ঘা দিবে, এক্সপ্লোসনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও প্রাণটি শেষ। সুতরাং হার্ডিং ঘা দিবার অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। গর্তে নাইট্রোগ্লিসারিন্ ঢালা হইল। তাহার উপরে তিনটি খোঁটা পুঁতিয়া, সেগুলির ডগা একত্রে বাঁধিয়া দেওয়া হইল।

বাঁধা ডগার মধ্যখানে খুব বড় এক ডেলা লোহা ঝুলান হইল। এই লোহার দাঁড়ির সঙ্গে আর একটা খুব লম্বা

এবং তাহাতে গন্ধক মাখান—এইরূপ দড়ি (পলিতা) বাঁধা হইল। দড়িগুলি অবশ্য গাছের ছালের তৈরি। ইহার পর সঙ্গীদিগকে অনেক দূরে পাঠাইয়া দিয়া হার্ডিং নিজেই পলিতার মুখে আগুন ধরাইয়া, ছুটিয়া গিয়া সকলের সহিত মিলিলেন। গন্ধক মাখান দড়িটা পুড়িয়া লোহার দড়িতে পৌঁছাইতে প্রায় পঁচিশ মিনিট লাগিবে—এইরূপে আন্দাজেই দড়িটি লম্বা করা হইয়াছিল। পলিতায় আগুন ধরাইয়া হার্ডিং সকলের সহিত চিম্‌নীতে ফিরিয়া আসিলেন। প্রায় পঁচিশ মিনিট পরে অতি ভীষণ এক্‌স্‌প্লোসন হইল। সমস্ত দ্বীপটাই যেন থর্‌ থর্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বড় বড় পাথরের চাপ ছিটকাইয়া শূন্যে উঠিয়াছিল—ঠিক যেমন অগ্ন্যুৎপাতের সময় হয়। প্রায় দুই মাইল দূরে চিম্‌নীটির পাথরগুলিকেও না কাঁপাইয়া ছাড়ে নাই। শুধু কি তাহাই। এক্‌স্‌প্লোসনের ধাক্কায় দ্বীপবাসিগণও সটান মাটিতে একেবারে লম্বা হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল।

এক্‌স্‌প্লোসনের পর, সকলে উঠিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল সেই জায়গার দিকে। সেখানে পৌঁছিতেই, সকলের মিলিত আনন্দধ্বনি আকাশ ফাটাইয়া দিল। তাহারা দেখিল—গ্রেনাইটের পরে ভীষণ এক ফুটা। সেই ফুটার পথে লেকের জল তীরের মত ছুটিয়া ফেনাইয়া গর্জন করিতে করিতে প্রায় তিন শত ফুট নীচে সমুদ্র-তীরের উপর পড়িতেছে। ক্রমশঃ

ব্যাঙ— গ্যাঙোর, গ্যাঙোর, গ্যাঙ।
ছুঁচোয় দিলো ল্যাং,
মুচরে গ্যাছে ঠ্যাং।
বাপরে, মারে, গেলাম মরে,
বাঁচাও, বাঁচাও ভাই।
বদ্যি বাড়ি হেঁটে যাবার
শক্তি আমার নাই।

- চকর, চকর, চল,
কি হয়েছে, বল।
আনছি আমি বদ্যি ডেকে
বদ্দিবাটির বাজার থেকে।

ব্যাঙ— গ্যাঙোর, গ্যাঙোর, গা,
পা চালিয়ে যা।
বাপরে, মারে, মরে গেলুম হায়,
আজকে আমার প্রাণটা বুঝি যায়
গ্যাঙোর, গ্যাঙোর, গায়,
বদ্দি নিয়ে আয়।

শেয়াল বদ্যি— হুক্কা-হুক্কা-হুক।
কেয়া হুয়া, পা ভেঙেছে ?
আহারে চুক, চুক।
হ্যাঁ করতো, জিভটা তোর,
দেখি কেমন গলায় আছে জোর।
যন্ত্রখানা আনতে পাঠাই
দেখতে হবে বুক।

ব্যাঙ— গ্যাঙোর, গ্যাঙোর, গ্যাঙ,
ছুঁচোয় দিলো ল্যাং।
বদ্যি মামা, দারুণ জোরে
মুচকে গ্যাছে ঠ্যাং।

শেয়াল বদ্যি— হুক্কা-হুয়া-হয়,
রোগটা সহজ নয়।
ইংরেজী নাম, দারুণ জটিল,
তাই তো আমার ভয়।

ব্যাঙ— গ্যাঙোর, গ্যাঙোর, গা,
আর যে বাঁচি না।
এবার বোধ হয় মরেই যাবো,
ঠাকুর, ভগবান।
পাঁচশো গেঁড়ি, মানত করি,
বাঁচাও আমার প্রাণ।

শেয়াল বদ্যি— হুক্কা-হুয়া, হুক্কা-হুয়া, হুক্কা-হুয়া হাই,
চিৎ হয়ে শোও, পেটটা তোমার
কাটতে হবে ভাই।
মাথাখানা ফুটো করে
ঢালতে হবে পাঁক।
গলায় তোমার বাঁধবো দড়ি,
বন্ধ করো ডাক।

ব্যাঙ— গ্যাঙোর, গ্যাঙোর, গাঁক,
চিকিচ্ছে মোর থাক।

বদ্যি না ছাই, খুনে ব্যাটা
বাঁচতে যদি চাই,
এক লাফেতে এখান থেকে
পুলিশ-পাড়া যাই।

শেয়াল বদ্যি— হুক্কা-হুয়া হৈ,
আরে, আরে, একি ব্যাপার, রোগী গেল কই ?
অপারেশন করবো বলে
করছি ছুরি ঠিক,
এমন সময় রোগী আমার
পালালো কোন দিক ?
ইঁদুর, ছুঁচো, কোথায় আছিস, দৌড়ে তোরা আয়,
খোঁড়া পায়ে, রোগী আমার ঐ পালিয়ে যায়।

ব্যাঙ— গ্যাঙোর, গ্যাঙোর, গাপ,
আবার দিলাম লাফ।
আজকে আমার প্রাণটা যেতো
সারতে গিয়ে ঠ্যাং।
দারুণ বাঁচা বেঁচে গেছি,
গ্যাঙোর গ্যাঙোর, গ্যাঙ।

গম্ভীরানন্দের গলায় রুদ্রাক্ষরের মালার মধ্যে লাল পাথরটা ঝিক্‌মিক্ করছে। মুখের মধ্যে স্বর্গীয় ভাব দেখা দিলো।

তিনি এবার গম্ভীর গলায় বললেন,

'মাত্র দশ টাকায় বজ্রকৈটভ ভস্মের জন্য ক্রিয়াকাণ্ডাদি সমাপন করতে চাও। বেশ সেই মত ব্যবস্থা করবো!'

'আজ্ঞে কোন দিদির কথা বললেন?'

'দিদি নয় হে! ক্রিয়াকাণ্ডাদি অর্থাৎ যজ্ঞের কাজের কথা বললাম।'

'ওঃ!' অভয়পদ এবারে বুঝতে পারে দিদি সম্বন্ধে কোনো কথা নয়।

'বাংলা ভাষায় তোমার তো জ্ঞান বড় ক্ষীণ!' গম্ভীরানন্দ ভ্রু কোঁচকালেন। আমার সঙ্গে বাংলা ভাষায় কথা বোলো না।'

'তা ইংরেজীতে বলতে পারি!

'থাক্—তাহলে যজ্ঞ না করেই আমাকে পলায়ন করতে হবে। বরং—'

'হিন্দীতে বলবো তাহলে। কী বলেন। হিন্দীটা আমার বেশ ভালো আসে। বহুৎ আচ্ছা আতা হায়।'

'চাঞ্চল্য প্রকাশ কোরো না অভয়ানন্দ। আর শোনো হিন্দী বলতে গিয়ে বেশী হায় হায় কোরো না। সহ্য করতে পারি না। আমারও হায় হায় করতে ইচ্ছে হয়। সে জন্যেই তো বিহার ত্যাগ করলুম। এতো হায় হায় যে শেষকালে ডুকরে কান্না শুরু করেছিলাম। শিষ্যরা বললো, পরভু রো মৎ।'

আমি বললুম, তা হলে তোমাদের ঐ হায় হায় ধ্বনি ত্যাগ করো। ওরা বললে, 'হায় হায় ছোড়নে নেহি সক্‌তা হায় পর্‌ভু!' বললুম, 'তাহলে আমার জন্যে হায় করো!' বলেই সেখান থেকে কেটে পড়েছি!'

'তাহলে হায় ত্যাগ করে হিন্দী বলতে হবে?'

'হুম্!' গম্ভীরানন্দ সায় দিলেন।

হায় ত্যাগ করে হিন্দী বলা শক্ত। কারণ হায় জুড়েই সাধারণত বাংলা থেকে হিন্দীতে পৌঁছুতে হয়। অনুস্বার জুড়ে যেমন সংস্কৃত করে সবাই। বিশেষ করে ইস্‌কুলের ছেলেরা। সংস্কৃত পরীক্ষার দিনতো অনুস্বারের ছড়াছড়ি। বাংলারা দেখতে দেখতে সংস্কৃত হয়ে যায়।

'কিন্তু স্বামিজী আজ তো হায় ছেড়ে হিন্দী বলতে পারবো না। হিন্দীর সঙ্গে হায়ের যে একেবারে অটুট সম্বন্ধ। আমাকে সময় দিন।'

'তথাস্তু!'

অভয়পদ উঠলো। হিন্দীচর্চা করতে হবে। হায়-মুক্ত হিন্দী। কিন্তু হায় মুক্ত হলে যে হিন্দী আর হিন্দী থাকবে না। বাংলা হয়ে যাবে।

হলেই কি বলতেই হবে। গম্ভীরানন্দ ওকে রাজা বানিয়ে দেবে। কেবল মুকুটাই থাকবে না। তা আজকাল কোন রাজাই বা মুকুট পরে!

অবশ্য বরাত জোরে গম্ভীরানন্দের সঙ্গে আলাপ হয়ে গিয়েছিলো। এমন দিলদরিয়া স্বামিজী ক'জন মেলে!

এক মক্কেলের কাছ থেকে হাজার খানেক টাকা আদায় করে অভয়পদ ফিরছিলো। টাকাটা অভয়পদ সাবধানেই রেখেছে। হামেশা টাকা তার সঙ্গে থাকে। পকেটমারের ভয় অভপদ করে না। কারণ টাকা সে আদপেই পকেটে রাখে না। অর্থাৎ পকেট মারের এক্তিয়ারের বাইরেই থাকে টাকা।

অভয়পদর সঙ্গেই বাসে উঠেছিলেন স্বামিজী এবং বসেছিলেন অভয়পদর পাশে। তখন পর্যন্ত ভয় পেগেনি। কিন্তু অভয়পদ ভবানীপুরে নামতেই স্বামিজীও নামলেন।

কী ব্যাপার! গা ছম্ ছম্ করে উঠলো অভয়পদর। গোপনে একবার টাকাগুলো স্পর্শ করে অভয়পদ। নাঃ, হাল্‌কা হয়নি! তাহলে স্বামিজী কি মতলবে পিছু নিয়েছে! স্বামিজীরা তো কোনো পকেট টকেটের ধার কাছ দিয়ে যাতায়াত করেন না! এমন কি তাদের আলখাল্লায় পর্যন্ত পকেট

থাকে না। পিছু নেয়া তো দূরের কথা! উল্টে সবাই তাদের পিছু নেয়!

বার কয়েক ফিরে ফিরে তাকাতে স্বামিজী হাসলেন,

'কী হে আমায় সন্দেহ হচ্ছে না, কি?'

'আজ্ঞে না, মানে স্বামিজীরা তো সন্দেহের বাইরে—কাজেই আপনাকে আর—'

স্বামিজী অমায়িক হাসলেন।

'ভালো বলেছো হে!' স্বামিজী বললেন, 'এসো একটা খাবার দোকানে যাই। কিছু গলাধঃকরণ করা যাক।'

তাও ভালো লঘুকরণ নয়। যে কোনো লঘুকরণই এখন অভয়পদর কাছে ভয়াবহ। ট্যাঁকের লঘুকরণ হলে যেমন তেমনি অংকের লঘুকরণ করতে হলেও এখন ভয়াবহ। তা যখন নয় তখন কিছু গলধঃকরণ করতে যেতে আপত্তি করলো না অভয়পদ।

বেশ আয়েস করে খেলো দু'জনে। স্বামিজী জোর করে অনেক কিছু খাওয়ালেন অভয়পদকে। নানা করেও বেশ খেয়ে নিলো অভয়পদ। নিজে পয়সা খরচ করে তো আর এতো খাওয়া হয় না কোনো দিন। বেশ করে খেয়ে নেওয়াটাই তাই যুক্তিযুক্ত। অন্ততঃ অভয়পদর কাছে।

স্বামিজী কেবল ছানার তৈরী মিষ্টি খেলেন। ছানা ছাড়া অন্য কিছু তার খাওয়া মানা, হাজার হলেও স্বামিজী তো!

খাওয়া শেষ হতে স্বামিজী বিল মিটিয়ে দিলেন। অভয়পদ বাধা দিলো না। কেউ খরচা করতে গেলে সে বাধা দেয় না। কিন্তু তাকে খরচ করতে বললে বাধা দেয়। প্রবল বাধা! খরচা করা তার স্বভাব-বিরুদ্ধ। খরচ করলেই কমে যায়। মিছিমিছি কমিয়ে লাভ কি? আর এখন তো স্বামিজী খরচ করছেন। যার কাছে টাকা মাটি, মাটি টাকা! কাজেই তাঁকে বাধা দেয়া একেবারেই অর্থহীন।

স্বামিজীর এই খাওয়াবার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ জেগেছিলো একবার অভয়পদর। কিন্তু উদ্দেশ্য নিয়ে বেশী মাথা ঘামিয়ে লাভ কি? যাই উদ্দেশ্য থাক না কেন পেটে খেলে সব সহ্য হবে। কাজেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অতো মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।

'নাও হে বেরোই এবার।' স্বামিজী অভয়পদকে নিয়ে বেরোলেন।

'আমি তো এখন বাড়ি ফিরবো!'

'ফিরবেই তো। কিন্তু তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তোমাকে আমি 'বজ্রকৈটভ ভস্ম' দিতে চাই!'

'এঁ্যা—কা দিতে চান!'

'বজ্রকৈটভ ভস্ম।'

'ওতে কি হয়?'

'ও গায়ে মেখে তিন দিন শবাসন করলে লাখ লাখ টাকার মালিক হবে!'

'কী বললেন—লাখ লাখ টাকা!!' অভয়পদ যেন স্বপ্ন দেখছে।

'হ্যাঁ! লাখ লাখ টাকা!'

'ভস্ম আজকেই দেবেন?'

'উহুঁ, এর জন্যে যজ্ঞ করতে হবে। 'বজ্রকৈটভ যজ্ঞ'। তারই ভস্ম মাখতে হবে।'

'যজ্ঞ করতে হবে?'

'তার জন্যে খরচাও করতে হবে কিছু।'

'খরচা!' অভয়পদ একটু হোঁচট খায়। নিখরচায় যদি হতো! কি আর করা যাবে! লাখপতি হতে হলে খরচ করতে হবে বৈকি। আস্তে আস্তে বলে, 'কতো খরচ হবে বলুন তো!'

'কালকে আমার ওখানে যেয়ো। সব প্রাঞ্জল করে দেবো। ও আমার নাম জানতে চাও—স্বামী গম্ভীরানন্দ আমার নাম। আর এই নাও ঠিকানা—' বলে এক টুকরো চিরকুট অভয়পদের হাতে দিলেন গম্ভীরানন্দ। 'আর তোমার নাম?'

'অভয়পদ চোংদার।'

'হুম্—তোমাকে অভয়ানন্দ বলে ডাকবো।'

'যা ইচ্ছে আপনার চোঙানন্দ বললেও ক্ষতি নেই।' অভয়পদ বলে। লাখ লাখ টাকা যে দেবে সে চোঙানন্দ বলতে পারে বৈকি!

'বেশ বেশ।' স্বামিজী বললেন। 'তাহলে আমি আজকে চলি। তুমি কালকে সত্যি সত্যি আমার ওখানে উপস্থিত হয়ো।'

বাড়ি ফিরে অভয়পদ কাউকে কিছু বললো না। টাকাটা লোহার সিন্দুকে রেখে নিশ্চিন্ত হলো। গম্ভীরানন্দের কথাটা চাগিয়ে উঠছে মনের মধ্যে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নও দেখে ফেললো; সেই কি ভস্ম মেখে যেন সে শবাসন করছে। তারপর লাখ লাখ টাকা উড়ে উড়ে আসছে। আঃ কী আনন্দ!

কাজেই সকালবেলা উঠে আর দেরী করে না অভয়পদ। লাখ লাখ টাকা যতো তাড়াতাড়ি আনা যায় ততই সুখ!

অভয়ানন্দের কাছ থেকে ফিরে এখন মনটা প্রফুল্ল লাগছে। এক হাজার টাকার ফর্দ দিয়েছিলো গম্ভীরানন্দ। সেই ভস্ম তৈরী করবার যজ্ঞের জন্যে। অনেক বলে কয়ে দশ টাকায় রাজী করাতে পেরেছে। প্রথমটা অবশ্য কিছুতেই রাজী হতে চায়নি। একশ' একশ' করে কমাতে কমাতে শেষকালে একশ' টাকায় নেমেছিলো গম্ভীরানন্দ।

লাখ লাখ টাকা যদি মাত্র দশটাকায় পাওয়া যায় তবে অন্য কেউ হলে আনন্দে নাচ্তে নাচ্তে বাড়ি যেতো। নাচ না শিখলে ও আনন্দের জন্য আপনা থেকে একরকম নাচে হাত পা গুলো দুলতে থাকে। সে নাচের নাম নেই অবশ্য। সবাই সে নাচ নাচে বলে নাচের খাস দরবারে এর প্রবেশাধিকার নেই।

পথে ফিরতে ফিরতে হায়-মুক্ত হিন্দী বলার চেষ্টা করলো অভয়পদ। কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারলো হায় ছাড়া হিন্দী ঠিক হচ্ছে না। বাংলা হয়ে যায়। কিন্তু উপায় কি? যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই ভস্ম মেখে তিন দিন শবাসন করা যায়, ততক্ষণ গম্ভীরানন্দের কথা শুনতে হবে বৈকি!

পরদিন সকালে অভয়পদ ফের ছুটলো গম্ভীরানন্দের আস্তানায়। চা-পান শেষ করেই। সেই হোটেলে।

কিন্তু হোটেলে পৌঁছেই অবাক হয়ে গেলো ম্যানেজারের কথা শুনে।

'স্বামিজী চলে গেছেন অভয়বাবু। আপনার জন্য একটা চিঠি আর একটা ঠোঙা রেখে গেছেন!'

'ঠোঙা!' রোমাঞ্চিত হলো অভয়পদ। ওঃ গম্ভীরানন্দ চলে গেছেন শুনে কী ভয়টাই না হয়েছিলো। কিন্তু ঠোঙার কথা শুনে স্পষ্ট বুঝতে পারছে গম্ভীরানন্দ ঠোঙায় যজ্ঞের ছাই রেখে গেছেন। ওফ্—আপশোষ করতে লাগলো অভয়পদ। দেবতাকে হাতে পেয়ে সে ছেড়ে দিয়েছে। উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'শিগগীর সেই ঠোঙাটা এনে দিন।'

ঠোঙাটা আসতেই অভয়পদ আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। হ্যাঁ গম্ভীরানন্দ ঠিক ঠিক ছাই রেখে গেছেন। মাথা আর ঠিক রাখতে পারলো না অভয়পদ। মুঠো মুঠো ছাই সারা শরীরে মেখে ফেললো অভয়পদ। তারপর সটান শুয়ে শবাসন। ম্যানেজার থেকে শুরু করে ঠাকুরটা পর্যন্ত সেই অভূতপূর্ব কাণ্ড দেখবার জন্যে ভিড় করেছে সেখানে। অভয়পদর ভ্রুক্ষেপ নেই সেদিকে। লাখ লাখ টাকা পেতে গেলে ওসব ভ্রূক্ষেপ করলে চলে না।

বেশ খানিকক্ষণ শবাসন করে উঠে দাঁড়ালো অভয়পদ। আঃ—আর তুদিন তুবার করলেই লাখ লাখ টাকা অনায়াসে চলে আসবে তার কাছে। কী আনন্দ! কী আনন্দ!

'চিঠিখানা কোথায়?'

শবাসন শেষে চিঠির কথা মনে হলো। ম্যানেজার অবাক চোখে চিঠিখানা দিলো অভয়পদর হাতে।

আস্তে আস্তে খাম খানা ছিঁড়ে চিঠিখানা চোখের সামনে ধরলো অভয়পদ:

'ওরে কিপ্টের বাদশা!

সেদিন এক হাজার টাকা নিতে দেখে অনুসরণ করলুম তোকে। ভাবলুম টাকাটা তোর মাথায় হাত বুলিয়ে আদায় করবো। সেজন্যে খরচও করলাম। এতো আশা ভরসা আর খরচের পরিবর্তে মাত্র দশ টাকা আদায় করতে পারলুম!

আসলটাই উঠলো না। তোর কাছ থেকে আর আদায় করা আমার গুরুদেবেরও সাধ্য নয়। কাজেই চললাম। আর তোর জন্যে ঠোঙায় হোটেলের হেঁসেলের ছাই রেখে গেলাম। মেখে ভূত হয়ে থাকিস।

ইতি

গম্ভীরানন্দ।

ভূত না হলেও অভয়পদর তখন সত্যি সত্যি অদ্ভুত অবস্থা। ভাগ্যে দশটাকার উপর দিয়েই গেছে!!

উর্মিলা চৌধুরী

স্নেহের সোনালী—

জানো একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে—তোমায় বলি—শোন।

এখানে না একটা আছে মস্ত দীঘি—তার নাম সাহেব বাঁধ—(এখানকার লোকেরা দীঘি বা পুকুরকে বলে বাঁধ—বড় হয়ে তুমি এ অঞ্চলের লাল বাঁধের নাম শুনতে পাবে)—সেই সাহেব বাঁধের চার ধার ঘিরে আছে মস্তো মস্তো নিম আর অর্জুন গাছ আর আছে তার নিচে নিচে ঘেঁটু গাছের জঙ্গল—কিছুটা দূর দিয়ে গেছে সুন্দর রাঁচি রোড। সাহেব বাঁধের এক পাশে অর্জুন গাছের ছায়ায় একটা খুব চওড়া লাল মাটির কাঁচা রাস্তা চলে গেছে—সেখান দিয়ে পৌঁছনো যায় এখানকার নিস্তারিণী কলেজ। রাস্তাটার এক ধারে পড়ে একটা লাইব্রেরী তার নাম 'সাহিত্য মন্দির'—আর অন্য ধারে সাহেব বাঁধ—বিরাট—গভীর নীল—মাঝে মাঝে ঝাঁঝি আর পানা—শালুক বনের মধ্যে টুপ্ টুপ্ ডুব দেয় পানকৌড়ি—আর আছে পাড়ের কাছ ঘেঁষে অনেক পানি ফলের গাছ।

একদিন দুপুরে ভারি মেঘ করেছে—আর সেই মেঘের চাদরটা মুড়ি দিয়ে আকাশটা যেন পা টিপে টিপে পৃথিবীর খুব কাছে চলে এসেছে -- অথচ বৃষ্টি নেই। মায়ের সঙ্গে এসেছিলাম কাছাকাছির পোস্টা-পিসে—মায়ের দেরী হচ্ছে দেখে সাহেব বাঁধের দিকে হাঁটতে সুরু করলুম। মেঘের ছায়া পড়ে গাছপালা গুলোর সবুজ রংটা ভারী ঘন হয়ে উঠেছিল। সাহিত্য মন্দিরের পাশের রাস্তাটা দিয়ে হাঁটছি—দুপুর

বেলাটা মেঘে একেবারে অন্ধকার—ঠিক যেমনটি হলে ইস্কুলের ক্লাসে আলো জ্বেলে পড়া হয় তেমনটি—হাঁটতে হাঁটতে সাহিত্য মন্দির ছাড়িয়ে গেছি হঠাৎ দেখি বাঁদিকে ছোট পায়ে চলা পথ—ঢুকে পড়লাম রাস্তাটায়—অমন মেঘের মধ্যে একটা অচেনা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে কি ভালো লাগে বুঝতেই পারছ। খানিকটা হেঁটেই দেখি—একটা মস্ত কুসুম ফুলের গাছ—তার পাতাগুলো লাল টুকটুক করছে—আর তার কাছেই একটা মস্ত ম—স্ত বাড়ি। দোতলা—ফিকে ফিকে সবুজ রং—মোটা মোটা কালো কালো জোড়া থাম—ভারি পুরনো পুরনো চেহারা বাড়িটার—বাগানের গাছে আর লতায় একতলার প্রায় সমস্তটাই আড়াল। দোতলার বারান্দার ছাদ থেকে প্রায় হাত দেড়েক নীচ পর্যন্ত ফিকে সবুজ জাফরি কাটা—রেলিংটাও তেমনি কেবল সেটায় আছে কালো পাড়। ভারি স্বপ্ন স্বপ্ন বাড়িটা—দোতলার বারান্দার এক কোণে বসেছিলেন একজন—তাঁর মুখখানা এত দূর থেকে ভালো বোঝা যায় না—কেবল দেখা যায় ধবধবে ফরসা একখানা হাত পদ্ম ফুলের মতো ফরসা গালের ওপর রাখা—কালো পাড়ের একটা গাঢ় সবুজ শাড়ী পরে তিনি একটা চেয়ারে বসে চুপটী করে বাইরের দিকে চেয়েছিলেন। আমি ভাবতেই পারিনি যে এই জঙ্গলের মধ্যে একটা এমন সুন্দর বাড়ি থাকতে পারে—অবাক হয়ে চেয়েছিলুম এমন সময়ে তিনি আমায় দেখতে পেলেন—চলে আসবো কিনা ভাবছি এমন সময়ে হঠাৎ হাত নেড়ে আমায় দাঁড়াতে বলে তিনি নিচে নেমে এলেন। এতক্ষণে দেখতে পেলাম—দিদির মতোই বড়ো হবেন হয়তো—কিন্তু দেখতে কি রকম জানো? রূপকথায় যে রাজকন্যার ছবি দেখি ঠিক সেই রকম—অবিকল। আমায় জিগেস করলেন 'কি করছিলে এখানে'? বললুম বেড়াচ্ছিলুম—হাতের পাথরগুলোর দিকে চেয়ে হেসে আবার জিগেস করলেন—'তুমি বুঝি পাথর জমাও?' ভারি মিষ্টি গলা—মাথা নাড়লুম—বললেন, 'দাঁড়াও আসছি'—ভিতরে গিয়েই ফিরে এলেন—হাতে একটা ছোট্ট গোল পাথর—মাখনের রং আর তার ভেতর থেকে ঠিক যেন সাদা আলো ফুটে বেরুচ্ছে। আমার মনে পড়লো– দেরি দেখে মা হয়তো ভাববেন—চলে এলাম।

তারপরে কতোদিন ভেবেছি তাঁর কথা আর সেই আশ্চর্য সুন্দর বাড়িটার কথা—সেদিন গিয়েছিলুম আরেক বার দেখে আসতে—কিন্তু সোনালী—তুমি বিশ্বাস করবে না—বাড়িটা কোথাও খুঁজে পেলাম না এমন কি রাস্তাটা অবধি না। কুসুমফুলের গাছ একটা দেখলুম কিন্তু সেটা জলের ট্যাঙ্কের পাশে। কতো খুঁজলুম—অনেকক্ষণ ধরে—কোথাও পাওয়া গেল না।

বড়দের দুয়েকজনকে বলেছিলুম—তাঁরা হেঁসে বললেন 'ও তোমার কল্পনা'—কিন্তু তুমিই বলো আমি নিজে যা দেখলাম তাকে আমি কল্পনা বলি কি করে? আর তাছাড়া অন্য পাথরগুলোর সঙ্গে সেই সাদা আলোর পাথরটাও আমার তাকে রয়েছে।

তুমি আমার ভালোবাসা নিও

ইতি—

সীলের দেশে

অ্যালাস্কা দেশটাকে সীলদের দেশ বলা চলে, কারণ প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে দলে দলে সাদা সীল সমুদ্রে যাযাবরগিরি ছেড়ে অ্যালাস্কার প্রিবিলফ দ্বীপপুঞ্জে কয়েক মাস ধরে বসবাস করে, কাচ্চাবাচ্চা মানুষ করে। শোনা যায় যে গ্রীষ্মকালে প্রিবিলফের সেণ্টপল আর সেণ্ট জর্জের তীরভূমিতে গিয়ে সীলদের মাথা গুণলে পনের লক্ষ থেকে সাড়ে সতেরো লক্ষ সাল পাওয়া যাবে।

অ্যালাস্কা জায়গাটাকে তোমরা মানচিত্রে দেখে থাকবে উত্তর আমেরিকার উত্তর পূব কোণটি জুড়ে রয়েছে। ১৮৬৭ সালে এই প্রদেশটিকে রাশিয়ায় কাছ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছিল।

এই সাদা লোমশ সীলগুলো নাকি তাদের মোট জীবনকালের অর্ধেকের বেশি উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের হিমশীতল জলে মাছের খোঁজে সাঁতরে বেড়ায়। এদের মতো ওস্তাদ সাঁতারু সীলবংশে খুঁজে পাওয়া যায় না!

যেই মে মাস পড়ে গোদা গোদা পুরুষ সীলগুলো প্রিবিলফের ডাঙ্গায় উঠে এসে যে যার পছন্দ মতো বাসা বাঁধার জায়গা ঠিক করে নেয়। সে একটি ব্যপার বিশেষ। এক একটা সীল নাক থেকে ল্যাজ অবধি ছয় ফুট লম্বা, ওজনে গড়ে একেকটা সাড়ে সাত থেকে আট মণ, পিঠে একটা করে প্রকাণ্ড কুঁজ, আগাগোড়া চর্বি দিয়ে ভরা ভরা, তার উপর ঘন লোম। এই কুঁজটি ওদের বিশেষ দরকার, কারণ যে তিন মাস ওদের ডাঙ্গায় বসবাস, সেই তিন মাসের আগাগোড়াই ওদের এক রকম নিজেদের বাসা আগলাবার যুদ্ধেই কাটে। এমন কি মাছের খোঁজে যদি বা একটু জলে নেমেছে তো ফিরে এসে নির্ঘাৎ দেখবে ইতিমধ্যে আরেকটা কেঁদো সীল দিব্যি ওর জায়গাটি জুড়ে স্ত্রীপুত্রপরিবারে হর্তাকর্তা বিধাতা হয়ে বসে আছে! কাজেই অষ্টপ্রহর পাহাড়া দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না, খাওয়া-দাওয়াও মাথায় ওঠে, ঐ কুঁজের মধ্যে জমা করা চর্বি দিয়েই তখন ওদের শরীরের শক্তি রক্ষা হয়। বলা বাহুল্য, এই পুরুষ সীলগুলো বাঘা যোদ্ধা, পিছনদিকের বিরাট ডানার মতো ঠ্যাঙের সাহায্যে দারুণ বেগে ওরা ডাঙ্গার উপর ছুটতে পারে, মাথা নিচু করে শত্রুর টুঁটি লক্ষ্য করে সে কি ঝাঁপ দেয়, একবার দাঁত বসাতে পারলেই তো হয়ে গেল!

যতক্ষণ পুরুষরা জায়গাগুলি দখল করে কায়েমি হয়ে বসছে, সীল মেয়েরাও দলে দলে এসে উপস্থিত হতে আরম্ভ করে দেয়। যে যার আগের বছরের বাসার জায়গাটি দিব্যি বেছে নিয়ে ঘর-সংসার পেতে বসে। একেকটি গোদা সীলের চল্লিশ পঞ্চাশটি করে পরিবার থাকে; তার ফলে অনেকগুলো দুর্বল সীলের ভাগ্যে আর স্ত্রী জোটে না, কেঁদোদের ধারকাছে ঘেঁষবার উপায় থাকে না, পিট্টির চোটে পালাবার পথ থাকে না।

এই বাড়তি সীলগুলোর উপরেই ওদেশের লাভজনক সীলের ব্যবসা চলে। শোনা যায় প্রতি বছর প্রিবিলফ দ্বীপপুঞ্জে পঁয়ষট্টি হাজার বাড়তি সীল মারা হয়। এদের লোম দিয়ে দামী জামা হয়, মাংস খাওয়া হয়, চর্বি থেকে উৎকৃষ্ট তেল তৈরী হয়।

অ্যামেরিকার মৎস্য ও বন্যপ্রাণী রক্ষা বিভাগ এই সীলদের দেখাশোনা করে থাকেন, বছরে কটা জানোয়ার মারা হবে, ব্যামোব্যাধি হলে তার চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা এঁদের হাতে।

গৃহস্থ সীলদের কখনো মারা হয় না, তারা নির্বিঘ্নে মাস তিনেক ডাঙ্গায় বাস করে। বাচ্চাগুলো যখন জন্মায়, তাদের ওজন হয় পাঁচ ছয় সের আর রং হয় ঘোর কালো। তাদের মা'রা দিব্যি তাদের সমুদ্রের তীরে রেখে, নিশ্চিন্ত মনে সমুদ্রে চরতে যায়, তারপর ফিরে এসে কি করে যে নিজেদের ছানা চিনে নেয় সে আর মানুষের বুদ্ধি দিয়ে বুঝে ওঠা যায় না।

বহু উৎসাহী ভ্রমণকারি প্রিবিলভের দ্বীপের সমুদ্রতীরে এক সঙ্গে হাজার হাজার সীল দেখবার জন্যে ঐ সময়ে ওখানে বেড়াতে যান। বলা বাহুল্য বেড়াতে গিয়ে সীল মারা বে-আইনী।

গপ্পিদাসের গপ্প
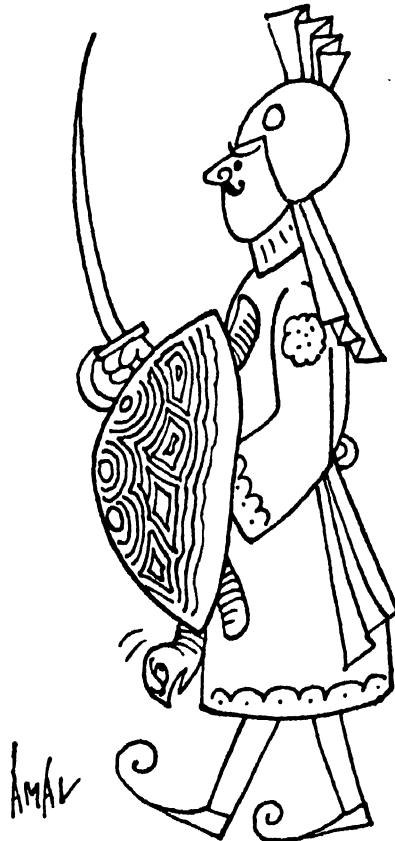
সুবিনয় রায়

আরেক রাত্রের গল্প। সেদিন রাত্রে মস্ত ভোজ হল। তারপর রাজামশাই গল্প আরম্ভ করলেন,—'যখন লঙ্কাদ্বীপে গিয়েছিলাম তখন আমার বয়স বেশি নয়। শিকারের সখ খুবই ছিল; তাই সেখানকার রাজকুমারকে নিয়ে একদিন শিকারে বের হলাম। তাঁর সে দেশে চলাফেরা করা অভ্যাস, পথঘাট বেশ জানা আছে; কাজেই তিনি আগে চলেছেন, আমি পিছন পিছন যাচ্ছি। কিছু দূর গিয়ে একটা জঙ্গল; তারই মধ্যে শিকারের সন্ধানে চলেছি। ঠিক জঙ্গলটার সামনে আসতেই দেখি প্রকাণ্ড একটা সিংহ আমারই দিকে গুঁড়ি মেরে আসছে। আমার তো চক্ষু স্থির। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলাম, মাথা ঘুরতে লাগল, গা ঝিমঝিম করতে লাগল। চোখে অন্ধকার দেখলাম।

সঙ্গে একটা বন্দুক ছিল, তাতে কেবল ছররা গুলি ভরা। তাড়াতাড়িতে সেই ছররা দিয়েই এক গুলি মেরে দিলাম। সিংহ তাতে আরো ভয়ানক রেগে আমাকে ধরতে এল। পিছন ফিরে পালাতে গিয়ে দেখি, একটা প্রকাণ্ড কুমীর এই বড় হাঁ করে আমাকে গিলে আর কি! তখনই আমি ভয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম, আর প্রতি মুহূর্তেই মনে হতে লাগল, যেন সিংহটা আমাকে ধরে খাবে। মিনিট খানেক যখন কিছু হলো না, তখন আমি চোখ মেলে পিছন দিকে চাইলাম। চেয়ে দেখি কি—সিংহটা লাফিয়ে একেবারে সটান কুমীরের মুখের মধ্যে গিয়ে পড়েছে, আর তার মাথাটা কুমীরের গলার ভিতরে গিয়ে আটকেছে। আমার তখন মনে পড়লো যে কোমরে একটা ছোরা আছে। অমনি সেটাকে বের করে নিয়ে সিংহের মাথাটা কেটে ফেললাম। তারপর বন্দুকের গোড়াটা দিয়ে সিংহের কাটা মাথাটা আচ্ছা করে কুমীরের গলায় ঠেসে দিলাম;—কুমীরও দম বন্ধ হয়ে মারা গেল।

আরেকদিন সন্ধ্যার সময় জঙ্গলের ধার দিয়ে বাড়ী ফিরছি, এমন সময় দেখি, একটা প্রকাণ্ড নেকড়ে আমাকে ধরবার জন্য দাঁত খিঁচিয়ে হাঁ করে এক হাত জিভ লকলক করতে করতে ছুটে আসছে। আমি তো থতমত খেয়ে গিয়ে আর কিছু সামনে না পেয়ে, নিজের ডান হাতখানাই নেকড়েবাঘের মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে, আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে গেলাম। হাতটা গলার ভিতর দিয়ে একেবারে সটান পেটের মধ্যে চালিয়ে দিলাম, নেকড়ে ভায়াও মহা ফাঁপড়ে পড়ে গেল; না পারে কামড়াতে না পারে হাত বের করে ফেলতে। কিন্তু এভাবে আর কতক্ষণ চলে? আমি কেবল ভাবতে লাগলাম 'এর পর কি করা যায়'! বুদ্ধিমানের বুদ্ধি জোগাতে কতক্ষণ আর লাগে? চট করে একটা উপায় মাথায় এসে পড়ল। আমি করলাম কি, পেটের মাংস চিমটে ধরে এইসা এক টান দিলাম যে, নেকড়ের ছালের ভেতর থেকে সব মাংস উল্টে বাইরে বেরিয়ে এল—ঠিক যেন পা থেকে মোজা বেরিয়ে এল। নেকড়ে ভায়া সেখানে ঐ অবস্থাতেই পড়ে রইলেন, আমি আস্তে আস্তে বাড়ি চলে এলাম।

নেকড়ের বেলা যে বুদ্ধি খাটালাম, পাগলা কুকুরের বেলায় সে বুদ্ধি খাটাতে পারিনি। ভীষণ শীতে একদিন পথ চলতে চলতে পাগলা কুকুরে আমাকে তাড়া করল। আমি তো চোঁচা দৌড় লাগালাম ; কিন্তু কুকুরও দেখি আমারই সমান দৌড়ায়। উপায় না দেখে, হাতে একটা বাঘছালের জামা ছিল, সেটা কুকুরের মুখের সাম্নে ফেলে দিলাম। ঘ্যাঁক করে কামড়ে ধরতেই আমি সরে পড়লাম। বাড়ী ফিরে চাকরকে বললাম, কোটটা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে দেরাজে রেখে দিতে। দু'দিন বাদে, চাকর হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে বল্‌ল—'মহারাজ, আপনার কোট পাগল হয়ে গেছে।' গিয়ে দেখি, সত্যি সত্যিই কোটটা পাগল হয়ে দেরাজের অন্য কাপড়-জামাদের আক্রমণ করছে। পাগল কুকুরের কামড় বড় সহজ নয়।
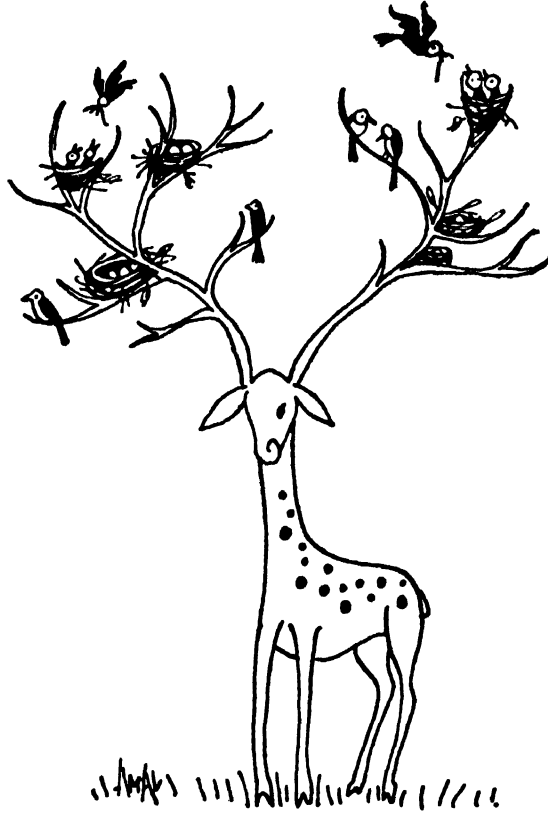
জীবন সর্দার

বর্ষাকালের দশটা খবর আমার কাছে নীলাঞ্জন জানতে চেয়েছিল। আষাঢ় সংখ্যায় সে দশটা প্রশ্ন আমি পড়ুয়াদের জানিয়েছিলাম। তাদের কাছ থেকে বেশ কিছু উত্তরও পেয়েছি। পড়ুয়াদের দেওয়া ঠিক ঠিক উত্তরগুলো নীচে দিলাম :

(এক) বর্ষাকালের হাওয়া দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে আসে।

(দুই) যে মেঘগুলো থেকে বৃষ্টি হয় তাদের রং ধূসর থেকে কালো। তাদের চেহারা হয় আকাশ-জোড়া।

(তিন) সব রকম মেঘ থেকে একই রকম বৃষ্টি হয় না।

(চার) সব রকম পাতা বর্ষায় একই রকম ভেজে না।

(পাঁচ) বর্ষায় সব জায়গার মাটি একই রকম ভেজেনা!

(ছয়) বর্ষাকালে দিনে ও রাতে একই জাতের পোকা দেখা যায় না। রাতে আলোর কাছে যারা উড়ে আসে দিনে তারা আড়ালে থাকে। বর্ষাকালের পোকা অন্য সময়ে দেখা যায় না।

(সাত) সব জাতের ব্যাংএর ডাক এক রকম নয়।

(আট) ভেজা স্যাতসেতে জায়গায়ই ব্যাঙের ছাতা গজায় বেশী। (ভেজা কাঠ বা গাছের গায়েও কেউ কেউ হতে দেখেছে। সব পড়ুয়াই তার চার পাশে তিন চার ধরনের ছাতা দেখেছে।)

(নয়) কেউ পারেনি এই প্রশ্নটার উত্তর দিতে। (মেঠো বা গো-বকের দিকে সব পড়ুয়াই নজর রেখ, সামনের বর্ষায় এদের রং হেরফের হয় কিনা দেখবে।)

(দশ) বর্ষায় কামিনী, কদম, দোপাটি, গন্ধরাজ, বেল, যুঁই, চামেলি, চাঁপা, মাধবীলতা, টগর ইত্যাদি ফুলগুলোই বেশী দেখা যায়। বর্ষাকালে ফুলে রংএর বাহারের চেয়ে গন্ধের বহরই বেশি।

* যে যে পড়ুয়া তাদের ঠিক ঠিক উত্তরের সাথে যুক্তি ও প্রমাণ দেখিয়েছ তাদের নাম :

অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা। কল্লোল ভট্টাচার্য, কলকাতা। রূপা মিত্র, কলকাতা। মিতালি দত্ত, কলকাতা। আশিষ কুমার দে, বহরমপুর।

* নতুন পড়ুয়া :

(৯২) গৌতমী ভট্টাচার্য, কলকাতা। (৯৩) ইন্দ্রজিৎ দাশগুপ্ত, বাগনান। (৯৪) নীহারিকা মণ্ডল, শ্রীপুর, ২৪ পরগনা। (৯৫) অমিয় কুমার বসু, শান্তিনিকেতন। (৯৬) অংশুমান রায়, শান্তিনিকেতন।

(একটি গবেষণার বিষয়)

শেয়াল কাঁটার ঝোপে সে আড়াল হয়ে গেল। গায়ে ডোরা-কাটা মাছিটার কথা বলছি।

ফুল বাগান থেকে পথে, পথ থেকে এই ঝোপে তার পিছু পিছু ছুটেছি—শুধু দেখতে কোন ফুলে সে বসে।

লাল, নীল, বেগুনি, সাদা কোন ফুলে সে বসল না। উপর উপর উড়ে গেল। তারপর এল শেয়াল-কাঁটার ঝোপে।

ঝোপের পাশে একটুক্ষণ থমকে দাঁড়ালাম। তারপর ঝোপের মধ্যে ঢুকতেই দেখি—শেয়াল-কাঁটার হলুদ ফুলের পাপড়িতে সে বসে আছে। সারা গায়ে পায়ে তার 'রেণু' মাখা।

ঘটনাটা একবার 'বাঁকা চোখে' দেখবার চেষ্টা কর : একটা মাছি হলুদ রং ছাড়া কোন ফুলে বসল না।

ফুলটির গন্ধ প্রায় নেই কিন্তু রেণু তার যেন অফুরন্ত। পাপড়িতেও অনেকখানি ঝরে পড়ে।

ফুলে ফুলে যত জাতের মাছি, মথ বা প্রজাপতি, ফড়িং আর পিঁপড়ে এসে বসে আর মধু খেয়ে রেণু মেখে উড়ে যায়, তাদের সবারই কি এমনি বিশেষ একটি ঝোঁক আছে যে, বিশেষ রং এর বিশেষ ফুল ছাড়া বসবে না!

না থাকাটাই অস্বাভাবিক। সেই খবরটা জানার চেষ্টা করলেই একটা গবেষণার দায়িত্ব কাঁধে এসে পড়বে।

উল্টোদিক থেকে দেখলে কেমন দেখায় ব্যাপারটা :

হয়তো ফুলের গড়ন এমন, পাপড়ির রং এমন, গন্ধ এমন, রেণু ও মধু এমন যে, একজাতের পতঙ্গকে সে, ডেকে বলছে 'এস বস আহারে'। অন্য জাতের কাছে সেটাই যেন 'প্রবেশ নিষেধ' এর বিজ্ঞাপন।

দুটো দিক এবার একসাথে পাশাপাশি রেখে সোজাসুজি দেখলে কি হয় :

ফুলগুলি সব এমন যে বিশেষ জাতের পতঙ্গ ছাড়া তার কাছ থেকে মধু বা রেণু পাওয়া অসম্ভব। অথবা, পতঙ্গদের মুখের গড়ন এমন যে বিশেষ জাতের ফুলের বুক থেকেই তাদের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধে মধু বা রেণু খেতে।

এই ধারণাটুকু নিয়ে আমরা আমাদের গবেষণার দিকে এগোতে পারি। গবেষণার বিষয়—কোন ফুলে কোন পতঙ্গের যাওয়া আসা। কার কি সুবিধে তাতে।

গবেষণার সময় নজর রাখতে হবে :

(১) যে, ফুলটিতে পরাগ বা ফুলের রেণু পাপড়ি না সরিয়ে সহজেই দেখা যায় কি না। যে সব পতঙ্গের ফুলের বুকে লুকিয়ে থাকা মধু খাবার মুখ নেই রেণু-খেকো সেই পতঙ্গদের ভিড় হবে এখানে।

(২) যে, ফুলটিতে 'মধু-ভাণ্ড' কতখানি গোপনে বা গভীরে রয়েছে। গভীর মধু-ভাণ্ড থেকে মধু শুষে খেতে প্রজাপতির সুবিধে। গোপন মধুর সন্ধানে মৌমাছি তৎপর।

(৩) যে, ফুলটির গন্ধ বেশি না রং বেশি। গন্ধওলা ফুল রাতেই ফোটে বেশি। মথ বা নিশাচর

প্রজাপতির আনাগোনা রাতেই। কিন্তু রাতে রংএর বাহার কে দেখে। সাদা রংটা তাই নজরে আসে বেশি। নিজের নিজের গায়ের রং বা ডানার রং মিলিয়ে কি কোন কোন পতঙ্গ ফুল বেছে নেয়?

আমাদের গবেষণায় পতঙ্গের রূপ নিয়ে কিছু ভাবনার কারণ আছে। বিশেষ করে তার মুখের আকার নিয়ে।

মধুর লোভে 'অলি' আসে। আরও যে কত জাতের মাছি, মথ, প্রজাপতি আর পিঁপড়ে আসে তার হিসেব নিকেশ নেই। যারা আসে, আশ্চর্যের বিষয়, তাদের সবার দেহের রং আর মুখের আকার এক নয়। তাই নিজের নিজের সুবিধে মত তারা বিশেষ বিশেষ ফুল বেছে নেয়। ফুলেই তাদের খাবার।

কোন পতঙ্গের মুখের আকার কি—ছোট জিভ, বড় জিভ, নলওলা না শুঁড়ওলা, তা যদি বুঝতে পারি তবে খাবার লোভে কোন ধরণের ফুলে গিয়ে সে বসবে তা বুঝতে কষ্ট হবে না।

কোন ফুলে কি পতঙ্গ বসে সে খবর জানার সাথে সাথে, সেই ফুল থেকে সে কি বয়ে নিয়ে যায় তাও জানা হয়ে যাবে। ফুলে পতঙ্গের এসে বসা আর উঠে আসা, মাঝখানে এই মুহূর্তটুকু লক্ষ্য করাই আমাদের আসল উদ্দেশ্য। ফুলের ফুল থেকে ফল বা বীজ-পরিণতির গোপন তথ্যটুকুর অনেকখানিই আমাদের জানা হয়ে যাবে তখন।

এর আগে প্রকৃতি পড়ুয়াদের স্বাধীন ভাবে গবেষণা করার কোন বিষয় দেওয়া হয় নি। তোমাদের কাছাকাছি জানা অজানা ফুল ও পতঙ্গের সম্পর্ক নিয়ে এবার তোমাদের মাথা ঘামাতে বলছি। খোঁজ নিতে বলছি। গবেষণার ফল নিয়মিত দপ্তরে জানিয়ে দিও।

(পুর্ব প্রকাশিত অংশের চুম্বক)

পৃথিবীর আসন্ন প্রলয়ের সম্ভাবনায় কয়েক লক্ষ লোক মহাকাশ-যান করে অন্য এক সূর্যমণ্ডলীতে, অনেকটা পৃথিবীব মতো এক গ্রহে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। এই ঘটনার দু'শ বছর পরে সেই গ্রহে প্রশান্ত, চিয়েন, মরিশ ও ফিসার নামে চার বন্ধু কলেজের শেষ পরীক্ষার পরে প্রফেসার সোমোরেনের সঙ্গে পুরোনো পৃথিবীতে যাবার এক অভিযানে যোগ দেবার সুযোগ লাভ করল। মহাকাশ যানে করে চার বৎসরের মতন রসদ সঙ্গে নিয়ে তারা রওনা হয়ে পড়ল। তিন মাস পরে তারা একটা চৌম্বক ক্ষেত্রের কাছাকাছি এসে পৌঁছল, যেখানে দু'শ বৎসর আগে তাদের পুর্বপুরুষেরা বিপদে পড়েছিলেন।

এই চৌম্বক ক্ষেত্রের আকর্ষণী শক্তির প্রভাব কাটাতে না পেরে সেই হারানো দলের মতো তারাও কি কক্ষপথ হারিয়ে মহাশূন্যে অন্য কোথাও চলে যাবে ?

তেরো

ঠিক এমন সময় প্রফেসার সোমোরেন খবর দিলেন রাডারে বোঝা গেছে যে দুটো বড়ো উল্কাপিণ্ড আমাদের যানটির দিকে ছুটে আসছে আর ক্যালকুলেটার যন্ত্রে তাদের গতিপথ হিসাব করে দেখা গেছে সে দুটি আমাদের গতিপথ ভেদ করে সেই চৌম্বক ক্ষেত্রের কেন্দ্রের দিকে চলেছে। কিন্তু যে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র আমাদের গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করছে, সেটি নিজে থেকেই আমাদের যানের গতিপথ ঘুরিয়ে দিয়ে উল্কা দুটির পাশ কাটিয়ে আবার নির্ধারিত পথে ফিরিয়ে আনবে, কাজেই সংঘর্ষ হবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

দেয়ালের গায়ে সুইচ টিপলে যে স্বচ্ছ আরশীটা বেরিয়ে পড়ে, সেই জানলার ধারে আমরা মাঝে মাঝেই আসতাম আর চারদিকে আকাশ দেখতাম। এই জানলা দিয়েই লক্ষ্য করেছিলাম কেমন আস্তে আস্তে আমাদের সূর্যটি একটি ছোট নক্ষত্র বিন্দুতে পরিণত হয়ে গেল। আর কিছুদিন থেকেই আকাশে একটা নতুন জিনিস দেখতে পাচ্ছিলাম। প্রথমটা মনে হয়েছিল দুটো তারা খুব কাছাকাছি রয়েছে,

তাদের একটা অন্যটা থেকে অনেক কম উজ্জ্বল। এখন সে দুটোকে মনে হয় জোড়া সূর্য, তার একটা খুব ঘোর রংয়ের। অন্যটির থেকে এটির জ্যোতি অনেক কম।

ডাক্তার প্যাপেন আমাদের সকলকে ডেকে এদুটিকে যখন প্রথম দেখান, তখনই বলে দিয়েছিলেন এই সেই ক্রুগার ৬০, এরি চারিদিকে সেই মারাত্মক চৌম্বক কেন্দ্র। উল্কাপিণ্ড দুটিকে জ্বলন্ত গোলার মতন আমাদের দিকে আসতে দেখে বেশ ভয় হয়েছিল। মনে মনে রাগ হয়েছিল প্রফেসারের উপর, এই রকম সাংঘাতিক বিপদ সামনে আর ওঁরা কি না একটা সামান্য যন্ত্রের উপর আমাদের সমস্ত ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে অন্য কাজ করে চলেছেন। কথায় বলে সাবধানের মার নেই, প্রফেসার নিজে হাল ধরলেই ত ভাল হত।

মরিশকে আমার মনের কথা বলাতে সে বলল 'যে বিষয়ে কিচ্ছু জান না তাই নিয়ে মাথা কেন ঘামাচ্ছ। মানুষের ভুলচুক হতে পারে কিন্তু ঐ যন্ত্রটি নির্ভুল।' খুব যে একটা আশ্বাস পেয়েছিলাম তা নয়, কিন্তু যখন দেখলাম উল্কা দুটি অন্য দিক দিয়ে চলে গেল আর আকাশের তারাগুলিকে আবার তাদের আগের জায়গায় দেখা যাচ্ছে, তখন স্বীকার করতেই হল, ওটি একটা অদ্ভুত যন্ত্র, মানুষের মতন হিসাব করে কাজ করে।

ডাক্তার ফষ্টারের কাছ থেকে খবর পাবার পর থেকেই ইঞ্জিনঘরে রাডারযন্ত্রের সামনে আর ভিসোফোন যন্ত্রটির সামনে আমরা সবাই আনাগোনা সুরু করলাম। যাঁদের ওপর এই যন্ত্র দুটির উপর নজর রাখার ভার তাঁরা ত রয়েছেনই, এর উপর আমরাও কেউ কেউ পালা করে যন্ত্রের পর্দায় অন্য কিছু নতুন ছাপ পড়ে কি না, তাই দেখতে সুরু করলাম।

সবারই মনে বেশ একটু উৎকণ্ঠার ভাব রয়েছে, সেজন্য কেউ কেউ যখন একটা নতুন কিছুর ছায়া দেখতে পেয়েছেন বলে খবর দিতেন তখন ভয়টা একটু বাড়ত আবার তার পরের দল যখন এসে বলতেন তাঁরা কিছুই দেখতে পান নি, তখন সকলেই একটু স্বস্তি পেতাম।

ডাক্তার ফষ্টারের হিসাবের দুদিনের প্রায় ৩৬ ঘণ্টা কেটে যাবার পর প্রফেসার সোমোরেন সকলকে ডেকে বল্লেন 'আমাদের পৃথিবীর সঙ্গে খবর দেওয়া নেওয়া যন্ত্রে একটু গোলমাল দেখা দিয়েছে, মাঝে মাঝে সংকেতের জোর খুব বেড়ে যাচ্ছে আবার মাঝে মাঝে সেটা একেবারে ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। রাডারের পর্দায় মাঝে মাঝে একটা নতুন ছাপের আভাস পাওয়া যাচ্ছে আর আমাদের দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের কাঁটা তার বাঁধা জায়গা থেকে সামান্য একটু সরে গেছে। খুব সম্ভব উল্কা দুটো থেকে বাঁচাবার জন্য আমাদের যেটুকু গতিপথ বদলান হয়েছিল তাতে যন্ত্রটি চৌম্বক ক্ষেত্রের অনেকটা ভিতরে গিয়ে পড়েছিল। ফলে স্বয়ংক্রিয় ক্যালকুলেটার যন্ত্রটি আমাদের একেবারে সঠিক নির্ধারিত পথে ফিরিয়ে আনতে পারে নি। বেশী গোলযোগ দেখা দিলে বিপদসূচক ঘণ্টা পড়বে তখন সকলেই সেই বিশেষ জামা পরে নেবেন আর যাদের উপর কোন কাজের ভার নেই, তাঁরা সকলেই বসবার কেবিনে জমায়েত হবেন।

এই বলে প্রফেসার সোমোরেন ইঞ্জিনঘরে চলে গেলেন আর আমরা নিজেদের কেবিনে এসে সেই বিশেষ জামা বার করে রাখলাম, যাতে চটপট জামা পরে নিতে পারি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বিপদ

অন্য গ্রহের আমি
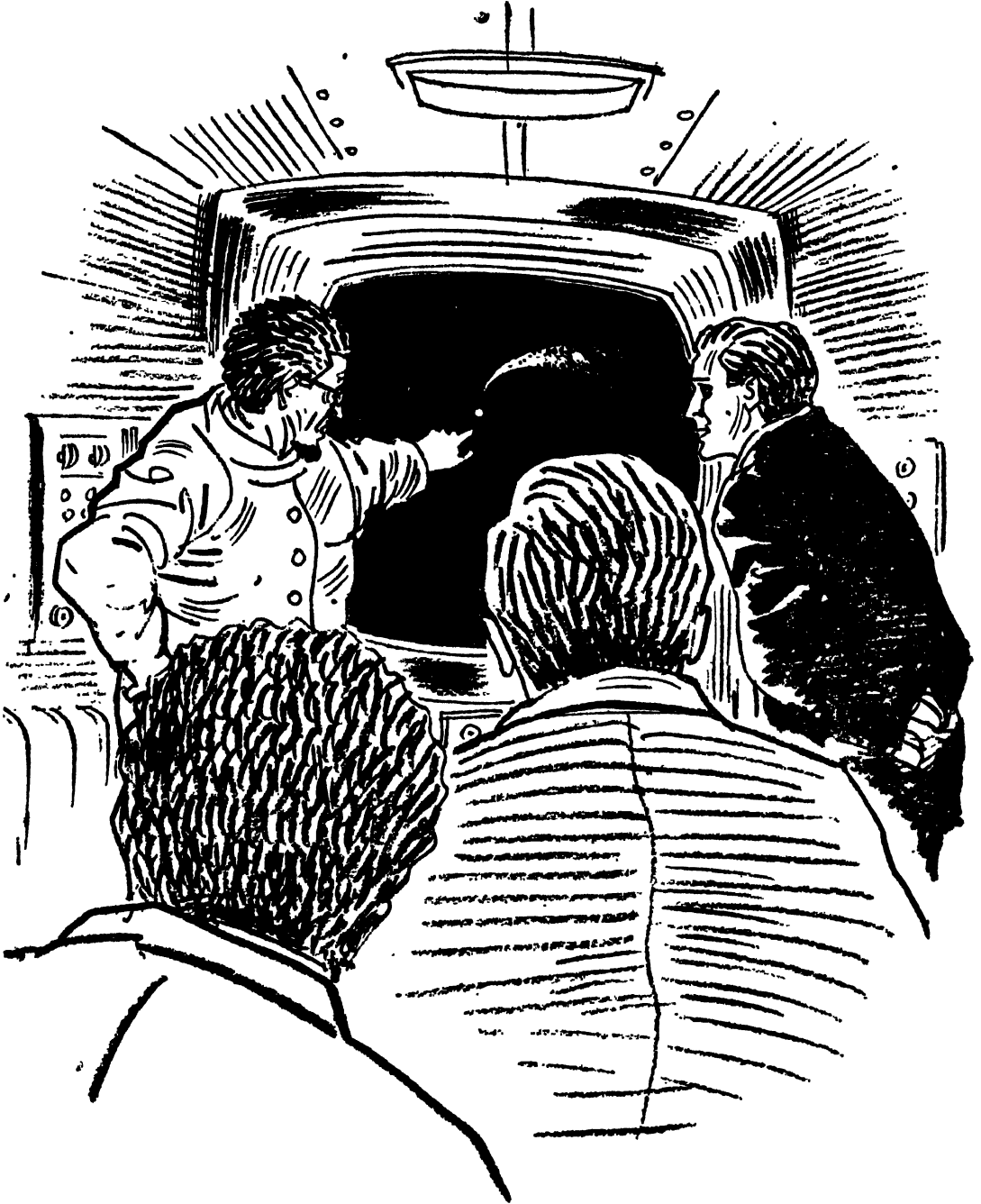
সংকেত বেজে উঠল আর আমরাও সেই পোষাক পরে বসবার কেবিনে গিয়ে জমা হলাম।

খবর খুব খারাপ, আমাদের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। রাডারের পর্দায় ঘন ঘন আলোকবিন্দু ভেসে উঠছে আর নিভে যাচ্ছে। যে স্বয়ংক্রিয় ক্যালকুলেটার যন্ত্রের সাহায্যে আমাদের যানটি ডাক্তার ফষ্টারের নির্দিষ্ট পথে একটানা চলেছিল সেই যন্ত্রটিতেও যেন গোলমাল হচ্ছে। গত তিন ঘন্টা থেকে ডাক্তার রোমানভ ক্যালকুলেটার যন্ত্রের সামনে রয়েছেন, প্রফেসার হ্যারল্ড ভিসোফোনের সামনে আর ডাক্তার ভন প্যাপেন আর প্রফেসার সোমোরেন নিজে ইঞ্জিনঘরে রয়েছেন

হ্যারিশ একবার এসে বলে গেল যে আমাদের যানটির গতিবেগ ক্রমশই কমে যাচ্ছে আর যানটি যেন এই চুম্বকক্ষেত্রের কেন্দ্রের দিকে যাবার চেষ্টা করছে। কারোর কিছু করার নেই, আমরা এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে আছি। ইঞ্জিনঘর বা অন্য কোন ঘর থেকে কেউ বের হলেই তাড়াতাড়ি তার মুখের দিকে তাকিয়ে স্বস্তির আভাস খুঁজি, কিন্তু সে মাথা নেড়ে অন্য ঘরে ঢুকে পড়ে।

ডাক্তার রোমানভের অঙ্ক কষা শেষ হল, তিনি ক্যালকুলেটার ছেড়ে দিয়ে প্রফেসার সোমোরেনের কাছে ইঞ্জিনঘরে চলে গেলেন আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার ভন প্যাপেন ক্যালকুলেটার যন্ত্রের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

টেলিভিসোফোনের পর্দায় এখন আর শুধু আলোকবিন্দু দেখা যাচ্ছে না, কালবৈশাখীর ঝড়ের সময় যেমন আকাশের এক মাথা থেকে অপর মাথা পর্যন্ত বিদ্যুৎ চমকানির আঁকাবাঁকা রেখা মেঘের বুক চিরে ঘন ঘন দেখা দেয়, ঠিক সেই রকম আঁকাবাঁকা রেখা একটার পর একটা অনবরত ফুটে উঠছে। এই গোলযোগ সুরু হবার অল্প পর থেকেই আমাদের যানটির ভিতরেও কি রকম একটা শব্দ হচ্ছিল আর তাপ মাত্রাও অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল।

আধ ঘন্টা এই রকম উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটানোর পর নিকলসন এসে খবর দিল, 'প্রফেসর আপনাদের সকলকে জানাতে বললেন যে আমাদের যানটির গতিবেগ অনেক কমে গেছে আর এই চৌম্বকক্ষেত্রের কেন্দ্রের দিকে যাবার চেষ্টা অনেক বেড়ে গেছে। এইবার চুম্বক শক্তির দুর্নিবার আকর্ষণ থেকে মুক্তি পাবার শেষ চেষ্টা করা হবে। সমস্ত আলো নিবিয়ে দেওয়া হবে, অন্যান্য সব বৈদ্যুতিক যন্ত্র থামিয়ে দেওয়া হবে। পূর্ণ বৈদ্যুতিক শক্তি ইঞ্জিনঘরে নেওয়া হবে, সমস্ত মোটর জেট, রকেট সব কিছু পুরো দম চালাবার জন্য। আপনারা সকলেই সেই বিশেষ জামা পরে যেমন ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল সেই ভাবে পোষাকের যন্ত্রগুলি এখনি চালু করে নিন। হাতে কিন্তু মোটেই সময় নেই।'

নিকলসন বেরিয়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে বাতিগুলোও নিবে গেল। ঘর অন্ধকার হয়ে গেল, সে অন্ধকার যা কখনো কল্পনাও করতে পারি নি। সূচিভেদ্য অন্ধকার কথাটা বইয়ে পড়েছি। একটু অতিরঞ্জিত বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু অন্ধকার যে কঠিন, জমাট—এ যে চারদিক থেকে নাগপাশের মতন আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে। শীততাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বন্ধ করার দরুণ ঘরটা হিম শীতল হয়ে পড়ল—

বিশেষ জামাটি পরা আছে বলেই কোনমতে আমরা প্রাণ নিয়ে বেঁচে রইলাম। সকলেই বুঝতে পারছি বাঁচবার শেষ চেষ্টা হচ্ছে, অথচ নিজেদের করার কিছু নেই।

সেই গভীর অন্ধকারে চুপ করে বসে কতক্ষণ কেটে গেল খেয়াল নেই, এমন সময় ফিসার হঠাৎ বলল, 'আরে সেই আওয়াজটা অনেক কমে গেছে বলে মনে হচ্ছে না?' তখন সকলে খেয়াল করলাম সত্যিই ত আওয়াজটা অনেক কম। একটু ক্ষণ পরেই একটা ছুটো করে বাতি জ্বলে উঠল আর ডাক্তার রোমানভ নিজে এসে খবর দিলেন, 'দেখুন আপাততঃ বিপদ কেটে গেছে। চৌম্বকক্ষেত্রের প্রভাব কাটিয়ে আমাদের যানটি আবার চলতে সুরু করেছে। তবে এই আকর্ষণে আমাদের যানটি তার নির্দিষ্ট পথ থেকে কতটা সরে গেছে, সেটা এখনও বলা যাচ্ছে না। এইবার নতুন করে হিসাব সুরু হবে, কতটা সরে গেছে তার হিসাব মেলাতে হবে, তারপর নতুন করে যাত্রাপথ ঠিক করতে হবে। তবে এটা ঠিক, এখন কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই, আপনারা নিজের কেবিনে বিশ্রাম করতে পারেন।

এতক্ষণে সকলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। এই চৌম্বকক্ষেত্র সম্বন্ধে খুব সামান্যই জানা ছিল, শুধু জানা ছিল যে এর কেন্দ্রে দুটি তারা আছে আর তাদের মধ্যে একটি ঘোর রংয়ের। তা ত' এবার আমরা সকলে নিজেদের চোখে দেখলাম। তারপর রং ঘোর হওয়া মানে সেটা তেমন আলোকরশ্মি বিকিরণ করতে পারে না বটে, কিন্তু ওটি থেকে খুব বেশী পরিমাণ অতি লাল রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। এবার এই জোড়া তারার সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ হয়েছে আর সে সব যখন বিশ্লেষণ করা হবে তখন সে বিষয়ে অনেক নতুন খবর পাওয়া যাবে বলে প্রফেসার সোমোরেন আশা করছেন।

কটা দিন বেশ শান্তভাবেই কেটে যাবার পর, প্রফেসার সোমোরেন খবর দিলেন যে তাঁদের হিসাব শেষ হয়েছে আর নতুন যাত্রাপথের নির্দেশও ঠিক করা হয়ে গেছে। আমাদের আগেকার হিসাব মত আর মাস কয়েকের পথ বাকি থাকার কথা কিন্তু এই চৌম্বকক্ষেত্রের আকর্ষণে পড়ে যে পথ বিচ্যুতি ঘটেছে তাতে মনে হচ্ছে আমাদের এখন আরও বছর খানেকের মতন সময় লাগবে। ওঁরা মনে করছেন যে আর দিন দশেক পরেই আবার আমাদের জগতের সঙ্গে টেলিভিসোফোনে যোগাযোগ ফিরে পাওয়া যাবে।

এই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়াতে নিশ্চয়ই ডাক্তার ফষ্টার ও তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে বেশ একটা আলোড়ন পড়ে গেছে। তবে এমনও হতে পারে যে ওখানকার প্রচণ্ড শক্তিশালী টেলিলোকেটার ও অন্যান্য যন্ত্রগুলির সাহায্যে তাঁরা আমাদের বিপদের কথা জানতে পেরেছিলেন আর কোন রকম সাহায্য করার অক্ষমতায় নিশ্চয়ই বিচলিত হয়ে পড়েছেন।

দিন আষ্টেক কেটে যাবার পর থেকেই আমরা মাঝে মাঝে খোঁজ নিতে লাগলাম আমাদের জগত থেকে কোনো খবর পাওয়া গেল কি না। এগারো দিন কেটে গেল, অথচ তখন পর্যন্ত কোনো খবরই নেই, আমরাও আবার সংশয়ের মধ্যে পড়লাম। আমাদের অনেকেরই তখন ঘুম আর খাওয়া মাথায় উঠল, সমস্তক্ষণ বসবার কেবিনে চুপ করে বসে থাকা আর মাঝে মাঝে ভিসোফোনে খবর পাওয়া গেল কি না খোঁজ নেওয়া, এই দাঁড়াল একমাত্র কাজ।

চোদ্দ

এবার অনেকেরই সন্দেহ হতে লাগল যে ডাক্তার রোমানভের অঙ্ক কষায় নিশ্চয়ই কোন ভুল আছে তা নইলে এখনও কেন আমাদেয় জগত থেকে কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। প্রফেসার সোমোরেন, ডাক্তার রোমানভ, ডাক্তার ভন প্যাপেন ও আরো জন দুই বিশেষজ্ঞ মিলে আবার নতুন করে হিসাব সুরু করেছেন। তবে নিকলসনের কথায় বুঝতে পারলাম ওরা হিসাবে কোনো ভুল পাচ্ছেন না।

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ হতাশ হয়ে বলতে সুরু করেছেন যে এই মহাশূন্যে আমরা অনির্দিষ্ট দিকে কোথায় ছুটে চলেছি কেউ জানে না। খাবার দাবার সব যখন ফুরিয়ে যাবে তখনও আমরা এই ভাবে উদ্দেশ্যহীন হয়ে ছুটে চলব, শেষ পর্যন্ত এই যানটিই হবে আমাদের সকলের শবাধার। আর এই শবাধার অনন্তকাল ধরে মহাশূন্যে ছুটেই চলবে।

এঁদের কথায় মনে যেমন একটু ভয় উকি মারতে আরম্ভ করল, তেমনি আবার ওদের উপর রাগও হতে লাগল। প্রফেসার সোমোরেনের ওপর যদি এইটুকু বিশ্বাসই না থাকে তাহলে তাঁরা কেন এই রকম একটা অভিযানে বের হলেন।

আরও দুদিন কেটে গেল, অবস্থার কোনো উন্নতি নেই, এমন সময় মরিশ হ্যারিশকে কি একটা বলাতে দেখলাম সে তাড়াহুড়ো করে প্রফেসার সোমোরেনের কাছে চলে গেল। মরিশকে জিজ্ঞাসা করাতে সে একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়াতে সেটা আমি হ্যারিশকে জানিয়েছি।' কিন্তু কি সে কথাটা বলতে রাজী হল না, খালি বলল, 'দাঁড়াও না, আগে দেখি হ্যারিশ এসে কি বলে, তারপর তোদের বলব।'

তবুও যখন আমরা একেবারে নাছোড়বান্দা হয়ে ওকে চেপে ধরলাম, তখন ও বলল, ঐ শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্রের পাল্লায় পড়ে আমাদের যানটির যখন এইরকম নাজেহাল হয়েছিল তখন আমাদের টেলিভিসোফোনের সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক তরঙ্গগুলি চুম্বকক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে আসবার সময় নিশ্চয়ই খুব বেশী রকম বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল, এই কথাটাই গত চার পাঁচদিন ধরে আমার মাথায় ঘুরছে। তরঙ্গগুলি কতটা বিক্ষিপ্ত হতে পারে সেটা প্রফেসার সোমোরেন, ডাক্তার রোমানভ এরা নিশ্চয়ই হিসাব করেছেন। আর সেই হিসাব মতই বলেছিলেন দিনদশেক পরে আমাদের জগতের সঙ্গে আবার যোগাযোগ সুরু হবে। দশদিন ছেড়ে প্রায় পনেরদিন হয়েছে তবু এতদিনেও যোগাযোগ না হওয়াতে আমার সন্দেহের কথাটা হ্যারিশকে বললাম।

তোদের কাছে বলতে লজ্জা করছিল, তোরা আবার কি ভাববি, ডাক্তার সোমোরেনের ভুল ধরতে চাইছি।'

এমন সময় ডাক্তার রোমানভ এসে মরিশকে খুব বাহবা দিয়ে বললেন মরিশ ভাগ্যিস্ তুমি সাহস করে তোমার সন্দেহের কথাটা বলেছিলে, নইলে আমরা বার বার হিসাব করেও কোনো ভুল পাচ্ছিলাম না। তরঙ্গ বিক্ষেপের সম্ভাবনার কথাটা আমাদের কারোই মনে হয়নি, বিক্ষিপ্ত যে হবেই সে

খেয়াল পর্যন্ত কারো হয়নি। যখন থেকে ভিসোফোনে সামান্য গোলমাল প্রথম বোঝা গিয়েছিল তখন থেকেই বৈদ্যুতিক তরঙ্গগুলি বিক্ষিপ্ত হতে আরম্ভ করেছিল ধরে নিয়ে, এইবার নতুন হিসাব সুরু হয়েছে। এই গোলমালের সুরু আমরা কানে বুঝতে পারার আগে থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। ক্যালকুলেটার যন্ত্রের টেপরেকর্ড আবার চালিয়ে সঠিক সময়ের হিসাব পাওয়া গেছে আর ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই হিসাব শেষ হয়ে যাবে।

এই কথা বলে ডাক্তার রোমানভ আবার প্রফেসার সোমোরেনের ঘরে চলে গেলেন। আমরাও খুব খুসি আমাদের দলের একজন সবার উপর টেক্কা দিয়ে এমন একটা কাজ করে ফেলেছে! ঘণ্টা দুই পরে হ্যারিশ এসে বলল খুব ক্ষীণ সাংকেতিক খবর মাঝে মাঝে ধরা পড়ছে আর প্রফেসার আশা করছেন অল্পক্ষণের মধ্যেই পরিষ্কারভাবে সংকেত পাওয়া যাবে। তখন বোঝা যাবে আমরা আমাদের সাবেক নির্দিষ্ট পথ থেকে কতটা সরে গিয়েছি।

আমাদের করার কিছুই নেই, যেই খবর পাওয়া গেছে আবার যোগাযোগ হয়েছে তখন থেকেই উৎকণ্ঠাও কমে গেছে। কাজেই এবার সবাই নিশ্চিন্ত মনে যে যার কেবিনে ফিরে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি অবাক কাণ্ড, চিয়েন ঘুমোচ্ছে আর দেখে বোঝা যাচ্ছে সে বেশ ঘণ্টাকয়েক ধরেই ঘুমোচ্ছে! মনে মনে হিংসা হল চিয়েনের এই অদ্ভুত ক্ষমতার জন্য। আমরা সকলে খবরের আশায় খাওয়া ঘুম সব ভুলে গিয়ে উদগ্রীব হয়ে এ ক'ঘণ্টা কাটিয়েছি আর চিয়েন কিনা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে কাটাল! এমন একটা উদাহরণ দেখে কে আর না ঘুমিয়ে থাকতে পারে, আমরাও শুয়ে পড়লাম আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

বারো চোদ্দ ঘণ্টা একটানা ঘুমাবার পর যখন হ্যারিশের ডাকে ঘুম ভাঙ্গল তখন বেশ ক্ষিদে পেয়েছে। গত ৩০।৪০ ঘণ্টা কি রকম উৎকণ্ঠার মধ্যে গেছে সে কথাত বলাই হয়েছে। সে সময়টাতে খাওয়া বা ঘুম কোনটার কথাই মনে ছিল না, তারই ফলে এই ঘুম আর এই খিদে। গত কয়েকদিন এই গণ্ডগোলে আমাদের যে বাঁধা নিয়মে চলবার কথা তা প্রায় কেউই পালন করে নি। খাবার ঘরে গিয়ে দেখি অনেকেই আমাদের মতন ১২।১৪ ঘণ্টা ঘুমিয়ে সবে খেতে বসেছে।

খাবার ঘরে এসে বসার পর প্রফেসার সোমোরেন খবর দিলেন 'গত ঘণ্টা দশেক থেকেই আমাদের জগতের সঙ্গে আবার পুরো যোগাযোগ স্থাপন হয়ে গেছে। সেখান থেকে ডাক্তার ফষ্টারও হিসাব করে আমাদের নতুন যাত্রাপথের নির্দেশ পাঠিয়েছেন, এখন পথে আর কোনো নতুন বিপদের আশঙ্কা নেই। দু চারটা উল্কাপিণ্ড অবশ্য সামনে এসে পড়লেও পড়তে পারে, তখন আমাদের স্বয়ংক্রিয় ক্যালকুলেটার যন্ত্রটি প্রয়োজন মত গতিবেগের বা গতিপথের পরিবর্তন করে সংঘর্ষ থেকে বাঁচাবে আর আবার সেই পুরোনো গতিপথেই আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। আমাদের দু'দলেরই হিসাব মতন দেখা যাচ্ছে যে এখনও আমাদের আর মাস আষ্টেক লাগবে পৃথিবীতে পৌঁছাতে।'

সোমোরেন আরো বললেন, ডাক্তার ফষ্টার এও জানিয়েছেন যে যতক্ষণ আমাদের যানটি ঐ চৌম্বক ক্ষেত্রের আকর্ষণের মধ্যে ছিল ততক্ষণ টেলিভিসোফোন যন্ত্রটি অচল হয়ে পড়লেও টেলিলোকেটার

যন্ত্রটিতে আমাদের যানটির খুব ক্ষীণ একটি ছায়া দেখতে পাচ্ছিলেন বলে তাঁরা আশা করেছিলেন যে আমরা তখনও বেঁচে আছি। টেলিলোকেটার যন্ত্রে চুম্বক শক্তির একটা পরিমাপ পাওয়া গেছে আর এই চৌম্বক ক্ষেত্রের নানারকম বৈচিত্র্যের সন্ধানও পাওয়া গেছে। আমাদের যানটির যন্ত্রগুলিতেও নানা তথ্য নিশ্চয়ই সংগৃহীত হয়েছে ধরে নিয়ে, ডাক্তার ফষ্টার এখন থেকেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন কবে তিনি সেই সব তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।'

ডাক্তার রোমানভ বললেন, 'এই গত কয়েকদিনের উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠার পর, আমাদের এখনকার সময়টা নিতান্ত নীরস লাগবে কিন্তু সেজন্য এখনকার রুটিন ভাঙ্গা চলবে না। শরীর আর মন সুস্থ রাখার জন্য সব দিক হিসাব করে আমাদের রুটিন তৈরী করা হয়েছে, এটা সবাইকে মেনে নিতেই হবে।'

খাবার পর যে যার কেবিনে ফিরে গেলাম। এরপর থেকে আবার সেই একঘেঁয়ে জীবন সুরু হল, সেই ঘড়ি ধরে খাওয়া, ঘুমানো, ব্যায়াম করা, গল্প করা বা একটু পড়াশুনা করা। ইতিমধ্যে ক্রুগার ৬০ এর জোড়া সূর্য ক্রমে ক্রমে একটি বিন্দুতে পরিণত হয়ে গেছে। শুধু চোখে আর বোঝাই যায় না যে ওখানে দুটি তারা আছে আর তাদের পরাক্রমে আমরা একদিন কি রকম বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম।

আমাদের এই একঘেঁয়ে জীবনে একটু বৈচিত্র্য আনবার জন্য মাঝে মাঝে প্রফেসার ডাক্তার ভন প্যাপেন বা ডাক্তার রোমানভ কিম্বা আর কেউ নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। মাঝে মাঝে চিয়েন কিম্বা আমার উপর হুকুম হত পুরোনো পৃথিবীর কোনো একটা ভাষায় আমাদের নিত্য ব্যবহার্য কয়েকশো কথার কি রূপ হবে তা শোনাবার।

এইভাবে দিন কাটতে লাগল। আমাদের মধ্যে অনেকেই সাবেক পৃথিবীর দুচারটা ভাষার কয়েক শো দরকারী কথা শিখে ফেললেন। মাসের পর মাস কেটে যেতে লাগল, আমাদের কাছে দিনগুলি একেবারে নীরস তবে প্রফেসার আর তাঁর সঙ্গীরা নানান কাজে যে রকম ব্যস্ত, তাতে বুঝতে পারতাম যে তাঁরা অনেক নতুন তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন।

ডাক্তার ফষ্টারের কাছ থেকে নিয়মিত খবর আসছে। নতুন খবরের মধ্যে তিনি জানিয়েছেন যে তাঁরা আরেকটি টেলিলোকেটার যন্ত্র বসিয়েছেন আমাদের জগতের দক্ষিণ মেরুমণ্ডলে। এবার দুটি যন্ত্রের সাহায্যে মহাশূন্যে যে কোনো সচল বস্তুর অবস্থিতি সঠিকভাবে নিরূপণ করা যাবে।

ইতিমধ্যে আরো তিন চারটা উল্কাপিণ্ড দেখা গিয়েছিল আর প্রত্যেকবারই আমাদের স্বয়ংক্রিয় ক্যালকুলেটার আমাদের গতিপথ প্রয়োজনমত পরিবর্তিত করেছে আর বিপদ পার হবার পর আবার সেই নির্দিষ্ট গতিপথে যানটিকে ফিরিয়ে এনেছে।

সাত মাস কেটে যাবার পর একদিন ডাক্তার প্যাপেন সকলকে ডেকে নিয়ে দেয়ালের গায়ে স্বচ্ছ জানালা দিয়ে আকাশে একটা ধুমকেতু দেখালেন। শুনেছিলাম ধুমকেতুর বিরাট ল্যাজ হয় কিন্তু এর ছোট্ট একটি ল্যাজ আর তার ভিতর দিয়ে আবার পিছনে তারা দেখা যাচ্ছে। সবই কি রকম অদ্ভুত মনে হল। ডাক্তার প্যাপেন অবশ্য সব বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, ধুমকেতুর ল্যাজটা কোনো কঠিন বস্তু দিয়ে

তৈরী নয়, ধূমকেতুর মাথায় যে কঠিন পিণ্ডটি আছে সেটা থেকে উৎক্ষিপ্ত গ্যাস দিয়েই ল্যাজের সৃষ্টি। এই জন্যই ল্যাজের ভিতর দিয়ে পিছন দিকের তারা দেখা যাচ্ছে। আরেকটা কথা, এই ধূমকেতু সূর্যের যত কাছে যাবে ততই এর ল্যাজটা বড় হবে আর সূর্যের উল্টোদিকে ছড়িয়ে যাবে। আবার সূর্য থেকে যতই দূরে চলে যাবে ল্যাজটাও ততই ছোট হয়ে যাবে।

এর পর উনি আরো বললেন, হিসাব করে দেখা গেছে আমরা এখন সেই পুরোনো সৌর জগতের কাছাকাছি এসে পড়েছি আর এই ধূমকেতুটিও এই সূর্যের আকর্ষণে বাঁধা পড়ে সৌরজগতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে।

ক্রমশঃ

নির্মলজ্যোতি দেব

('কুইনাইন' আবিষ্কারের গল্প)

ম্যালেরিয়া রোগের কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। যদিও বর্তমানে মানুষ এই রোগের হাত থেকে অনেকখানি মুক্তি পেয়েছে কিন্তু বেশ কয়েক বছর পূর্বেও অনেকেই এই রোগে খুব ভুগতেন। এই ম্যালেরিয়া রোগের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য 'কুইনাইন' নামক ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে। আজ তোমাদের কাছে এই কুইনাইনের জন্মকথা সম্বন্ধে বলব।

প্রায় তিনশো বছর পূর্বে দক্ষিণ আমেরিকার বনে একরকম বুনো গাছ পাওয়া যেত। সে সময় ওই অঞ্চলের অধিবাসীরা এই বুনো গাছের ছাল থেকে এক রকমের রঙ্ তৈরী করত, এই রং দিয়ে তারা কাপড় ছোপাত। কিন্তু কাপড় রং করা ছাড়া এই গাছের ছাল যে অন্য কোনো কাজে ব্যবহৃত হতে পারে তা তাদের একেবারেই জানা ছিল না।

তারপর একসময় স্পেনদেশের লোকেরা যখন দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি জয় করে নিল, তখন দক্ষিণ আমেরিকার 'পেরু' নামক স্থানের যিনি বড়লাট ছিলেন তিনি হলেন স্পেন দেশের অধিবাসী। এই বড়লাটের স্ত্রী কাউণ্টেস্ অফ সিন্‌কন্ একবার খুব ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হলেন। বড়লাটের স্ত্রীর রোগমুক্তির জন্য বড় বড় চিকিৎসকেরা এলেন কিন্তু তাদের চিকিৎসার দ্বারা তাঁর অসুখ সারল না। বড়লাট চিন্তিত হয়ে পড়লেন, ভাবলেন এই অসুখের হাত থেকে বাঁচবার জন্য চিকিৎসকদের কি কোন ওষুধ জানা নেই। তাঁর দুশ্চিন্তা দিন দিন বেড়ে চলল। তারপর হঠাৎ একদিন বড়লাটের কাছে এসে হাজির হলেন একজন স্থানীয় চিকিৎসক।

তিনি বললেন যে তিনি নিজেই কাউণ্টেস্‌এর চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিবেন।

তারপর বড়লাটের অভিপ্রায় অনুযায়ী এই চিকিৎসক দক্ষিণ আমেরিকার সেই বুনো গাছের ছাল থেকে একরকম ঔষুধ তৈরী করে খাওয়ালেন এই রোগিণীকে। ডাক্তার যেই ওষুধ খাওয়ালেন অমনি সঙ্গে সঙ্গে কাউণ্টেস্‌এর জ্বর ছেড়ে গেল। দেখতে দেখতে বড়লাটের স্ত্রী সুস্থ হয়ে উঠলেন। বড়লাট এই স্থানীয় ডাক্তারকে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। সে সময় কাউণ্টেস্ অফ সিন্‌কন্‌এর নাম অনুসারে ঐ বুনো গাছের নামকরণ করা হল সিন্‌কোনা।

ইতিমধ্যে সারা ইউরোপের লোকেরা কাউণ্টেস্‌এর জ্বর ছাড়ার কথা জানতে পারলেন। ইংলণ্ডের ব্যবসায়ীরা তখন এই বহু মূল্যবান গাছের শুকনো ছাল গুঁড়ো করে বাজারে বিক্রি করতে শুরু করলেন। এই শুকনো গাছের ছালের নাম দেওয়া হল জেস্যুইট। জ্বরের শ্রেষ্ঠ ওষুধ হিসাবে জেস্যুইটকে সকল মেনে নিলেন।

তারপর ১৮২০ খৃষ্টাব্দে পেলটিয়ার ও ক্যাভেণ্ট নামক দুইজন বৈজ্ঞানিক সিনকোনা থেকে কুইনাইন আবিষ্কার করলেন। তখন থেকে ম্যালেরিয়ার শ্রেষ্ঠ ওষুধ হিসাবে কুইনাইন সারা পৃথিবীর লোকের কাছে সমাদর পেয়েছিল।

১৮৬০ সালে প্রথম এই সিনকোনার বীজ ও চারা দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ভারতবর্ষে আনা হল। এই বীজ ও চারা লাগান হল দার্জিলিং জেলার ছোট পাহাড়ে জায়গা মংপুতে। এই সিনকোনা গাছের চারা এমন জায়গায় লাগাতে হবে যা ১৮০০ ফুট থেকে ৫৫০০ ফুটের মধ্যে উচু হয়। বছরে গড়ে যেখানে ৮০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয় আর সেখানকার তাপমাত্রা গড়ে ৪০° ডিগ্রি ফারেনহাইট থেকে ৯০° ফারেনহাইট পর্যন্ত উঠানামা করবে। মংপু অঞ্চলটি এই সমস্ত জলবায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থানের উপযুক্ত জায়গা। মংপুতে 'কুইনাইন' তৈরী করার একটি ছোট কারখানাও গড়ে উঠেছে।

বর্তমানে মংপু ছাড়া লাটপাচার ও মানসং অঞ্চলে এই সিনকোনা গাছের চাষ করা হয়।

সিনকোনা গাছের শুকনো ছালের গুঁড়ো থেকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় তৈরী করা হয় এই কুইনাইন।

তুচ্ছ প্রাণীর প্রতি মমতা

সমিতা ব্যানার্জি—সেন্ট্ মার্গারেট স্কুল

আজ "তুচ্ছ প্রাণীর প্রতি মমতা" সম্বন্ধে একটি গল্প লিখতে বসে আমার অনেকদিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ছে। এর সঙ্গে আরও ছোটবেলার স্মৃতির কথা মনের দুয়ারে আবছা আলোয় উঁকি মারছে।

বছর চারেক আগেকার কথা, হাজারি-বাগে গিয়াছিলাম। একদিন সে কি বৃষ্টি, আকাশ যেন ভেঙ্গে পড়বে মনে হচ্ছে। তারপর বৃষ্টি একটু কমতে আমি একটু বাড়ার বাইরে গেলাম, সেদিন সমস্ত দিন না বেড়িয়ে অবস্থা একেবারে শোচনীয়। একঘেয়ে লাগছে, কলকাতায় যদি থাকতাম, তাহ'লে বই নিয়ে তখনি পড়তে বসতাম। কিন্তু বাইরে না বেড়ালে ভাল লাগবে কেন? বাইরে এসে দেখি বাগানের একটা গাছ ভেঙ্গে পড়েছে ঝড়ে। আর মধ্যে থেকে একটা অস্পষ্ট পাখির ডাকের আওয়াজ আসছে। ডালপালা সরিয়ে দেখি একটা ছোট বাচ্চা ভয়ে আধমরা হয়ে রয়েছে। নরম তুলতুলে ছোট্ট শরীর, আস্তে তুলে হাতের চেটোর উপর রাখলাম। কিসের বাচ্চা কে জানে? তারপর তাকে বাড়ী নিয়ে এলাম। বললাম, খুব ভাল পাখির বাচ্চা। মা হেসে বললেম দুর, ওতো চড়াইয়ের বাচ্চা। আমি বললাম তা হোক, ওকে আমি পুষব। তারপর কলকাতায় আসবার সময়ে ওকে নিয়ে এলাম ছোট্ট খাঁচায় করে। তখন ও মোটেই বাড়েনি। একদিন রাত্রে ঝটপট শব্দ শুনে দেখি খাঁচাটা মাটিতে নামানো, আর একটা বেড়াল ওৎ পেতে এগোচ্ছে। চাকর খাবার খাইয়ে খাঁচাটা বোধ হয় আর উপরে তোলেনি। বেড়ালটাকে তাড়িয়ে দিলাম, পাখিটার চাউনি যেন আমাকে অভিনন্দন জানাল। পরের দিন ওকে ছেড়ে দিলাম। এখানে থাকলেই বিপদ। আমি না থাকলে ও হয়ত মরেই যাবে। ওর জ্ঞাতি-ভাইদের সঙ্গে ওকে ছেড়ে দিলাম। রোজই কত চড়াই এসে বারান্দার রেলিংএ বসে কিচ্‌মিচ্ করে, কে জানে আমার সেই ছোট্ট চড়াই তাদের মধ্যে আছে কিনা?

আজ এখানেই শেষ করি। আমার এই কাহিনী হয়ত ভাল হবে, হয়ত হবেনা, কি জানি, কত চড়াই বাড়ীতে আসে, তাদের মধ্যে আমার চড়াইটাকে কি খুঁজে পাবনা ?

চার্লি চ্যাপলিন

শিখা রায়

বয়স ১৩ গ্রাহক নং ২২৫৬

টারমিনার থেকে বাসে চেপেছি। বাস ছাড়তে তখনও কিছু দেরী আছে। একজন অন্ধ একটি পাত্র হাতে উঠল, চোখদুটি আধ বোজা, লাঠি ঠুকে পা ঘষে ঘষে চলছে। আর একটানা একঘেয়ে স্বরে বলতে লাগল—'বাবু! একটা পয়সা দিন। ভগবান্ আপনার মঙ্গল কোরবে, আপনার ভালা হোবে, উন্নত্ হোবে।' বসে বসে মনোযোগ সহকারে দেখে বাড়ীতে এসেই শুরু করলাম নকল। একটা লাঠি নিয়ে, ঠিক সেইরকম পা ফেলে, চোখ পিট পিট করে, একঘেয়ে সুরে বলতে লাগলাম—'আপনার ভালা হোবে উন্নত্ হোবে'। পিসী দেখে খুব একচোট বকলেন। মা কিন্তু না বকে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন। অবাক লাগল। পরে ফাঁক পেয়ে যখন জিজ্ঞাসা করলাম, হাসলেন কেন, উনি বললেন—'আমার মনে হয়েছে তুমি অন্ধকে উপহাস করবার জন্য করনি একটা নূতন রকম চলা বা কথা বলা দেখে সেটা আয়ত্বে আনার চেষ্টা করছ। এতে আমি কিছু দোষ দেখিনি। এটা একরকম শিল্প'। তারপরই মা আমাকে একটা বই পড়তে দিলেন—চার্লি চ্যাপলিন।

এই নকল করাটাকেই প্রকৃত শিল্প-চর্চ্চা হিসাবে ধরে নিয়েছিলেন বিশ্ববিখ্যাত অভিনেতা চার্লি চ্যাপলিন। এই প্রেরণা পেয়েছিলেন তাঁর মা লিলি চ্যাপলিনের কাছ থেকে। মিউজিক হলের শিল্পী ছিলেন তাঁর বাবা ও মা। পিতার মৃত্যুর পর তাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে। এক চার্চের থেকে সুপ আনতে যখন তাঁর দাদা সীড্নি যেতেন তখন তাঁর মাতা জানালায় বসে পথচারীদের দেখতেন। তাদের যাওয়া আসা, কথাবার্তা, বাচনভঙ্গী সব কিছুই মন দিয়ে লক্ষ্য করতেন তিনি। তারপর দুই শিশু পুত্রকে অবিকল নকল করে দেখাতেন। একটুও ক্লান্তি লাগত না তাঁর। ঐ দারিদ্র্যের মধ্যেও তাঁদের মুখের হাসি মিলাত না। নিদারুণ শীতের মধ্যে সীড্নি যখন তাঁর মায়ের ভেলভেটের বেখাপ্পা কোট আর মোজা পরে চার্চে সুপ আনতে যেতেন তখন মা ও দুটি পুত্র তাই নিয়েই হাসাহাসি করতেন। বিড়ম্বনাও তাঁর মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতো।

১৮৮৯ সালের ১৬ই এপ্রিল চার্লি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর পুরো নাম ছিল চার্লস স্পেন্সার চ্যাপলিন। তাঁর জন্মস্থান লণ্ডনের অন্তর্গত বামনসিতে। তিনি জাতিতে প্রোটেস্ট্যাণ্ট। চার্লির জন্মের সময় কয়েকদিন অনুপস্থিত থাকবার পর একদিন বাধ্য হয়ে চার্লিকে কোলে নিয়ে লিলি রঙ্গমঞ্চে অবতরণ করেন। বিশ্ব-বিখ্যাত অভিনেতা চার্লি চ্যাপলিনের সেই প্রথম মঞ্চাবতরণ।

অভাবে পড়ে ছোট দুই ভাই অতি অল্প বয়সে রোজগারের চেষ্টায় বেরিয়ে পড়ে। অতি অল্প বয়সেই চার্লি অন্যের ভাবভঙ্গী সুন্দরভাবে নকল করতে পারতেন। লিলি তাঁদের দুভাইকে নাচও শেখাতেন। রাস্তায় রাস্তায় সীড্‌নি আর চার্লি গান গেয়ে নেচে বেড়াতেন। এবং ঐ ভাবেই অল্প কিছু আয় করতেন।

স্কুলে সবসময় হাত পা ছুঁড়ে আর বিকট মুখভঙ্গী করে সহপাঠীদের হাসিয়ে মারতেন তিনি।

এরপর তিনি খুব শিশুবয়সে নাটকের দলে দলে ঘুরে সংসারের সাহায্য করতে থাকলেন। একটা বইয়ে তালিম না দিয়ে নেমে কুকুরের গন্ধশোঁকা অবিকল নকল করে তিনি খুব প্রশংসা অর্জন করলেন। তখন কয়েকটা সিনেমা কোম্পানী খুলেছে। তারা তাঁকে অনেক বেশী পয়সা দিয়ে নিয়ে গেলেন, সেই থেকেই চার্লি চ্যাপলিন সিনেমার সঙ্গে সংযুক্ত। ক্রমে তিনি সপ্তাহে ২০০০ পাউণ্ড পর্যন্ত উপার্জন করেছেন। তিনি নিজে চিত্র পরিচালনা, সঙ্গীত পরিচালনা, কাহিনী লেখা, চিত্রাভিনয় প্রভৃতি করেছেন। মোট কথা তাঁর বইয়ে তিনি নিজেই সব করতেন। 'দি কীড', 'লাইমলাইট', 'গোল্ডরাশ', 'মডার্ণ টাইমস্‌' প্রভৃতি তাঁর সৃষ্ট চলচ্চিত্রের অন্যতম। তাঁর অধিকাংশ বই-ই নির্বাক। তিনি সবাক ছবি পছন্দ করতেন না তার কারণ তাঁর মতে কথা বললে অভিনয়ের মহত্ত্বটুকু বিনষ্ট হয়ে যায়। কথা না বলে অঙ্গ পরিচালনার দ্বারা মনের ভাবকে পরিষ্কার করে ব্যক্ত করার নামই অভিনয়।

পরবর্তী জীবনে ঐশ্বর্য এবং খ্যাতির সিংহাসনে আরোহণ করে চার্লি চ্যাপলিন তাঁর মাকে তাঁর কাছে নিয়ে আসেন এবং সুখ, শান্তিতে রাখেন। প্রভূত আড়ম্বরের মধ্যে তিনি মাকে রেখেছিলেন। তিনি বলেছেন তাঁর মার শিল্পপ্রতিভার ধারে কাছে পৌঁছতে পারেন এমন ক্ষমতা চার্লির নেই। তাঁর মা ছিলেন উঁচুদরের শিল্পী। তাঁর মত শিল্পী চার্লি জীবনে কখনও দেখেননি। তিনি বলেছেন 'যা কিছু তাঁর ছিল, তা সবই তিনি আমাকে দিয়ে গেছেন, প্রতিদানে তিনি কিছুই চান নি।'

সাঁচী ভ্রমণ

অনুতোষ চট্টোপাধ্যায়, বয়স—১৩½ গ্রাহক নং—১৮২৭

গত বৎসর। তখন নভেম্বর মাস। অল্প-অল্প ঠাণ্ডা পড়্‌ছে। পুজোর ছুটিতে দাদা কলকাতা থেকে এসেছিল। দাদাকে নিয়ে কোন একটি ভাল জায়গায় বেড়াতে যাবার কথা চল্‌ছিল। ঠিক হো'ল, সাঁচী যাওয়া হবে। সাঁচীর কথা আমরা অনেকেরই মুখে আগে শুনেছি। সাঁচী যাবার কথায় আমার খুব আনন্দ হো'ল।

আমরা আর বেশি বিলম্ব না করে তার পরের দিনই এগারোটার বাসে রওনা হয়ে পড়লাম। সাগর থেকে সাঁচী, বাসের পথে, প্রায় একশো মাইল। ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল। বাসটা যখন বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, তখন পথের দুপাশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতি মনোরম লাগছিলো। বিকেল

পাঁচটা নাগাদ আমরা সাঁচী গিয়ে পৌঁছুলাম। বাস থেকে নেমেই আমরা ডাক-বাঙ্গলোয় গিয়ে উঠলাম। আমরা সকলে কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। খাওয়া-দাওয়া করে সে দিনের মত বিশ্রাম নিলাম।

পরের দিন খুব সকালে তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ সেরেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। সাঁচীর স্তূপগুলি একটি ছোট পাহাড়ের উপরে। স্তূপগুলি প্রাচীন ও গোলাকার। স্তূপগুলির গায়ে অনেক-প্রকারের কারু-কার্য করা আছে। কারু-কার্য দেখে বোঝা যায়, প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা অতি উন্নত ধরণের ছিল। স্তূপের নিকটে কয়েকটি বৌদ্ধ-বিহারের ভগ্নাবশেষ আছে। তার মধ্যে একটি বৌদ্ধ-বিহারে ভগবান বুদ্ধদেবের একটি খুব বড় পাথরের মূর্তি দেখলাম। সম্রাট্ অশোকের রাণীর বিহারটিরও ভগ্নাবশেষ আমরা দেখলাম। এই স্তূপগুলির কাছে একটি মিউজিয়ম ভারত সরকার নির্মাণ করেছেন। এখানে কিছু প্রাচীন শিলালিপি ও কিছু প্রস্তর মূর্তি ও একটি অশোকস্তম্ভও আছে। সাঁচীর স্তপগুলির আর এক দিকে ভগবান বুদ্ধের প্রধান শিষ্য মহামোগ্গানা ও সারিপুত্তের দেহাবশেষের উপর ভারত সরকার একটি আধুনিক ধরণের মঠ নির্মাণ করেছেন। বুদ্ধের এই মহাশিষ্যের অস্থি যখন কয়েক বছর আগে সিংহল থেকে ভারতে আনা হয়, তখন এখানে একটি ছোটখাট সুন্দর অনুষ্ঠান হয়েছিল। ভারতের মহাবোধি সমিতির সভাপতি পরলোকগত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন।

এই নতুন বৌদ্ধ মন্দিরের ভিতরে ভগবান বুদ্ধের একটি সুন্দর সৌম্য মূর্তি আছে। আমরা সারাদিন স্তপগুলি দেখে, বিকেল বেলা ডাকবাঙ্গলায় ফিরে এলাম। তার পরের দিন সকালে সাঁচী থেকে রওনা হলাম।

বাড়িতে এসে সকলেই নিজের-নিজের মন্তব্য প্রকাশ করলেন। তবে সকলেরই সাঁচী ভাল লেগেছিল! আমার ত খুবই।

দুষ্টু মেয়ে

কেয়া বসু

গ্রাহক নং ১৪৬০ বয়স ৯—বছর

একটা ছিল দুষ্টু মেয়ে,
নাম ছিল তার 'মিষ্টি'
সর্বক্ষণ সেই মেয়েটা
করত অনাসৃষ্টি ॥
ভিজে ভিজে করত খেলা,
কাগজ দিয়ে গড়ত ভেলা,

ফেলত জলে মাটির ঢেলা,
পড়ত যখন বৃষ্টি।
মা তো তখন ব্যস্ত কাজে
পড়ত না তাই দৃষ্টি।
সর্বক্ষণ দুষ্টু মেয়ে
করত অনাসৃষ্টি॥
যখন তখন নিয়ে কালি
চোখে মুখে মাখত খালি,
কখনও বা সাজত মালী,
কতই বা দিই লিষ্টি।
করত না সে লেখাপড়া,
জানত না সে কৃষ্টি।
সর্বক্ষণ মিষ্টি মেয়ে
করত অনাসৃষ্টি॥

পটুয়া

ঊর্মিমালা ঘোষ গ্রাহক নং ৩০২ বয়স—১৪

রূপ দেখেছি চিকন শ্যামল পাতায়
ঐ আকাশের চাঁদোয়া ঢাকা নীরব নীলের আভায় -
সাঁঝ গগনের থমথমে মেঘ মুখ করেছে কালো,
থেকে থেকে দিচ্ছে উকি রক্ত অরুণ আলো,—
ফাগুনের ঐ পরশ-মাখা কৃষ্ণচূড়ার গায়ে,
পেঁজাতুলো-শুভ্রমেঘ আর বুলবুলির নাচায়—
কাকচক্ষু কালো জলে শুভ্র মরাল চলে,
পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝর্ণার উত্তালে,—
দেখে দেখে আশ মেটেনা—নীলাকাশের বুকে
বলাকার দল সারি বেঁধে উড়ছে আপন সুখে,
দীঘির ধারে সদ্য ফোটা কিশলয়ের দোলা,
নদীর ধারে রাশী রাশী কাশফুলেরই মেলা।
কে সে তুলিকর?

যাছুর কাঠির পরশ দিয়ে,
মনের মত রঙ মিলিয়ে,
আপন মনে জগৎ-পটে সজীব ছবি আঁকে ;
রাঙিয়ে দিয়ে মিঠে রঙিন ফাগে,
তাজা রঙের অরূপ অনুরাগে ॥

চিঠিপত্র

গ্রাহকেরা মাঝে মাঝে লেখ—আমাকে 'অমুক' মাসের সন্দেশ পাঠান নি।

তোমরা কি জানো না যে প্রত্যেক মাসেই তোমাদের সকলের সন্দেশ under certificate of posting পাঠানো হয়? প্রতি ইংরাজি মাসের ২৯/৩০ তারিখে পরের মাসের সন্দেশ পাঠান হয়। অবশ্য কয়েকখানা প্রতি মাসেই ডাকে হারায় তা আমরা জানি সুতরাং তোমরা যখন জানাও যে পাওনি তখন আর এক কপি পাঠিয়ে দিই।

আজকাল তো সন্দেশ খুবই নিয়মিত বেরোচ্ছে বাংলা মাসের মধ্যে সেই মাসের পত্রিকা যদি না পাও, তাহলে তখনই জানিও, আমরা আর এক কপি পাঠিয়ে দেব। কিন্তু কোন গ্রাহকের বই যদি বারবার ডাকে হারাতে থাকে তাহলে বারবার তো আর আমরা ক্ষতিপূরণ করতে পারবো না, তারা ডাকঘরে খোঁজবার পর ডাকবিভাগে চিঠি লেখো। কিন্তু আমরা পাঠাচ্ছি না এমন কথা আর কখনও লিখ না।

নতুন গ্রাহকেরা অনেকে হয়তো গ্রাহক কার্ডের বিষয় বিজ্ঞপ্তি বুঝতে পার নি, তাই কিছু জানাও নি। সন্দেশের প্রত্যেক গ্রাহক সম্পাদকদের সই করা একটা কার্ড পাবে। পুরোন গ্রাহকেরা অনেকেই এই কার্ড পেয়েছ। যারা পাওনি তারা আর নতুন গ্রাহকেরা সবাই কার্ড পাবে। কিন্তু চাঁদা দেবার সময়ে অনেকে গ্রাহক নম্বর না দেওয়াতে কে নতুন আর কে পুরোন আমরা বুঝতে পারছি না।

ঠিক সময়ে যারা জানিয়েছিলে তাদের কার্ড পাঠিয়ে দিয়েছি। আরো যারা কার্ড পাওনি তারা সকলে চিঠি লিখে জানাও। নতুন না পুরোন গ্রাহক এবং নাম ও নম্বর লিখে পাঠাও তারপরে তাদের সকলের কার্ড পাঠিয়ে দেব।

স্কুল বা ক্লাব গ্রাহক হলে তারা অবশ্য কার্ড পাবে না।

(১) সুরঞ্জন সিংহ—এন্‌-১২১৫ বয়স—৮ বছর পূজা সংখ্যা তোমার ভালো লেগেছে জেনে খুশি হলাম। কিরকম লেখা পড়তে চাও মাঝে মাঝে জানিও।

(২) কল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩৪২, বয়স চোদ্দ ; সখ—ছবি আঁকা, গল্পের বই পড়া, নাচগান, ক্রিকেট—পত্রবন্ধু চাই।

সে তো হল, কিন্তু বানান সম্পর্কেও আরেকটু সাবধান হওয়া চাই, নইলে বড় হয়ে লেখক হবে কি করে? বয়স ও গ্রাহক সংখ্যা সর্বদা দেবে বই কি, অনেকে দেয় না বলে চিঠির উত্তর দেওয়া যায় না।

(৩) নন্দিতা মৌলিক, ২৩৮১ পুজা সংখ্যা উপভোগ করেছ শুনে উৎসাহিত হলাম। হাত পাকাবার আসরের জন্য আরো ভালো ভালো লেখা পাঠাও, তা হলে বেশি বেশি ছাপা যাবে।

(৪) অপরাজিতা সেনগুপ্ত, এন্ ৪২৫ তোমার বিজ্ঞান বিভাগ যখন এত ভালো লাগে, কোনো বিশেষ বিষয়ে জানবার ইচ্ছা থাকলে জানিও, আমরা প্রবন্ধ জোগাড় করবার চেষ্টা করব।

(৫) বন্দন হালদার (১৭০৬) যা বলেছ, বেশি সংখ্যার জন্য পুরস্কার যখন, কম সংখ্যারা পায় কি করে!

নতুন গ্রাহককে চাঁদা ও চিঠি পাঠাতে বল, যত গ্রাহক সংখ্যা বাড়ে ততই ভালো। এই বিষয়ে তোমাদের সাহায্য পেলে কাগজের কত উপকার হয়।

(৬) করবী গুপ্ত (২৪২৩) শুনলেই তো, তোমরা যত বেশি ভালো লেখা পাঠাবে, হাত-পাকাবার—আসরটিও ততই শশীকলার মতো বেড়ে উঠবে।

(৭) মণিদীপা সেনগুপ্তা (২৪৭১), পুজা সংখ্যায় ধারাবাহিক গল্প দেওয়া হয় নি, যাতে যারা গ্রাহক নয় তারাও এই বিশেষ সংখ্যাটি উপভোগ করতে পারে। তার পরের সংখ্যাতে তো ধারাবাহিক গল্পগুলো পড়তে পেরেছ।

(৮) সুশান্ত কুমার সাহা (১২৬৯) ছবি হারানোর জন্য আমরা দুঃখিত। ডাকটিকিট পাঠিও না, কেমন? তা হলে ফেরৎ না পেলে টিকিটের জন্য দুঃখ হবে না। ছবিও এমন পাঠিও যা হারালে দুঃখ হবে না, নয়তো কারো হাতে দিয়ে পাঠিও, যাতে সে তখন তখনই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

ছেলেমেয়েদের আপন জন নেহরু

এ মাসের সন্দেশের প্রথমেই যাঁর ছবি দেওয়া হল তোমরা সবাই তাঁকে চেনো তো?

শ্রীনেহেরু যেদিন বালক ছিলেন সে অবশ্য অনেক দিন আগেকার কথা! কিন্তু শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ছেলেমেয়েদের প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন কারণ তাদের মধ্যেই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন মানুষের অনন্ত আশার অনির্বাণ শিখা, চির নূতনের প্রেরণা। ছেলেমেয়েরাও তেমনি তাঁকে আপন লোক বলে জেনেছিল। রাষ্ট্রের কর্ণধার হলেও, বিশ্ব-বন্দিত মানুষ হলেও, তাদের কাছে তিনি ছিলেন চাচা-নেহেরু।

রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুতর কর্মভারে যখন তিনি ক্লান্ত বোধ করতেন, তখনই তিনি ছেলেমেয়েদের কাছে গিয়ে আনন্দ পেতেন। নতুন কাজের উৎসাহ সঞ্চয় করে নিতেন। তাঁর অন্তরের মধ্যেই ছিল

যেন চিরন্তন ছেলেমানুষটি। তাই ছেলেমেয়েদের মধ্যে গিয়ে তিনি নিজেই যেন শিশুতে রূপান্তরিত হয়ে যেতেন। তাদের সঙ্গে মিশতেন, হাসতেন, খেলতেন, নাচতেন, গাইতেন। তাই তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তাঁর দিবসকে (১৪ই নভেম্বর) শিশুদিবস হিসাবে পালন করা হয়।

শ্রীনেহেরু ছেলেমেয়েদের বলেছিলেন—আমি তোমাদের মধ্যে থাকতে ভালবাসি, তোমাদের সঙ্গে আলাপ করতে, খেলতে, আমি আনন্দ পাই। তোমরা যখন আমাকে ঘিরে থাকো তখন আমাদের এই সুন্দর পৃথিবী, জীবজন্তু, পাহাড়, পর্বত, তারা, আরো সব সুন্দর জিনিষ সম্বন্ধে গল্প করতে ভালোবাসি। আমাদের চারপাশে এই রকম অনেক সুন্দর জিনিষ আছে, কিন্তু আমরা যারা বড় হয়েছি তারা প্রায়ই এ সব কথা ভুলে যাই।

শিশু-চিত্রকলা প্রদর্শনী দেখে শ্রীনেহরু বলেছিলেন—'বাইরের দিক থেকে দেখতে গেলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে বলে মনে হবে। তারা ভিন্ন ভাষায় কথা বলে, ভিন্ন পোষাক পরে। তবু এদের মধ্যে আশ্চর্য মিল আছে। তাদের এক সঙ্গে রাখুন তারা পরস্পরের সঙ্গে আনন্দে খেলা করবে। তারা তাদের পার্থক্যের কথা, তাদের ধর্ম, বর্ণ বা মর্যাদার কথা ভাবে না। এদিক দিয়ে তারা তাদের বাপ-মায়ের চাইতে জ্ঞানবান। কিন্তু তারাই যখন বড় হয়, তখন বড়দের আচরণ দেখে এই সহজ বুদ্ধি মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ইস্কুলে ছেলেমেয়েরা অনেক কিছু শেখে এবং সেগুলি খুবই দরকারী সন্দেহ নেই! কিন্তু তারা এই আসল কথাটি ভুলে যায় যে মানবতা, দয়া ও খেলাধুলোর মনোভাব আরো অনেক বেশি মূল্যবান।

ধাঁধাঁর উত্তর

কার্তিক মাসের ধাঁধাঁর উত্তর আর উত্তরদাতাদের নাম দেওয়া হল।

তোমরা কেউ কেউ চিঠি লিখেছ যে সঠিক উত্তর পাঠানো সত্ত্বেও আগের বারে নাম বেরোয় নি। কিন্তু উত্তর আমাদের হাতে ঠিক সময়ে পৌঁছলে নাম নিশ্চয় বেরোবে। ডাকের গোলমাল ছাড়াও কখনও কখনও ধাঁধাঁর উত্তরটা ঠিক জায়গায় পৌঁছায় না, কারণ, (১) কেউ কেউ খামের উপর 'হাত-পাকাবার আসর' বা 'প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর' লিখে দাও, ধাঁধাঁর উত্তরের সঙ্গে খামটা রাখা হয় না। (২) কেউ কেউ সম্পাদকের একটি চিঠিতেই অন্যান্য কথার সঙ্গে ছোট ছোট অক্ষরে ধাঁধাঁর উত্তর দাও, চট চোখে পড়ে না। বেশ স্পষ্ট পরিস্কার অক্ষরে 'ধাঁধাঁর উত্তর' আর নিজের নাম, ঠিকানা, গ্রাহক নং লিখে উত্তর পাঠাও, গোলমাল হবে না।

বাগাড়ম্বর বাবুর উত্তর—(১) কামাই (২) ধোপা (৩) চাখাই (৪) গুণ (৫) চাল।

গ্রাহকদের পাঠান ধাঁধাঁর উত্তর—

(১) ছাগল।

(৩) (ক) গাইবান্ধা। (খ) লোহার ডগা। (গ) দ্বারভাঙ্গা।

(ঘ) কালনা (ঙ) লঙ্কা।

গ্রাহকদের পাঠানো ধাঁধার উত্তর কেবল দুইজনই সঠিক দিয়েছ।—গ্রাহক নং ১৮১ মিষ্টি ও বাসবেন্দু। অন্য ধাঁধার সঠিক উত্তর দাতাদের নাম নিচে ছাপা হল। ১ দীপংকর বসু, ৬৩ অনিরুদ্ধ রক্ষিত, ১০৪ উজ্জয়িনী, সুচরিতা, নবনীতা ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য, ১২৪ দীপংকর মজুমদার, ১২৫ লালিয়া বসাক, ১৩৩ সর্বানী ভট্টাচার্য ১৯৫ নিমাই, খুকু ও টা টা চৌধুরী ২২৬ জয়ন্ত ও প্রবাল রায় ৩২১ কবিতা ও অজন্তা ঘোষ, ৩২৯ চন্দ্রগুপ্ত ও মার্কোপোলো শ্রীমাল, ৪২৪ অশোক ও অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, ৫০৯ শচীন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার, ৫২১ ব্রততী—প্রকৃতি বিশ্বাস ৫২৭ অভিজিৎ, অভিজিৎ ও বিনীতা বিশ্বাস, ৭০৬ ছবি বারিক ৮৩৩ ভারতী ভট্টাচার্য ৮৬১ শিখা ও মিত্রা গোস্বামী, ৯৮৩ জ্যোতির্ময় মজুমদার, ১০৭৬ দীলিপ ও গীতা গোস্বামী, ১০৯৭ ঝুমকা সেন, ১১২৮ অমিতাভ দত্ত, ১১৪৫ সুতপা রায়, ১৩০০ ছন্দা ও নন্দা রায়, ১৩৩৮ বন্দনা দে, ১৩৪৫ অরুন্ধতী সেনগুপ্ত ১৩৭৪ কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, ১৪৪৪ পূরবী গুপ্ত, ১৪৬০ কেয়া বসু, ১৫০৩ শ্যামশ্রী মিত্র, ১৫১৭ কিশলয় নন্দী, ১৬৭৫ মধুশ্রী দাশগুপ্ত, ১৬৯৭ দীপিকা গুহ, ১৭০৬ চন্দন, রঞ্জন ও বন্দন হালদার ১৭০৭ মোমা ও শ্রীমতী চৌধুরী, ১৭১৬ অমিতকুসুম ভট্টাচার্য ১৭৬১ দেবাশিষ গাঙ্গুলী, ১৭৬২ আল্পনা রায়চৌধুরী ১৮২১ জয়ন্তিকা সেন, ১৮২৪ স্মৃতিলেখা গুহ, ১৮৫৬ মিলনী রুরাল লাইব্রেরি, ১৯০৮ মিতালি বসাক, ১৯১১ সৌমিত্র গিরি, ২২৮০ নীলাঞ্জন ও সুভাষিত চট্টোপাধ্যায় ২৩৪২ কল্পনা ব্যানার্জি ২৪৬৯ অভিজিৎ গুহ, ২৪৭১ মনিদীপা সেনগুপ্ত, ২৫৪৪ ভারতী, মণিকা ও সান্ত্বনা রায়চৌধুরী, ২৬০০ মঞ্জু সান্যাল ২৬২১ সুভা বিশ্বাস, ২৭৭৩ মৌসুমী সেন, ২৭৭৫ গোপা পাল ২৭৯৬ শর্মিলা সেন গুপ্ত, ২৮৮৬ অভিজিৎ চক্রবর্তী, নতুন গ্রাহক নমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নতুন ধাঁধা

উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ ৩০শে জানুয়ারী

(নিচের পদ্যটির প্রত্যেক লাইনে দুটি করে শব্দ বাদ দেওয়া হয়েছে, সেই শূন্য স্থানে দুটি অর্থ হয় এমন একটি করে শব্দ বসাও যেমন 'লোহার সিন্দুকে ভরি শত ভরি সোনা।

পিয়নের ——— শুনি '——— এল' বলি
——— পানে গেল ভোলা আনন্দেতে ———।
'বৃক্ষশাখে ——— নাহি' ——— দিল বাপে
'——— দেশে অনাবৃষ্টি ——— জন্ম পাপে!
শূন্য ——— ফিরি কত, কি ——— কপালে।
বহু ——— পরে ——— ভাত দিনু গালে।'
পত্র ——— ভূমে ——— নাহি সরে কথা
ক্ষণ ——— কহে '——— কি বুঝিবে ব্যথা!

পরের মনের ——— ——— যাবে কিসে
সর্ব ——— জ্বলে ——— নিজ চিন্তা বিষে।
বেশি ——— ছিল সবে ——— বিঘা জমি।
তাও কিনা ——— খুড়ো ——— নিলে তুমি ?
——— ভূষা বিলাসেতে ——— আছে পাপী।
——— ঘরে ——— গায় আমি শীতে কাঁপি।
রাজর্ষি ——— তুল্য ——— আমারি।
তবু কেন ——— নাহি ——— গিরিধারী ?'
এই ——— যত ——— রাগে দেহ জ্বলে,
তেড়ে ——— 'পাপিষ্ঠেরে মারি নিজ ——— ।
আর কেন ——— কথা ——— সাড়ে চারি,
——— দিব আজি তারে এই ——— মারি।'
——— লয়ে বংশ যষ্ঠি ——— আস্ফালন।
না শুনে ——— যেন উন্মত্ত ——— ।
মত্ত ——— সম বেগে শত ——— গিয়া
'করে দ্বন্দ্বে ——— ?' কহে সে ফিরিয়া।
'মরিল ভায়েরা ——— আমি ——— বাকি।
——— জ্বরে ছেলে ——— সবি দিল ফাঁকি।
ঝঞ্ঝা ——— ভুগি ——— কাঁপে মাতা শীতে
——— না পারি মরে গৃহিণী ——— ।
কে ——— বর্ণিতে দুঃখ, বসি নদী ——— ।
'জল ———' বলি পিতা ——— বুঝি ছাড়ে।
পথ ——— কাঁদে ভোলা পড়ি মোহ ———,
'রয়েছি কুটির ——— শত ছিন্ন ———,
ভাঙিল সুখের ——— ——— দুঃখ সয়ে।
অদৃষ্টের ——— লোকে ——— অন্ধ হয়ে।
শূন্যে ——— কহে 'আর কি ——— সংসারে
বাঁচিবে কি ——— মম ——— মারি তাঁরে ?
যে ——— করিল ——— সহিব তাহারে'।
বলি পথ ——— বসে মুছি অশ্রু ——— !
হরি ——— দুঃখ ভুলি ——— গিয়া জলে,
জল ——— শান্ত হয়ে গৃহ ——— চলে।

ক্রীড়াজগৎ

শ্রীঅরবিন্দ দাশগুপ্ত

এ বৎসরের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা গৌহাটী শহরে নেহেরু স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই প্রতিযোগিতা এবার নিয়ে এই দ্বিতীয় বার আসামে অনুষ্ঠিত হল। এ বৎসরের প্রতিযোগিতায় ভারতীয় রেলদল ২-১ গোলে ফাইন্যালে বাংলাকে পরাজিত করে জাতীয় ফুটবলের বিজয়ী পুরস্কার সন্তোষ ট্রফী লাভ করেছে। জাতীয় ফুটবলের ২০টী প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ ১১ বার বিজয়ী ৪ বার রানার্স অর্থাৎ ফাইন্যালে পরাজিত হয়েছে। গত বৎসরের বিজয়ী ও এরকম শক্তিশালী বাংলাদলকে হারিয়ে রেলদল বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে সন্দেহ নাই।

খেলার মাঠে এ বৎসরে সব চেয়ে বড় খবর মোহনবাগান দলের প্লাটিনাম জয়ন্তী। অর্থাৎ এ বৎসর মোহনবাগান দল তাদের শুরু থেকে মোট ৭৫ বৎসর পূর্ণ করেছে। মোহনবাগান ক্লাবের এ জয়ন্তী উৎসব ৭ই নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে ও প্রায় ২½ মাস চলবে। এরই মধ্যেই ফুটবল ক্রিকেট হকি ও এথলেটিক স্পোর্টস্ খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। যদিও আজ খেলাধুলার সব বিভাগেই মোহনবাগান ক্লাবের প্রতিষ্ঠা তবুও ফুটবল খেলাতেই মোহনবাগান ক্লাবের সব চেয়ে সুনাম। কাজেই ফুটবল খেলবার জন্য এই উৎসবে হাঙ্গারীর টাটাবানিয়া দলের কলকাতায় খেলতে আনা খুবই সময়োপযোগী বলা যেতে পারে। মোট তিনটী প্রদর্শনী খেলার মধ্যে প্রথমটিতে টাটাবানিয়া দল মোহনবাগানকে ৩-০ গোলে, দ্বিতীয় খেলায় ইষ্টবেঙ্গল দলকে ৫-১ গোলে ও তৃতীয় খেলায় ভারতীয় একাদশকে ৩-১ গোলে পরাজিত

করেছে। সব কটী খেলাতেই হাঙ্গারীদল সুন্দর বোঝাপরা, যোগাযোগ ও অদ্ভুত বলকণ্ট্রোল এর পরিচয় দিয়েছে। টাটাবানিয়া দলের খেলার সব চেয়ে বৈশিষ্ট্য যে তারা ফাউল মোটে করেই না ও খেলার একটীতেও একবারও কোন্ খেলোয়াড় অফসাইড করে নি। এ প্রসঙ্গে ভুললে চলবে না যে এ বৎসর অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় হাঙ্গারী ফুটবলে বিজয়ী হয়েছে। প্রতি বৎসর এরকম দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা খেলতে পারলে ভারতীয়দের খেলার মান আরও উন্নত হবে সন্দেহ নাই।

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এ বৎসরের ডুরাণ্ড প্রতিযোগিতায় গত বৎসরের বিজয়ী মোহনবাগান দল আবারও বিজয়ী হয়েছেন। ফাইন্যাল খেলা কলকাতার তথা ভারতবর্ষের দুই শক্তিশালী ও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মোহনবাগান ক্লাব উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখিয়ে ২-০ জয়লাভ করেছে। জয়ন্তী উৎসবের বৎসরে মোহনবাগান দলের এ সাফল্য ক্রীড়ামোদীদের আনন্দ দিয়েছে।

বাঙ্গালোরে ভারত ও সিংহলের মধ্যে অনুষ্ঠিত বেসরকারী প্রথম টেষ্ট খেলায় ভারতীয় দল এক ইনিংসে ও ৪৬ রানে জয়লাভ করেছে। চারদিনব্যাপী এই টেষ্টখেলা শেষ হতে পুরো তিন দিনও লাগে নি। ভারতীয় দলে সেঞ্চুরী করেছেন সারদেশাই ও হনুমন্ত সিং।

অকলাণ্ডে অনুষ্ঠিত এ বৎসরের এমেচার বিলিয়ার্ড খেলায় ভারতীয় খেলোয়ার উইলসন জোন্স্ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান আখ্যালাভ করেছেন। এখনকার প্রতিযোগিতায় কোন খেলায় তাকে হার স্বীকার করতে হয় নি। লণ্ডন চ্যামপিয়ন জ্যাক ক্যারকেম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য যে ১৯৫৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপেও শ্রীযুক্ত জোনস্ বিজয়ী হয়েছিলেন।

রাবণ কৈলাস পর্বত তুলিতেছে।

৪র্থ বর্ষ দশম সংখ্যা ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫ | মাঘ ১৩৭১

আড়ি

মুরারি মোহন বিট

মাগো, দিদির সাথে দিলাম আমি আড়ি,
বলবো না আর একটি কথা দুষ্টু ও যে ভারি!
ঠাকুমা যখন দুপুরবেলা পুকুরঘাটে যাবে
তখন দিদি চোরের মত আচার নিয়ে খাবে।

চাই মা যদি একটুখানি ভাগ—
অমনি দিদি চোখ রাঙিয়ে দেখায় বড় রাগ।
বলবে 'বেরো পাজির ধাড়ি হতচ্ছাড়া ছেলে?
ঘুরিস্ কেন এদিক-ওদিক অংক-কষা ফেলে?'
এই না বলে কানটি ধরে জোরসে দেবে নাড়ি
তাইতো আজি দিদির সাথে দিলাম আমি আড়ি।

দাদাও মাগো বড্ড আমায় মারে।
দেখবে যদি সকাল বেলা খেলছি পথের ধারে—
ঠকাস্ করে গাঁট্টা দেবে, অশ্রু চোখে আসে
মণ্টু, দীপু, বাবলু আমার কান্না দেখে হাসে।
হয়েছি বড়, বল্‌না মাগো সইতে এসব পারি ?
তাইতো দিনু দাদার সাথে আড়ি।

বাবার কাছেও যেতে আমার বড়ই লাগে ভয়,
পাঠের পড়া বলতে যদি একটু দেরী হয়—
বলবে 'হাঁদা, মাথায় যে তোর গোবর শুধু ভরা
মুখ্যু ছেলের দুঃখু অনেক কররে লেখাপড়া।'
তার পরেতেই আমার পিঠে পড়বে বেতের বাড়ি
তাইতো আমি বাবার সাথেও দিলাম মাগো আড়ি

বলেন মাতা 'আমিও মারি, ভাবৃছি কি যে হবে—
আমার সাথেও খোকন সোনার রইলো আড়ি তবে ?'
মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে বললে খোকা লাজে
'আমায় তুমি মারলে মাগো মোটেই লাগে না যে!'

রাবণ

উপেন্দ্রকিশোর রায়

(পূর্ব প্রকাশিত অংশের চুম্বক)

(বিশ্রবা মুনির পুত্র দশগ্রীব যারপর নাই দুষ্ট রাক্ষস ছিল। ভয়ঙ্কর তপস্যা করিয়া সে শিবের নিকট বর পাইল যে দেব, দানব, দৈত্য কেহ তাহাকে মারিতে পারিবে না। তাহার দাদা কুবেরকে লঙ্কা হইতে বিতাড়িত করিয়া সে রাজা হইয়া বসিল। তারপর রথে চড়িয়া সে ত্রিভুবন জয় করিতে বাহির হইল।)

২

বাহির হইয়াই সে সকলের আগে গিয়া কুবেরের নিকট উপস্থিত হইল—তাহার উপরেই রাগটা বেশি। কুবেরের সৈন্যরা অনেক যুদ্ধ করিয়াও তাহার কিছুই করিতে পারিল না। দশগ্রীবের সঙ্গে ভীষণ রাক্ষসেরা গিয়াছিল; তাহারা যক্ষদের এমনি দুর্গতি করিল যে তাহা আর বলিবার নহে। যক্ষেরা সোজাসুজি সরল ভাবে যুদ্ধ করে, আর রাক্ষসেরা নানারকম ফাঁকি দেয়; কাজেই যক্ষেরা হারিয়া গেল। কুবের নিজে আসিয়াও বিশেষ কিছুই করিতে পারিলেন না। দশগ্রীব তাঁহাকে অস্ত্রের আঘাতে অজ্ঞান করিয়া, তাঁহার 'পুষ্পক' নামক রথখানি লইয়া চলিয়া গেল। সে রথ বড়ই আশ্চর্য ছিল। তাহাতে সঙ্গে দানা, পানি, সইস কোচমান কিছুরই দরকার হইত না! যেখানে যাইবার হুকুম পাইত অমনি সে উড়িয়া গিয়া সেখানে হাজির হইত।

সেই পুষ্পকরথে চড়িয়া দশগ্রীব বিশাল শরবনে গিয়া উপস্থিত হইল। পর্বতের উপরে সে অতি পবিত্র বন, কার্তিকেয়ের জন্মস্থান, তাহার উপর দিয়া কোন রথের যাইবার হুকুম নাই! বিশেষতঃ শিব আর পার্বতী তখন সেখানে ছিলেন। কাজে কাজেই পুষ্পক রথ সেখানে গিয়া আটকাইয়া গেল। ইহাতে দশগ্রীব যারপর নাই আশ্চর্য হইয়া নানারূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময় শিবের দূত নন্দী আসিয়া তাহাকে বলিল যে, 'দশগ্রীব, মহাদেব এখানে আছেন, তুমি ফিরিয়া যাও।'

নন্দীর চেহারা বড়ই অদ্ভুত ছিল। ছোট্ট খাট্টো পিঙ্গলবর্ণ লোকটি, হাত দুখানি এতটুকু, মাথাটি নেড়া, মুখখানি বানরের মত। দশগ্রীব তাহার কথা শুনিবে কি, সে হাসিয়াই অস্থির। কিন্তু নন্দী ছাড়িবার পাত্র নহে। সে ছোট হইলেও দেখিতে বড়ই ষণ্ডা, তাহাতে আবার হাতে ভয়ঙ্কর শূল। দশগ্রীব রাগের ভরে রথ হইতে নামিয়া সবে বলিয়াছিল, 'কে রে তোর মহাদেব?' অমনি নন্দী তাহাকে দুই ধমক লাগাইয়া দিল। তখন সে ভারী চটিয়া বলিল, 'বটে? আমাকে যাইতে দিবি না? আচ্ছা, দাঁড়া তোদের পাহাড় আমি তুলিয়া নিব; এই বলিয়া সত্য সত্যই সে কুড়িহাতে সেই পর্বতের তলা ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। সেকি যেমন তেমন টান? টানের চোটে পর্বত নড়িয়া উঠিল,

শিবের ভূতগুলি ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, পার্বতী যার পর নাই ব্যস্ত হইয়া মহাদেবকে জড়াইয়া ধরিতে গেলেন। মহাদেব কিন্তু কিছুমাত্র ব্যস্ত হইলেন না।

তিনি কেবল পায়ের বুড়ো আঙুলটি দিয়া পর্বতখানিকে একটু চাপিয়া ধরিলেন তাহাতেই সে তাহার জায়গায় বসিয়া গেল, আর অমনি, দরজার কামড়ে দুষ্টু খোকার আঙুল আটকাইবার মতন, দশগ্রীব মহাশয়ের হাত কখানিও পর্বতের চাপনে আটকাইয়া গেল।

তখন ত দশগ্রীব দশমুখে ভ্যা ভ্যা শব্দে চেঁচাইয়া অস্থির। চীৎকারে ত্রিভুবন কাঁপিতে লাগিল; সাগর উছলিয়া উঠিল, দেবতারা ছুটিয়া পথে বাহির হইলেন।

হাজার বৎসর ধরিয়া দশগ্রীব ঐরূপ চ্যাঁচাইয়াছিল, আর মহাদেবকে ক্রমাগত মিনতি করিয়াছিল। মহাদেবের দয়ার কথা সকলেই জান। বেচারার এই কষ্ট দেখিয়া তিনি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাহাকে ছাড়িয়া ত দিলেনই, তাহার উপর আবার ভারী ভারী কয়েকটী অস্ত্রও তাহাকে দিয়া দিলেন, আর বলিলেন, দশগ্রীব তুমি চমৎকার চ্যাঁচাইয়াছিলে তোমার চীৎকারে সকলেই ভয় পাইয়াছিল। অতএব এখন হইতে তোমার নাম 'রাবণ' (যে চীৎকারে লোকের ভয় লাগাইয়া দেয়) হইল।' দশগ্রীব দেখিল, পাহাড় চাপা পড়িয়া মোটের উপর তাহার লাভই হইয়াছে কাজেই সে খুব খুসি হইয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিল।

দশগ্রীব শিবের নিকট বর পাইয়া রাবণ হইল, অস্ত্রশস্ত্রও অনেকগুলি পাইল। তখন হইতে সে ব্রহ্মাণ্ডময় কেবল ঘুরিয়া বেড়ায়, আর রাজ রাজড়া যাহাকে সামনে পায় তাহাকেই বলে, 'হয় যুদ্ধ কর না হয় হার মান।'

উষীরবীজ নামে একটা জায়গায় মরুত্ত নামে এক রাজা যজ্ঞ করিতেছেন, রাবণ পুষ্পক রথে চড়িয়া হেইয়ো হেইয়ো শব্দে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। যজ্ঞের স্থানে দেবতাদের অনেকেই ছিলেন, রাবণকে দেখিয়াই ভয়ে তাঁহাদের মুখ শুকাইয়া গেল। ছুটিয়া যে পলাইবেন, এতটুকুও তাঁহাদের ভরসা হইল না;—কি জানি পাছে ধরিয়া ফেলে। তাই তাঁহারা সেইখানেই নানা জন্তুর বেশ ধরিয়া লুকাইয়া রহিলেন। ইন্দ্র হইলেন ময়ুর, ধর্ম হইলেন কাক, কুবের হইলেন গিরগিটি, বরুণ হইলেন হাঁস।

এদিকে মরুত্তের সঙ্গে রাবণের খুবই যুদ্ধ বাধিবার যোগাড় দেখা যাইতেছে, গালাগালি আরম্ভ হইয়াছে মারামারিরও বিলম্ব নাই, এমন সময় মরুত্তের গুরু সম্বর্ত্ত মুণি তাঁহাকে বলিলেন, 'মহারাজ। যুদ্ধ করিয়া কাজ নাই কেন না তাহা হইলে তোমার যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহাতে সর্বনাশ হইবে। কাজেই মরুত্ত চুপ করিয়া গেলেন, আর রাবণ 'জিতিয়াছি জিতিয়াছি' বলিয়া খুবই বাহাদুরী করিতে লাগিল। তার পর সেখানে যত মুনি উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের সকলকে খাইয়া যারপর নাই খুসি হইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

তখন দেবতা মহাশয়েরা আবার যার যার বেশ ধরিয়া মনে করিলেন 'বাবা, বড্ড, বাঁচিয়া গিয়াছি।' যে সকল জন্তুর সাজ তাঁহারা নিয়াছিলেন, তাহাদের উপরে অবশ্য তাঁহারা খুবই খুসি হইলেন, আর তাহাদিগকে বর দিতে লাগিলেন।

ইন্দ্র ময়ূরকে বলিলেন, 'তোমার সাপের ভয় থাকিবে না, আর, আমার যেমন হাজার চোখ, তোমার লেজেও তেমনি হাজার চোখ হইবে।' ময়ূরের লেজে আগে শুধুই নীলবর্ণ ছিল, তখন হইতে তাহাতে চমৎকার চক্র দেখা দিল।

ধর্ম কাককে বলিলেন, 'তোমার আর কোন অসুখ হইবে না। মরণের ভয়ও তোমার দূর হইল; কেবল মানুষে যদি মারে তবেই তোমার মৃত্যু হইবে।'

বরুণ হাঁসকে বলিলেন, 'তোমার গায়ের রং ধবধবে সাদা হইবে। তখন হইতে হাঁস সাদা হইয়াছে, আগে তাহার আগাগোড়া সাদা ছিল না, পাখার আগা নীল, আর কোলের দিক ছেয়ে রঙের ছিল।

কুবের গিরগিটিকে বলিলেন, 'তোমার মাথা সোনার মত হইবে।' সেই হইতে গিরগিটির মাথায় সোনালি রং।

এদিকে রাবণের আর গর্বের সীমাই নাই। দুষ্মন্ত, সুরথ, গাধি, গয়, পুরূরবা প্রভৃতি বড় বড় রাজারা তাহার নিকট হার মানিয়া গেলেন, অন্যের ত কথাই নাই। কিন্তু অযোধ্যার রাজা অনরণ্য কিছুতেই তাহার নিকট হার মানিতে রাজী হইলেন না। তিনি আগেই অনেক সৈন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া ছিলেন, রাবণ তাঁহার রাজ্যে আসিবামাত্র সেই সকল সৈন্য লইয়া তিনি তাহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। হায়, তাঁহার সে সৈন্য রাবণের সৈন্যদের হাতে দুদণ্ডের মধ্যেই শেষ হইয়া গেল, নিজেও রাবণের হাতে ভয়ানক আঘাত পাইয়া রথ হইতে পড়িয়া কাঁপিতে লাগিলেন। রাবণ তখন তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, 'কি? আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া এখন কেমন হইল?' অনরণ্য বলিলেন, 'মরিতে ত একদিন সকলকেই হয়, কিন্তু আমি তোমার কাছে হটি নাই, যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিতেছি আর আমি একথা তোমাকে বলিতেছি যে, আমাদের এই বংশে দশরথের পুত্র রামের জন্ম হইবে, সেই রামের হাতে তুমি তোমার উচিত সাজা পাইবে।'

রাজার কথা শেষ হইতে না হইতে দেবতারা তাঁহার উপরে পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। স্বর্গে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে রাজাও দেহ ছাড়িয়া সেখানে চলিয়া গেলেন।— ক্রমশঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(পূর্ব প্রকাশিত অংশের চুম্বক)

আমেরিকার গৃহ যুদ্ধের সময় অবরুদ্ধ রিচমণ্ড সহর হইতে বেলুনে চড়িয়া পলায়ন করিতে গিয়া পাঁচটি অসম সাহসী ব্যক্তি ঝটিকার প্রকোপে এক নির্জন দ্বীপে পরিত্যক্ত হন। ইঁহারা হইলেন ধীমান এঞ্জিনিয়র ক্যাপটেন সাইরাস হার্ডিং, তাঁহার ভৃত্য নেব, সুদক্ষ নাবিক পেনক্রফ্‌ট্, বালক হারবার্ট এবং বিখ্যাত সাংবাদিক গিডিয়ন স্পিলেট। হার্ডিং এর কুকুর টপও সঙ্গে ছিল। সমস্ত কাজই তাঁহাদিগকে একেবারে প্রথম অবস্থা হইতে সুরু করিতে হইল। দ্বীপে নানাপ্রকার খনিজ ও রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়া গিয়াছিল। হার্ডিংএর আশ্চর্য বুদ্ধি ও সকলের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে কারখানা তৈরী করিয়া লোহা ও স্টিলের যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হইল।

লেকের জলের ভিতরকার একটি গহ্বরকে বাহির করিবার জন্য হার্ডিং নাইট্রো গ্লিসারিন নামে এক সাংঘাতিক এক্সপ্লোসিভ প্রস্তুত করিয়া তাহার সাহায্যে লেকের একপারের পাথর উড়াইয়া দিয়া একটি প্রকাণ্ড ফুটা করিলেন। সেই পথে লেকের জল প্রবল বেগে বাহির হইয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িতে লাগিল।

॥ বিংশ পরিচ্ছেদ ॥

নাইট্রোগ্লিসারিনের কাজ খুব সন্তোষজনক হইয়াছে। লেকের পাড়ে ফুটাটি এমনই বড় হইয়াছে, যে, পূর্বে গ্র্যানিট, (granite) পাহাড়ের ভিতরকার পথে যতটা জল বাহির হইয়া যাইত, এখন তাহার তিনগুণ জল এই নূতন পথে বাহির হইতেছে। অল্প সময়ের মধ্যেই লেকের জল দুই ফুটেরও বেশি কমিয়া যাইবে।

দ্বীপবাসিরা চিম্‌নীতে ফিরিয়া গেল—গাঁইতি, বল্লম, ছালের দড়ি চকমকি পাথর, স্টিল প্রভৃতি আনিবার জন্য। জিনিসগুলি লইয়া সকলে আবার প্লেটোতে চলিল, সঙ্গে তাহাদের টপ্।

পথে পেন্‌ক্রফ্‌ট জিজ্ঞাসা করিল—'ক্যাপটেন, আচ্ছা, এই যে তরল পদার্থটি তৈরি করেছেন, এটা দিয়ে গোটা দ্বীপটা উড়িয়ে দেওয়া যায় ?'

হার্ডিং বলিলেন—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দ্বীপ, দেশ, এমন কি পৃথিবীটাও উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে—তবে কিনা, তরল পদার্থটির পরিমানের উপর সেটা নির্ভর করে। প্রস্‌পেক্ট হাইটে পৌছিয়া সকলে সেই পুরাতন ফুটোটার কাছে গেল। ফুটোটা ততক্ষণে জলের উপরে উঠিয়াছে। এই ফুটোর পথে গিয়া এখন পাহাড়ের ভিতরটা সন্ধান করা যাইবে। গর্তের নিকট গিয়া দেখা গেল, গর্তের মুখটা প্রায় কুড়ি ফুট চওড়া কিন্তু উঁচু মোটে দুই ফুট।

আর একটু উঁচু না হইলে ভেতরে প্রবেশ করা মুস্কিল। পেন্‌ক্রফট্ ও নেব গাঁইতি লইয়া গর্তের মুখ উঁচু করিতে আরম্ভ করিল। সাইরাস, হার্ডিং দেখিলেন, গর্তের মেঝেটি বেশী ঢালু নয়। আগা গোড়া যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে, সহজেই সম্ভবতঃ একেবারে সমুদ্রের নিকট পৌছান যাইবে। যদি সমান একটা গহ্বর পাওয়া যায়, তবে ত কথাই নাই—সেটাকেই বাসস্থান করা যাইবে।

. পেন্‌ক্রফট্ মহা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। বলিল—আমরা অপেক্ষা করছি কিসের জন্য ? টপ্‌ ত এগিয়ে চলে গিয়েছে, চলুন আমরাও এগুই।' হার্ডিং বলিলেন—'চল তবে। কিন্তু অন্ধকারে পথ দেখতে পাওয়া যাবে না। নেব। তুমি শুকনো ডাল পাতা দিয়ে দুটো মশাল তৈরি করে আন।'

দেখিতে দেখিতে মশাল প্রস্তুত হইল। চকমকি ও স্টিলের সাহায্যে তাহাতে আগুন ধরাইলে পর সাইরাস হার্ডিং সকলের সহিত গহ্বরের অন্ধকার পথ ধরিয়া চলিলেন। তাঁহারা যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, দেখা গেল, গহ্বরের পথ ক্রমেই উঁচু হইতেছে। এবং খানিক পরেই সকলে সটান দাঁড়াইয়া চলিতে সক্ষম হইলেন। কতকাল ধরিয়া এই গ্র্যানিটের উপর দিয়া জল বহিয়া গিয়াছে। সেজন্য পথ পিচ্ছিল—হঠাৎ আছাড় খাইবার সম্ভাবনা। তাই যাত্রীদল একে অন্যের সহিত দড়ি দিয়া বাঁধিয়া লইলেন—পাহাড় চড়িবার সময় লোকে যেমন করিয়া থাকে।

টপ্‌ সকলের আগে, তাহার পিছনে যাত্রীদল নীরবে চলিয়াছেন। এই পথে কখনও মানুষ চলে নাই, সকলের মনেই ভয়ের মত একটা ভাব। মুখে কথা নাই বটে কিন্তু সকলের মনে চিন্তা। পথটার যখন সমুদ্রের সঙ্গে যোগ, আছে, তখন, কে জানে, যদি বা কোন সংঘাতিক জলজন্তু হঠাৎ সম্মুখে পড়ে। যাহা হউক, টপ্‌ আগে আগে চলিয়াছে—তেমন কিছু ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে সে-ই খবর দিবে।

প্রায় একশত ফুট নামিলে পর, একটু প্রশস্ত একটা জায়গা পাওয়া গেল, স্পিলেট্ বলিলেন—এই জায়গাটা বেশ নিরাপদ মনে হয়, কিন্তু এই স্থানটা বাসের অনুপযুক্ত। জায়গাটা বড় ছোট আর অন্ধকার।

পেন্‌ক্রফট্ বলিল—আমরা জায়গাটাকে বড় করে নিতে পারি না ? আলো বাতাসের জন্য পথও তৈরি করে নেওয়া যাবে।

হার্ডিং বলিলেন—চল আরো এগিয়ে যাই। হয়ত সামনে এমন জায়গা পেতে পারি যেখানে এতটা পরিশ্রম করতে হবে না। আরও পঞ্চাশ ফুট নামিলে পর, হঠাৎ দূর হইতে টপের ডাক শুনিতে পাওয়া গেল। টপ্‌ যেন বেশ রাগিয়া চীৎকার করিতেছে। তখন বল্লম বাগাইয়া খুব হুঁশিয়ার হইয়া, সকলে টপের ডাক লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। প্রায় ষোল ফুট নামিলে পর টপের দেখা পাওয়া গেল।

সেখানে পথের শেষে প্রকাণ্ড একটা গহ্বর দেখা গেল। টপ্‌ রাগিয়া চিৎকার করিতে করিতে, একবার সম্মুখের দিকে একবার পিছনের দিকে ছুটাছুটি করিতেছে। নেব্‌ ও পেন্‌ক্রফট্ চারিদিকে মশালের আলো ফেলিতে লাগিল—হার্ডিং, স্পিলেট ও হারবার্ট বল্লম বাগাইয়া প্রস্তুত, যদি আত্মরক্ষার জন্য আবশ্যক হয়। কিন্তু

দেখা গেল, বিশাল গহ্বরটি শূন্য—চারিদিকে খুঁজিয়াও কোন জন্তুর সন্ধান পাওয়া গেল না। টপ্ কিন্তু তবু কেবলই চীৎকার করিতেছে। কত ভয় দেখান হইল, আদর করা গেল কিন্তু সে কিছুতেই চুপ করিল না।

মশালের আলোকে সকলে দেখিলেন—গহ্বরের মধ্যখানে প্রকাণ্ড একটা কূয়া, এই কূয়াটা দিয়া জল সমুদ্রে গিয়া পড়িত। কূয়ার ধারগুলি একেবারে খাড়া, ইহাতে নামা অসম্ভব।

সাইরাস হার্ডিং মশাল হইতে একটা জ্বলন্ত ডাল লইয়া কূয়ার মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। জ্বলিতে জ্বলিতে ডালটা নিচের দিকে চলিল, এবং খানিক পরে ছ্যাঁৎ শব্দ করিয়া নিবিয়া গেল—অর্থাৎ মশালটা জলে গিয়া পড়িয়াছে, সেই জল সমুদ্রের জলের সঙ্গে এক।

মশালটা জলে পড়িতে যতক্ষণ লাগিল, সেই সময়টুকু হিসাবে করিয়া হার্ডিং বুঝিতে পারিলেন—কূয়াটা প্রায় নব্বুই ফুট গভীর। তাহা হইলেই দেখা যায় কূয়ার মুখটা সমুদ্র হইতে নব্বুই ফুট উচ্চে।

হার্ডিং বলিলেন—এখানেই আমাদের বাড়ি করিতে হইবে।'

স্পিলেট্ বলিলেন—তা কি করে হয়, এখানে যে কি-না-কি একটা জন্তু ছিল।

হার্ডিং বলিলেন—সেটা কি আর এখনও আছে? এই কুয়ো দিয়ে জন্মের মত চলে গিয়েছে।

সাইরাস্ হার্ডিং এর অসাধারণ বুদ্ধির বলে দ্বীপবাসিগণের অভাব পূর্ণ হইল। বাসস্থান মিলিয়াছে। এই গহ্বরটিকে এখন ইঁটের পার্টিসন্ দিয়া ভাগ করিয়া, কয়েকটি ঘর করিয়া লইলেই হইল। যে জল সরিয়া গিয়াছে তাহার আর ফিরিয়া আসার সম্ভাবনা নাই—স্থানটি এখন মুক্ত। এখন দুইটি বিষয়ে মুস্কিল আছে। প্রথম—নিরেট পাথর ফুটা করিয়া আলো বাতাসের জন্য পথ করা। দ্বিতীয়তঃ—এখানে আসিবার পথটা আরও সহজ করা। উপরের দিকে ফুটা করিয়া আলো বাতাসের পথ করা একেবারেই অসম্ভব—গহ্বরের ছাদ ভীষণ পুরু। সমুদ্রের দিকের দেয়ালটায়, হয়ত বা চেষ্টা করিলে ফুটা করা যাইতে পারে। হার্ডিং অনেক হিসাব করিয়া বুঝিতে পারিলেন—সমুদ্রের দিকের দেয়াল বেশী পুরু হইবে না। দেয়াল ফুটা করিয়া আলোর পথ করিতে পারিলে সেই দেয়ালেই দরজা ফুটাইয়া যাতায়াতের পথ করিতে পারা যাইবে। বাহিরের দিকে মজবুত দড়ির তৈরি একটা সিঁড়ি (Rope-ladder) ঝুলাইয়া দিলেই হইল। হার্ডিং তাঁহার উদ্দেশ্যে সকলকে বুঝাইয়া দিলে, পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—তবে আর দেরি কেন? আমার হাতে গাঁইতি আছে—বলুন দেয়ালের কোনখানে ফুটা আরম্ভ করব।

ফুটা করিবার স্থানটি হার্ডিং দেখাইয়া দিলে পর, পেন্‌ক্রফ্‌ট মশালের আলোতে গাইতি চালাইতে আরম্ভ করিল। পেন্‌ক্রফ্‌ট ক্লান্ত হইলে স্পিলেট্ এবং তিনি ক্লান্ত হইলে নেব্। এইরূপে প্রায় দুই ঘণ্টা পরিশ্রমের পর সকলে একরকম নিরাশই হইয়াছেন, এমন সময় স্পিলেটের আঘাতে হঠাৎ দেয়াল ফুটা হইয়া তাঁহার হাতের গাঁইতি সেই ফুটা দিয়া বাহিরে গিয়া পড়িল। পেন্‌ক্রফ্‌ট ত আনন্দে চীৎকার করিয়া অস্থির। দেখা গেল, সেখানে দেয়াল প্রায় তিন ফুট চওড়া। ফুটা দিয়া হার্ডিং দেখিলেন আশি ফুট নিচে সমুদ্র তীর ও ক্ষুদ্র দ্বীপটি, তার পরেই বিশাল সমুদ্র।

ফুটা দিয়া আলো আসিয়া, হঠাৎ গহ্বরটি যেন যাদুবলে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

গহ্বরটি বাঁ দিকে ফুট ত্রিশেক উঁচু এবং চওড়া, কিন্তু ডানদিকে সেটা একেবারে বিশাল—ছাদ প্রায় আশি ফুট উঁচু। স্থানে স্থানে গ্র্যানিটের থাম ছাদটিকে মাথায় করিয়া রাখিয়াছে—গহ্বরটিকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, যেন, খুব বড় গির্জার অভ্যন্তর। গহ্বরের সৌন্দর্য এবং বিশালতা দেখিয়া সকলে মহা বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন ছোট খাট একটি গহ্বরই হইবে—কিন্তু এটা যে একটা প্রাসাদের মত। হার্ডিং বলিলেন—বন্ধুগণ।

গহ্বরের সৌন্দর্য এবং বিশালতা দেখিয়া সকলে মহা বিস্মিত হইলেন

আলোর ব্যবস্থা হ'লে পর, গহ্বরের বাঁ পাশে থাক্‌বার ঘর, ভাঁড়ার ঘর প্রভৃতি করা যাবে। আর আদত গহ্বরটিকে কর্‌ব আমরা বস্‌বার ঘর এবং মিউজিয়াম (যাদুঘর)। হারবার্ট বলিল—'এ বাড়ীর নাম দিব তখন—'

হার্ডিং বলিলেন—'গ্র্যানিট্ হাউস্।' এই নামটি সকলের নিকট এতই ভাল লাগিল, যে, 'হুর্‌রে হুর্‌রে' করিয়া গহ্বরটিকে ফাটাইয়া দিল। এদিকে মশালের আলো ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। সেই অন্ধকার পথেই যখন ফিরিতে হইবে, তখন আর দেরি করা চলে না। নূতন বাড়ির ব্যবস্থা বন্দোবস্ত কাল আসিয়া করা যাইবে, এই স্থির করিয়া সকলে ফিরিয়া চলিল।

ফিরিবার সময়ে কষ্ট হইল বেশি। ক্রমে নেবের হাতের মশালটি নিবিয়া গেল। তখন একটি মশালের সাহায্যেই খুব তাড়াতাড়ি চলিয়া বিকালে প্রায় চারিটার সময়, অন্ধকার পথ ছাড়িয়া সকলে আলোকে আসিয়া পৌঁছিলেন। ঠিক সেই সময়ে পেনক্রফ্‌টের হাতের মশালটিও নিবিয়া গেল।

॥ একবিংশ পরিচ্ছেদ ॥

পরদিন, ২২এ মে নূতন বাড়ির কাজ আরম্ভ হইল। চিম্‌নীটি একেবারে পরিত্যাগ করা যাইবে না, হার্ডিং এর ইচ্ছা, সেখানে ভবিষ্যতে তাঁহাদের কারখানা হইবে। হার্ডিং এর প্রথম কাজ হইল, বাহিরের দিক্ হইতে গ্র্যানিট্ হাউসের অবস্থানটা দেখা। তিনি সকলের সহিত সমুদ্রের তীরে গেলেন। পূর্বদিন স্পিলেটের হাত হইতে গাঁইতিটা সেই ফুটা দিয়া, ঠিক সোজা পর্বতের পাদদেশে পড়িয়াছিল। সুতরাং সেখানে গেলে গাঁইতি ও পাওয়া যাইবে, এবং উপরে সেই ফুটাটাও দেখিতে পাওয়া যাইবে।

গাঁইতি পাইতে মুস্কিল হইল না, এবং সেটা যেখানে খাড়াভাবে পড়িয়াছিল সেখান হইতে উপরের দিকে চাহিবামাত্র হার্ডিং ফুটা ও দেখিতে পাইলেন।

হার্ডিং এর ইচ্ছা গহ্বরের ডান দিক্‌টায় কতকগুলি ঘর করিবেন। পাঁচটি জানালা এবং একটি দরজা কাটিয়া, আলোর ব্যবস্থা করিতে হইবে। পাঁচটি জানালা হইবে শুনিয়া পেনক্রফ্‌ট খুবই খুসি হইল। কিন্তু দরজার দরকার কি সেটা বুঝিতে পারিল না। গহ্বরে ঢুকিবার জন্য স্বাভাবিক পথই ত আছে, দরজার প্রয়োজন কি?'

হার্ডিং বলিলেন—'স্বাভাবিক পথে গহ্বরে ঢোকা আমাদের পক্ষে যেমন সোজা বাইরের লোকের পক্ষেও ত তেমনি সহজ হইবে? আমি তাই ভাবছি—ও পথটা একেবারে বন্ধ করে দিব, পথটার অস্তিত্ব লুকিয়ে ফেল্‌ব।'

পেনক্রফ্‌ট বলিল—'তাহলে আমরা ঢুক্‌ব কোন্ পথে?'

হার্ডিং বলিলেন—'বাইরের দিকে সিঁড়ি ঝুলিয়ে সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠ্‌ব। আবার সেই সিঁড়ি টেনে তুলে ফেল্‌লে—বাইরের লোকের সাধ্যও হবে না, যে, গ্র্যানিট্ হাউসে ঢোকে।'

পেনক্রফ্‌ট বলিল—তাত বুঝলাম। কিন্তু ক্যাপ্‌টেন্। এতটা সাবধান হবার দরকার আছে কি? সাংঘাতিক কোন জন্তু ত এ পর্যন্ত দেখ্‌তে পাওয়া যায়নি। আর, দ্বীপে অন্য কোনও মানুষ আছে—একথা আমি বিশ্বাসই করি না।

হার্ডিং বলিলেন—'এটা তুমি নিশ্চয় করে বলতে পার?'

পেনক্রফ্‌ট বলিল—অবশ্য তন্ন তন্ন করে সবটা দ্বীপ না খোঁজা পর্যন্ত একথা নিশ্চয় করে বল্‌বার উপায় নাই।

হার্ডিং বলিলেন—ঠিকই বলেছ। যা হোক, দ্বীপের মধ্যে কোন শত্রু না থাক্‌লেও বাইরে থেকে আস্‌তে পারে ত? প্রশান্ত মহাসাগরের এমন জায়গায় ভয় বিপদের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

তখন স্থির হইল, গ্র্যানিট হাউসের সামনের দেওয়ালে পাঁচটি জানালা এবং একটি দরজা কাটিতে হইবে। তা ছাড়া আরও একটা বড় জানালা এবং গোটা কয়েক ছোট ছোট জানলা কাটিয়া, বড় হলটির আলোর ব্যবস্থা করিতে হইবে। এখন প্রথম কাজ হইল জানালা ফুটান। শুধু গাঁইতির সাহায্যে এই কাজ করিতে হইলে অনেক সময় লাগিবে।

হার্ডিংএর কাছে তখনও নাইট্রোগ্লিসারিন উদ্বৃত্ত ছিল। ইহার সাহায্যে হার্ডিংএর পছন্দমত স্থানে দেওয়াল ফুটা করা হইল। ফুটার অসমান ধারগুলি সমান করিয়া দেওয়া হইল, গাঁইতি ও কোদালের সাহায্যে।

এইরূপে কয়েক দিনের মধ্যে সূর্যের আলোক প্রচুর পরিমাণে গহ্বরের মধ্যে আসার দরুণ, সমস্তটা গহ্বর হইতে অন্ধকার দূরে পলায়ন করিল। সাইরাস হার্ডিংএর প্ল্যান্ মত গহ্বরটিকে পাঁচ ভাগ করিয়া পাঁচটি ঘর করিতে হইবে। সবগুলি ঘরেরই সম্মুখটা থাকিবে সমুদ্রের দিকে। ডান পাশে একটি দরজা থাকিবে। সিঁড়িটি এই দরজার মুখে ঝুলিবে। তারপর রান্নাঘর খাবারের ঘর, শুইবার ঘর, বসিবার ঘর—তাছাড়া বড় হল্‌টি ত আছেই। কিন্তু তবু গহ্বরে আরও যথেষ্ট জায়গা থাকিবে—প্রাসাদের আর বাকি কি? আবার রাশি রাশি ইঁট প্রস্তুত করিয়া গ্র্যানিট হাউসের নিচে জড় করা হইল। এই সমস্ত ইঁট গহ্বরের স্বাভাবিক পথে ভিতরে লইয়া যাওয়া মহা মুস্কিলের ব্যাপার। সুতরাং হার্ডিং স্থির করিলেন আগে দড়ির সিঁড়িটি প্রস্তুত করিতে হইবে।

এই দড়ি খুব যত্নের সহিত প্রস্তুত করা দরকার। পেনক্রফট্ নাবিক্ দড়িদড়ার কাজে নিপুণ—এ কাজের ভার তাহার উপরেই পড়িল। সিঁড়ির পাশের দড়ি দুইটা মজবুত হওয়া চাই। এক রকম বেত পাকাইয়া এই দড়ি তৈরি করা হইল।

সেটা শক্ত হইল, মোটা তারের পাকান দড়ির মত। দড়ির সিঁড়ির এড়ো ধাপগুলি গাছের শক্ত ডাল দিয়া বানাইল। অন্য সব দরকারী দড়ি বানাইল গাছের ছাল দিয়া।

গ্র্যানিট হাউসের দেওয়ালে যে দরজা কাটা হইয়াছিল, সেই দরজার মুখে একটা কপি-কলের মত লাগান হইল, ইহাতে ইঁট তুলিবার সুবিধা হইল খুবই। চুনের অভাব নাই, হাজার হাজার ইঁট প্রস্তুত। দেখিতে দেখিতে গহ্বরটা ভাগ হইয়া, ঠিক প্ল্যান্‌মত ভিন্ন ভিন্ন ঘরে পরিণত হইল।

২৮এ মে গ্র্যানিটের দেওয়ালে সিঁড়ি ঝুলিল। এই আশি ফুট লম্বা সিঁড়িতে ধাপ হইল একশতটি। এত লম্বা সিঁড়ি দোল খাইবে ভয়ানক, ইহা ভাগ করিয়া লইতে পারিলে ভাল হয়।

সৌভাগ্যক্রমে, প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচুতে পাহাড়ের গায়ে, একটা স্বাভাবিক রোয়াকের (platform) মত ছিল। সেটাকে গাঁইতি দিয়া সমান করিয়া লওয়া হইল। সিঁড়িটাকে দুই ভাগে ভাগ করা হইল। দরজা হইতে রোয়াক পর্যন্ত প্রথম ভাগ, আর রোয়াক হইতে মাটি পর্যন্ত দ্বিতীয় অংশ ঝুলান। এখন আর সিঁড়ি তেমন দোল খাইবে না।

এই সিঁড়ি দিয়া উঠা নামা অভ্যাস করা দরকার। নাবিক পেনক্রফট্ এ বিষয়ে ওস্তাদ। সে অন্য সকলকেও দেখিতে দেখিতে নিপুণ করিয়া তুলিল। টপ্‌কেও ত সিঁড়ি-চড়া শিখান চাই? পেনক্রফ্‌টের শিক্ষায় টপ্‌ও সিঁড়ি-চড়া বিদ্যায় অন্যদের চাইতে কম ওস্তাদ হইল না। কিন্তু তবু পেনক্রফট্ মধ্যে মধ্যে টপ্‌কে কোলে করিয়া উপরে তুলিত। এই সকল ব্যবস্থা ও বন্দোবস্তের সঙ্গে সঙ্গে, স্পিলেট্ হারবার্টকে লইয়া প্রতিদিন শিকারে যাইতেন। খাদ্যের ব্যবস্থা করার ভার এই দুইজনের উপরেই ছিল। এ পর্যন্ত তাঁহারা মার্সিনদীর বাঁ পাড়ে জ্যাকমার বনেই শিকার করিয়াছেন। কারণ, মার্সি নদী পার হইবার ব্যবস্থা ছিল না। জ্যাকমার বনে শূকর, ক্যাঙ্গারু প্রভৃতি শিকার যথেষ্ট ছিল। হারবার্ট একদিন একটা জলাভূমিতে খরগোশের আড্ডার সন্ধান পাইল।

স্পিলেট্ ও হারবার্ট অনেক সন্ধানের পর, এই আড্ডার আসল জায়গাটি দেখিতে পাইলেন—সেখানে দেখিলেন, জমিতে হাজার হাজার ফুটো ঠিক যেন চালুনীর মত।

এখন কথা হইল, এই সকল গর্তের মধ্যে খরগোশ আছে কিনা। এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে দেরি হইল না। একটু পরেই ছোট্ট খরগোশের মত শত শত জন্তু, চারিদিকে ছুটিয়া এমনই দ্রুত পলাইতে লাগিল, যে, টপ্‌ও সেগুলির সঙ্গে ছুটিয়া পারিল না। তখন লম্বা লাঠি গর্তে ঢুকাইয়া হারবার্ট ও স্পিলেট্ দেখিতে লাগিলেন—কোন গর্তে আরও খরগোশ আছে কি না।

এইরূপে প্রায় আধ ঘণ্টা পরিশ্রমের পর, চারটা খরগোশ ধরা পড়িল। রাত্রে আহারের সময় দেখা গেল, খরগোশগুলির মাংস চমৎকার। এই খরগোশের আড্ডার সন্ধান পাওয়ায়, খাদ্যের হিসাবে খুবই ভাল হইল। কোন দিন এই খরগোশের অভাব হইবে না।

৩১এ মে, গ্র্যানিট্ হাউসের ঘরগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাগে প্রস্তুত হইল। ঘরগুলিতে চৌকি, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি আস্‌বাব তৈরি করা চাই। এই কাজ হার্ডিং রাখিয়া দিলেন শীতকালের জন্য। প্রথম ঘরটিকে করা হইল রান্নাঘর তাহাতে ইঁটের তৈরি চিম্‌নী করিয়া দেওয়া হইল। রান্না ঘরের জানলার ফুটার সঙ্গে চিম্‌নীর চোঙ্গা জুড়িয়া দেওয়া হইল—সেখান দিয়া ধোঁয়া বাহির হইবে।

ভিতরকার এইসব কাজ শেষ হইলে, হার্ডিং গহ্বরের স্বাভাবিক পথটি বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। বড় বড় পাথর পথের মুখে গড়াইয়া আনিয়া আনিয়া, সবগুলিকে সিমেণ্ট দিয়া এক সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইল। তারপর ওখানে ঘাস লাগাইয়া সে পথের চিহ্ন একেবারে দূর করিলেন। সরু সরু খাল কাটিয়া লেকের জল গ্র্যানিট হাউসের ভিতরে আনা হইল। পরিষ্কার টল্‌টলে জলের ব্যবস্থাটি এমন সুন্দর হইল, যে গ্র্যানিট্ হাউসের লোকদের কোনদিন জলের অভাব হইবে না।

দুর্দিন দুর্যোগের কাল নিকটবর্তী। ভগবানের কৃপায় উপস্থিত সমস্ত কাজগুলি তাহার পূর্বেই শেষ হইয়া গেল। এখন দ্বীপবাসীদিগের আর ভাবনা কি? চমৎকার নিরাপদ বাড়ী তৈরি হইয়াছে জানালা দিয়া সমুদ্রের দিকে সমস্তই দেখিতে পাওয়া যায়—দ্বীপবাসিগণের আনন্দের আর সীমা নাই।

ক্রমশঃ

(পূর্ব প্রকাশিত অংশের চুম্বক)

পৃথিবীর আসন্ন প্রলয়ের সম্ভাবনায় কয়েক লক্ষ লোক মহাকাশ-যান করে অন্য এক সূর্যমণ্ডলীতে অনেকটা পৃথিবীর মত এক গ্রহে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। এই ঘটনার দুশো বছর পরে সেই গ্রহের চারটি ছেলে প্রশান্ত, চিয়েন, মরিশ ও ফিসার প্রফেসার সোমোরেনের সঙ্গে পুরোনো পৃথিবীতে যাবার এক অভিযানে যোগ দেবার সুযোগ লাভ করল। চার বৎসরের মতন রসদ নিয়ে তারা বেরিয়ে পড়ল।

বহু কষ্টে তারা একটা সাংঘাতিক চৌম্বক ক্ষেত্রের আকর্ষন এড়িয়ে আবার নির্দিষ্ট পথে চলল। ক্রমে তারা পুরোনো পৃথিবীর কাছাকাছি এসে পড়ল।

১৫

ডাক্তার প্যাপেন তারপর একটু পুরোনো ইতিহাস বলতে সুরু করলেন। তিনি বললেন—'সেই ২০০ বছর আগে একটা বিরাট ধূমকেতুর সঙ্গে এই সৌরজগতের তখনকার দিনের ষষ্ঠ গ্রহ শনির একেবারে মুখোমুখি সংঘর্ষ হওয়ায়, শনিগ্রহটি কয়েক টুকরো হয়ে যায়। আর ভাঙ্গা টুকরোগুলি কক্ষচ্যুত হয়ে ঐ ধূমকেতুর চূর্ণখণ্ড নিয়ে সাবেক পৃথিবীর দিকে যখন যাত্রা করে, তখন প্রলয়ের আশঙ্কা করে আমাদের পূর্বপুরুষরা বাঁচবার আশায় নতুন জগতের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিলেন।

যদিও শনিগ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর ঠিক সংঘর্ষ হয়নি, তবুও সেটা পৃথিবীর এত কাছ দিয়ে গিয়েছিল যে তারি প্রকোপে সারা পৃথিবীতে একটা বিরাট প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটবার কথা। এই দুর্যোগের ফলাফল আমাদের জানা নেই কারণ তার আগেই আমাদের পূর্বপুরুষদের ঐ মহাযাত্রা সুরু হয়ে গিয়েছিল।

পৃথিবী পার হয়ে শনিগ্রহের সঙ্গে সূর্যের প্রথম গ্রহ বুধের সংঘর্ষ হয়েছিল আর তার ফলে বুধ, শনি আর ঐ ধূমকেতুটি তিনটিই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে সূর্য গোলকের চারধারে একটা আবরণী সৃষ্টি করে ফেলল। মহাশূন্যে দূর থেকে এইটুকু আমাদের পূর্বপুরুষরা দেখতে পেয়েছিলেন। শনির কক্ষচ্যুতি আর বুধের ধ্বংসের পরে অন্যান্য গ্রহগুলির কক্ষপথ শেষ পর্যন্ত কি রকম দাঁড়াল সেটা অবশ্য তাঁদের অজানা। আজ আমরা এই অজানা রাজ্যে এসে পৌঁছেছি। এই আবরণীর ফলে সূর্যের রশ্মির তেজ এখন অনেক কমে গেছে, কাজেই সেই পৃথিবী এখন একটা হিমবাহের মধ্যে পড়ে আছে বলেই সকলে আশঙ্কা করেন।

এই সৌরজগতের সীমানার কাছে আসার পর থেকেই আমাদের যানটির গতিবেগ অনেক কমানো হয়েছে। টেলিলোকেটারের সাহায্যে ডাক্তার ফষ্টার আমাদের সঙ্গে সমানে যোগাযোগ রেখে চলেছেন আর টেলিভিসোফোনে অনেক নির্দেশও পাঠিয়েছেন।

প্রফেসার সোমোরেন এবার ডাক্তার ফষ্টারকে জানিয়ে দিলেন যে যদিও এখন আমরা এই সৌর-জগতের পঞ্চম গ্রহ বৃহস্পতির কক্ষপথ পার হচ্ছি, এই গ্রহটি বর্তমানে সূর্যের অপর পারে থাকাতে, সেটা সম্বন্ধে কোনো খবর জোগাড় করা সম্ভবপর হল্ না।

এতদিনে এই সৌর জগতের সূর্যটি একটি আলোকবিন্দু থেকে ছোট্ট গোলাকার রূপ নিয়েছে। আমাদের সূর্যর তুলনায় কত ছোট এই সূর্য আর কত লালচে এর রং। দিন দুই তিন পরেই সকলে যখন বসবার ঘরে বসে আছি, দেয়ালের সেই জানালা খুলে প্রফেসার সোমোরেন বললেন 'ঐ দেখ, সেই পৃথিবী যার উদ্দেশ্যে আমরা এতদূর এসেছি'।

সবাই তাকিলে দেখলাম জানলার কোণে পঞ্চমীর চাঁদের মতন মস্ত বড় একফালি চাঁদ, একটু ফিকে সবুজ রংয়ের আর দূরে অনেকটা ছোট একটা লালচে চাঁদ। শুনলাম লাল চাঁদটি হচ্ছে এই জগতের পুরোনো চতুর্থ গ্রহনক্ষত্র আর এই সবজে চাঁদটাই হল সেই পুরোনো পৃথিবী যেটা আমাদের পূর্বপুরুষেরা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

ক্রমে ক্রমে সেই সবুজ চাঁদ আমাদের জানালার অনেকখানি জুড়ে ফেলল। এর দু মাথায় অনেকখানি জায়গা খুব উজ্জ্বল, মধ্যে মধ্যে অনেকটা জায়গার বেশ ঘন রং আবার কোনো কোনো জায়গার রং ফিকে সবুজ বাদামী মাখানো অনেকটা জায়গাও দেখা গেল।

প্রফেসার সোমোরেন বললেন 'ঘন রং যেখানে সেটা হল সমুদ্র, জ্বলজ্বল করছে পৃথিবীর দুই মেরুর বরফে ঢাকা অঞ্চল আর সবুজ আর বাদামী রং হল স্থলভাগের চিহ্ন'।

আমাদের যন্ত্রটির গতিবেগ আরো কমিয়ে দেওয়া হয়েছে আর আমরা এই পৃথিবীকে চক্কর দিতে সুরু করেছি, যেন ওরই একটি নতুন উপগ্রহ। আমাদের থেকে অনেক নিচে পৃথিবীর নিজের চাঁদ ঘুরছে তাত দেখতে পাচ্ছি। আমাদের আকাশে দুটো চাঁদ দেখেই আমাদের অভ্যাস এখানকার লোকেরা মোটে একটা চাঁদ দেখে ভাবতেও একটু অদ্ভুত লাগছিল।

এতদিন পরে আবার রাত আর দিন হচ্ছে, প্রায় বছর খানেক ধরে আমাদের কাছে রাত বা দিন

বলে আলাদা কিছুই ছিল না, সব সময়ই সেই একটানা অন্ধকার। আমাদের যানটির বাতিগুলিই ছিল আলোর একমাত্র উৎস আর ঘড়ি ধরে রাত ঠিক করা ছিল ঘুমোবার জন্য।

ক্রমে ক্রমে চাঁদের কক্ষপথ ছাড়িয়ে পৃথিবীর আরও অনেক কাছে এসে পড়লাম। যানটির গতিবেগ আরও কমানো হয়েছে, বেশ কিছুক্ষণ আগেই অ্যাটমিক ইঞ্জিন বন্ধ করে জেট-রকেট ইঞ্জিন চালান হয়েছে। ধীরে ধীরে আমরা এই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের কাছাকাছি এসে পড়লাম আর প্রফেসার সোমোরেনের হিসাব মতো গতিবেগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় প্রথম বায়ুস্তরে এসে পৌঁছে গেলাম। এখানে অবশ্য বায়ুর ঘনত্ব নিতান্তই কম আর নেহাৎ বৈজ্ঞানিকরাই পরীক্ষা করে বলছেন বায়ুস্তরে পৌঁছেছি, নইলে এখানটাও বায়ুহীন বলা চলে।

আমরা জনকয়েক ছাড়া বাকিরা সকলেই কাজে ব্যস্ত, বাইরের বায়ুমণ্ডলের, রাসায়নিক পরীক্ষা, তার ঘনত্ব ইত্যাদি নানা রকম হিসাব নেওয়া হচ্ছে, কারণ বায়ুমণ্ডল দূষিত হলে আমাদের অনেক বিষয়ে সাবধান হতে হবে। এইসব পরীক্ষার ফলে জানা গেল যে বায়ুমণ্ডলে কোনো বিষাক্ত গ্যাস নেই, কিন্তু আমাদের গ্রহের তুলনায় এখানে এমোনিয়া আর কার্বনডাইঅক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ সামান্য বেশী হলেও সেগুলির অনুপাত কিছু মারাত্মক নয়।

ঘন বায়ুস্তরে ঢোকার আগেই আমাদের যানটির বেগ আরও কমান হল নয়তো ঘন বাতাসের সংঘর্ষে যে তাপের সৃষ্টি হবে তাতে বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে আমাদের যানটি পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়াটাও বিচিত্র নয়। জেট-রকেট ইঞ্জিনও বন্ধ করা হয়েছে, প্রথমটা এই পৃথিবার আকর্ষণেই যানটি খাড়া নামছিল এখন বিকর্ষণী শক্তির প্রয়োগে এই পড়ার গতিবেগ একটা নির্দ্ধারিত সীমার মধ্যে রাখা হয়েছে।

প্রফেসার সোমোরেনের কথামত ভূতল থেকে ৫০ মাইল উপরে থাকতে থাকতেই যানটিকে নিচের জমির সমান্তরাল ভাবে চালান হল। দেয়ালের সেই জানালা দিয়ে ছোট ছোট বাইনোকুলার দিয়ে কেউ কেউ দেখতে আরম্ভ করলেন নিচের পুরোনো পৃথিবীটাকে যেটা আমাদের কাছে একেবারে নতুন।

খাওয়া দাওয়ার পর বসবার ঘরেই আমরা সকলে ছিলাম কারণ ডাক্তার প্যাপেন এই পৃথিবী সম্বন্ধে কিছু বিবরণ দেবেন বলেছিলেন। এই পৃথিবী ছেড়ে চলে আসবার সময়কার কিছু কিছু মানচিত্র আর সেই সময়কার প্রাকৃতিক দৃশ্য বা আবহাওয়ার অবস্থা সম্বন্ধে অল্পসল্প জ্ঞান আমাদের সকলেরই আছে। ডাক্তার প্যাপেনের কাছ থেকে নতুন খবর পাবার আশায় আমরা সকলেই ভিড় করে বসে আছি।

এই বসবার ঘরের জানালার উল্টোদিকে দেয়াল জুড়ে টেলিস্ক্রীন যন্ত্র, এটি এতদিন মোটেই ব্যবহার হয় নি সেজন্য এটির ব্যবহার সম্বন্ধে চিয়েনের আর আমার কৌতূহলের অন্ত ছিল না। এবার যখন ডাক্তার প্যাপেন বসবার ঘরেই বসে নিচের পৃথিবীটার সম্বন্ধে বক্তৃতা সুরু করলেন তখন সবে ভাবছিলাম যে এই টেলিস্ক্রীন যন্ত্রটিকে দেয়াল জুড়ে শুধু সাজিয়ে না রেখে একটু ব্যবহার করে দেখালেই

পারেন, এমন সময় যন্ত্রের পর্দায় আলো জ্বলে উঠল আর নিচের পৃথিবীর একটা পরিষ্কার ছায়া তার উপর ফুটে উঠল। যে জায়গা সম্বন্ধে ডাক্তার প্যাপেন বলছেন ছায়ায় সেই জায়গাটার উপর একটা তীরচিহ্ন ফুটে উঠতে লাগল।

উনি মেরু অঞ্চল দেখিয়ে বললেন—'এই অঞ্চল দুটি আগের তুলনায় অনেক বড় হয়ে গেছে কারণ সূর্যের চারপাশ শনি, বুধ আর সেই ধূমকেতুর চূর্ণে আচ্ছন্ন থাকাতে সূর্যের আগেকার সে তেজ আর প্রকাশ পাচ্ছে না ; সেজন্য তার তাপ অনেক কম পরিমাণে পৃথিবীতে পৌঁছোতে পারছে। এই কারণেই উত্তর ও দক্ষিণের হিম অঞ্চল এখন অনেক বেশী বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। উত্তরে আর দক্ষিণে সমুদ্রের জল অনেকখানি জমে যাওয়াতে উত্তর আর দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে আর অন্যান্য মহাদেশগুলির স্থলভাগের মধ্যে এখন আর কোথাও জল নেই। এর ফলে উত্তরে বা দক্ষিণে প্রায় ৫০° অক্ষাংশ পর্যন্ত হিম বাহ নেমে এসেছে। এত বেশী জল জমে যাওয়াতে পুরাকালে সমুদ্রের উপকূলে যে সমস্ত অঞ্চল ১৫০।২০০ ফুট জলের নিচে ছিল সে সমস্ত ভূভাগ এখন জলের উপর জেগে উঠেছে। এই কারণে আমাদের কাছে এই পৃথিবীর যে সব মানচিত্র আছে তার সঙ্গে বর্তমান সমুদ্র উপকূলের চেহারা মিলবে না। তবে আরও নিচে নামলে খুব সম্ভবই এই নতুন জেগে উঠা জমি, পুরোনো জমি থেকে আলাদা করা যাবে তখন খুব সম্ভবই মানচিত্রের চেহারার সঙ্গে মেলানো কষ্টকর হবে না।'

আমরা পৃথিবীর চারদিকে একটা পাক দিলাম। নিচে অনেক জায়গায় সহরের ধ্বংসাবশেষ দেখা গেল। সমুদ্র-তীরের কাছাকাছি অনেক জায়গা দেখেই বোঝা যায় যে প্রলয়ংকরী বানের জল সব ধুয়ে মুছে ভেঙ্গেচুরে তছনছ করে গেছে। কোনো কোনো জায়গায় আবার অগ্ন্যুৎপাতের চিহ্ন রয়েছে, মাটির তলা থেকে গলা পাথর ইত্যাদির ধারা বেরিয়ে সমস্ত চাপা দিয়ে ফেলেছে। এই সব প্রাকৃতিক দুর্যোগের চিহ্ন এখনও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

নিচে অনেকবারই পাহাড় দেখা গেছে, সব পাহাড়েরই চূড়ো বরফে ঢাকা। মাঝে মাঝে বেশ বড় জঙ্গলও রয়েছে, কিন্তু মানুষ কি আছে? চিয়েন সব দেখে শুনে মন্তব্য করল 'এককালে যেমন এই জগত মানুষে ভরা ছিল, এখন খুব সম্ভবই এখানে কোনো প্রাণীই বেঁচে নেই—দেখছ না চারদিক শুধু বরফ আর বরফ। তবে মরিশ আর ফিসার দুজনেই আশা করছে মাটিতে নামলেই আমরা এ জগতের অধিবাসীদেরও দেখতে পাব।

ক্রমশঃ

ছড়া

ননীগোপাল মজুমদার

থাকগে দাদা থাকগে
কী আর হবে
লোকের পিছে লাগকে ?
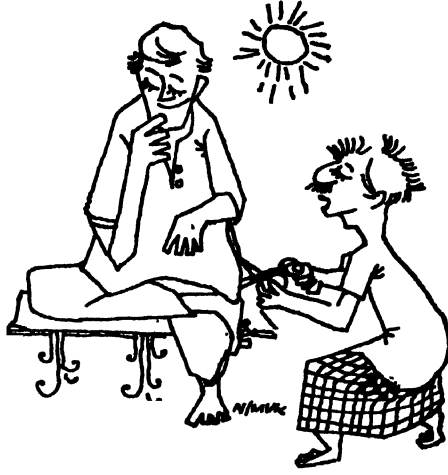
না হয় থুতু দিচ্ছি গায়ে
মাড়িয়ে না হয় দিচ্ছে পায়ে
কাটছে না হয় পকেট তোমার
তবু দাদা থাকগে
থাকগে দাদা থাকগে।

উড়ছে না হয় দিব্বি হাওয়াই
পড়ছে না হয় তোমার দাওয়ায়
পুড়ছে না হয় কাপড় চোপড়
তবু দাদা থাকগে
কী আর হবে
লোকের পিছে লাগকে ?

মহৎ যদি হবেই তবে,
সহ্য সবই করতে হবে
জ্বললে পিত্তি চলবে নাকো
ওসব দাদা থাকগে।
কী আর হবে
লোকের পিছে লাগকে ?
সবার সঙ্গে থাকতে গেলে
পিনের খোঁচা না হয় খেলে

৫

না হয় দিচ্ছে গালিগালাজ
তবু দাদা থাকগে
কী আর হবে
লোকের পিছে লাগকে ?
ওরা না হয় হচ্ছে পাজী
আমরা তো ভাই সাচ্চা আছি
কী আর হবে ছুঁচো বাঁদর বোলকে
থাকগে দাদা থাকগে

তিনটে কালো চাম্‌চিকে—
চিম্‌সে পোড়া লিক্‌লিকে
বিক্রি আছে কিনতে পারো
দাম বেশী নয় পাঁচ সিকে।

কাৎরাতে আর কাৎরাতে
হাত পাখা চাই হাতড়াতে
নয়ত শেষে কূল পাবো' না
ঘামের সাগর সাঁৎরাতে।

পদ্য ভ'রে বস্তাতে—
ফেরিওয়ালা সস্তাতে—
হাঁকবে কবে 'জল্‌দি লে যাও
নয়ত হ'বে পস্তাতে'।

তিনটে কালো চাম্‌চিকে—
চিম্‌সে পোড়া লিক্‌লিকে—
পক্ষী কূলের কুলীন তারা
তাইত এত চিক্‌চিকে।

আয় আয় কাগা
খুকুমণিকে জাগা

যা চাস্ দেবো খেতে
সাবান দেব গা ধুতে

খড়মড়িয়ে খাবি
রং ফর্সা হবি ॥

চড়ুই কাছে আয় না
দেখতে দেব আয়না

ব্যস্ত কেন ? বোস্‌তো
খেতে দেব পোস্ত

ফুরিয়ে গেছে খেলনা
খোকার সঙ্গে খেল্ না ॥

পায়রা ওরে পায়রা
মাথায় দেব টায়রা

আয়-না কাছে একটু
খোকন বড় দুষ্টু।

সারা সকাল উড়লি
এখান সেখান ঘুরলি

হবি হুতুমথুমো
দুপুরবেলা ঘুমো।

খোকার সঙ্গে খেলা
করবি বিকেলবেলা

খাবি অনেক রকম
করবি বকমবকম ॥

বেড়াল ছানা

সুলতা সেনগুপ্ত

মিঁউ-মিঁউ-ম্যাঁও-ম্যাঁ-ও
কাঁদছে বোসে পুষু ছাও,
মা গিয়েছে পাশের বাড়ি
কোরতে সাবাড় দুধের হাঁড়ি।
দোরের কাছে ঘুমোয় বাঘা
মুখটি ভীষণ রাগা-রাগা
তারেই বলে ছোট্ট পুষু
নাওগো কোলে নাও নাও।
গোমড়া মুখে ফুটলো হাসি
বোল্‌লে, ওগো বাঘের মাসি
বড্ড তোমায় ভালোবাসি
হও যদি ভাই বাঘার মাসি,
কোল নেই, তাও তুলবো পিঠে,
এসো এসো আও আও।
খুসি খুসি মুখটি তুলে
হাসছে তখন পুষু ছাও।

বদ্যি বুড়ো : বদ্যি বুড়ী

সন্তোষ মুখোপাধ্যায়

আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ো
চশমা এঁটে দুই কানে
জল দিয়ে সে পদ্য লেখে
অপূর্ব তার হয় মানে।

হঠাৎ কখন বদ্যি বুড়ো
নস্যি দিয়ে দুই নাকে
অন্ধকারে, জ্যোৎস্না দিয়ে
গুব্‌রে পোকার ঠ্যাং আঁকে

তাইনা দেখে বদ্যি বুড়ীর
কম্প দিয়ে জ্বর আসে
মেঘগুলোকে পথ্যি করে
এক্‌কেবারে নিঃশ্বাসে।

রোদ উঠেছে মিষ্টি হাওয়া
বৃষ্টি পড়ার তাইত ধুম
বদ্যি বুড়ো, বদ্যি বুড়ী
চোখ খুলে তাই দিচ্ছে ঘুম।

চারদিকে নীলসাগরে ঘেরা নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ—সেখানে লাপাটি নামে একটি ছোট গ্রাম আছে। সে গ্রামের লোকেরা নিজেদের দেশ ছাড়া আর অন্য কোনো দেশে যেত না—আর কোনো দেশের খবরও রাখত না। ছোট ছোট নৌকো ক'রে মাঝ সমুদ্রে গিয়ে শিকার করত মাছ আর নানা রকম সামুদ্রিক প্রাণী। এ ছাড়া সমুদ্রের ধারে সকলে মিলে খেলা ধুলো নাচ-গান ক'রে চলে যেত তাদের দিন। মাঝে মাঝে বিদেশী বণিকের জাহাজ যখন তাদের দেশে আসত তখন তারা দলবেঁধে নৌকো ক'রে নারকেল নিয়ে যেত ঐ জাহাজে—তার বদলে নানা জিনিস পাবে বলে বণিকদের কাছ থেকে। মস্ত মস্ত বিদেশী জাহাজগুলো পাড়ে ভিড়তে পারত না, তাই নোঙর ক'রে দাঁড়াত মাঝ সমুদ্রে।

অনেক—অনেকদিন আগেকার কথা, লাপাটি গ্রামে এল এক জাহাজ, নানা রকম মনোহারী জিনিসপত্র নিয়ে। লাপাটি গ্রামের একটি ছেলে, নাম তার তনোয়াল—সে তার ছোট নৌকো চ'ড়ে—গাছের কয়েকটি নারকেল নিয়ে গেল সেই জাহাজে বেচাকেনা করতে। এমনি তার গ্রামের আরও অনেকে গেল সেই জাহাজে। গ্রামের লোকেরা নারকেলের বদলে যার যা প্রয়োজনীয় জিনিস তুলল এনে তাদের যার যার নৌকায়। কিন্তু তনোয়াল তখন জাহাজে ঘুরে ঘুরে দেখছে কত রং বেরংএর

মানুষ, কেমন তাদের সাজসজ্জা— জাহাজ ভর্তি কত রকমারী জিনিষ—দু' চোখে তার রাজ্যের বিস্ময়—ভুলেই গেল সে বেচাকেনার কথা। ছোটবেলা থেকে লাপাটি গ্রামেই সে থেকেছে। বাপের সঙ্গে বাগিচায় গেছে কাজ করতে—নয়তো সমুদ্রের ধারে খেলাধুলো নাচ-গান করেছে—বড় জোর বড়দের সঙ্গে সমুদ্রে গেছে মাছ ধরতে বা কোনো গ্রামে নৌকো বাইচ্ দেখতে। তবে হ্যাঁ, দূর দেশে সে একবার গিয়েছিল বটে—যেতে লেগেছিল প্রায় দু' দিন তাদের নৌকায়। সেও একটা দ্বীপ, সে দ্বীপের নাম চাউরা—সেখানে তাদের গ্রামের লোকেরা বছরে একবার যায় রান্নার হাঁড়িকুঁড়ি আর নৌকো কিনতে। কিন্তু সেখানে গিয়ে তার একটুও ভাল লাগে নি—মানুষ জন, ঘরদোর সবই প্রায় তাদের লাপাটি গ্রামের মতোই।

কোথায় বা রইল তার বেচাকেনা, কোথায় রইল কি, এক বুড়ো খালাসীর কাছে নানা দেশের গল্প শুনে সে এমন মশগুল হ'য়ে গেল যে কত সময় যে পার হ'য়ে গেল সে টেরই পেল না—মন তার উধাও হয়ে গেছে কোন্ অজানা দেশে। কেমন সে দেশ—কেমনই তার লোকজন। এমনি নানা কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দেখে তনোয়াল জাহাজ কখন চলতে আরম্ভ করে দিয়েছে। দৌড়ে আসে সে সিঁড়ির কাছে—কোথায় সিঁড়ি। দূরে তার নোকোখানা ঢেউএর দোলায় দুলছে মাঝ সমুদ্রে। সঙ্গের লোকেরা কখন ফিরে গেছে গ্রামে। দু'চোখ ছাপিয়ে জল আসে তার চোখে। ভয়ে আতঙ্কে কি করবে সে ভেবে পায় না। তার প্রিয় গ্রাম লাপাটি মুছে যায় আস্তে আস্তে তার চোখের সামনে থেকে—যেদিকে তাকায় শুধু জল। মা, বাবা, ভাইবোন, বন্ধুবান্ধব সবার কথা মনে হ'য়ে কেঁদে কেঁদে তার চোখ ফুলে যায়। কেঁদে কেঁদে কখন ঘুমিয়ে পড়ে সে জাহাজের এক কোণে।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে দেখে কি সুন্দর একটি নতুন দেশ—জাহাজ দাঁড়িয়েছে সেখানে—অবাক হ'য়ে যায় সে সব কিছু দেখে—যেদিকে তাকায় সব নতুন। ক্রমে নিত্য-নতুন বন্দরে ঘুরে ঘুরে নানা দেশ দেখার আনন্দে তনোয়াল ক্রমে ভুলে যায় তার বাড়ির দুঃখ। এমনি ক'রে কেটে গেল কয়েক বছর—তনোয়াল একটি নতুন দেশে গিয়ে বাস করতে লাগল—আরও বয়স বাড়ল, তখন সে বিয়ে থা ক'রে সুখে আছে—এমনি সময় একদিন সমুদ্রের ধারে ধারে বেড়াতে তার চোখে পড়ল একটি নৌকো পড়ে আছে তীরের কাছে। নৌকোটি দেখে হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল বাড়ির কথা—বাবা, মা, ভাইবোন, সকলের জন্য মনটা তার কেঁদে উঠ্ল। যেই মনে হওয়া অমনি আর কথা নেই। রইল পড়ে তার সুন্দর বৌ, ঘর সংসার। কিছু খাবার আর জল নিয়ে সেই নৌকোয় করে সে ভেসে পড়ল অকূল সমুদ্রে। ভাসতে ভাসতে একদিন এসে সত্যি সত্যি সে উপস্থিত হ'ল তার জন্মভূমি লাপাটি গ্রামে।

গ্রামে পৌঁছে দুরু দুরু বুকে এগুচ্ছে সে তাদের কুটীরের দিকে—কাছাকাছি আসতেই দেখতে পেল তাদের কুটীরে কিসের হৈ চৈ শোনা যাচ্ছে।

এদিকে তনোয়ালকে খুঁজে না পেয়ে তার আত্মীয় স্বজনরা ধরে নিয়েছিল যে নিশ্চয় সে সমুদ্রে নৌকাডুবি হ'য়ে মরে গেছে—তাই তারা তার আত্মার মুক্তির জন্য কানা-আন হাউনি—উৎসবের আয়োজন করেছে যেদিন—ঠিক সেদিনই তনোয়াল সশরীরে এসে উপস্থিত।

দূর থেকে কানা-আন্‌-হাউন্‌ উৎসবের শব্দ পেয়ে প্রাণটা তার চমকে উঠল—তবে কি তাদের পরিবারের কেউ মারা গেল? দূর থেকে উঁকি মেরে দেখে—না সবাইতো রয়েছে ভীড়ের মধ্যে। সকলে মিলে নাচ গান করছে—খাওয়া দাওয়ারও আয়োজন হ'চ্ছে—তবে কে মরল? একটু পরে তার নিজের নাম উচ্চারিত হতে শুনে তার আর কিছু বুঝতে বাকী থাকল না—এ যে তারই জন্য কানা-আন্‌-হাউন্‌ অনুষ্ঠান হ'চ্ছে। ব্যাপার দেখে তো তার আত্মা এবার সত্যিই খাঁচা-ছাড়া হবার জোগাড়। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ। এ অবস্থায় রাত্তির করে—হঠাৎ ওদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালে কি রকম অভ্যর্থনা জুটবে বুঝতে আর বাকী রইল না। কুটীরের পিছনে তার প্রিয় নারকেল গাছটি দাঁড়িয়ে আছে তেমনি—তনোয়াল উঠে পড়ল সেই গাছে—ভাবলে, যাক্‌ একটা ডাব খেয়ে তো ধাতস্থ হই তারপর দেখা যাবে।

যেই গাছে ব'সে ডাব ফাটিয়ে খেতে গেছে অমনি সেই শব্দে কয়েকজন লোক তেড়ে এসেছে গাছের তলায় নারকেল চোর মনে করে।

তারা বল্লে—'কে রে নারকেল গাছের ওপরে? মৃত লোকের গাছে উঠ্‌তে নেই তাও কি জানিস্‌ না?'

উপর থেকে তনোয়াল এবার জিজ্ঞেস করে—

'কে সেই মৃত?'

'কেন? তনোয়াল আমাদের প্রিয় বন্ধু আজ তো তারই বাৎসরিক কানা-আন্‌-হাউন্‌ উৎসব হচ্ছে।'

'কে বললে তোমাদের যে সে মরে গেছে? সেতো এখন তারই নিজের গাছে বসে ডাব খাচ্ছে' বলেই মড়্‌মড়িয়ে নেমে এলো সে নিচে।

সবাইতো ভয়ে অস্থির—ভাবলে এ নিশ্চয় তনোয়ালের ভূত। তনোয়াল তখন অতি কষ্টে সবাইকে বুঝায় যে সে সত্যি সত্যিই তনোয়াল। সবাই তখন তাকে ঘিরে বসে শুনতে লাগল তার অদ্ভুত অভিজ্ঞতাপূর্ণ বিচিত্র দেশভ্রমণের কাহিনা। এমনি করে তনোয়ালকে ফিরে পেয়ে সকলের কি আনন্দ—আনন্দের চোটে সারা রাত তারা নেচে গেয়েই কাটিয়ে দিল!

রেড্‌ভেণ্টেড্‌ বুলবুলের বাসা ও তাদের বাচ্চা

প্রতুলকুমার সেনগুপ্ত

গায়ক পাখি যা আছে আমাদের দেশে—যারা শিস দিতে পারে এরা তাদের মধ্যে। সারাদিন ছটফট, এ ডাল থেকে ও ডাল, মাথার পালক ফুলিয়ে ঝুঁটির মতন করে, লেজ নাচিয়ে, বাগানে নিজেদের অধিকারের জায়গাটুকু মাতিয়ে বেড়ায় পাখিগুলো।

মাঝারী গড়নের দেখতে এরা। দেহের ওপরটা গাঢ় চকোলেট রংয়ের, তলায় বুকের কাছে কাল ভেলভেট রংয়ের। 'ভেণ্টে'র কাছের পালকগুলো লালচে। সেজন্যে গাছের মাথায় এরা বসে থাকলে তলা থেকে খালি চোখে পার্থক্য বুঝতে পারা যায় লেজ নাচালে। কর্তা-গিন্নী এক সঙ্গে থাকে।

ফুর্তিবাজ বলে সাংসারিক বুদ্ধি বড্ড কম এদের। এরা বাসা করে সাধারণতঃ মাটি থেকে পাঁচ ফুটের মধ্যে, একটু ঝোপঝাপ গাছ পেলেই। উঁচু গাছ নিরালা এ সব খুঁজে বার করার মত ধৈর্য নেই মোটেই। কাজেই এদের ডিম আর বাচ্চা নষ্ট হয় প্রায়ই।

এই ধরনের বুলবুলের যে জোড়াটার কথা বলতে যাচ্ছি সেটা বাসা বেঁধেছিল বাগানে আসা-যাওয়ার পথের ধারে মানুষ সমান কেয়ারী করা ঝোপের (হেজ) মাঝে। বাসাটা ছিল সামান্য পাতার আড়ালে, কিন্তু ডালটা বেঁকে প্রায় রাস্তার উপর পড়েছিল। বাসাটা ছিল মাটি থেকে চার ফুট উঁচুতে। গড়নটা গোলাকার, দশ ইঞ্চি প্রায়, গভীরতা দেড় ইঞ্চি মত, উচ্চতা দুই ইঞ্চি মত। বেশ করে শুকনো সরু লতা, কাঠিকুটি দিয়ে বানানো আর শুকনো কলা-খোলের লেস দিয়ে ফাঁকগুলো বোজান, একটা তে-ডালার মধ্যে গুছিয়ে তৈরী। রেখে দিয়েছি বাসাটা। পাখিরা আর আসে না ওতে।

এই এপ্রিল মাস নাগাদ ডিম দিয়েছিল ওরা। এক সঙ্গে তিনটে। ঘি রংয়ের মেঝের ওপর লাল রংয়ের কুচির ছিটে দেওয়া। দিন পনের ফুটতে লেগেছিল মনে হয়। বাবা মা পালা করে ডিমে তা দিত।

দুটো ডিমের আগে পরে বাচ্চা হল। একটা কোথায় নষ্ট হল, আমরা পেলাম না খুঁজে। ক্ষুদে ক্ষুদে বাচ্চাগুলোর সারাদিন খাই খাই। সাড়া পেলেই ঠোঁট ফাঁক করা খাবার জন্য। মা-বাবারা সারাদিন আনাগোনা করত খাবার ঠোঁটে নিয়ে। পাশের একটা বড় গাছের পাতার আড়ালে বসে বেশ কিছুক্ষণ ধরে দেখে নিত ধারে পাশে কেউ আছে কিনা। তারপর একজনা টুক করে নেমে আসত। আরেকজনা পাহারা দিত আর লেজ নাচাত। বাচ্চাদের ওজন নিয়েছিলাম আমরা—এক সপ্তাহ হলে। প্রায় উনিশ গ্রাম ছিল।

গায়ে একটু পালক বেরিয়ে বড়সড় হতেই আমরা বাচ্চা দুটোকে নিয়ে এলাম বাচ্চা পালন করবার খাঁচায়। খাঁচার মেঝেয় গোল করে খড় বিছিয়ে রেখে দিলাম তাদের। খাবার, পিঁপড়ের

সরু ডিম ছাতু দিয়ে মাখা। পরিস্কার কাঠির মাথায় করে খাওয়ান হত আর আঙুলের মাথায় করে জল। অল্প পরিমাণ লিকুইড প্যারাফিন দেওয়া হত মাঝে মাঝে। বাচ্চারা মুখ হাঁ করে চ্যাঁচ্যাঁ করলেই দেওয়া হত খাবার খেতে। তবে পেট ভর্তি থাকলে বড় একটা চ্যাঁচাত না।

যতদিন বাচ্চারা ছোট ছিল, হাতে করে খেত ততদিন কেমন একটা পোষমানা ভাব ছিল। আঙুলের ওপর রাখতাম বা হাতে নিয়ে বেড়াতাম আমরা। যত উড়তে শিখল ডানায় জোর হতে লাগল নিজে খাবার খুঁজে খেতে শিখল তত পোষমানা ভাব কেটে যেতে লাগল। এখন পাঁচ সপ্তাহ হয়ে গেছে, ওজন প্রায় ছত্রিশ গ্রাম। আমরা ওদের বড় খাঁচায় রেখেছি, কিন্তু ওরা আর কাছে আসে না, খাঁচার কাছে গেলে লাফালাফি করে। খাঁচা খুলে জোর করে ধরে হাতে রাখলে উড়ে, উড়ে যায়। একেবারে বনের পাখি হয়ে গেছে। আগেকার দিনে শুনেছি বুলবুল পুষত অনেকে।

মাঘ মাসের কনকনে শীত। রাতের অন্ধকার কাটতে না কাটতেই ছোট ছোট মেয়েগুলি দল বেঁধে পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে গান গাইছে,

ওঠ ওঠ সুয্যি গো ঝিকিমিকি দিয়া

সুয্যি তখন ঘুমোচ্ছিল। ওদের গানের শব্দে তার ঘুম ভেংগে গেল, আর সে লাফ দিয়ে উঠে পড়ে বলল, মা গো মা, আমি চললাম। ওই যে ওরা আমায় ডাকছে।

সুয্যির মা ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, না না, রাত যে এখনও ভোর হয়নি। এখন কোথায় যাবি তুই এই শীতের মধ্যে?

সুয্যি হেসে বলল, কি যে বল মা! সারা পৃথিবীর শীত ভাংগি আমি, আমার আবার শীত? আমি আমার রোদ ছড়াব, তবে না শীত কাটবে।

সুযির মা চার যুগের খবর রাখে, কোন কথা সে না জানে? তবু মায়ের প্রাণ তো, বুঝেও বুঝতে ায় না, বলে, আহা, যাবিই তো, সারাদিন তো বাইরে বাইরেই ঘুরবি। তোকে আটকে রাখব, সে াধ্য কি আমার আছে? যাবিই তো বাছা। তবে আর একটু বেলা হোক।

মায়ের কথা শুনে সুয্যি হাসে। হাসতে হাসতে বলে, তুমি সব বুঝেও অবুঝ হয়ে থাকবে, তামাকে আমি কেমন করে বোঝাব? আমি যদি না যাই বেলা উঠবে কেমন করে?

কিন্তু মা কিছুতেই যেতে দেয় না, যে লাল টুকটুকে জামাটা গায়ে দিয়ে সুয্যি রোজ সকাল বেলায় ঠে, সেই জামাটা মা লুকিয়ে ফেলল। মা ভাবল, এই টুকটুকে জামাটা ওর বড় পছন্দ। এ জামা য়ে না দিয়ে কি আর ও বাইরে যাবে?

অনেক খুঁজে খুঁজে জামাটা না পেয়ে সুয্যি বলল, ধ্যেত্তেরি ! না, আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। চাই না আমার জামা। আমি এমনিই চলে যাব।

এ কেমন কথা ? এমন সময় এই শীতে কেউ কখনও বেরোয় ? মা মনে মনে বলল, রাখ, বের করছি তোর যাওয়াটা। আদ্যি কালের সেই বুড়ী কত রকম মন্তর তন্তর জানে। সে বিড়বিড় করে কি বলতে বলতে তার কমণ্ডলু থেকে এক আঁচলা জল আকাশের গায়ে ছুঁড়ে মারল। আর অমনি সংগে সংগে দিক দিগন্ত আকাশ আর পৃথিবী কুয়াশায় কুয়াশায় ছেয়ে গেল। সে কি কুয়াশা! এক হাত দূরের কিছু দেখা যায় না।

এই কুয়াশার ঘন পর্দা ঠেলে বেচারা সুয্যি আর বেরোবার পথ পায় না। বুড়ী মনে মনে হাসে আর বলে, কেমন, যাওনা দেখি এবার ? সুয্যি এখন কি করে ? সে একেবারে ফাঁফরে পড়ে গেল।

এমন সময় সেই দূর পৃথিবী থেকে আবার সেই মেয়েদের গান ভেসে এল,

ওঠ ওঠ সুয্যি গো ঝিকিমিকি দিয়া

সুয্যি তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলল, যাই গো যাই, আর একটু ধৈর্য ধর, দেখ না আকাশ কেমন করছে।

উঠিতে না পারি আমি কুয়াশার লাগিয়া

মেয়েরা গানের সুরে বলে পাঠাল,

কুয়াশার ছেঁড়া কাঁথা শিয়রে থুইয়া
ওঠ ওঠ সুয্যি গো ঝিকিমিকি দিয়া।

কুশায়ার মেয়েগুলি হেসে কুটিকুটি, বলে, কেমন জব্দ ! আমাদের ঠেলে যাবে ? বেশ, যাও দিকিনি একবার ?

ওরা নেচে নেচে গান করে,

রাগ কইরো না সুয্যি ঠাকুর, মুখ ফিরাইয়া চাও
ঘরেতে আর মন টেকে না কোথায় চইলা যাও ?
কার ডাকেতে ছুটছ এমন আগল পাগল হইয়া ?
থাক থাক দণ্ডখানেক মায়ের কাছে বইয়া।

সুয্যি বড় কাজের মানুষ। কাজের সময় এসব ঠাট্টা মস্করা তার ভাল লাগে না। সে চটে লাল হয়ে উঠল। লাল কি লাল, যেন আগুনের গোলা। শাঁ শাঁ করে সে তার আগুনের তীর ছুঁড়তে লাগল। আর কি কথা আছে ? কুয়াশা ভেংগে খান খান। কুয়াশার মেয়েগুলো যে দিকে পারে ছুটে পালাল। সুয্যির সংগে কে পারবে ? সুয্যির মা বুড়ী দেখে, আর অবাক হয়ে ভাবে, আমার সুয্যি কি যে সে ছেলে ? তার কাছে মন্তর তন্তর কিচ্ছু খাটে না।

আঁধার কাটল, কাটল কুয়াশা, সারা পৃথিবী আলোয় আলোয় ঝলমল করতে লাগল। এবার সুয্যি উঠবে, চারি দিকে সাড়া পড়ে গেল।

বামনের বাড়ির মেয়েরা গাইল,

সুয্যি উঠবেন কোনখান দিয়া ?
বণিক বাড়ির ঘাটা দিয়া।

মালী বাড়ির মেয়েরা গাইল,

সুয্যি উঠবেন কোনখান দিয়া ?
মালী বাড়ির ঘাটা দিয়া।

শুধু কি তারা ? চারিদিক থেকে সবাই ডাকে। বাঁশ বন মাথা নুয়ে বলে, সুয্যি ঠাকুর প্রণাম নাও! আমার মাথায় তোমার পায়ের ছোঁয়া দাও! আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছি।

দুব্বো ঘাসের কচি পাতাটা এই মাত্র বেরিয়েছে, থরথর করে কাঁপছে আর বলছে, আমি যে বড়ই ছোট। তাই বলে তুমি কি আমায় দেখতে পাবে না ?

সমুদ্র ডাকে, ও সুয্যি, আমি যে তোমার আশায় বসে আছি, আমার বুকে প্রথমে ডুব দিয়ে তারপর তুমি ওঠ। দেখছ না, আমার ঢেউগুলি যে তোমার সংগে লুটোপুটি খেলবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে।

বাগ্‌দী পাড়ার তেংড়ী বুড়ী তার কুঁড়ে ঘরের দাওয়ায় বসে ডাকতে থাকে, সুয্যি বাবা, সুয্যি বাবা, শীতে যে মরে গেলাম, তুমি আমার ঘরের বরাবর দিয়া ওঠো।

খোকনমণি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিয়ে বলে, সুয্যি মামা, সুয্যি মামা, আমার জানালা দিয়ে যদি না ওঠো, তবে আর কোন দিন তোমার সংগে খেলব না।

সুয্যি উঠতে গিয়েও একটু থেমে গেল, সবাই বলছে, আমার সামনে দিয়ে ওঠো। একা সুয্যি কত দিকে যাবে ? যার কাছে না যাবে, সেই মনে দুঃখ পাবে, সেই মুখ ভার করবে।

তখন সুয্যি আর কি করে ? মায়ের কাছে যেই মন্তর শিখেছিল, সেই মন্তরটা ছেড়ে দিল, আর দেখতে দেখতে এক সুয্যি কত সুয্যি হয়ে গেল, তার আর অন্ত নাই। এবার আর ভাবনা কি ? সুয্যি এক সংগে সবার সামনা দিয়ে উঠল।

সারা পৃথিবীতে জয় জয় পড়ে গেল—সুয্যি উঠেছে! সুয্যি উঠেছে! আর সবাই মনে মনে বলল, সুয্যি আমাকেই সব চেয়ে বেশী ভালবাসে। তাই তো ঠিক আমার সমুখ দিয়েই এসে উঠেছে।

শেষ

টুনটুনি আজ তুই
দুষ্টুমি রাখ।
পুতুলের ঘরে এসে
চুপ্‌চাপ্‌ থাক!
এই ছাখ টবে জল
রয়েছে পাশেই,
স্নান সেরে নিতে তোর
অসুবিধে নেই।
ফ্রক যদি লাগে তোর
তা-ও আছে ঢের!
বাক্‌সটা থেকে তুই
ক'রে নিস্‌ বের।
দেখ চেয়ে এককোনে
রেখেছি খাবার,
যত খুশি খেয়ে নিস্‌
বক্‌বে কে আর?
দুপুরেতে যদি তোর
খুব ঘুম পায়,
ঘুমোতে পারিস তুই
এই বিছানায়।
একি, তবু উড়লি যে?
বোকা তুই ঠিক!
এক্ষুনি দেখে নিস্‌
আসবে শালিক!!
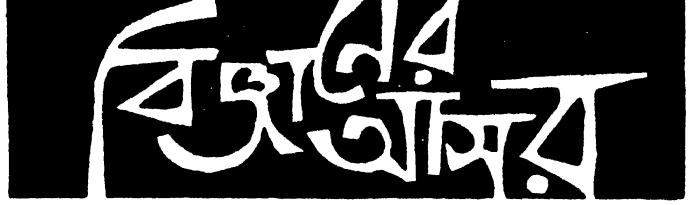
রহস্যময় তুষার-মানব

মিহিরকুমার ভট্টাচার্য

তুষারে ঢাকা হিমালয় সম্বন্ধে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের মনে নানা জিজ্ঞাসা আর কৌতূহল। বার বার পৃথিবীর নানা দেশের মানুষ হিমালয়ের বুকে অভিযান চালিয়েছে—অজানাকে জানবার জন্য। এই সব অভিযানে বিপদের ঝুঁকি বড় কম নয়। কিন্তু হিমালয়ের তুষার-মানবের কথা আজও রহস্যে ঘেরা। সেই তুষার-মানব সম্বন্ধে তোমাদের কিছু বলছি।

কেউ বলেন—তুষার-মানব সত্যিই আছে; আবার কেউ বলেন—ওসব বাজে কথা—আসলে তুষার মানব বলে কিছু নেই। অতি উৎসাহীরা তুষার-মানবের খোঁজে হিমালয়ের বুকে কম অনুসন্ধান করেন নি। কিন্তু সকলে ব্যর্থ হয়ে ফিরেছেন। তুষারের বুকে অদ্ভুত পায়ের ছাপ ছাড়া তাঁরা আর কিছু দেখতে পান নি। বেশী দিনের কথা নয়—গত ৮ই এপ্রিল (১৯৬৪) একটি খবর প্রকাশিত হয়েছিল—এই অদ্ভুত পায়ের ছাপ সম্বন্ধে। তোমরা অনেকেই হয়তো খবরটি দেখে থাকবে। সিকিম হিমালয় অভিযাত্রী দল পূর্বি র‍্যাটং হিমবাহের উপর এক রহস্যময় পায়ের ছাপ দেখেছেন। এই পায়ের ছাপ এমন কোনো প্রাণীর যে দু-পায়ে হাঁটে—কিন্তু সে মানুষ নয়। স্যার এডমণ্ড হিলারিও এই অদ্ভুত পায়ের ছাপ দেখে বলেছিলেন—এটা ভালুকের পায়ের ছাপ। কিন্তু প্রশ্ন হল ভালুক শুধু শুধি কেন দু-পায়ে হেঁটে যাবে? তবে কি এটা ইয়েতির পায়ের ছাপ? সঙ্গের শেরপারা এক সঙ্গে চেঁচিয়ে বলেছিল—ইয়েতি, ইয়েতি।

এই পায়ের ছাপের রহস্যভেদ আজ পর্যন্ত হয়নি। এই পায়ের ছাপের আসল মালিক কে—এই নিয়ে যত চিন্তাভাবনা। স্থানীয় অধিবাসীরা পায়ের ছাপের মালিকের যে সব বর্ণনা দিয়েছে—তাতে একজনের বর্ণনার সঙ্গে আর একজনের বর্ণনার গরমিল আছে।

১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর মাস। কর্ণেল সি. কে. হাওয়ার্ডবারী উত্তর হিমালয়ে অভিযান করেন। ২২০০০ ফুট উঁচু লাখ পালা গিরিপথে তিনি কয়েকটি অদ্ভুত পায়ের ছাপ দেখতে পান। প্রথমে তাঁর মনে হয়—এগুলি নেকড়ে, খরগোস বা খেঁকশিয়ালের পায়ের ছাপ। পরে তিনি ছাপগুলি ভালভাবে দেখেন—খালি পায়ে হাঁটলে মানুষের পায়ের যেমন ছাপ পড়ে—এই ছাপগুলি অনেকটা সেরকমের। তাঁর দলের শেরপাদের মতে—এগুলি মিটোকাংমীর (metohkangmi) পায়ের ছাপ। Kangmi-র

অর্থ করা হয় তুষার-মানব আর metoh-র অর্থ করা হয়—বীভৎস, জঘন্য, নোংরা প্রভৃতি। দুটো কথা এক হয়ে—'Abominable snow-man' বা 'বীভৎস তুষার-মানব' কথার উৎপত্তি হয়েছে।

১৮৮৯ সালে মেজর এল, এ. ওয়াডেল নামক এক ভদ্রলোক হিমালয় অভিযানে যান। তিনিও এই রহস্যময় পায়ের ছাপ দেখেন। তিনি স্থানীয় তিব্বতীদের এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। তিব্বতীদের ধারণা এগুলি হল অনন্ত তুষাররাশির মধ্যে বসবাসকারী এক জাতের লোমশ বুনো মানুষের পায়ের ছাপ। কিন্তু মেজরের ধারণা হয়—এগুলি এক জাতের ভালুকের (Ursus isabellinus) পায়ের ছাপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৯২২ সালে হিমালয় অভিযাত্রীদলের নেতা জেনারেল সি. জি. ব্রুস হিমালয় পর্বতের উত্তরদিকে অবস্থিত রংবুক (Rongbuk) মঠের প্রধান লামাকে মিটোকাংমি বা তুষার-মানব সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করেন। প্রধান লামা মিটোকাংমিকে ইয়াক বলে উল্লেখ করেন।

সব চেয়ে রোমাঞ্চকর বিবরণ দেন—এন. এ. টোম্বাজী নামে এক ইতালীয় হিমালয় অভিযাত্রী ১৯২৫ সালে। হিমালয়ের ১৫,০০০ ফুট উঁচুতে সত্যিই তিনি তুষার-মানব দেখেছেন বলে তিনি দাবী করেন। তিনি বলেন—প্রাণীটিকে দেখে আমি বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যাই। একনাগাড়ে আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকি। আমাদের দু-জনের মধ্যে বোধ হয় ২০০।৩০০০ গজের মত দূরত্ব। খাড়া হয়ে সে হাঁটছে আর মাঝে মাঝে দাঁড়াচ্ছে। সাদা তুষারের মধ্যে তাকে ঘন কালো দেখায়, দেহ তার একেবারে অনাবৃত। মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে দেখা—তার পরেই প্রাণীটি চোখের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যায়।

টোম্বাজী পরে তুষারের বুকে পায়ের ছাপগুলি পরীক্ষা করেন। তাঁর মতে—এগুলি সম্ভবতঃ কোনো মানুষের পায়ের ছাপ। লম্বায় ৬-৭ ইঞ্চি আর চওড়া ৯ ইঞ্চি। ১ ফুট থেকে ১½ ফুট দূরে দূরে এই ছাপ দেখা যায়। পাঁচটা আঙ্গুলের ছাপ খুব পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়, কিন্তু গোড়ালীর ছাপ অস্পষ্ট। তাঁর মতে—এটা নিঃসন্দেহে কোন দু-পাওয়ালা প্রাণীর পায়ের ছাপ।

১৯৩৬ সালে চু-উপত্যকা এবং স্যালউইন (Shalween) নদীর মাঝখানের গিরিপথে হিমালয় অভিযাত্রী রোনাল্ড কাউলবাক (Ronald Koulbach) কয়েকটি রহস্যময় পায়ের ছাপ দেখেন। ছাপগুলি দেখে মনে হয় যেন খালিপায়ে কোনো মানুষ বরফের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছে। প্রথমে ধারণা হয়—নেকড়ে বা পাণ্ডা (Panda) কিংবা কোনো অজ্ঞাত জাতের বানরের পায়ের ছাপ। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা যায়—সেখানে ঐ জাতীয় কোন প্রাণী বাস করে না।

কেউ কেউ মত দেন—এগুলি হিমালয় পর্বতে বসবাসকারী এক জাতের ভালুকের (Ursus aretos pruinosus) পায়ের ছাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই জাতের ভালুক একমাত্র হিমালয় অঞ্চলেই দেখা যায়। এদের পশমের রং বাদামী। সাধারণতঃ এরা চলবার সময় পিছনের দুটো পা দিয়ে সামনের দুটো পায়ের ছাপ মুছে ফেলে। ফলে ছাপগুলি মিশ্রপায়ের ছাপের আকৃতি ধারণ করে। পিছনের দুটো পায়ে ভর দিয়ে যখন এরা দাঁড়ায়—তখন দূর থেকে এদের রীতিমত ভয়ঙ্কর দেখায়।

তুষার মানবের পায়ের ছাপ সম্বন্ধে ফ্রাঙ্ক, এস স্মিথের মতও উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন—(The Valley of Flowers, New York Norton 1949)—সমতল ভূমিতে এই অদ্ভুত পায়ের ছাপ খুব পরিষ্কার বোঝা যায়। সমতল ভূমিতে পায়ের ছাপ লম্বায় প্রায় ১৩ ইঞ্চি আর চওড়ায় প্রায় ৬ ইঞ্চি। পদক্ষেপের দূরত্ব ১৮ ইঞ্চি থেকে ২ ফুট। পাঁচটা আঙ্গুলের ছাপ পরিষ্কার বোঝা যায়। আঙ্গুলগুলি ঠিক মানুষের পায়ের আঙ্গুলের মত সাজানো নয়, সমান ভাবে সাজান। তিনি এই অদ্ভুত পায়ের ছাপের ফটো তুলে নেন। অধ্যাপক জুলিয়ান হাক্সলী, মিঃ মার্টিন এ. সি, হিন্টন, মিঃ আর. আই. পোকক প্রমুখ প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌রা সেই ফটো পরীক্ষা করেন। তাঁদের ধারণা হয় এগুলি একজাতের ভালুকের (Ursus aretos isobellinus) পায়ের ছাপ। এই জাতের ভালুক একমাত্র হিমালয়েই দেখা যায়।

১৯৩৭ সালে এরিক শিপটন ও এইচ. ডব্লু. টিলম্যান কারাকোরাম অভিযান করেন। তাঁদের দলের কয়েকজন কয়েকটি বিস্ময়কর পায়ের ছাপ দেখেন। ছাপগুলি মোটামুটি গোল, তুষারের মধ্যে প্রায় ৯ ইঞ্চি গভীর গর্ত সৃষ্টি করে এবং এর ব্যাস প্রায় ১ ফুট। আরও মজার ব্যাপার—ছাপগুলি বরাবর সোজা ছিল; ডাইনে কিংবা বাঁয়ে একটুও বেঁকে যায়নি। চতুষ্পদী প্রাণীরা লাফিয়ে চললে যে রকম পায়ের ছাপ পড়ে এই ছাপ সেরকম নয়। শেরপাদের ধারণা—ইয়েতির পায়ের ছাপ এগুলি। এরিক শিপটনের ধারণা ছিল—এগুলি গলিত তুষারের ছাপ। টিলম্যানের বিশ্বাস—তুষার-মানব আসলে নেই।

পায়ের ছাপ সোজাসুজি পড়ায়—অনেকের বিশ্বাস এগুলি ভালুকের পায়ের ছাপ নয়, কারণ—ভালুক তো সরল রেখা বরাবর হাঁটতে পারে না। তবে এই পায়ের ছাপ কার? এই প্রশ্নের উত্তর আজও সঠিক জানা যায় নি।

এই প্রসঙ্গে তোমাদের পামীরের তুষার-মানব সম্বন্ধে দু-একটা কথা জানাচ্ছি। পামীর পর্বতমালায় বেশ কিছুদিন আগে একটি ল্যাজ বিশিষ্ট লোমশ প্রাণী দেখা যায়। দেখতে অনেকটা মানুষের মতো। রাশিয়ার সংবাদপত্রে হৈচৈ সুরু হয়। সবাই বলে—এটি তুষার-মানব ছাড়া অন্য কিছু নয়। মিরোলশো আসলেদিনফ নামে একজন কৃতী শিকারী শেষ পর্যন্ত প্রাণীটিকে গুলি করে মারে। প্রাণীবিজ্ঞানী অধ্যাপক পোর্শনেফ এই প্রাণী সম্বন্ধে ২৩শে ফেব্রুয়ারী (১৯৬২) তারিখের 'ত্রুদ' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন—তাতে জানা যায় এটি বড় পুরুষ বানর—এর দেহ লম্বায় ৬৪ সেন্টিমিটার, ল্যাজটি লম্বায় ২৭ সেন্টিমিটার এবং ওজন নয় কিলোগ্রাম। পামীরের পার্বত্য অঞ্চলে এর আগে কখনও বানর বা বানর জাতীয় প্রাণী দেখা যায়নি; কারণ স্থানটি তাদের বাসের পক্ষে উপযুক্ত নয়। অধ্যাপক পোর্শনেফের ধারণা—যে ভাবেই হোক এই বানরটি তিব্বত বা তার কাছাকাছি জায়গা থেকে পামীরে এসে উপস্থিত হয়েছে। এই হয়তো সেই বিখ্যাত তুষার-মানব!

বল্‌বন্ত সিং ছেলেবেলায় আমাদের ক্লাসে পড়ত। তার বাড়ি পাঞ্জাবে; বেশ সুপুরুষ চেহারা; লম্বায় তখনই সাড়ে পাঁচ ফুট ছিল। তারপর আর তার সঙ্গে বহুদিন দেখা হয়নি। প্রায় ১৫।১৬ বছর কেটে গেছে। দু'জনে খুবই বন্ধুতা ছিল বটে; কিন্তু তার ঠিকানা আমার জানা না থাকায় আর আমার ঠিকানাও তার জানা না থাকায় দু'জনে চিঠি লেখালিখি চলে নি।

সেবার পুজোর ছুটিতে পাঞ্জাব বেড়াতে যাই। লাহোরে আমার বিশেষ বন্ধু বিজয় ঘোষ ওকালতী করে; তারই বাড়িতে ওঠা স্থির হয়। লম্বা রাস্তা, যেন আর ফুরোয়ই না ঠাণ্ডাও বেশি পড়েনি তখনও। ট্রেণ তখন লাহোরের কাছাকাছি এসেছে; আমি ক্লান্ত হয়ে একটু ঝিমাচ্ছি। হঠাৎ দরজা খুলে একটি লোক কামরায় ঢুকে পড়ল আর সামনে আমাকে দেখে 'আরে।' বলে আমার কাঁধে হাত তুলে দিল। চমকে চেয়ে দেখি বলবন্ত সিং আমার সামনে। তখনই আমি সরে গিয়ে বলবন্ত সিংকে পাশে বসালাম আর সঙ্গে সঙ্গে কুশল প্রশ্ন ইত্যাদি চলতে লাগল। বলবন্ত বলল 'আমি স্কুল ছেড়ে পাঞ্জাবে চলে আসি; এখানের ইউনিভার্সিটিতে আই-এস্‌-সি পাস করে কৃষি-বিদ্যা শিখবার জন্য এগ্রিকালচারাল কলেজে ভর্তি হই। সেখান থেকে পাশ করে কিছুদিন সরকারী চাকরী করি। সম্প্রতি সে চাকরী ছেড়ে নিজে চাষবাস করার মতলব কর্‌ছি। চার বছর হ'লো আমার বাবা মারা গেছেন। তাঁর সব সম্পত্তির অধিকারী আমিই। লাহোর থেকে প্রায় ২০০ মাইল দূরে কিষণপুরে আমার দু'হাজার বিঘে জমি আছে; সেখানকার দৃশ্যও বড় চমৎকার। অসুবিধার মধ্যে ৩০ মাইল গরুর গাড়িতে যেতে হয়; তবে আমি ঘোড়ার টাঙ্গার ব্যবস্থা কর্‌ছি। তোমাকে ভাই একবার আমার ওখানে যেতেই হবে; কিছুতে ছাড়ছি না।'

আমি বললাম, বন্ধু বিজয়বাবু যদি নিতান্ত নারাজ না হন, নিশ্চয়ই যাব। তোমার ঠিকানাটা দাও ভাই ; আমার ঠিকানাটাও লিখে রাখ।

কথা বলতে বলতে ট্রেণ লাহোরে পৌঁছিয়ে গেল। স্টেশনে বিজয় এসেছিল ; তার সঙ্গে বলবন্ত সিংএর আলাপ করিয়ে দিলাম। বিজয় বলবন্তকে অনেক পীড়াপীড়ি করল তার বাড়িতে থাকবার জন্য। বলবন্ত কিছুতেই রাজী হলো না ; সে সরাইখানাতে গিয়ে উঠল। সেখান থেকে রোজই সে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে ; অনেক গল্প গুজব হয়। তিনদিন পর যখন আমার লাহোর দেখা শেষ হলো তখন বলবন্ত বলল, 'এবার আমার ওখানে যেতে হচ্ছে ভাই। বিজয়বাবুকে নিয়ে কাল দুপুরের গাড়ীতে রওয়ানা হয়ে হার্‌বন্‌ওয়ালা স্টেশনে পৌঁছাব। রাত্রে ওয়েটিংরুমে ঘুমিয়ে ভোরবেলা রওয়ানা হয়ে ১১টার মধ্যে কিষণপুর পৌঁছাব। আমিও অনেক দিন সেখানে যাই নি। কাল সেখানকার জমাদারের চিঠি পেলাম ; আমাকে চিঠি পেয়েই যেতে লিখেছে। হার্‌বন্‌ওয়ালায় ঘোড়ার টাঙ্গার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।'

পরদিন খাওয়া দাওয়ার পর আমি, বিজয় আর বলবন্ত ১২টার ট্রেণে রওয়ানা হয়ে পড়লাম। সন্ধ্যার সময় হার্‌বন্‌ওয়ালায় পৌঁছে স্টেশনের ওয়েটিং রুমে রাত্তিরটি কাটালাম।

ভোরবেলা উঠে, চা খেয়ে, আমরা ঘোড়ার টাঙ্গায় রওয়ানা হয়ে পড়লাম। রাস্তা বেশ পরিষ্কার, ধুলো-বালি নাই বেশি। জঙ্গল মাঝে মাঝে রয়েছে, ছোট পাহাড়ও বিস্তর আছে। পথে এক জায়গায় ঘোড়া বদল হলো। সেখান থেকে কিষণপুর ১৫ মাইল বেলা ১০½ টায় আমরা বল্‌বন্তের সম্পত্তির দরজায় পৌঁছালাম।

গাড়ি থেকে নেমে যা দেখ্‌লাম তাতে আমার মনে বড়ই আনন্দ হলো। চারিদিকে সুন্দর গাছ পালায় সবুজ হয়ে আছে ; পিছনে দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, একটি ছোট নদীও বয়ে যাচ্ছে। বাগানের মাঝে একটি ছোট্ট বাংলো ধরণের বাড়ি। উঁচু থামের উপর তিনটি কাঠের ঘর, তার চারিদিকে বারান্দা ; কাঠের সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে ঘরে ঢুকতে হয়। ঘরের উপরে লাল টালির ছাত, ঘরের রং সবুজ। দূর থেকে সুন্দর ছবির মত দেখায়।

আমরা পৌঁছবামাত্র বল্‌বন্তের জমাদার বুড়ো নিরঞ্জন সিং দৌড়ে এসে সকলকে সেলাম করল। তার বয়স প্রায় ৭০ বছর, কিন্তু শরীর খুব সবল আছে। লম্বায় প্রায় সাড়ে চার হাত ; ধব্‌ধবে সাদা দাড়ি গোঁফ। মুখে কিন্তু তার ভয়ের চিহ্ন। আমাদের বারান্দায় বস্‌বার ব্যবস্থা করে দিয়ে সে খাবার আন্‌তে গেল।

খেতে বসে আমরা নিরঞ্জনের কাছে যে ঘটনা শুন্‌লাম তাতে আমাদের মন অনেকটা দমে গেল। সে বলল যে কিষণপুরের ঐ বাগানে নাকি অনেকদিন থেকে ভূতের বাস। সে প্রথমে কিছুতেই বিশ্বাস করেনি, এবং প্রথমে কিছুদিন ভূতের নাম-গন্ধও ছিল না। শেষে শুন্‌তে পেল যে, ভূত নাকি শরৎকালে চাঁদনী-রাতে দেখা যায়। প্রথমে সে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু তিন দিন আগে সে নিজের চোখে যা দেখেছে তাতে ভূতকে আর অবিশ্বাস করা চল্‌তে পারে না।

তিন দিন আগে সন্ধ্যার পর সে দক্ষিণের বারান্দার উপর বসে ছিল। সেদিন শুক্লপক্ষের একাদশী; সুন্দর জ্যোৎস্না হয়েছে। কতক্ষণ বসেছিল মনে নাই তার। বাগানের মালী শাদু‍র্ল সিং সঙ্গে ছিল। দুজনে গল্প করতে করতে সবেমাত্র একটু ঘুমাবার চেষ্টা করছে, এমন সময় হঠাৎ মনে হলো যেন সোঁ সোঁ শব্দে ঝড় উঠেছে। চমকে সামনে চাওয়া মাত্র দেখতে পেল প্রকাণ্ড একটা শাদা মূর্তি ঊর্দ্ধশ্বাসে তাদের দিকে ছুটে আসছে। দুজনেই উঠে ঘরে পালাবার চেষ্টা করল, কিন্তু একটু দূরে গিয়েই মাথা ঘুরে পড়ে গেল। তারপর কি হ'লো মনে নাই। অনেকক্ষণ পরে যখন তাদের চেতনা হলো তখন দেখল যে ভোর হয়ে গেছে, আর তারা দুজনেই ঘরের দরজার সামনে পড়ে আছে। সেদিন থেকে ভয়ে তারা রাত্রে ঘরের ভিতর শোয়, কিন্তু ভূত আর সেদিন থেকে আসে নি। এর আগেও নাকি একটি লোক ঐ দক্ষিণের বারান্দা থেকে শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্না রাতে ঠিক ঐ রকমের ভূত দেখতে পেয়েছিল। নিরঞ্জন সিং সাহসের জন্য বিখ্যাত; লড়াইয়ে সে অনেক মেডেলও পেয়েছে। কিন্তু সেদিনের ভূত তাকে ভয়ে একেবারে কাবু করে ফেলেছিল।

খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা বাগানে বেড়াতে গেলাম আর পরামর্শ চলতে লাগল রাত্রে কি করা যায়। বলবন্ত ভূতে বিশ্বাস মোটেই করত না, আমি আর বিজয়ও অনেকটা সাহসী ছিলাম; কাজেই ভূতের ভয়ে আমরা পিছ পা হলাম না। পরামর্শ করে ঠিক করলাম সেই রাত্রেই (সেদিন পূর্ণিমা) আমরা তিনজন দক্ষিণের বারান্দায় শুয়ে থাকব; বলবন্তের হাতে পিস্তল থাকবে; আমার কাছে বন্দুক থাকবে, ভূত দেখলেই তাকে গুলি করব।

গল্প-গুজব, বেড়ান, চা, খাওয়া, রাত্রের খাওয়া ইত্যাদি সারতে রাত ৮টা বাজল। ততক্ষণে দক্ষিণের বারান্দায় আমাদের বসবার জন্য গালিচা আর তাকিয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেছে; আমরাও খাওয়া দাওয়া সেরে দিব্য আরামে তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে গল্প গাছা করতে লাগলাম, আর মাঝে মাঝে দক্ষিণের পাহাড়ের দিকে আর গাছপালার দিকে নজর দিতে লাগলাম। চমৎকার জ্যোৎস্না, দিব্য ফুরফুরে বাতাস; সুন্দর ফুলের গন্ধ বাতাসে ভেসে আসছে, তার উপর পথের ক্লান্তি, কাজেই ঘুম আর কতক্ষণ আটকা থাকে? ক্রমেই আমাদের তন্দ্রা বোধ হ'তে লাগল; বলবন্ত সিং কিন্তু তখনও সজাগ।

কিছুক্ষণ বাদে বিজয় আর আমি একরকম ঘুমিয়েই পড়লাম; বলবন্তও ঝিমাতে লাগল—হঠাৎ ঝড়ের মত সোঁ সোঁ আওয়াজ হলো আর সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পেলাম দক্ষিণ দিক থেকে প্রকাণ্ড একটা শাদা মূর্তি শূন্যপথে ঊর্দ্ধশ্বাসে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। আমি বন্দুক উঠাতে চেষ্টা করলাম; হাত কেঁপে বন্দুক পড়ে গেল। বলবন্ত দুড়ুম করে পিস্তল ছাড়ল, কিন্তু মূর্তির কিছুই হলো না। আমরা তিনজনেই উঠে ঘরের দিকে ছুটতে চাইলাম, কিন্তু মাথা ঘুরে তিনজনেই পড়ে গেলাম।

যখন চেতনা হলো তখন দেখলাম ভোর হয়ে আসছে। মাথা তখনও যেন ঘুরছে। আগের রাতের ঘটনা সব স্বপ্নের মত মনে হ'তে লাগল।

সকালে চা খেয়ে আমরা তিনজনে আগের রাতের ঘটনার বিষয় আলোচনা করতে বসলাম। মূর্তিটা যে কি রকম ছিল তা' স্পষ্টভাবে কারো মনে নেই— শুধু আবছায়া গোছের মনে আছে। ঝড়ের

শব্দটা তিনজনেই একসঙ্গেই শুনেছি কিনা তাও ঠিক বোঝা গেল না ; তবে মোটামুটি এই বোঝা গেল যে, প্রথমে তিনজনেরই মাথা ঘুরেছিল, তারপর তন্দ্রার ভাব এসেছিল, তার কিছুক্ষণ পরে ঝড়ের শব্দ শোনা গেছিল।

প্রকাণ্ড একটা শাদা মূর্তি শূন্যপথে উর্দ্ধশ্বাসে আমাদের দিকে ছুটে আসছে!

সেদিন রাত্রে কি করা হবে সে বিষয়ে আমরা ঠিক করে নিলাম, বলবন্ত বল্‌ল, সে দক্ষিণের বারান্দাতেই থাক্‌বে ; প্রত্যেকের হাতেই পিস্তল থাকবে ; মূর্তি দেখা দিলেই 'এই' বলে প্রত্যেকে অন্যদের জানিয়ে দেবে। ঝড়ের শব্দ শোনা গেলেও জানাবে।

সারাদিন ঘোরাঘুরি, গল্প-গুজব ক'রে কাটিয়ে রাত্রে আমরা কথা-মত যে-যার জায়গায় বস্‌লাম আর কথাবার্তা চল্‌তে লাগ্‌ল। কিছুক্ষণ বাদে বল্‌বন্ত ঝিমাতে লাগল ; বিজয় আর আমি গল্প কর্‌তে লাগ্‌লাম। হঠাৎ বলবন্ত চীৎকার করে উঠল 'ঐ-ঐ-ঐ ঝড় ; একটু বাদেই আবার বল্‌ল 'ঐ-ঐ-মূর্তি ; বলেই দুড়ুম করে পিস্তল ছেড়ে দিল। আমরা কিন্তু ঝড়ও শুন্‌লাম না, মূর্তিও দেখলাম না।

ছুটে গিয়ে বলবন্তকে দু'জনে ধ'রে টানাটানি করে পশ্চিমের বারান্দায় নিয়ে এলাম ; তখনও সে অজ্ঞান হয়নি, কিন্তু টল্‌ছে। খানিকক্ষণ বাতাস করার পর তার মাথা পরিষ্কার হয়ে গেল ; তখন সে আমাদের জিজ্ঞাসা কর্‌ল ঝড়, মূর্তি এসব আমরা টের পেয়েছি কি না। আশ্চর্যের কথা আমরা দু'জনে ঝড়ের শব্দ একটুও শুনি নি, মূর্তিও দেখিনি। মাথাটা খুব সামান্য ভার মনে হয়েছিল, আর কিছুই টের পাইনি। অথচ, আমরা তিনজনেই একদিকে চেয়েছিলাম।

সারারাত আমি এ বিষয় বসে ভাবলাম। ছেলেবেলা থেকে সায়েন্স, পড়ার সখ আছে ; দু'চারটা পুঁথিও নাড়াচাড়া করেছি, কাজেই এ বিষয়ের একটা বৈজ্ঞানিক মীমাংসার কথা মাথায় ঘুর্‌তে লাগ্‌ল।

বিজয় আর বলবন্ত এটাকে একটা ভৌতিক কাণ্ড বলেই ধরে নিল। বলবন্ত স্পষ্টই বল্‌ল, এতদিনে আমার ভূতে বিশ্বাস জন্মাল। 'চোখের দেখা তো আর অবিশ্বাস কর্‌তে পারি না।'

সকালে উঠে বিজয় আর বলবন্ত বাগানে বেড়াতে গেল; আমি আর তাদের সঙ্গে গেলাম না, চুপচাপ একটু তদন্ত কর্‌বার চেষ্টায় বাড়ির দক্ষিণ দিকে গেলাম। থামের উপর বাড়ীটি তৈরী করা হয়েছে; থামের গায়ে লতা উঠেছে। একটি লতা একটু নূতন ধরণের; তার পাতার রং লালচে গোছের; একটি মাত্র প্রকাণ্ড বেগুনি ফুল সেই লতায় ফুটেছে তার গন্ধই বা কি সুন্দর। ফুলটি বারান্দায় রেলিংএর গায় সকালবেলা আধ ফুটো অবস্থায় রয়েছে। এমন সুন্দর ফুল আমি খুব কমই দেখেছি।

দক্ষিণ দিকের শোভাটা এত সুন্দর যে আমি ভূতের বিষয় তদন্তের কথা একেবারেই ভুলে গেলাম। চারিদিকে দেখতে দেখতে আবার বারান্দার দক্ষিণ দিকে উঠে গেলাম; ইচ্ছা সেই ফুলটা ভাল করে দেখি। কাছে গিয়ে দেখলাম ফুলটি দূরে যত সুন্দর, কাছ থেকে আরও বেশী সুন্দর দেখায়। ফুলের গায়ে কি সুন্দর কাজ করা। কাছ থেকে ফুলের গন্ধটিও খাসা; রাত্রে যে গন্ধ বাতাসে ভেসে আসছিল সে এই ফুলেরই গন্ধ।

একটু বাদেই ফুলের গন্ধে আমার মাথাটা ঘুরতে লাগল—আমি চট্ করে সরে এলাম। তখনই কানের মধ্যে একটু সোঁ সোঁ আওয়াজ হলো, আর চোখের সাম্নে একটা সাদা গোছের পর্দার মত জিনিস দেখা দিল; সঙ্গে সঙ্গে মাথাটাও ঘুরে গেল। কিছুক্ষণ বাতাসে বসার পর আবার মাথা পরিষ্কার হয়ে গেল; সঙ্গে সঙ্গে ভূতের ব্যাপারও অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেল। তখন বুঝলাম এ ফুলের গন্ধেই আমাদের নেশার মত হতো আর তারই ফলে ঝড়ের শব্দ শাদা মূর্তি এসব আমরা শুন্‌তাম এবং দেখতাম। নেশা ক্রমে ঘোর হয়ে অজ্ঞান করে ফেলত এবং অজ্ঞান হবার অল্পক্ষণ আগেই চোখের সামনে ঝাপসা শাদা মূর্তি দেখা যেত। আমরা কেউ মূর্তিটি আবছায়া গোছের ছাড়া স্পষ্ট দেখিনি এবং মুহূর্তের মধ্যেই সেটি মিলিয়ে যেত; তার পর চেতনা থাকত না। সেই ফুলের লতা নাকি বলবন্তের বাবার এক বিশেষ বন্ধু হনলুলু থেকে এনেছিলেন। ফুলের দোষ গুণ তিনি জানতেন না; তার অপরূপ চেহারা দেখেই লতাটি অনেক টাকা দিয়ে কিনে, খুব যত্ন করে ভারতবর্ষে এনে বলবন্তের বাবাকে উপহার দিয়েছিলেন। আগের দিন বাগানে বেড়াবার সময় বলবন্ত ঐ ফুলের লতার কথা আমাকে বলেছিল। শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্না রাতে ফুল ফুটত।

রাত্রে আমরা যে যার জায়গায় বসে গল্প করতে লাগলাম। আমি মাথাটাকে পিছনে হেলিয়ে সেই বেগুনি ফুলটি থেকে যথাসম্ভব দূরে রেখেছি আর তার দিকে নজরও রেখেছি। জ্যোৎস্না দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ফুলটিও আস্তে আস্তে ফুটে উঠছে দেখছি আর সঙ্গে সঙ্গে তার গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে।

বুঝলাম, বেশি দেরী করা উচিত হবে না; তাই হঠাৎ 'ঐ-ঐ' বলে চেঁচিয়ে চট্ করে উঠে ফুলটিকে দূরে ফেলে দিলাম; সঙ্গে সঙ্গে গুড়ুম করে পিস্তলও ছেড়ে দিলাম; তারপর আস্তে আস্তে হেঁটে বলবন্তের কাছে গিয়ে বললাম, দেখলে না, ভূতকে গুলি করে মেরে ফেললাম? বলবন্ত ভয়ে কাঁপছিল।

আমার কথা শুনে বলল 'ভূত আমি দেখতে পাইনি ; তবে তাকে মেরে ফেলেছ শুনে আমি নিশ্চিন্ত হলাম।'

আমি বললাম, 'চল যাই ঘুমাই গিয়ে।'

পরদিন সকালে উঠেই আগে আমি বাগানে গিয়ে সেই ফুলটি দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখি, ফুল একেবারে শুকিয়ে গেছে। তখনই তাকে মাটিতে পুঁতে ফেললাম। তারপর সেই লতার শিকড়টি টেনে উপড়িয়ে ফেলে দিলাম ; যাতে আর না গজায়। আশে পাশে বেশ করে খুঁজে দেখলাম সেই লতা আছে কিনা—দেখলাম একটিও নাই।

সে রাত্রে আমরা তিনজনেই দক্ষিণের বারান্দায় রইলাম। রাত্রে সুন্দর জ্যোৎস্না উঠল, ফুরফুরে বাতাস বইল ; চমৎকার ফুলের গন্ধ পাওয়া গেল—কিন্তু সেদিনের গন্ধটি যেন একটু অন্য ধরণের। বলবন্ত বলল, "ভূত পালাবার সঙ্গে সঙ্গে কি ফুলের গন্ধও বদলে গেল ? আমি শুধু "হু" বললাম। সে রাত্রে আর ভূত দেখা দিল না ;—এমন কি তখন থেকে নাকি সেখানে ভূত আর দেখাই দেয় নি। এর জন্য বলবন্ত আমার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ; সে বলল, "পিস্তল তো অনেকে ছোঁড়ে ; কিন্তু, তোমার মত অব্যর্থ হাত কা'রো নাই।"

বনে বনে (১)

জীবন সর্দার

আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি চোখ মেললাম আর দেখলাম আমি গভীর বনের মাঝে।

সাধ করে আর বনে আসিনি। আমার চেয়ে ভীরু কে কোথায় দেখেছে? দলে পড়ে বনে এসেছি বেড়াতে।

ঘুরে বেড়ান সখ আমার। নীলাঞ্জন আমার মত অকারণ ঘুরে বেড়ায় না। দু চোখ দিয়ে দু'পাশের সকল জিনিষ খুঁটিয়ে দেখা তার স্বভাব। কি জানি কেন, একদিন আমাদের মনে হল কাছাকাছি সবকিছু দেখা শেষ। একটু দূরে একটু গভীরে এবার ঘুরে এলে কেমন হয়!

কোথায় যাব ঠিক হল না কিন্তু রাজি হয়ে গেলাম যেখানে খুসি যেতে।

ইচ্ছেটা জানালাম মেজদাকে। কোন কথা না বলে তিনি ভারতবর্ষের মানচিত্রখানা বিছিয়ে দিলেন মেঝেতে। মানে, কোথায় যাব আমাদেরই ঠিক করতে হবে।

থুতনিটা লঙ্কাদ্বীপে রেখে নীলাঞ্জন উবু হয়ে পড়ে রইল মানচিত্রটার উপর। আমি ঠাণ্ডা মেঝেয় গা এলিয়ে দিলাম। কান খাড়া করে রাখলাম মেজদা কি বলেন শোনার জন্যে।

ভূগোলে পড়েছ ভারতবর্ষ উত্তর-দক্ষিণে ৩২০০ কিঃ মিঃ লম্বা, আর পুব পশ্চিমে চওড়া ৩০০০ কিঃ মিঃ। শিয়রে বরফ-চূড়ার হিমালয় উত্তুরে ঠাণ্ডা হাওয়াকে আটকেছে। বরফ গলা জলে জন্ম হয়েছে অসংখ্য নদী নালার। দক্ষিণে ত্রিকোণ দেশটার তিন দিকে তিন সাগর। জল ভরা মেঘ পাঠায় উত্তরে সময় হলেই। মেঘ ঠেকাতে সেখানে দুই কূলে মাথা তুলেছে দুই সারি 'ঘাট-পর্বত মালা'। মাঝে সিন্ধু-গঙ্গার সমভূমি। নদীনালা কিলবিল করে সেখানে। তার পশ্চিমে মরুভূমি কিন্তু পুব সীমানায় মুষল বৃষ্টিধারার দেশ। বলত এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে?

প্রশ্ন করেই মেজদা আবার সুরু করলেন—কোন দেশের জল হাওয়া যদি এমন বিচিত্র হয়, সে দেশের গাছপালা হবে বিচিত্রতর। জলহাওয়া আর গাছপালার প্রভাব পশুপাখির উপর যে কতখানি তা কি কারও জানতে বাকি! তাই নানা ধরনের···

মেজদাকে থামিয়ে নীলাঞ্জন বললে, আচ্ছা এবার যদি ভরতপুর বা কোদাইকানাল কিংবা কচ্ছের জলা জায়গায় পাখি দেখতে যাই ত' কেমন হয়?

আমি বললাম, দূর আবার সেই ট্রেনে ট্রেনে আর বাসে বাসে। অন্য জায়গা দেখ। হাতেতে মাথা রেখে পায়ের উপর পা রেখে আমি আবার মেজদার কথায় কান দিলাম।

ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকার নানাধরণের পশুপাখির দেখা মিলবে এই দেশে। কেননা সেই সব দেশের জলহাওয়া আর মাটির গুণ কিছু না কিছু এখানে আছেই।

যদি বেড়াতে যেতে চাই, সহরে না, গ্রামেও না, বনে বনে, তবে কেমন হয়। কেমন হয় নীলাঞ্জন! লাফিয়ে উঠে আমি বললাম।

চমৎকার! আগ্রহে সে উঠে বসল। বনে কিন্তু কোন বনে?

কেন হিমালয়ের কোন গভীর বনে। তরাইএ।

না, সে ভাবে আমাদের বন দেখা হবে না। মেজদা মুচকি হেসে বললেন। তাঁর কথা শুনে মনে হল বনে যাবার ইচ্ছে নিয়েই তিনি এতক্ষণ আমাদের এত কথা শোনালেন।

ভেবে দেখ, সিন্ধুর উৎস থেকে ব্রহ্মপুত্র যেখানে ভারতে ঢুকেছে সে অবধি হিমালয়টা প্রায় ২৪০০ কিঃ মিঃ। এর উৎস থেকে ওর মুখ অবধি তিনটি ভাগ তোমাদের নজরে আসবে—জলহাওয়া আর গাছপালার গুণে। (১) পশ্চিম-হিমালয়। (২) পুব-হিমালয়। (৩) মাঝের হিমালয়—এর সবটাই প্রায় নেপাল রাজ্যে।

হিমালয়ের পশ্চিম অংশে কাশ্মীর ও লাডাক। এখানে বৃষ্টি কম, শীত বেশী। পাতা ঝরা গাছের বন এখানে। এখানে এমন কয়েকটি প্রাণী আছে যা ভারতের কোথাও নেই। উত্তর ও পশ্চিম এশিয়ার প্রাণীদের জ্ঞাতি ভাইদের যদি দেখতে চাও ত' সেখানে যাও। পুবের হিমালয়, দার্জিলিংএর কাছ থেকে আসামের শিয়রে ছড়ানো। এখানকার জলহাওয়া, গাছপালা এমন, বৃষ্টি এত হয় যে এখানকার বনে বনে মালয়, ইন্দোচায়না আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির পশুপাখির জাতভাইরা মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ায়।

মাঝের হিমালয়, এই এলাকায় পুব আর পশ্চিমের দুই এলাকার পশুপাখিরই চরে বেড়াবার জায়গা হয়েছে। মজার কথা কি জান, দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম উপকূলের বন উপবনে যে সকল প্রাণীর দেখা মেলে, তেমনি জাতের প্রাণীদের দেখা মিলবে মাঝের হিমালয়ের নিচের তলায়; মানে হাজার তিনেক ফুটের ভেতর।

কারণ কি! কারণ, উত্তরের এই অংশের সাথে পশ্চিমঘাট পর্বত অঞ্চলের মিল খুব বেশী। দুটো জায়গায়ই বৃষ্টি প্রচুর। প্রচুর বৃষ্টির বনে কি ধরণের প্রাণীর পদসঞ্চার হয়েছে যদি দেখতে চাও, তবে, চল যাই—নীলগিরি, আন্নামালাই, কর্দোমন বা মালাবার উপকূলে।

পশ্চিমঘাটকে ডিঙ্গিয়ে জল নিয়ে বাতাস পুবে বেশী আসতে পারে না। দক্ষিণ ভারতের মাঝ-বরাবর বা পুব উপকূলের বনগুলি বেশী-বৃষ্টির বন নয়। কড়গড়ি বা বুনো-কুকুর আর নেকড়ে পালের ছুটোছুটি এই ধরনের বনের মেঝেয়। কিন্তু পশ্চিমঘাটের নীচু কাঁধ ডিঙ্গিয়ে কিছু জলো হাওয়া ঢুকে পড়ে গোদাবরী নদীর কাছে। গোদাবরীর উত্তর থেকে সাতপুরা আর বিন্ধ্যাচলের গোড়া অবধি—এই এলাকার বন আর উত্তর-ভারতের সমতলের বন এক গোত্রের।

দূরের বনে না গিয়ে, মেজদা, চল কাছের বনে যাই। আমরা সমতলের লোক, সমতলের বন দেখা কাজের হবে। নীলাঞ্জন আবদার করলে।

সমতলে একটি বনও বাকি নেই—চাষ আবাদের জন্যে সব কেটে সাফ করেছি। গ্রাম ও নগর বসিয়েছি। নয়ত' সত্যিকারের ভারতীয় বন এখানেই দেখতে পেতাম। বন যখন উধাও হল বনের প্রাণীরা প্রাণ নিয়ে পালাল উত্তরে তরাই বনে, দক্ষিণের নানা বন উপবনে, পশ্চিমে আরাবল্লীর পার্বত্য বনে আর পুবে সুন্দরবন আর ব্রহ্মপুত্র এলাকার জঙ্গলে।

পশ্চিমের মরুভূমি এই সমতলের অংশ। এখানকার বন আর বুনোদের সাথে আফ্রিকা আর দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার বেশ মিল খুঁজে পাবে। মরু এলাকা ছেড়ে সোজা পুবে চল, বৃষ্টি বাড়বে, গাছপালা ঘন হবে আর মাটি হবে সরস। যদি ভগীরথের পথ ধরে চল তবে সাগরের মুখোমুখি এসে দাঁড়াতে হবে।

নদী মোহনায় মাটি রেখে নীল জলে গা ভাসিয়েছে। মাটি জমে জমে দ্বীপ হয়েছে অসংখ্য। আর দ্বীপগুলিতে জন্ম নিয়েছে পৃথিবীর একটি ভয়ঙ্কর সুন্দর বন।

সুন্দরবন! চেঁচিয়ে উঠল নীলাঞ্জন।

কি সুন্দরবন? আমি জিগগেস করলাম।

চলো যাই সুন্দরবন।

কিন্তু সেখানে যে পায়ে হেঁটে যাওয়া চলবে না।

যেখানে যেমন ভাবে যাওয়া যাবে আমরা তেমনি ভাবে যাব।

কিন্তু বনে ঘুরে বেড়াবার আইন কানুন, নিয়ম কিছুছু যে আমি জানি না।

সে ভাবনা আমাদের নয়—মেজদার। তাই না মেজদা?

ঘাড় কাত করে মেজদা বললেন, হু। মানে সত্যি সত্যি বনে যাবার জন্য তৈরী হতে হবে।

সেদিন থেকে আজ অবধি আমাদের বনে বনে ঘুরে বেড়ানো শেষ হয়নি। প্রকৃতি পড়ুয়ার যদি ভালো লাগে তবে মাঝে মাঝে আমার অভিজ্ঞতার কথা তাদের কাছে হাজির করতে পারি।
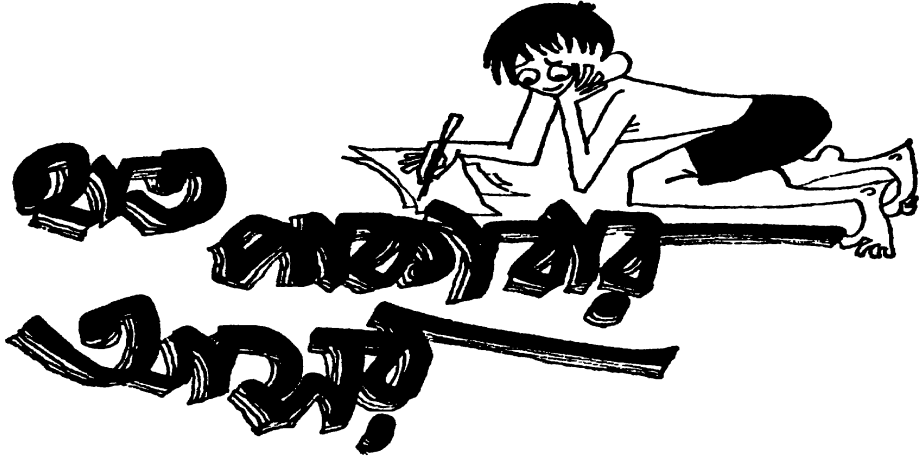
রুণু মাসির বিয়ে

গ্রাহক নং ২৫১

গোপা দাস

রুণু মাসির বিয়ে হবে কি মজা ভাই আজ
ফুলচন্দন, গয়না গাঁটি, দিয়ে হবে সাজ ।
ভাল করে খাবি তোরা
নেমন্তন্ন ভারি
দই, সন্দেশ রসগোল্লা
আসবে হাঁড়ি হাঁড়ি
আর আসবে চন্দ্রপুলি
গাড়ি ভরা ভরা
খেয়ে দেয়ে পারবো নাকো
করতে নড়াচড়া
গাড়ি করে মাসি আমার
যাবে শ্বশুরবাড়ি
তাই দেখে বাড়ির সবাই
কেঁদে উঠবে ভারি

চিঠি

গ্রাহক নং ১৮০৩
নীহারিকা মণ্ডল

সন্দেশ সম্পাদক লিখছি তোমায়।
চিনিলে চিনিতে পার দিলে পরিচয়।
প্রতিযোগিতায় আমি ব্যর্থ হয়েছি।
ব্যর্থতাই হাসিমুখে বরণ করেছি।
চিঠির উত্তর পেয়ে পুনরায় তাই
সন্দেশের সংখ্যায় কবিতা পাঠাই।
এবারেও কি ব্যর্থ হব—মনে লাগে ভয়
নিশ্চয় জানা যাবে পর সংখ্যায়।
ফিরিয়ে দিও না মোরে এ মম মিনতি।
যাহা ছিল মোর ঘরে, যে টুকু শকতি,
পাঠিয়ে দিলাম তাহা সন্দেশের তরে
এর বেশি ভালো 'ছুধ' নেই মোর ঘরে।
পরীক্ষা করিয়া দেখো এ 'ছুধে' আমার
হবে কি খাবার মত 'সন্দেশ' তোমার!
ওঃ আমি ভুলে গেছি সভ্যা নম্বর দিতে,
১৮০৩ নম্বর—পার কি স্মরিতে?
নীহারিকা মণ্ডল মোর পুরো নাম
পিতা শ্রীগৌরচন্দ্র, শ্রীপুর গ্রাম।
টাবাবাড়িয়া নাম হেথা ডাকঘর
ইহাই লিখিয়া দিও ঠিকানা আমার।
কি যে করি আরো ভুল—২৪ পরগণা জেলা,
১৫ বৎসর বয়স, (এবার শেষের পালা)
অনেক হল যে লেখা—সময় তো নাই—
স্কুল ফাইনাল দেবো—এবার পড়তে যাই।

পরীরা কোথায় থাকে ?

গ্রাহক নং ২২৩৯

অনুপকুমার দে

রোজই দেখে।

স্কুলে যাওয়া-আসার পথে।

সামনে যায়না ; ওরাই তো রাতে চুরি করে ; ওরাই তো পকেট মারে ; দিনের বেলা ভিক্ষে করার ছলে দেখে যায় বাড়ির কোথায় কি আছে ; পরে রাত্তির বেলা চুরি করে। হ্যাঁ, তপন শুনেছে—ওরাই ছেলে ধরে ; ছেলে ধরে ধরে পঙ্গু করে দেয় ; পথের পাশে ভিক্ষে করায়।—কি সর্বনেশে লোক সব !! ভয়ে আর ঘৃণায় ওদের নোংরা বস্তীর সামনে দিয়েও পারতপক্ষে যায় না তপন।

*

আরে, এ যে পরীর রাজ্য !
শতশত ফুটফুটে পরী !
উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।
কত সুন্দর সুন্দর ফুল।
—'এত সুন্দর তোমাদের দেশ ?'
'—হ্যাঁ'।—জবাব দেয় মুচ্‌কি হেসে একটা পরী।
—'ঐ রাণীমা আস্‌ছেন।'

অবাক্ হয়ে দেখছিল তপন।—কি সুন্দর দেশ ; কি সুন্দর লোক ; কি সুন্দর ফুল ; কি সুন্দর কথাবার্তা।—কোথাও রোগ নেই, শোক নেই, দুঃখ নেই, জরা নেই। তপন ভাবে—'ইস্, আমি যদি এ রাজ্যে থাক্‌তে পারতাম্ !'

হঠাৎ হাস্‌তে হাস্‌তে পরীর রাণী ওর সামনে এসে উপস্থিত। তিনি বুঝি তপনের মনের কথা বুঝেছিলেন। বললেন—'খোকা, তুমি পরীর রাজ্যে থাকতে চাও—না ? হ্যাঁ, প্রত্যেক মানুষই এখানে থাকতে চায়। আমরা দিই না। দিই না কারণ, মানুষ তো আর পরী নয় ; সবাই পরীর রাজ্যে থাকবে কেন ?…আচ্ছা ; তবু তোমাকে আমরা আমাদের পৃথিবীর রাজ্যের সন্ধান দিতে পারি। তবে কিনা যদি তুমি তিনটি প্রশ্নের জবাব দিতে পারো। আজ পর্যন্ত কেউ এর জবাব দিতে পারেনি।'

তপন ভাবল—'মন্দ কী ? চেষ্টা করা যাক্।' তাই বল্লো—'রাজী'।

—'আচ্ছা, বলতো, তোমাদের বাড়িতে পরীরা কোথায় থাকে ?'

তপন একটু ভাবল, তারপর বলল—'রূপকথার পাতায়'।

—'এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন। বলতো—'আকাশ কত বড় ?'

তপন প্রমাদ গনে। 'বাঃব্বাঃ, এর জবাব কি করে দিই।' কিন্তু হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি আসে—'পরীরা তো রবি ঠাকুরের কবিতা পড়েনি। রবিঠাকুরের সেই কবিতাটা—'যত তুমি ভাবৃতে…'

তপন বল্লে—'যত তুমি ভাব্‌তে পারো
তার চেয়ে সে অনেক আরো ..'

—'আচ্ছা বলতো—গাছেরা দুঃখের গান গায়, না খুসির গান গায় ?'

তপন দুঃখ-টুঃখের ধার ধারে না। বলে বসল—'খুসির।'

—'বাঃ বাঃ, বেশ।—এবার চল তোমাকে আমাদের দেশ দেখিয়ে আনি। কিন্তু একটা কথা কি জানো—পরীর রাজ্যে দুঃখ নেই ; পৃথিবীতে আছে। তাই পৃথিবীতে আমাদের অনন্ত দুর্দশা তুমি একটু দূর কোরো !'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ ; নিশ্চয়ই।'

—'বেশ ! চল।'

পরীরা পৃথিবীতে নামল।

কিন্তু এ কোথায় যাচ্ছে তারা ?···আরে, এ বস্তীর দিকে কেন ?·· তপন না বলে পারল না—'তোমরা কি পথ ভুল করলে ?'

মৃদু হেসে জবাব দেয় পরীরা—'না'।

হায় হায়—এ বস্তীর ভেতরে ? তপন ভাবে বলবে—'আমি যাব না'। কিন্তু পারে না।

ছোট ছোট চটের দরজা। পরীরা প্রবেশ করে। তাদের দেহের জ্যোতিতে ঘরটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

—'এই আমাদের পৃথিবীতে রাজ্য।'

—'এখানে থাক তোমরা ?'

—'হ্যাঁ।'

তপন চারিদিকে চোখ ফিরিয়ে দেখতে থাকে।···হঠাৎ চমকে তাকিয়ে দেখে—পরীরা অদৃশ্য ! তাদের জায়গায় বসে আছে সেই ক্লেদাক্ত কুষ্ঠরোগীর দল—ভিখারীর দল। সবাই তপনের দিকে তাকিয়ে যেন নীরব কণ্ঠে বলছে—'বড় দুঃখ—সাহায্য, সাহায্য চাই !'

—'ছিঃ ছিঃ ছিঃ। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়, না, পরীরা তো বলেছিল—পৃথিবীতে ওদের বড় কষ্ট।'···দুঃখে কষ্টে, পৃথিবীতে এসে ফুটফুটে পরীদের এই অবস্থা হয়েছে ?—এ রকমই হয় নাকি ?

*

ঘুম থেকে তড়াক করে করে লাফিয়ে ওঠে তপন। চোখ রগড়ায় পকেট খুঁজে দেখে একটা টাকা আছে। কাকু দিয়েছিল। চপ্পলটা পায় দিয়ে বাড়ী থেকে বেরোয় তপন ; 'ও পয়সা খাব না।'

তপন ছুটতে ছুটতে বস্তীর দিকে রওনা হয় টাকাটা হাতে করে।

ক্রীড়াজগৎ

শ্রীঅরবিন্দ দাশগুপ্ত

এ বৎসরের উডবার্ন পার্কে অনুষ্ঠিত এশিয়ান টেনিশ চ্যামপিয়ানশিপ প্রতিযোগিতায় ভারতের বাইরে থেকে কয়েকজন প্রখ্যাতনামা খেলোয়াড় যোগ দিয়েছিলেন যথা অষ্ট্রেলিয়ান মার্টিন মুলিগ্যান ও বব হিউইট ও ইংলণ্ডের এক নম্বর মাইক স্যাংষ্টার। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ম্যুলিগান ১৯৬২ সালে ওয়েম্বলডন প্রতিযোগিতার ফাইনালে পরাজিত হয়েছিলেন। ভারতের তরুণ খেলোয়াড় জয়দীপ মুখার্জী স্যাংষ্টারকে পরাজিত করে বিশেষ ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। ভারতের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় কৃষ্ণান এ বছরের প্রতিযোগিতায়ও জয়লাভ করেছেন। তিনি সেমি ফাইনালে মুলিগ্যান ও ফাইনালে বব হুইটকে পরাজিত করেন। তার সঙ্গে মুলিগ্যানের খেলাটাই এ বৎসরের এশিয়ান চ্যামপিয়ানশিপের শ্রেষ্ঠ খেলা। ফাইনালে তিনি অতি সহজেই বব হুইটকে পরাজিত করেন। কৃষ্ণান গত বৎসর কোন বিশ্ব প্রতিযোগিতায় যোগ দেন নি। তাই অনেকে সন্দেহ করেছিলেন যে হয়ত তার ক্রীড়া-দক্ষতা কমে গেছে। তাই তার এ বৎসরের ক্রীড়া-নৈপুণ্য দেখে সকলেই আশ্চর্য হয়েছেন। আশা করা যায় অন্ততঃ এ বৎসর তিনি আবার ওয়েম্বেলডনে খেলবেন ও অজেয় থাকবেন। টেনিসে আর একটি উদীয়মান তারকা হচ্ছেন এ বৎসরের মেয়েদের সিংগ্‌লস বিজয়ী মিস বসন্ত। দেশবাসী তার ভবিষ্যৎ আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করবে।

সংক্ষিপ্ত-ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস্ ফাইনাল :—

কৃষ্ণান হারিয়েছেন বব হুইটকে ৬-২ ; ৬-১ ; ৬-৪

মেয়েদের সিঙ্গলস ফাইনাল :—

মিস বসন্ত হারিয়েছেন মিস মহাদেবনকে ৬-২ ; ৬-৪

পুরুষদের ডাবলস্ :—

মুলিগ্যান ও বব হুইট হারিয়েছেন কৃষ্ণান ও কুমারকে (অসমাপ্ত) ৪-৬ ; ৪-৬, ৭-৫, ৬-৩

মেয়েদের ডাবলস্ :—

ফুরাইয়া ও স্কামবার্গার হারিয়েছেন মিস পাঞ্জাবী ও মিস বসন্তকে : ৬-২ ; ৬-৪

মিক্সড ডাবলস্ :—

হুইট ও মিসেস হুইট হারিয়েছেন বেঙ্কটেসন ও মহাদেবনকে ৪-৬, ৭-৫, ৬-২

ফুটবল

এ নববর্ষে ইংলণ্ডের বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় স্টানলী মেথুসকে (Stanley Mathews) ইংলণ্ডের রাণী 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। ফুটবল খেলার উৎকর্ষের জন্য ইংলণ্ডে তিনিই প্রথম এ উপাধি পেলেন। "ফুটবলের যাদুকর" নামে খ্যাত এ অপূর্ব খেলোয়াড় প্রথম শ্রেণীর ফুটবল খেলেছেন ৩০ বৎসরের উপর। এর মধ্যে তিনি ৫৪ বার বিশ্ব প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ডের প্রতিনিধিত্ব করেন। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য যে ক্রিকেট খেলায় পারদর্শিতার জন্য ব্রাডমান্, হবস্ ও হাটন অনেক পূর্বেই স্যার উপাধি পেয়েছেন।

হকি

ভারত সফরকারী ফরাসী হকিদল শেষ টেষ্ট খেলায় ভারতকে ১-০ গোলে পরাজিত করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। ভারত ভ্রমণের ফলে তাদের খেলার মানের যে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে শেষ টেষ্টের ফলাফল তারই চূড়ান্ত প্রমাণ। গত অলিম্পিকে ফরাসী হকিদল যোগ দেয় নাই। আগামী অলিম্পিকে হকিতে অংশ গ্রহণ করার যোগ্যতা তারা অর্জন করেছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

নেহেরু স্মৃতি হকি প্রতিযোগিতা এ বৎসরই প্রথম অনুষ্ঠিত হোল। দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এ খেলায় ভারতের অনেক শক্তিশালী দল যোগ দিয়েছিল। ফাইনালে শেষ পর্যন্ত খেলা হয় দু রেল দলের মধ্যে। উত্তর রেলদল ফাইনালে পৌঁছেন বোম্বাই দলকে ২-১ গোলে হারিয়ে। আর দক্ষিণ-পূর্ব রেলদল ফাইনালে পৌঁছায় সেণ্ট্রাল রেলদলকে হারিয়ে। ফাইনালে উত্তর রেলদল ২-০ গোলে জয়লাভ করে নেহেরু স্মৃতি হকি প্রতিযোগিতায় প্রথম বিজয়ী দল হলেন।

ক্রিকেট

রঞ্জীট্রফীর দ্বিতীয় খেলায় বাংলার দল উড়িষ্যাকে হারিয়েছে কিন্তু প্রথম ইনিংসের রান সংখ্যায় বিজয়ী হওয়া ছাড়া পুরো পয়েন্ট লাভ করতে পারে নি। এটা বাংলা দলের পক্ষে মোটেই কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। উড়িষ্যার মতন দুর্বল প্রতিপক্ষের কাছ থেকে সম্পূর্ণ পয়েন্ট লাভ না করতে পারাটা দলের দুর্বলতার পরিচয়।

চিঠিপত্র

(১) রূপক ও শুক্লা চট্টোপাধ্যায় ১০৯০

গ্রাহক কার্ডের কথা আমাদের আপিশে বলে দিলাম, আশা করি এতদিনে পেয়ে গেছ। আর কোন কোন বিষয়ে পড়তে ইচ্ছা করে আমাদের জানালে খুশি হব।

(২) মিতালি দত্ত এন্ ৮৪৬

আমাদের কাগজের দেশেই চলাফেরা, বিদেশের পত্রবন্ধু কোথায় পাব, ভাই? দিশী হলে চলবে না?

(৩) সোমা সেন এন্ ৮৫৫

তোমার গল্প পড়লাম। হতাশ ও ব্যর্থতার গল্প লিখবে কেন? এমন গল্প লেখো যাতে পাঠকদের মনে বল ও বিশ্বাস আসে।

(৪) অলক ব্যানার্জি ১৬১৯

তোমার চিঠি পেলাম। বুঝতেই পারছ সব সময় সব পত্রিকার সব লেখকের সব রচনা পড়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই আমরা সর্বদাই আশা করে থাকি আমাদের আদরের হাত পাকাবার আসরের লেখকেরা অন্যের লেখা চুরি করে না পাঠিয়ে নিজের লেখাই দেবে। চিঠিপত্রের বেলাতেও তাই; আমরা আশা করে থাকি সন্দেশের গ্রাহকরা নিজেদের মনের কথাটাই নিজেদের হাতে লিখে পাঠাবে।

(৫) করবী গুপ্তা ২৩২৪

খবর না দিয়ে একদিন
পক্ষীরাজে চেপে
ত্রিপুরাতে যাব, চাল
রেখো ভাই মেপে।

(৬) রামপ্রসাদ মুখার্জি ৪৩৪৭

তোমার কবিতাটি পড়লাম। এমনিতে মন্দ হয় নি, কিন্তু বানানের কি হল? এক পাতা কাব্যে যে সাতটি বানান ভুল! লিখবার যখন ইচ্ছা আছে, ভাষাকে সব দিক দিয়ে শুদ্ধ করবার চেষ্টা কর, তারপর প্রকাশ করার কথা ভাবা যাবে, কি বল?

অগ্রহায়ণ মাসের ধাঁধার উত্তর

ছয়টি বিখ্যাত ব্যক্তির নাম ঃ—

১। রবীন্দ্রনাথ, ২। সেক্সপীয়র, ৩। বিবেকানন্দ,
৪। গৌতমবুদ্ধ, ৫। আইনস্টাইন, ৬। সুভাষচন্দ্র।

সাবাশ গ্রাহক ভাই !
অনেক পেলাম ধাঁধার জবাব
সঠিক সব ক'টাই।
ধাঁধার প্যাঁচে ঘুরবে যত,
যুক্তি, ফিকির খুঁজবে কত,
বুদ্ধি সবার বাড়বে তত ;
এই তো মোরা চাই।
সাবাশ, সাবাশ ভাই !
আচ্ছা, এসো ফের,
নতুন মাসে নতুন ধাঁধা
করছি আবার বের।
(ভীষণ কঠিন কিন্তু এবার)
চেষ্টা কর জবাব দেবার,
ঠিক উত্তর চাই যে আবার
অনেক, অনেক, ঢের।
জবাব পাঠাও ফের॥

গ্রাহক নং ৮৬১ শিপ্রা ও মিত্রা গোস্বামীর কবিতায় লেখা ধাঁধার উত্তর, গ্রাহক নং ১৪৫৩ সুধাংশু ও জগদীশের ধাঁধার কবিতা আর গ্রাহক নং ২৬০০ মঞ্জু সান্যালের ছবি এঁকে উত্তর খুব ভাল হয়েছে।

এরা সকলেই সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে।

৭ সুচিত্রা ঘোষ, ১৫ বনশ্রী দাশ, ১৬ অপর্ণা, অঞ্জন ও অনীতা, ৩২ মধুচ্ছন্দা ফৌজদার, ৫৭ শাশ্বতী দত্ত, ৫৯ সর্বাণী রায় চৌধুরী, ৬৩ অনিরুদ্ধ রক্ষিত, ৯৭ সান্ত্বনা দাস, ১২৪ দীপংকর মজুমদার, ১২৬ ব্রততী, ফাল্গুনী, অনুপ, অংশু, শৈলেন ও অশনি মুখার্জী, ১৩১ কুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, ১৩৪ মনিদীপা সেনগুপ্ত, ১৩৭ মৈত্রেয়ী মুখার্জী, ১৬১ প্রতিমা নাগ, ১৮২ ব্রতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, ১৮৩ নীপা গোস্বামী,

১৯৫ নিমাই, থুকু ও টাটা, ২০৩ রুবী বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০৮ শুক্তিশ্রী চট্টোপাধ্যায়, ২১১ মিতা বসু, ২১২ মধুশ্রী চৌধুরী, ২২৫ অভিজিৎ সেন, ২২৬ জয়ন্ত ও প্রবাল রায়, ২২৭ দীপা ও কৃষ্ণা ভট্টাচার্য, ২৩১ অভীশ কুমার রায়, ২৩৯ অতনু বসু, ২৪২ রাজা দাশগুপ্ত, ২৮২ অর্চনা দত্ত, ৩০৫ শিপ্রা সেন, ৩২১ কবিতা ও অজন্তা ঘোষ, ৩২৯ মার্কো পোলো ও চন্দ্রগুপ্ত শ্রীমাল, ৩৩৫ সুমিত্রা ভাদুড়ী, ৩৫৭ সুমিতা রায়, ৩৮১ মৃন্ময় নাগ চৌধুরী, ৩৯১ অমিতাভ নিয়োগী, ৪০৩ বুদ্ধদেব নিয়োগী, ৪২৪ অশোক ও অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, ৪৩৬ লীনা মুখোপাধ্যায়, ৪৪৯ রবীন গোস্বামী, ৪৬৮ সুস্মিতা দে, ৪৬৯ মণিদীপা রায়, ৪৭৭ দীপঙ্কর দাশগুপ্ত, ৪৯১ অলকা চন্দ্র, ৪৯২ অপর্ণা ও অখিলেশ খাঁ, ৫০৯ শচীন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার, ৫২১ ব্রততী ও প্রকৃতি বিশ্বাস, ৫৪৪ মল্লিকা ও সুবীর চক্রবর্তী, ৬০৮ আনন্দ, নন্দন ও ঝুলন দাশগুপ্ত, ৬২৫ হীরক চক্রবর্ত্তী, ৬৩২ শুক্লা বক্সী, ৬৪৯ শ্রীমতী দে, ৬৬৯ সীমা ও অসীম মুখোপাধ্যায়, ৬৮৩ চৈতালী সেন, ৭০৭ মন্দিরা দেব, ৭৪৮ সুমিত রায়, ৭৪৯ বুলন সেনগুপ্ত, ৭৫৩ গৌতম মুখার্জি, ৭৮৬ অশ্রুকুমার মণ্ডল, ৭৯৩ সুগত রায়, ৭৯৬ পিয়া বোস, ৭৯৮ উজ্জ্বল ও দুর্গা সিদ্ধান্ত, ৮০৮ অমিতাভ ঘোষ, ৮২৯ এলা মুখোপাধ্যায়, ৮৩৭ কল্পনা মৈত্র, ৮৪০ রমা ঘোষ, ৮৪৫ সঙ্ঘমিত্রা চৌধুরী, ৮৪৯ স্মরণ দাশগুপ্ত, ৮৫১ সোনালী সেনগুপ্ত, ৮৫৩ তপন কুমার দত্ত, ৮৬১ শিপ্রা ও মিত্রা গোস্বামী, ৮৯১ দীপক কুমার ঘোষ, ৯৪৮ কাজরী দত্ত, ৯৪৮ গৌতম, দেবাশিষ, গোপা, লক্ষ্মী ও সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯৬৮ কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়, ৯৮৩ জ্যোতির্ময় মজুমদার, ১০৪৪ স্বাতী ও স্মিতা ঘোষ, ১০৫৩ হৈমন্তী মুখার্জি, ১০৬০ শৈবাল দত্ত, ১০৯৭ ঝুমকা সেন, ১১০৩ দক্ষিণ চাতরা ছাত্রাবাস, ১১১২ প্রসাদকল্প ও সন্দীপন দাস, ১১১৩ সুস্মিতা সেনগুপ্ত, ১১২২ অনুপ কুমার গুপ্ত, ১১৪৩ অর্চ্চনা রায় চৌধুরী, ১১৫৯ গায়ত্রী রায়, ১১৯০ অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২০৪ জয়তী ও দেবপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২৪৪ নন্দা ও ছন্দা চ্যাটার্জি, ১২৬৭ জয়শ্রী মজুমদার, ১২৬৯ সুশান্ত সাহা, ১২৭১ অঞ্জন মুখার্জি, ১২৯৮ কল্লোল দে, ১৩০০ ছন্দা ও নন্দা রায়, ১৩২০ বিজলী ঘোষ, ১৩২১ কুমকুম ও অনীতা সেন, ১৩৩১ জয়ন্তী বিশ্বাস, ১৩৩৮ বন্দনা দে, ১৩৪৫ অরুন্ধতী সেনগুপ্ত, ১৩৪৮ ফৌজিয়া করিম, ১৩৬১ রীতা রায়, ১৩৭৪ কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, ১৩৯১ স্বাতী ও শুক্তি সেনগুপ্ত, ১৩৯২ শংকর কুমার গুপ্ত, ১৪১৮ শেখর নাহার, ১৪৪৪ পূরবী গুপ্ত, ১৪৫৩ সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় ও জগদীশ ভট্টাচার্য, ১৪৬০ কেয়া বসু, ১৪৭১ অশোক চৌধুরী, ১৪৯৭ শুভ্রা কুণ্ডু, ১৫০০ ভারতী রায়, ১৫০৭ ব্রততী গুহ, ১৫১৩ সৌম্যকান্তি আচার্য, ১৫১৭ কিশলয় নন্দী, ১৫১৮ হেনা চক্রবর্ত্তী, ১৫৪৩ অপর্ণা সরকার, ১৫৪৭ অপর্ণা সিংহ, ১৫৯৭ বিচিত্র কুমার গুহ, ১৬১০ ঋত্বিক্ষর দত্ত, ১৬১১ ফাল্গুনি রায়, ১৬১৩ ভারতী ও অভিজিত দে, ১৬১৯ অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৬২৫ পার্থ বোস, ১৬৪৪ সুমিতা বাজোরিয়া, ১৬৫২ লিপিকা মজুমদার, ১৬৫৪ সুপ্রিয় দত্ত, ১৬৬৫ রত্নাবলী চক্রবর্ত্তী, ১৬৮৪ দীপঙ্কর মুখার্জী, ১৬৯১ অর্চ্চনা ও ত্রিদিব সাহা, ১৬৯৩ শ্যামল ও আশীষ পাইন, ১৬৯৭ দীপিকা গুহ, ১৭০৫ কৃষ্ণকলি ব্যানার্জী, ১৭০৬ বন্দন হালদার, ১৭১১ ঈপ্সিতা গাঙ্গুলী, ১৭১২ শুক্লা গাঙ্গুলী, ১৭১৬ অমিত কুসুম ভট্টাচার্য, ১৭২১ প্রদীপ ও সন্ধ্যা গোমেজ, ১৭২৪ অনির্বিৎ রক্ষিত, ১৭৩৯ নোটন, ১৭৪১ তাপসী সেনগুপ্ত, ১৭৪৭ ভাস্বতী ঘোষ, ১৭৫৯ শমীন্দ্র দেব, ১১৫৫ পুষণ গুপ্ত, ১৭৬৭

ঝিকিমিকি দত্ত, ১৭৮৮ পলাশ, ১৭৮৯ রীতা গুহ, ১৭৯৫ সুপ্রিয়া ভট্টাচার্য্য, ১৮০৮ বন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮২১ জয়ন্তিকা সেনগুপ্ত, ১৮২৪ স্মৃতিলেখা গুহ, ১৮২৭ অনুতোষ ও অশোক চট্টোপাধ্যায়, ১৮৩৩ মানসী ও অতসী বসু, ১৮৪০ অনুরাধা ঘোষ, ১৮৪১ ইন্দ্রজিৎ দাশগুপ্ত, ১৮৫৩ মিলনী রুরাল লাইব্রেরী, ১৯০৭ বাসব চট্টোপাধ্যায়, ১৯০৮ মিতালী বসাক, ১৯১৫ করুণাময় রায়, ১৯১৯ মাধুরী রক্ষিত, ১৩৩৮ লীলা মিত্র, ২১০৫ রাসমণি ঘোষ, ২১৬০ শিবনাথ গুহ, ২১৬৪ সুযশ ও শোভন, ২১৭১ সন্দীপকুমার ঘোষ, ২১৯৪ বনানী রায়, ২১৯৭ তিলক গুপ্ত, ২২৫৯ উজ্জ্বল চৌধুরী, ২৩০১ তপতী ভট্টাচার্য, ২৩০৫ অরূপ দত্তগুপ্ত, ২৩৩৪ পার্থসারথী সেন, ২৩৪২ কল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৩৫২ উর্মিলা দাশগুপ্ত, ২৩৭৫ রূপমঞ্জরী বিশ্বাস, ২৪০৪ সঙ্ঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৪১৫ সুশান্ত বোস, ২৪২৩ করবী, জবা ও দীপালী গুপ্ত, ২৪৬৭ পার্থমিত্রা ঘোষ, ২৪৬৯ অভিজিৎ গুহ, ২৪৭১ মনিদীপা সেনগুপ্ত, ২৪৭৩ সুনীরা সেন, ২৪৮৩ বাণী, নচিকেতা ও অনিরুদ্ধ সাধু, ২৫০৭ দেবব্রত মণ্ডল, ২৫৪৪ ভারতী, মণিকা ও সান্ত্বনা, রায় চৌধুরী, ২৬০০ মঞ্জু সান্যাল ২৫৫৫ সুজাতা মুখোপাধ্যায়, ২৫৯৭ শ্রীনন্দা চৌধুরী, ২৬৩৮ সৌমিত্র ভট্টাচার্য্য, ২৬৪৭ দেবাশীষ তরফদার নীলাঞ্জন চৌধুরী, ২৭০১ মধুশ্রী বন্দ্যোপোধ্যায়, ২৭০২ অঞ্জন প্রকাশ সেনগুপ্ত, ২৭১৫ সর্ব্বাণী চৌধুরী, ২৭১৬ মধুরা ভট্টাচার্য্য, ২৭২২ সুনিমা ও শর্ম্মিলা নিয়োগী, ২৭৩৫ উৎপল ভটাচার্য, ২৭৪০ সোনালী ব্যানার্জি, ২৭৫২ প্রদীপ মিত্র, ২৭৬৫ সুমিত্র কুমার বিশ্বাস, ২৭৭৩ মৌসুমী সেন, ২৭৭৫ গোপা পাল. ২৭৯৬ শর্ম্মিলা সেনগুপ্ত, ২৮৮৬ অভিজিৎ চক্রবর্ত্তী, ২৮৮৯ রণজিৎ দে, নতুন গ্রাহক সৌমেন্দু সরকার,

এ ছাড়াও আরো ২০।২৫ জনের কাছ থেকে ঠিক উত্তর পাওয়া গেছে কিন্তু তাদের নাম ছাপানো গেল না কারণ কেউ কেউ গ্রাহক নম্বর, ঠিকানা ইত্যাদি ঠিকমতন দাওনি, কেউ কেউ নিজের নামই দাওনি, আবার কেউ বা গ্রাহক নয়, শুধু পাঠক। গ্রাহকেরা মনে রেখো যে সব সময় নিজের নাম, গ্রাহক নম্বর, বয়স আর ঠিকানা স্পষ্ট করে লিখতে হবে। প্রত্যেক সন্দেশের মোড়কের উপর লক্ষ্য করে দেখো—নামের ঠিক বাঁ ধারে গ্রাহক নম্বরটি লেখা আছে দেখবে।

নতুন ধাঁধা

(১)

(তৈলজাতীয় পদার্থের) (পশ্চাতে) শ, (সময়) স (সময়ে) যে কথা (সংবাদ) (লাঙল) সে (গরল) য়ে (মাতামাতা) কে তো (মৃত) কিছু জা (লইয়ো) না। ব (বর্ণ) (কাটারি মুল্য) শাই (কোন ব্যক্তি) ও (ভারি চাকর) কা (বায়সে) এ (বিস্বাদ) (শক্তি) লে (কপাল) (ঘোড়া)। (পাতায়) স (যন্ত্র) ব্যা (চরণ) র খুলে (পরিচিত) নো (সাহচর্য) ত (একটি সংখ্যা)। (মাতা শেষ প্রান্তের) কাছে স (কেতাব) (জীবন) তে (তট)। এ (বাছুর) র ক (অম্ল) গিয়ে (রসাল ফল) রা (পোষাক) ভা (গ্রহণ করি) (গুণ) ম, কে (শক্তি) দা (পত্নী) খো (কর্তিত) (পঞ্চ) ড়ার (কল) পায় খু (পুস্তক) ভু (গমন করিয়াছে)। (কুড়াল) (আকাশ-চুল) (ইহা মনুষ্যাদিসূচক সর্বনাম ঘৃণাসূচক শব্দ) ল। বে (ছোট গাছের) (এক প্রকার পানীয় হাতি) গিয়েছে। ফে (নিযুক্ত) (আহ্বানে) তো (মাতা) দের খ (বিবাহের পাত্র) পেলে (অন্ধ) ন্দিত হব। ইতি

(লক্ষ্মী) অ (দাম) (পা) (লুকোন)।

ব্র্যাকেটের মধ্যে যে কথাগুলি দেওয়া হয়েছে তার বদলে তার একটি প্রতিশব্দ বসালেই উপরের চিঠিটা পড়তে পারবে। বাগান কে লেখা যেতে পারে বা (সঙ্গীত)।

(২)

এক ভদ্রলোক তাঁর চাকরকে ১৬টি টাকা ভাঙ্গাতে দিলেন, দোকানদার প্রতি টাকায় ২৫ পয়সা বাটা নেবে।

চাকরটি দোকানে গিয়ে টাকা ভাঙ্গিয়ে আনল, দোকানদার টাকা পিছু ২৫ পয়সা কেটে নিল, ভদ্রলোক তাঁর প্রাপ্য ১২ টাকার ভাঙ্গানি ফেরত পেলেন, কিন্তু তবু চাকরটির ১ টাকা লাভ রইল। এটা কি করে সম্ভব হল ?

(৩)

এমন একটি রাশির নাম কর যাকে ২ দিয়ে ভাগ করলে ১ বাকি থাকে, ৩ দিয়ে ভাগ করলে ২ বাকি থাকে, ৪ দিয়ে ভাগ করলে ৩ বাকি থাকে, ৫ দিয়ে ভাগ করলে ৪ বাকি থাকে আর ৬ দিয়ে ভাগ করলে ৫ বাকি থাকে।

কারুর ভালো করতে নেই

আশা দেবী

আমাদের পাড়ার গলির পথ ধরে হাঁটতে গেলে প্রথম যাঁর সঙ্গে তোমাদের দেখা হবে এবং কুশল প্রশ্ন বিনিময় হবে তিনিই আমাদের রাধামাধব বাবু। দেখতে একেবারে গোলগাল ডানলোপিলোর বালিশের মতো, গায়ে কালো একটা ধুসো কোট,—হাতগুলো ছোট হতে হতে ব্লাউজের মত হয়ে গেছে। বোধ হয় সেটা ওঁর অন্নপ্রাশনের উপহার—, হয়তো আদর করে কোনো মাসিপিসিই দিয়ে থাকবেন।

রাধামাধব বাবু কোনো চাকরী করেন না—করতে ভালোও বাসেন না মোটেই। কাজেই সংসার চলবার জন্য কতকগুলো ফ্ল্যাট তৈরী করে রেখেছেন। তারই ভাড়ায় চলে তাঁর।

ভবানীপুরে তাঁর একখানা নতুন বাড়ি আছে। তারই এক তলায় থাকেন রাধামাধব বাবু আর তার দোতলাটা ভাড়া দেন। রাধামাধব বাবুর নির্ঝামেলার সংসার। একটি মাত্র ছেলে—কার্তিকের মতো চেহারা নিয়ে ময়ূরে চড়ে উড়ে গেছে সিমলা পাহাড়ে চাকরী করতে, আর তাঁর স্ত্রী বিষয়বাসিনী দেবী ছেলের কাছেই থাকেন। রাধামাধব বাবু অনেক চিঠি দিয়েছেন তাঁকে আসবার জন্যে। অনেক অনুনয় বিনয় করে বলেছেন 'নিজের রান্না করে খেতে খুবই অসুবিধা হচ্ছে' কিন্তু তবু তাঁর স্ত্রী বিষয়বাসিনী দেবীর মন দুর্গাপুরের স্টীলের মত শক্ত হয়েই থেকেছে। এবং পত্রোত্তরে লিখেছেন : মনে করো আমি মৃত—কখনও ফিরবো না।

রাধামাধব বাবু একেবারে হতাশ হয়ে পড়লেন। এতো ভালো লোক তিনি, এত ভালো ব্যবহার করেন সবার সঙ্গে,—সদাহাস্য মুখে থাকেন, লোকের উপকার করবার জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত তবু কেন লোকে তাঁকে পছন্দ করে না? তাঁর ছায়া দেখলেই গলির ছেলেরা 'বাপরে—মারে' বলে বারাসতে পালায়;—টালার লোকে পালায় টালীগঞ্জে? তাঁর পুত্র সিমলায় পালালো, স্ত্রী বিষয়বাসিনী দেবী বিষণ্ণচিত্তে পালালেন আর তার অমন সুন্দর নতুন বাড়িতে ভাড়াটে কিছুতেই টেঁকে না? এর কারণ কী—? রাধামাধববাবুর কোনই ত্রুটি নেই, অথচ ভাড়াটে থাকে না কেন? রাধামাধববাবু লক্ষ্য করেছেন তিনি যত বেশি ভালো ব্যবহার করেন তত তাড়াতাড়ি তাঁর ভাড়াটে পালায়।—তিনি ভাড়ার জন্যে তাড়া দেন না। দু চার মাস ভাড়া না দিতে পারলেও—হেসেই বলেন, 'তাতে কী যখন পারেন দেবেন'। তবু সেবার ভাড়াটে পনের দিন যেতে না যেতেই পালাল বাড়া ভাত আর আলু পোস্তর চচ্চড়ি ফেলে দিয়ে। ভাত তরকারী না হয় তুচ্ছ—, বাসনের মায়াতেও বাড়ির ত্রিসীমানায় আর ঘেঁসলো না। রাধামাধব বাবু আর কী করেন—তিনি প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেন তারপর কাক তাড়ালেন—ধৈর্যচ্যুত হয়ে একখানা তালপাতার পাখা নিয়ে মাছি তাড়ালেন তারপর আর কী করেন মনের দুঃখে আলু পোস্ত চচ্চড়ি আর ভাত নিজেই খেয়ে ফেললেন।

অনেকেরই মনে হতে পারে রাধামাধববাবুর বাড়িটা নিশ্চয়ই হানাবাড়ি—ভূতটুতের উপদ্রবে বাড়িতে লোকে আসে না, আর এলেও থাকে না। কিন্তু ওসব কিছু নয়;—বাড়ী খুব সুন্দর, তায় নতুন, ভূত থাকবার কোনো কারণই নেই। কারণটা একটু ভিন্ন রকমের। সেটাই আমার গল্পের বিষয়।

রাধামাধববাবু যখন যুবক তখন তিনি সর্বত্র বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন, কাজ ছিল তাঁর ক্যানভাসিং। বাড়িতে, গাড়িতে, ট্রামে, বাসে, পথে, ঘাটে সর্বত্র তিনি এমন তোড়ে গলদ ঘর্ম হয়ে চোখ কপালে তুলে বক্তৃতা দিতেন যে তাঁর কাছে কেউ কিছু কিনবে কি, কাছেই ঘেঁসতে সাহস করতো না। লোককে যত বলতে চাইতেন জিনিসের গুণাবলী সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা করে—লোকে 'ওই এলো' বলে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতো। ক্রমে ক্রমে তাঁর কথা বলার এম্‌নি অভ্যাস হয়ে গেল যে তিনি যাকে দেখতেন তাকে আর ছাড়তেন না। একেবারে গোড়া থেকে বোঝাতে সুরু করতেন।

একদিন তার কারখানার মালিককে বোঝাতে গিয়ে তাঁরও চাকরী গেল মালিকেরও হার্টফেল হবার উপক্রম! তারপর থেকে তিনি আর চাকরী করবেন না ঠিক করেছেন, বাড়ি ভাড়া দিয়েই চালাবেন।

কিন্তু ভালো উপদেশ তো আর বাক্সে ভরে রাখার জিনিষ নয়! সে—'যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে'—সুতরাং উপদেশ কারুকে দিতেই হবে—না দিলে চলবে কী করে—এ সব কথা ভাবতে ভাবতেই দেখলেন রাস্তার ধারে ছেলেরা ঘুড়ি ওড়াচ্ছে।—আর যায় কোথায়—; তিনি গুটি গুটি পায়ে সেখানে এসে বসলেন। বেশ ঘন হয়ে বসে খানিকক্ষণ ঘুড়ি ওড়ানো দেখলেন। তারপর বুঝি-বুঝি মুখ করে একটু একটু মিট মিট করে হাসতে লাগলেন। শেষে খুব কোমল অথচ গম্ভীর গলায় সুরু করে দিলেন: কিচ্ছু হচ্ছে না—কিচ্ছু হচ্ছে না। আরে আমাদের ছোট বেলা—সেটা ঘুড়ি ওড়াবার স্বর্ণযুগ ছিল বলতে পারো। আমরা উঠতাম একেবারে ব্রাহ্মমুহূর্তে—রাত চারটের সময়—। তারপর হাত মুখ ধুয়ে বিশ্বকর্মা ঠাকুরের নাম ভক্তি করে স্মরণ করে মাঠের দিকে ঘুড়ি আর লাটাই নিয়ে ছুটতাম। ঘুড়ি ওড়ানো ছিল আমাদের একটা সাধনা।

তারপর সুরু হলো ঘুড়ির উৎপত্তি হলো কবে থেকে, কি করেই বা তার ক্রমবিকাশ ঘটলো তারই লোমহর্ষণ বিবরণ দিতে লাগলেন। বিশ্বকর্মা মানে ঘুড়ির দেবতা—প্রকৃত পক্ষে কে? তিনি ঘোড়ায় না চেপে হাতিতে চাপেন কেন? আর চাপেনই যদি তবে তাতে যথারীতি হাওদা নিয়ে বেশ আরাম করে বসেন না কেন?—আরাম যদি তাঁর পছন্দই না হয় তাহলে হাতির লেজ ধরেও ঝুলতে পারতেন, কারণ ঘুড়ি ওড়াবার পদ্ধতির মধ্যে যে ঘুড়িকে সুতো দিয়ে বাঁধা হয় গবেষণা করে দেখলেই বোঝা যাবে বিশ্বকর্মা হাতির লেজ ধরে না ঝুললেও পরে নিশ্চয়ই ঝুলবেন, এমন একটি সম্ভাব্য ইঙ্গিত আছে। বিশ্বকর্মার বাবার নাম নিয়ে নানা মতদ্বৈধ থাকতে পারে তবে গুণীজনের মতই আমরা গ্রহণ করবো। বিশ্বকর্মার ঠাকুরদাদার কাকার পা একটু খোঁড়া ছিল, তাতে কী এসে যায়। বর দিতে তো আর পায়ের দরকার হয় না—হাতই যথেষ্ট। তবে আমাদের পাড়ার যে বিশ্বকর্মা পুজো হতো তার কি করে একটা হাত যেন ভেঙ্গে গিয়েছিল আর সেবার 'আমি—তোদের কী বলবো' বলতে বলতেই খ্যাক্-খ্যাক্ কোঁ-

খোঁ করে শেয়ালের মত হাসতে লাগলেন—'বলবো কি ঝপাং করে বিশ্বকর্মা বিসর্জনের দিন গঙ্গার জলেই পড়ে গেলাম।'

জ্ঞানের কথা শুনতে শুনতে প্রায় অজ্ঞান হয়ে সবাই পালিয়ে যায় কিন্তু যাতে গল্পটি শ্রোতার অভাবে পণ্ড না হয়, সে জন্য যে দুটি ছেলেকে দু হাতে চেপে রেখেছেন তারা মুরগীর বাচ্চার মত পাখা ঝটপট করছে—আর সমানে চেঁচাচ্ছে: 'ছেড়ে দিন—মরে যাবো—মরে যাবো—'।

'মরবি কেন?' রাধামাধববাবু খেঁকিয়ে ওঠেন: ভালো কথা—জ্ঞানের কথা শুনলেও ভাল হয়! তাতো বুঝবি না কেবল 'মরবো—মরবো' বলে চ্যাচাচ্ছিস। মরতে যাতে না হয় তার জন্যে ডাক্তার আছে; তবে চল ডাক্তারের কাছে তোর বুকটা আজ আমি না দেখিয়ে ছাড়বো না; তোরা কিন্তু জাতির ভবিষ্যৎ—! জাতিই যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে আমরা দাঁড়াবো কোথায়—? তোদের উদ্দেশ্য করেই তো কবিগুরু গেয়েছেন—'ইহাদের কর আশীর্বাদ—অ—অ—'

একজন আলুর খোসা ছাড়াবার মত করে নিজের জামা খুলে ফেলে এবং আর একটি হঠাৎ রাধামাধব বাবুকে কুতুকুতু দিয়ে এমন ছুট দিলো যে কার সাধ্য তাদের ধরে। রাধামাধববাবু সমানে—'পালালো—পালালো ধর—ধর' বলে ছুটলেন কিন্তু তাদের ধরে সাধ্য কার!

আর রাধামাধববাবুর ভাড়েটেরা কেন থাকে না তার কথা ভেবে ভেবে মাঝে মাঝে যখন তিনি নিরাশ হয়ে পড়েন ঠিক তখনই এক একটি ভাড়াটে আসে। এবারও একটি এলো। লোকটির নাম দুঃখহরণ। সরকারী চাকুরী—, বাইরে থেকে বদলী হয়ে রাত চারটের গাড়িতে এসে পৌঁছুলেন

কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দিলেন রাধামাধববাবু নিজেই। তরতর করে উপরে উঠে গিয়ে চাবির গোছা এনে দুম দাম করে সব ঘর খুলে দিলেন, তারপর ব্যতিব্যস্ত হয়ে মুটের মাথার থেকে মালপত্র নামাতে লাগলেন। ভাড়াটে তো একেবারে হতভম্ব। ভাড়াটে গিন্নী বললেন: 'থাক—থাক রাখুন—রাখুন ওর মধ্যে কাঁচের বাসন আছে।' বলতে না বলতে একেবারে দুম করে বাক্স সুদ্ধ মেজেতে ফেলে একেবারে চুরমার! গিন্নী মাথায় হাত দিয়ে বসলেন আর সেই মুহূর্তে রাধামাধব-বাবু আধটিন সরষের তেল হন্তদন্ত হয়ে গোছাতে গিয়ে উল্টে ফেলে দিতেই ভাড়াটের ছেলে তাতে পিছলে দুম ক'রে ধরাশায়ী হলো। কিন্তু রাধামাধব বাবুকে ঠেকাতে পারে এমন লোক দুর্লভ। তিনি তৎক্ষণাৎ ছেলেটার হাত ধরে টেনে নিয়ে তিন মাসের বাসি চৌবাচ্চার জলে সাবান মাখিয়ে চান করিয়ে আনলেন। আর এ সব শেষ হলে বাইরে আসতেই দেখলেন মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে খোদ ভাড়াটে--যেন মরে গেছে। এই সুযোগ, তিনি অমনি চট করে এসে পড়লেন—পাশেই একটা কালো ট্রাঙ্ক পড়েছিল তার ওপর বসে সুরু করলেন: কোথায় কোন ফার্নিচার রাখলে বেশ ভালো দেখাবে; চায়ের সঙ্গে কী-কী খাওয়া উচিত—মানে, ডিম, রুটি, বিস্কুট জ্যাম সম্পর্কে উপদেশ দিতে লাগলেন। তারপর হয়তো বলতে লাগলেন জগুবাবুর বাজারে কে ভালো মাছ বেচে কে ঠকায়, কে টাটকা পালং শাক বেচে, কার দোকানের ডাল সেদ্ধ হয় না—

ভাড়াটে গিন্নী ছুটে এসে বললেন : 'দয়া করে আপনি একটু থামুন ওঁর শরীর বড্ড খারাপ করছে!' কিন্তু রাধামাধব বাবু নির্বিকার—এখনও তাঁর অনেক কর্তব্য বাকী আছে বলেই তিনি মনে করেন। সুতরাং সারাক্ষণ তাদের সঙ্গে না থাকলে বিদেশী লোক—কখন কি অসুবিধা হবে কে জানে! কাজেই ওঁরা ভদ্রতা করে চলে যেতে বললেই কি আর চলে যাওয়া যায়? না ভদ্রলোকের তা যাওয়া উচিত? তার ওপর এঁরা তাঁর নিজেস্ব ভাড়াটে কত দিন পর এসেছে এরা যদি চলেই যান?

সুতরাং কাল সকালে উঠে কি কি সম্ভাব্য অসুবিধা হতে পারে গল্প ও উপদেশ-উপদেশ আর গল্প দিয়ে ওঁদের মনটাকে একটু সরস করতে হবে। তার ওপর যে জায়গা ছেড়ে ওঁরা এসেছেন তার জন্যেও তো মন খারাপ করা খুবই স্বাভাবিক। কাজেই ওঁদের মনোরঞ্জনের জন্য সুরু করলেন; ট্রাম থেকে কী ভাবে নামতে হয়—তিনি একবার চলন্ত ট্রাম থেকে উল্টো দিকে মুখ না করে নেমে কি হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব করেছিলেন। ভাতের ফেন ফেলে দিতে দিতে কি করে মৌর্যবংশ ধ্বংস হয়ে গেল আর যেন কী একটা ইতিহাসের সুদূর ক্ষীণ চিন্তা তাঁর মনে আসতে না আসতে তিনি মোহন বাগানের কথায় এলেন এবং তার ছোট বেলায় কারা কারা খেলতো—তাদের স্বাস্থ্য কেমন ছিল তাদের মধ্যে কে কী খেতে ভালোবাসতো—কে তাঁর বাড়ির পাশের ঘরের ভাড়াটে এই সব বেশ করে গুছিয়ে বলে শেষে সুরু করলেন ষাঁড়ের কথা। আগে খানিকটা নিজেই হেসে নিলেন তারপর বললেন; কী বদ মেজাজী আর রাগী একটা কালো ষাঁড় থাকতো রমেশ মিত্তির রোডে। শোনা যায় সে নাকি শিবকে এক ঝাঁকুনিতে পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে তার বাবাকে পর্যন্ত তেড়ে গুঁতোতে গিয়েছিল। আর শুধু তাই? তার চোখের সামনে যে পড়তো তাকেই সে গুঁতোতো—বলেই তিনি একটা হুঁকোর সন্ধানে ওপরে চলে গেলেন।

ভাড়াটে গিন্নী বললেন : 'বেশ হয়েছে—খুব শিক্ষা হয়েছে আর নয় এখুনি হোটেলে গিয়ে উঠবো। —গাড়ি ডাকো এখুনি।'

রাধামাধব বাবু এবার কিন্তু মনে ভারি কষ্ট পেলেন। কিন্তু কী করেন, সবই অদৃষ্ট। কত গনৎকারকে হাত দেখান তাঁর হাতে ভাড়াটের রেখা কেমন, সবাই বলে, 'অত্যন্ত ভালো' কিন্তু তবু ভাড়াটে টেঁকে না কেন?

তিনি এবার ঠিক করলেন। তিন দিনের মধ্যে যদি কেউ ভাড়াটে হয়ে আসে তিনি তাকে ছ মাস বিনে ভাড়ায় রাখবেন। এই কথা শুনে এক হাড় কৃপণ ভাড়া নিয়ে দাঁত কামড়ে পড়ে রইল ছ মাস। তারপর একদিন হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো :

'সহসা নিদ্রার বশে নাসারন্ধ্রে কটাং কটাং—
মনে হলো অকস্মাৎ যেন কোন ওরাং ওটাং
'নাসিকায় বাঁধিয়াছে বাসা'—তার কবিতা আর শেষ হলো না, ছ মাসের দাঁত কামড়ে পড়ে থাকার ফল স্বরূপ এখন সে টিকিট কেটে রাঁচীর পাগলা গারদে বাস করছে।—

তারপর থেকে বাড়ি খালিই পড়ে আছে। রাধামাধব বাবু বহু চেষ্টা করেও কোন ভাড়াটে

জোগাড় করতে পারেন নি। রাধামাধববাবু যখন হয়রাণ হয়ে পড়লেন তখন একদিন হঠাৎ কোথা থেকে এক ভাড়াটে এসে গেলেন। নাম বজ্রধ্বজবাবু।

দেখতে ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ—গভীর লোমে আচ্ছাদিত পেশল বাহু। বাটারফ্লাই গোঁফের মতো বাহারী ভুরু। মুখের চেহারা গম্ভীর এবং ভয়ানক রকম গম্ভীর। নিঃসন্তান—একাই থাকেন। হাঁস-খালিতে ডিমের ব্যবসা করেন। কি যেন কাজে মাস দুই কলকাতায় থাকতে হবে তাই এই বাড়ি ভাড়া নেওয়া। চোখ দুটো গোল, সাইকেলের চাকার মতো সর্বদাই ঘুরছে।

রাধামাধব বাবু গুটি গুটি এগিয়ে এলেন। দেখলেন বজ্রধ্বজ বাবু বেশ নির্বিকার চেয়ারে বসে আছেন। তিনি আর একটু এগিয়ে এলেন। এবারও বজ্রধ্বজ বাবু তেমনি নির্বাক নিবাত প্রদীপের মতই বসে রইলেন উদাস হয়ে—ডাকলেনও না, বসতেও বললেন না। রাধামাধব বাবু মনে মনে যেন কেমন একটু সাহস পেলেন। তিনি ধীরে ধীরে নিজেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন; বার দুই একটু কুঁই—কাঁই করলেন তারপর একটু নিজে নিজেই হাসলেন যেন কত হাসির কথা তাঁর মনে পড়েছে। তারপর বলতে সুরু করলেন; মানে ধরুন ভিটামিন—এ সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন?—নিশ্চয়ই কিছুই না। কিন্তু আমি এ নিয়ে বরাবরই চিন্তা করি। কারণ ভিটামিন ছাড়া খাদ্য আর অখাদ্য সমান। আর দেখুন পাড়ায় বড্ড কাকের উৎপাত হয়েছে মশাই। ওদের জন্যে ঝাঁটা, চামচ, জুতোর ফিতে কিছুটি রাখবার উপায় নেই—দেখলো কি নিয়ে গিয়ে বাসা বেঁধে ফেললো। সেদিন তো আমার পায়ে থেকে এক পাটি মোজাই খুলে নিয়ে চলে গেল। তাড়াতে গেলে তো চটে মাথার ওপর টক টক করে টোকা দিতে আসে। কলকাতায় যখন ট্রাম ঘোড়ায় টানতো তখন আমার পিসিমা থাকতো কালীঘাটে নাম 'অনিল'। তার মাথায় ছিল এক বিরাট টাক—

এদিকে বজ্রধ্বজ বাবু সেই রুদ্ধশ্বাসে বলা গল্প শুনতে লাগলেন। তাঁর বাটারফ্লাই গোঁফের মত ভুরু ঘন ঘন নাচতে লাগলো—চোখ ক্রমে গোল আর লাল হতে লাগলো এবং তিনি হঠাৎ সিংহের মত একটা গর্জন করে উঠলেন, সেই গর্জনে রাধামাধব বাবুর পিসিমা 'অনিলের' টাকের গল্প বন্ধ হয়ে গেল, হাত থেকে নস্যির ডিবেটা পড়ে গেল আর একটা দাঁড় কাক টক করে সেটা ঠোঁটে করে নিয়ে উধাও হলো!

গোল চোখ ফুটবলের মত আরো পরিপূর্ণ গোলাকার করে—চক্রাকারে ঘোরাতে ঘোরাতে বজ্রধ্বজ বাবু বললেন: ডাক্তার বলেছিল আমি বেশি কথা বলি—তাই আমার মাথার দোষ হয়েছে। ঠিক করেছিলাম রাঁচী থেকে ফিরে আর কথা বলবো না। ডাক্তার আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন যেন আমি কথা আর না বলি কিন্তু এখন দেখছি সে প্রতিজ্ঞা আর রাখা গেল না। তবে শুনুন রাধামাধববাবু গোড়া থেকেই। জেনে নিন, ডিমের ব্যবসার নিয়ম কি।

বলেই বজ্রধ্বজবাবু বজ্র বাহুতে রাধামাধববাবুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে মাইক-বিনিন্দিত কণ্ঠে মহতী চিৎকার সহকারে একেবারে সূচনা থেকেই বক্তৃতা দিতে লাগলেন। শুনুন ডিমের কথা জানতে হলে আগে জানা দরকার হাঁসের কথা। 'হাঁস এক প্রকার পক্ষী বিশেষ—

জলে সাঁতার দেয় ও মানুষকে ডিম খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখে'—বইয়েতে এ সব কথা লেখা থাকলেও মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে হাঁসকে ভগবান ডিম পাড়বার জন্যেই সৃষ্টি করেছেন। হাঁসের ডিম খেতে অত্যন্ত উপাদেয়—এতে ওমলেট হয়, ডালনা হয়, সেদ্ধ খাওয়া যায়, ডেভিল হয়, চপ-কাটলেট, মোগলাই পরোটা—সবেতেই লাগে। হাঁসের ডিমকে সাহেবরা নিরামিষ খাবার বলে, আমি বলি ব্রজের আলু। মুখে দিলেই একেবারে রসগোল্লার মত মিলিয়ে যেতে চায়।

রাধামাধববাবু আর পারছেন না। তিন ঘণ্টা ধরে এক নাগাড়ে সে কি দানবিক চিৎকার। মাথা ঘুরছে—দু কান ফেটে যাচ্ছে। তিনি দাপাদাপি করতে লাগলেন, চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগলেন, বজ্রধ্বজ-বাবুকে আঁচড়াতে লাগলেন। কিন্তু পাহাড়ের গায়ে শিলাবৃষ্টিতে কী ক্ষতি হয়।

ঠিক এমনি সময়ে একটা মশা কুটুস করে বজ্রধ্বজবাবুর নাকে কামড়ে দিতেই বজ্রধ্বজবাবু দু হাত তুলে যেই মারতে গেলেন আর অমনি সেই ফাঁকে রাধামাধববাবু তাঁর হাত থেকে ছাড়িয়ে এক ছুটে একে-বারে বেরিয়ে এলেন। আর এক ছুটে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি চেপে সোজা শেয়ালদহ।

বজ্রধ্বজবাবুও আর একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে ওঁর পেছু নিলেন। একটা লোককে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে, একটা লোককে আহত করে বিনা টিকিটেই উঠে পড়লেন একটা চলন্ত ট্রেনে।

বজ্রধ্বজবাবু এসে পড়লেন কিন্তু তাঁর গাঁটে গাঁটে বাত তাই ছুটে এসেও গাড়ি ধরতে পারলেন না। সমানে চিৎকার করে বলতে লাগলেন: আপনি আমার বক্তৃতাটা শুনতে না পেয়ে যে কী ক্ষতি করলেন তা আমি কি বলবো। অনেকেই জানে না যে তারা কী হারাচ্ছে। তবু আমি চেষ্টা করবো সংক্ষেপে যতটা পারা যায় ততটাই বলি।

হাঁসকে আমরা পাখির মধ্যে সব চেয়ে বেশী মর্যাদা দি। রাজহাঁসের পিঠে সরস্বতী বসে থাকেন তাঁকে কামড়াতে চেষ্টা করলেই বীণার প্রহারে সায়েস্তা হয়—এই হাঁস—

গাড়ি ততক্ষণ 'ধর—ধর—ধর পাকুর-পাকুর' বলতে বলতে গোবর ডাঙ্গার দিকে যাত্রা করছে।

রাধামাধববাবু এখন গোবর ডাঙ্গাতেই থাকেন। এখানে একটা মঠ করেছেন—আর তাতে তিনি মৌনীবাবা—কারো সঙ্গে আর কথা বলেন না।

সতের জনের জীবন রক্ষা পদক লাভ

ভারত সরকারের প্রেস ইন্‌ফর্মেশন ব্যুরো আমাদের জানিয়েছেন যে আমাদের রাষ্ট্রপতি ১৭ জনকে জীবন রক্ষা পদক দান অনুমোদন করেছেন। এঁরা সকলেই বিশেষ সাহসের পরিচয় দিয়ে অপরের জীবন রক্ষা করেন।

এর মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হল এলাহাবাদ জেলার পারানিপুর গ্রামের শ্রীঅম্বিকা মিশ্রের নাম। তিনি উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা নিজের জীবন তুচ্ছ করে এবং অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে গ্যাস ভর্তি একটা খনির মধ্যে আগুন থেকে ১৭০ জনের প্রাণ রক্ষা করেন।

আমরা এই সব সাহসী বীরদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

"দেয়ালের পাশ দিয়ে গলাটা বাড়িয়ে দিলাম"

প্রফেসর শঙ্কু ও আশ্চর্য পুতুল। পৃ ২৬৪

৪র্থ বর্ষ একাদশ সংখ্যা

মার্চ ১৯৬৫ । ফাল্গুন ১৩৭১

কাক পাখি বক পাখি উট পাখি আছে জানি,
পাখিদের দেশ কোথা, কে ওদের রাজা রাণী?
গান গায়, ওড়ে সুখে ঘোরে কত দেশ দেশে
কোথা থেকে আসে ওরা, যায় কোথা সব শেষে?
মাঠ ঘাট নদী নালা সাগর পাহাড় বন,
ধু ধু মরু আর যত মেরুদেশ নির্জন,
ঘুরে ঘুরে দেখেছে তো,—সেই কথা ওরা যদি
বলে সবে,—শুনি বেশ মজা ক'রে নিরবধি।

সব চেয়ে ভালো লাগে পাখিদের সাজ বেশ
যাকে যা মানায় পরে, পোষাকের নেই শেষ—
কাক বক টিয়া চিল চড়ুই শালিখ আর
মাছরাঙা বুলবুলি ময়ূর কি ময়নার !
কালো সাদা পীত নীল খয়েরী সবুজ লাল
জামা পরে সেজেগুজে থাকে সবে চিরকাল।
কারো বা মাথায় ঝুঁটি, চোখেতে কাজল কারও,
রাঙা ঠোঁটে, হার গলে বাড়ায় বাহার আরও।
আমাদের মাঝে ভাই পূজা আর উৎসবে
ঝাঁকে ঝাঁকে দল বেঁধে এসে ওরা সাথী হবে ?
হয়তো তা আসবে না,—ছুদিনের তরে এই
এতটুকু আমোদেতে পাখিদের সুখ নেই।
বছরের সবদিন উৎসবে মেতে থাকে,
লেখাপড়া নেই বেশ ;— আমাকেও দলে ডাকে !
মন চায় ওই মতো যা খুশি ক'রে বেড়াই,
রামধনু ডানা মেলে পাখি হ'য়ে উড়ে যাই।

১৩ই মে, ১৯—

আজ আমার জীবনে একটা স্মরণীয় দিন। সুইডিশ অ্যাকাডেমি অফ সায়ান্স আজ আমাকে ডক্টর উপাধি দান করে আমার গত পাঁচ বছরের পরিশ্রম সার্থক করল। এক ফলের বীজের সঙ্গে আরেক ফলের বীজ মিশিয়ে এমন আশ্চর্য সুন্দর সুগন্ধ সুস্বাদু ও পুষ্টিকর নতুন ফল যে তৈরি হতে পারে, এটা আমার এই রিসার্চের আগে কেউ জানত না। গত বছর সুইডেনের বৈজ্ঞানিক সৃভেণ্ডসেন আমার গিরিডির ল্যাবরেটরিতে এসে আমার ফলের নমুনা দেখে এবং চেখে একেবারে থ। দেশে ফিরে গিয়ে কাগজে লেখালেখির ফলে আমার এই আবিষ্কারের কথা বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। আমার আজকের এই সম্মানের জন্য সৃভেণ্ডসেন অনেকখানি দায়ী। তাই এখন ডায়রি লিখতে বসে তাঁর প্রতি মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠছে।

সুইডেনে আগে আসিনি। এসে ভালোই লাগছে। সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেশ। এটা মে মাস—তাই চব্বিশ ঘণ্টাই সূর্য দেখছি। কিন্তু সে সূর্য কেমন জানি ঘোলাটে, নিস্তেজ। সব সময়ই মনে হয় সন্ধ্যা হয়ে আছে। শীতকালে যখন রাত ফুরোতে চায় না, তখন না-জানি লোকের মনের অবস্থা কেমন হয়। শুনেছি ছ মাস রাত্রের পর প্রথম সূর্যের আলো দেখে এখানের অনেক লোক নাকি আনন্দে আত্মহারা হয়ে আত্মহত্যা করে। আমরা যারা বিষুব রেখার কাছাকাছি থাকি, তারা বোধহয় ভালোই আছি। বেশি উত্তরে ঠাণ্ডা দেশে যারা থাকে তাদের হিংসে করার কোন কারণ নেই।

এখানের কাজ সেরে নরওয়েতে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। এর অবিশ্যি একটা কারণ আছে। বছর

চারেক আগে যখন ইংলণ্ডে যাই, তখন বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদ্ প্রফেসর আর্চিবল্ড অ্যাক্রয়েডের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়। সাসেক্সে তার কটেজে একটা উইক এণ্ড ও কাটিয়ে এসেছিলাম। অ্যাক্রয়েডও তখন নরওয়ে যাবো যাবো করছে, কারণ সেখানে নাকি 'লেমিং' ব'লে ইঁদুর জাতীয় এক অদ্ভুত জানোয়ার বাস করে—সেইটে সে স্টাডি করবে। লেমিং এক আশ্চর্য প্রাণী। বছরের কোন একটা সময় এরা কাতারে কাতারে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের দিকে যাত্রা করে। পথে শেয়াল নেকড়ে ঈগল পাখি ইত্যাদির আক্রমণ অগ্রাহ্য ক'রে ক্ষেতের ফসল নিঃশেষ করে সবশেষে সমুদ্রে পৌঁছে সেই সমুদ্রের জলেই ঝাঁপিয়ে প'ড়ে আত্মহত্যা করে।

দুঃখের বিষয় অ্যাকরয়েডের স্ট্যাডি বোধহয় অসমাপ্ত থেকে গিয়েছিল, কারণ গিরিডি থাকতেই কাগজে পড়েছিলাম, নরওয়ে ভ্রমণের সময় অ্যাকরয়েডের মৃত্যু হয়। অ্যাক্রয়েডের পক্ষে যেটা সম্ভব হয়নি, আমার দ্বারা সেটা হয় কিনা দেখব বলেই নরওয়ে যাওয়ার কথা ভাবছিলাম।

রাত্রে ডিনারের পর-হোটেলে ফেরার কিছু পরে যখন আমার ঘরের দরজায় টোকা পড়ল, তখনও আমার মাথায় লেমিং-এর চিন্তাই ঘুরছিল। আরাম চেয়ারটা থেকে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখি একটি মাঝবয়সী লম্বা ভদ্রলোক, মাথায় সোনালি চুল, চোখে সোনার চশমা, আর সেই চশমার পুরু কাঁচের পিছনে এক জোড়া তীক্ষ্ণ নীল চোখ। ভদ্রলোক ঠোঁট ফাঁক করে অল্প হেসে যখন তাঁর পরিচয় দিলেন তখন লক্ষ্য করলাম তাঁর একটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। তাঁর কথায় জানলাম তাঁর বাস নরওয়ের সুলিটেল্‌মা শহরে। নাম গ্রেগর লিণ্ডকুইস্ট। লোকটি নাকি শিল্পী, বিখ্যাত লোকেদের প্রতিকৃতি তৈরি করেন ঠিক পুতুলের মত ক'রে। অর্থাৎ গায়ের রং, চুল, চোখ, নখ, পোষাক-টোষাক সব আসল মানুষেরই মত, কেবল সাইজ ছ-ইঞ্চির বেশি নয়।

একথা-সেকথার পর একটু বিনয়ী, কিন্তু-কিন্তু ভাব করে বললেন, 'আপনি যদি আমার ওখানে দিন কতক আতিথ্য গ্রহণ করেন তাহলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব, এবং সেই অবসরে আপনার একটি পুতুল-প্রতিকৃতি গড়ে নিতে পারব।' লিণ্ডকুইস্ট আরো বললেন যে তাঁর কালেকশনে নাকি কোন বিখ্যাত ভারতীয়ের পুতুল-মূর্তি নেই, এবং আমি এই প্রস্তাবে রাজি হলে নাকি তিনি নিজেকে ধন্য মনে করবেন।

কথায় কথায় আমার লেমিং সম্পর্কে জানবার আগ্রহটাও প্রকাশ পেয়ে গেল। তাতে ভদ্রলোক বললেন, লেমিং-এর সন্ধানে বনবাদাড়ে ঘোরার আগে তিনি তাঁর বাড়িতেই নাকি একটি লেমিং সংগ্রহ করে আমাকে দেখাতে পারবেন। এর পরে আর আমার কিছু বলার রইল না।

আগামী বৃহস্পতিবার ভদ্রলোকের সঙ্গেই নরওয়ে যাত্রা করব স্থির করেছি।

১৭ই মে—

দুদিন হ'ল সুলিটেল্‌মা শহরে এসেছি। নরওয়ের উত্তরপ্রান্তে কিয়োলেন উপত্যকায় এ-শহরটি ভারী মনোরম। আশে পাশে তামার খনি রয়েছে, আর শহরের পশ্চিমদিকে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে রয়েছে

সুলিটেল্‌মা পর্বতশৃঙ্গ। ৬০০০ ফুটের মত হাইট, কাজেই আমাদের হিমালয়ের এক একটি শৃঙ্গের কাছে একে সামান্য টিলা বলে মনে হবে। কিন্তু নরওয়েতে এই শৃঙ্গ উচ্চতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

লিণ্ডকুইস্ট আমাকে পরম যত্নে রেখেছে। এঁর বাড়ির আশে পাশে আর কোন বাড়িটাড়ি চোখে পড়ে না। এমনিই নরওয়ে দেশটায় লোকসংখ্যা কম, তার মধ্যেও লিণ্ডকুইস্ট যেন একটি জনবিরল পরিবেশ বেছেই নিয়েছে। আমার এতে কোন আপত্তি নেই। আমাদের গিরিডির বাড়িটাও নিরিবিলি জায়গা বেছেই তৈরি করেছিলাম আমি।

লেমিং এখনও দেখা হয়নি। দুএকদিন সময় চেয়ে নিয়েছে লিণ্ডকুইস্ট্। এতেও আপত্তি নেই—কারণ আমি হাতে কিছুটা সময় নিয়েই দেশ ছেড়েছি। আপাতত বিশ্রামেরই প্রয়োজন। ট্রাউট মাছ খাচ্ছি আর খুব ভালো cheese খাচ্ছি। সব মিলিয়ে বেশ আরামে আছি।

তবে লিণ্ডকুইস্টের একটা বাতিক মাঝে মাঝে কেমন যেন অসোয়াস্তির সৃষ্টি করে। সে আমার দিকে প্রায়ই এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে। কথা বলার সময় চাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যখন দুজনে চুপচাপ বসে থাকি, তখনও মাঝে মাঝে অনুভব করি যে সে স্থিরদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। আজ সকালে এর কারণটা জিগ্যেস না করে পারলাম না। লিণ্ডকুইস্ট্ বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে বলল, কোন লোকের পোর্ট্রেট করার আগে কিছুদিন যদি ভালো করে তাকে দেখা যায়, তাহলে মূর্তি গড়ার সময় শিল্পীর কাজ সহজ হয়ে যায়, এবং যার পোর্ট্রেট হচ্ছে তাকেও আর একটানা বেশিক্ষণ পাথরের মত দাঁড়িয়ে বা বসে থাকতে হয় না। আমার আরেকটা প্রশ্নও আর চেপে রাখতে পারলাম না। বললাম, 'আপনার পুতুলগুলি কবে দেখাবেন? বড় কৌতুহল হচ্ছে কিন্তু।'

লিণ্ডকুইস্ট বলল, 'পুতুলগুলোয় ধুলো পড়েছে। আমার চাকর হান্‌স সেগুলো পরিষ্কার করলে পর কাল সন্ধ্যা নাগাৎ সেগুলো দেখাতে পারব বলে আশা করছি।'

'আর লেমিং?'

'আগে পুতুল—তারপর লেমিং। কেমন?'

অগত্যা রাজি হয়ে গেলাম।

১৮ই মে, রাত ১২টা—

দু'ঘণ্টা হল ঘরে ফিরেছি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত উত্তেজনা কাটিয়ে উঠতে পারিনি। তাই আজকের ঘটনা পরিষ্কার করে লিখতে রীতিমত অসুবিধে হচ্ছে।

আজ সন্ধ্যা সাতটায় (সন্ধ্যা বলছি ঘড়ির টাইম অনুযায়ী কারণ এখানে সত্যিকারের রাতদিনের কোন তফাৎ বোঝা যায় না) লিণ্ডকুইস্ট তার বৈঠকখানায় একটা গোপন দরজা খুলে একটা ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে আমাকে মাটির নীচে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে তার পুতুলগুলো দেখালো। আমি এরকম আশ্চর্য জিনিষ আর কখনো দেখি নি।

টেবিলের উপর রাখা কাঁচের আবরণে ঢাকা যে জিনিসগুলি দেখলাম, সেগুলিকে পুতুল বলতে

বেশ দ্বিধাবোধ করছি। আসল মানুষের সঙ্গে এদের তফাৎ কেবল এই যে এগুলো নিষ্প্রাণ। এবং এর কোনটাই ছ'ইঞ্চির বেশি লম্বা নয়। মোটামুটি বলা যেতে পারে যে আসল মানুষের যা আয়তন, এগুলি তার দশ ভাগের এক ভাগ।

সবশুদ্ধ ছ'টি পুতুল রয়েছে। সবই নামকরা লোকের, যদিও এদের সকলের চেহারার সঙ্গে আমার আগে পরিচয় ছিল না। যাদের দেখে চিনলাম তাদের মধ্যে রয়েছে—ফরাসী ভূপর্যটক আঁরি ক্লেমো, আর নিগ্রো চ্যাম্পিয়ন বক্সার বব স্লীম্যান।

আর ছ'নম্বর কাঁচের খাঁচায় যে-পুতুলটি কালো চশমা পরে ডানহাত কোটের পকেটের ভিতর ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি হলেন পরলোকগত বৃটিশ প্রাণীতত্ত্ববিদ্ ও আমার বন্ধু আর্চিবল্ড অ্যাক্‌-রয়েড—ছবছর আগে লেমিং এর সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে নরওয়েতেই যাঁর মৃত্যু হয়।

অ্যাক্‌রয়েডের পুতুলটি দেখেই বুঝতে পারলাম পোট্রেট হিসেবে এগুলো কী আশ্চর্যরকম নিখুঁত। শুধু যে মোটামুটি তার চেহারা মিলেছে তা নয়—এগুলো এমন কোনো পদার্থ দিয়ে তৈরি যাতে নাকি মাথার চুল, গায়ের চামড়া, চোখের তারা, সবই একেবারে জীবন্ত বলে মনে হয়।

এই শেষ পুতুলটি দেখে ত নিশ্বাস বন্ধ হবার জোগাড়। অ্যাক্‌রয়েডের সামনে আমাকে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লিণ্ডকুইস্ট জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হল? একে চেনো নাকি?'

বললাম, 'বিলক্ষণ। ইংলণ্ডে আলাপ হয়েছিল—প্রায় বন্ধুত্বই। লেমিং-এর খবর ওঁর কাছেই পাই। নরওয়েতেই ত ওঁর মৃত্যু হয় বলে শুনেছিলাম।'

'তা হয়। তবে আমার ভাগ্যটা খুবই ভালো। মৃত্যুর কয়েকদিন আগেই আমার এখানে এসেছিলেন, আর তখনই এই পুতুলটি তৈরি করে ফেলি।...যাদের পুতুল দেখছ তাদের সকলেই আমার বাড়িতে থেকে আমাকে 'সিটিং' দিয়ে গেছে।'

গুপ্ত ঘরটা থেকে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার সময় লিণ্ডকুইস্ট বলল, 'পরশু থেকে তোমার পোট্রেটের কাজ শুরু করব।'

আমি ঘরে বসে বসে ডায়রি লিখছি, আর অ্যাকরয়েডের সেই হাসি হাসি মুখটা আমার মনে পড়ছে। কোন মানুষের পক্ষে যে এমন পুতুল তৈরি করা সম্ভব হতে পারে এটা আমি কল্পনাই করতে পারিনি। লিণ্ডকুইস্ট লোকটা কি শুধুই শিল্পী—না বৈজ্ঞানিকও বটে? কী উপাদান দিয়ে ও পুতুল-গুলি গড়ে, যাতে চোখ নখ চামড়া চুল এত আশ্চর্য রকম স্বাভাবিক বলে মনে হয়? আশাকরি আমার মূর্তিটি ও আমার সামনেই গড়বে, যাতে মালশশলা নিজের চোখে দেখার সুযোগ হবে।

কাল সকালে বরং ওকে এবিষয় দুএকটা প্রশ্ন করে দেখব, দেখি না কী বলে।

আপাতত লেমিং-এর প্রশ্নটা স্থগিত রেখে পুতুল নিয়েই পড়া যাক।

১৯শে মে

কাল রাত্রে একটা ঝোড়ো হাওয়ার দমকার সঙ্গে একটা তীব্র উগ্রগন্ধ নাকে আসতে ঘুমটা ভেঙে

গিয়েছিল। গন্ধটা অনেকক্ষণ ছিল। কিছু পরিচিত এবং কিছু অপরিচিত জিনিস মেশানো একটা নতুন গন্ধ। চেনার মধ্যে কপার সালফেট ও ফেরাস অক্সাইড। এছাড়া কেমন যেন একটা মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ—সেটা কেমিক্যালও হতে পারে বা অন্য কিছুও পারে। মোট কথা এই বাড়িতে কিম্বা বাড়ির আশেপাশে কোথাও কেমিক্যাল নিয়ে কারবার চলছে। লিণ্ডকুইস্ট যে বৈজ্ঞানিকও বটে সে-সন্দেহটা আরো দৃঢ় হল।

সকালে বুড়ো চাকর হান্‌স এসে বলল, 'বাবু একটু বেরিয়েছেন; আপনাকে অপেক্ষা না করে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিতে বলেছেন।'

খাওয়া দাওয়া সেরে বাড়ির ভিতরে এবং আশপাশটায় একটু পায়চারি করে দেখলাম। এখানে সেখানে ঝোপঝাড়ের পিছনে ফ্লাস্ক, টেস্টটিউবের টুকরো এবং একটা মর্চে ধরা বুনসেন বার্ণার দেখে আমার মনে আর কোনই সন্দেহ রইল না। পুতুলগুলোর পিছনে একটা বৈজ্ঞানিক কারসাজি রয়েছে। আমার চোখে ধুলো দেওয়া অত সহজ নয়।

একটা খট্‌কা কেবল মনে খোঁচা দিচ্ছে। যে বৈজ্ঞানিক, সে আর একজন বৈজ্ঞানিকের কাছে নিজেকে শিল্পী বলে পরিচয় দেবে কেন?

সাড়ে নটা নাগাৎ যখন ঘরে ফিরছি তখনও লিণ্ডকুইস্টের দেখা নেই। হান্‌স-কে জিগ্যেস করাতে সে তার ফেরার টাইম কিছু বলতে পারল না। একা ঘরে বসে থাকতে থাকতে মাথায় একটা বদ্‌বুদ্ধি এলো। দিনের বেলা পুতুলগুলোকে আরেকবার দেখে আসতে পারলে কেমন হয়?

গুপ্ত ঘরের দরজাটা খোলার একটা সংকেত আছে। দরজার হাতলটা কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়ে তারপর সেটাকে একটা টান দিলেই সেটা খুলে যায়। গতকাল লিণ্ডকুইস্ট হাতলটা নিয়ে কবার ডান দিকে কবার বাঁ দিকে ঘুরিয়ে তারপর টানটা দিয়েছিল সেটা আমি মনে মনে মুখস্থ করে রেখেছিলাম। সাধারণ লোকের পক্ষে অবিশ্যি এ কাজটা সম্ভব হত না।

হান্‌স-কে ডেকে বললাম, আমার একটা জরুরী টেলিগ্রাম পাঠানো দরকার। তুমি যদি কাজটা করে দিতে পার—আমার ঠাণ্ডা দেশে এসে একটু হাঁপ ধরছে—এতটা পথ হাঁটতে ভরসা পাচ্ছি না।'

হান্‌স অবিশ্যি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলো, এবং আমিও আমার বাড়ির চাকর প্রহ্লাদের নামে একটা আজগুবি টেলিগ্রাম লিখে হান্‌স-কে টাকা দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম।

হান্‌স রওনা হবার পর আরো পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে আমি বাড়ির গেটের বাইরে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালাম। এদিকে ওদিকে চাইলে বহুদূর অবধি দেখা যায়। লিণ্ডকুইস্টের কোনো চিহ্ন দেখলাম না—বুঝলাম সে ফিরলেও মিনিট পনেরর আগে নয়।

ভেতরে ফিরে এসে গুপ্ত দরজাটায় গিয়ে মুখস্থমাফিক হাতলটা এদিক ওদিক ঘোরানো শুরু করলাম। যথাসময়ে একটা খচ্‌ শব্দ করে দরজাটা খুলে গেলো। পকেটে টর্চ ছিল। সেটা জ্বেলে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলাম।

গুপ্ত ঘরে পৌঁছে একটা একটা করে কাঁচের খাঁচাগুলোর উপর—আলো ফেলে দেখতে শুরু

করলাম। কালকের চেয়ে কোন বিশেষ তফাৎ চোখে পড়ল না। এক নম্বরে সেই ইটালীর গায়ক—নাম বোধহয় মারিয়ো বাতিস্তা, দুই-এ মুষ্টিযোদ্ধা বব স্লীম্যান, তিন-এ ফরাসী পর্যটক আঁরি ক্লেমো, চারে জাপানী সাঁতারু হাকিমোতো। পাঁচে সেই জার্মান কবি নাম মনে নেই, আর ছ'-য়ে আমার বন্ধু অ্যাক্‌রয়েড।

আমি টর্চটা নিয়ে অ্যাক্‌রয়েডের খাঁচার দিকে এগিয়ে গেলাম। খাঁচাগুলি বেশ। এরকম জিনিস এর আগে দেখিনি কখনো। একরকম কাঁচের আবরণ থাকে—মন্দিরের চূড়োর মত থাকে অনেক সময় ভালো ঘড়ি কিম্বা মূর্তি ঢাকা দেওয়া থাকে। এ কতকটা সেইরকম কিন্তু তফাৎ এই যে এতে আবার একটা দরজা আছে। এবং তাতে কবজা এবং চাবি লাগানোর বন্দোবস্ত আছে। অবিশ্যি ইচ্ছা করলে পুরো ঢাক্‌নাটাই হাত দিয়ে তুলে ফেলা যায়।

আমি কাঁচের সঙ্গে প্রায় মুখ লাগিয়ে দিয়ে অ্যাকরয়েডের পুতুলটা দেখতে লাগলাম। দেখতে দেখতে মনে হল গত কালের ভঙ্গীর সঙ্গে যেন সামান্য একটু তফাৎ। কালকে যেন ডান হাতটা পকেটের মধ্যে আরেকটু বেশি ঢোকানো মনে হয়েছিল। তাই কি?—না আমার চোখের ভুল? এমনওত হতে পারে যে পুতুলগুলির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়ানোর ব্যবস্থা করা আছে। লিণ্ডকুইস্ট হয়ত মাঝে মাঝে দরজা খুলে তাদের দাঁড়াবার ভঙ্গীটা একটু বদল করে দেয়। কিম্বা হয়ত পুতুলগুলোকে ঝাড়পোঁছ করার সময় হাত পা একটু নড়ে যায়। একবার খুলে পরীক্ষা করে দেখলে কেমন হয়?

কিন্তু অ্যাক্‌রয়েডের পুতুলটায় হাত দিতে কেমন জানি সঙ্কোচ বোধ হল, তাই জাপানী সাঁতারুর পুতুলের ঢাকনাটা খুলে সেটা আস্তে হাতে তুলে নিলাম। নিয়েই বুঝলাম যে হাত পা নড়ানোর কোন উপায় লিণ্ডকুইস্ট রাখেনি। পুতুলগুলো একেবারেই অসাড় এবং অনড়।

কাঁচের ঢাকনা চাপা দিয়ে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উঠে গুপ্ত দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে ফিরে এলাম।

লিণ্ডকুইস্ট ফিরল সাড়ে বারোটার সময়। দুপুরে খাবার টেবিলে তাকে বললাম, 'আজ একটু পড়াশুনো করবার ইচ্ছে হচ্ছে। তোমাদের এখানেও শুনেছি বেশ ভাল একটা পাবলিক লাইব্রেরি আছে। একবার যাওয়া যায় কি?'

লিণ্ডকুইস্ট বলল 'স্বচ্ছন্দে। আমি রাস্তা বাৎলে দেবো। আজই যাও—কারণ কাল থেকেত তোমায় সিটিং দিতে হবে।'

আমি বিশ্রাম না করেই বেরিয়ে পড়লাম। মনের মধ্যে কেমন জানি একটা অস্পষ্ট সন্দেহ উঁকি মারছিল, সেই কারণেই কিছু পুরোনো খবরের কাগজ ঘাঁটার দরকার হয়ে পড়েছিল।

সাড়ে তিন ঘণ্টা লাইব্রেরিতে বসে 'লণ্ডন টাইম্‌স' কাগজের ফাইল ঘেঁটে মনে গভীর সন্দেহ, উত্তেজনা ও উদ্বেগ নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। দুবছর আগের ১১ই সেপ্টেম্বরের টাইম্‌স কাগজে আর্চিবল্ড অ্যাকরয়েডের মৃত্যু সংবাদ পড়ে জানতে পারলাম যে অ্যাক্‌রয়েড কী ভাবে কোথায় মারা গিয়েছিল তা জানা যায় নি। নরওয়ে ভ্রমণকালে সে নিখোঁজ হয়ে যায়। তাকে শেষ দেখা গিয়েছিল ফিয়োর্ড

পরিভ্রমণের উদ্দেশ্যে একটি নৌকায় চাপতে। সেই নৌকাটির কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি—কাজেই ধরে নেওয়া হয়েছিল যে নৌকাডুবির ফলেই অ্যাক্রয়েডের মৃত্যু ঘটে।

বব স্লীম্যান, হাকিমোতো ও আঁরি ক্লেমোর মৃত্যু সংবাদও পড়লাম। এরা সকলেই ইউরোপে নিখোঁজ হয়েছেন, এবং সকলকেই অনেক অনুসন্ধানের পর মৃত বলেই ধরে নেওয়া হয়েছিল।

বাড়ি ফিরে এসে বাকিটা দিন যথাসাধ্য স্বাভাবিকভাবেই কাটিয়ে দিতে চেষ্টা করলাম। লেমিং সম্পর্কে কৌতূহলটা মন থেকে প্রায় মুছে গেছে।

রাত্রে খেতে বসে লিণ্ডকুইস্ট বলল, 'শঙ্কু, তুমিত মদ খাও না। আমাদের দেশের একটা ভালো ওয়াইন একটু চেখে দেখবে নাকি? আমার অবশ্য এই বিশেষ মদটা রোচে না, তবে লোকে খুব ভালো বলে। একটু দেখো না খেয়ে।'

পাছে লিণ্ডকুইস্টের মনে আমার সন্দেহ সম্পর্কে কোন সন্দেহ জাগে তাই আপত্তি করলাম না।

লিণ্ডকুইস্ট খানিকটা মদ গ্লাসে ঢেলে দিল। গেলাসটা ঠোঁটের কাছে আনতেই কেমন জানি একটা সন্দেহজনক গন্ধ পেলাম। তাও সামান্য খানিকটা চুমুক দিয়ে সেটাকে ন্যাপকিনে ফেলে দিয়ে বললাম। এ ব্যাপারে তোমার ও আমার রুচি একই রকম। তার চেয়ে বরং তুমি যেটা পান করছ সেটাই কিছুটা আমাকে দাও না।'

লিণ্ডকুইস্ট মদের মধ্যে ঘুমের ওষুধ দিচ্ছিল; এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। তার অভিসন্ধিটা আমার কাছে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে আসছে।

আজ রাতটা যে করে হোক জেগে থেকে ও কী করে সেটা দেখতে হবে।

২০শে মে

কাল রাত্রে না ঘুমোনোর ফলে যে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল সেটা আজ সকালেই লিখে ফেলছি।—

লিণ্ডকুইস্টের এই কাঠের বাড়িতে দরজার চৌকাঠ বলে কিছু নেই।

ফলে হয়কি, পাশের ঘরে আলো জ্বালালে, দরজা বন্ধ থাকলেও তার তলার ফাঁক দিয়ে সে আলো দেখা যায়। লিণ্ডকুইস্টের বৈঠকখানায় কুকু-ক্লক্-এর কোকিল তখন সবে বারোটার ডাক ডেকেছে। আমি আমার সেই ঘুম-তাড়ানি ট্যাবলেটটা না খেয়েও তখন দিব্যি জেগে বসে আছি—কারণ মনে কেমন জানি দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে রাত্রে একটা কিছু ঘটবে। এময় সময় আমার বন্ধ দরজার তলা দিয়ে আলো দেখলাম। কে জানি বৈঠকখানায় আলো জ্বেলেছে।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তারপরেই একটা পরিচিত 'খুচ্' শব্দ শুনতে পেলাম।

এবার বৈঠকখানার বাতিটা নিবে গেল।

আমি মিনিট খানেক চুপ করে থেকে মোজা পায়ে আস্তে আস্তে আমার দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে সেটা ইঞ্চি খানেক ফাঁক করে চোখ লাগিয়ে এদিক ওদিক দেখে নিলাম! তারপর দরজা খুলে এগিয়ে গেলাম গুপ্ত দরজার দিকে। গিয়ে দেখি দরজা খোলা।

বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও তখন একটা অদম্য বৈজ্ঞানিক কৌতূহল আমাকে পেয়ে বসেছে। আমি দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলাম। সাড়ে তিন পাক নামলে পরে পুতুলের ঘরে পৌঁছান যায়। তিন পাকের শুরুতেই একটা অদ্ভুত শব্দ আমার কানে এলো।

আমার কান—শুধু কান কেন, আমার সব ইন্দ্রিয়ই—সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি সজাগ; তবুও এ শব্দটা এতই নতুন, এটা চিনতে আমার বেশ কিছুটা সময় লাগল। অবশেষে হঠাৎ চিনতে পেরে বিস্ময়ে ও আতঙ্কে আমার রক্ত হিম হয়ে গেলো।

এ হোল মানুষের চীৎকার! কিন্তু গলার স্বরটা সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক, অনেক গুণে তীক্ষ্ণ ও মিহি। চীৎকারের ভাষাটা জাপানী।

আমার বুঝতে বাকি রইল না যে ওই জাপানী পুতুল সাঁতারু হাকিমোতোই কোন বিপন্ন অবস্থায় পড়ে এ-ভাবে আর্তনাদ করছে।

আমি স্তম্ভিত হয়ে চীৎকারটা শুনছি, এমন সময় হঠাৎ সেটা থেমে গেল। তারপর টং করে কাঁচের শব্দ। এ শব্দেরও কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। কাঁচের খাঁচার দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ এটা।

আমার কৌতূহল এখন সব ভয়কে ছাপিয়ে উঠেছে। আমি সিঁড়ির বাকি ধাপ কটা নেমে গিয়ে দেওয়ালের পাশ দিয়ে গলাটা বাড়িয়ে দিলাম।

লিণ্ডকুইস্ট একটা চাবি দিয়ে সেই ফরাসী পর্যটকের খাঁচাটা খুলেছে। তারপর হাত ঢুকিয়ে মুঠো করে পুতুলটাকে বাইরে বের করে এনে তার গায়ে বাঁ হাত দিয়ে কী যেন একটা ঠেকাতেই পুতুলটা হাত পা ছুঁড়তে আরম্ভ করল—এবং তারপর শুরু হল ক্ষীণ মিহি সুরে আর্তনাদ। লিণ্ডকুইস্টের ব্যবহারে কোন বিচলিত হবার লক্ষণ দেখলাম না। সে আর্তনাদ অগ্রাহ্য করে একটা ছোট্ট ড্রপার দিয়ে পুতুলের হাঁ করা মুখে কী যেন পুরে দিচ্ছে।

আস্তে আস্তে পুতুলের হাত পা ছোঁড়া থেমে গেল। তারপর লিণ্ডকুইস্ট আগের সেই প্রথম জিনিসটা পুতুলের গায়ে ঠেকাতেই সেটার হাত পা অসাড় হয়ে আগের অবস্থায় চলে এলো। লিণ্ডকুইস্ট সেটাকে খাঁচার মধ্যে পুরে দাঁড় করিয়ে দরজা বন্ধ করে চাবি দিয়ে দিল। আমি আমার জায়গায় বিহ্বল অথচ তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তার পিছনেই দশ হাতের মধ্যেই যে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি, সেটা লিণ্ডকুইস্টের খেয়ালই হল না।

এর পরে অ্যাক্রয়েডের পালা।

উন্মাদ বৈজ্ঞানিকের হাতের মুঠোয় অ্যাক্রয়েডের শোচনীয় অবস্থা দেখে আমার ক্রোধ ও উত্তেজনা সংবরণ করা কঠিন হচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ দেখলাম অ্যাক্রয়েডের ছট্‌ফটানি থেমে গেল। এত দূর থেকেও মনে হল তার মাথাটা যেন আমারই দিকে ঘোরানো রয়েছে। তারপরে পরিষ্কার মার্জিত ইংরেজি উচ্চারণে অতি কষ্টে মিহি চীৎকার এলো—'শঙ্কু, তুমি কী করছ এখানে—পালাও, পালাও!'

পুতুলের মুখে আমার নাম শোনা মাত্র লিণ্ডকুইস্ট্ বিদ্যুদ্বেগে সিঁড়ির দিকে দৃষ্টি ঘোরাতেই

আমিও ঘুরে তিন চার সিঁড়ি এক সঙ্গে উঠে বৈঠকখানা পেরিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে আমার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

কিন্তু আশ্চর্য—লিণ্ডকুইস্ট আর আমার ঘরের দিকে এলো না।

এখন সকাল নটা। ব্রেকফাস্টের জন্য আমার ডাক পড়েনি। এটাও বুঝতে পেরেছি—যে আর ডাক পড়বে না। আমার ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

২৩শে মে

কালকের ঘটনার পর চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গেছে। এখনো লিণ্ডকুইস্টের দেখা নেই। আমার ঘরে কিছু ফল রাখা ছিল, আর আমার সঙ্গে কিছু বিস্কুট ছিল—এ ছাড়া কাল থেকে কিছুই খাওয়া হয়নি। খিদের সঙ্গে সঙ্গে শরীরে একটা অবসাদও এসে পড়ছে। কাল রাত্রে সব বিদ্‌ঘুটে স্বপ্ন দেখেছি। তার মধ্যে একটাতে দেখলাম ইঁদুরের মত দেখতে একটা অতিকায় জানোয়ার আমার জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকতে চেষ্টা করছে। তারপরে একটা বিস্ফোরণের শব্দ আর একটা বিকট চীৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। আমি কিছুক্ষণ অবশ হয়ে পড়ে রইলাম। তখন থেকেই ঘরে একটা গন্ধ পাচ্ছি; এখন বুঝতে পারছি সেটা আসছে আমার ফায়ার প্লেসের ভিতর থেকে। চিমনি দিয়ে গন্ধটা ঘরে ঢুকছে।

শুধু গন্ধ নয়। গন্ধের সঙ্গে বাষ্পের মত কী যেন ঢুকে ঘরটাকে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। আমার মাথাটাও কেমন যেন ঝিম ঝিম করছে। লিখতেও বেশ অসুবিধে হচ্ছে। আর বোধহয় কলম—

৭ই জুন।

আমি সুস্থ আছি বলব না—তবে বেঁচে যে আছি সেটাই বা কী কম আশ্চর্যের কথা? স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান এয়ার ওয়েজের ভারতগামী প্লেনে বসে ডায়রি লিখছি। ডিনারে ট্রাউট মাছ দিয়েছিল—খাইনি, লিণ্ডক্বিউস্টের বাড়িতে খাওয়া কোন কিছুই আর কোনদিন খেতে পারব কিনা জানিনা। সুলিটেলমার পুরো ঘটনাটা মন থেকে চিরকালের জন্য মুছে ফেলার কোন বৈজ্ঞানিক উপায় আছে কিনা সেটা গিরিডিতে গিয়ে ভেবে দেখতে হবে। যাই হোক্—আপাতত ঘটনাটা আমার এই ডায়রিতে লিখে রাখি কারণ এ ধরণের পৈশাচিক কাণ্ড কারখানার একট বিবরণ দেওয়া থাকলে আর কিছু না হোক, ভবিষ্যতে একটা ওয়ার্নিং-এর কাজ করতে পারে।

আমার একুশে অক্টোবরের বিবরণে ধোঁয়া আর গন্ধের কথা বলেছিলাম। গন্ধটা কখন যে আমাকে অজ্ঞান করে দিয়েছিল সেটা টেরই পাইনি। জ্ঞান যখন হল তখন মনে হল আমি একটা বিশাল ঘরের মধ্যে শুয়ে আছি। ঘরের ছাতটা এতই উঁচুতে যে আমি যেন ভালো করে দেখতেই পাচ্ছি না। প্রথমে মনে হল আমি হয়ত কোন গির্জার ভিতরে রয়েছি। কিন্তু তারপর ভালো করে দেখতে ছাতের কড়ি বরগাগুলো চোখে পড়ল, আর সেগুলো যেন কেমন চেনা চেনা মনে হল।

যে জিনিসটার উপর শুয়ে আছি সেটা পিঠের তলায় কেমন নরম নরম মনে হচ্ছিল। তবে সেটা বিছানা নয়, কারণ সেটা স্থির থাকছিল না।

তন্দ্রার ভাবটা কেটে গেলে আমার মাথাটা একটু ডান দিকে ঘোরাতেই একটা তীব্র আলোয় আমার চোখটা প্রায় ঝলসে গেল। সেই আলোটাও যেন অস্থির, মাঝে মাঝে আমার চোখে পড়ছে, মাঝে মাঝে সরে যাচ্ছে। একবার আলোটা সরে গিয়ে আমার চোখটা কিছুক্ষণ রেস্ট পাওয়াতে সব ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম।

আলোটা আসছিল দুটো বিরাট গোল কাঁচ থেকে রিফ্লেক্টেড হয়ে। কাঁচের পিছনে জ্বল জ্বল করছে দুটো মসৃণ নীল চক্র—তার মাঝখানে আবার অপেক্ষাকৃত ছোট দুটী কালো চক্র। এই কালো বিন্দু সমেত নীল চক্র দুটিও স্থির নয়—এদিক ওদিক নড়ছে, আর মাঝে মাঝে আমার দিকে চাইছে। হ্যাঁ—চাইছেই বটে—কারণ ও দুটো আসলে চোখ। লিণ্ডকুইস্টের চোখ। কাঁচ দুটো লিণ্ডকুইস্টের সোনার চশমা। আমি শুয়ে আছি লিণ্ডকুইস্টের দস্তানা পরা হাতের উপর।

আর আমি আয়তনে হয়ে গেছি অন্য পুতুলগুলোরই মত। অর্থাৎ, যা ছিলাম তার দশ ভাগের এক ভাগ। কিন্তু সাইজে ছোট হয়ে গেলেও, আমার জ্ঞান, বুদ্ধি অনুভূতি কমেনি। কেবল বাঁ হাতের কাঁধের কাছটায় একটা যন্ত্রণা। বুঝলাম সেখানে একটা ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে।

লিণ্ডকুইস্ট্ এবার আমার উপর ঝুঁকে পড়ল। তার গরম নিঃশ্বাস আমার শরীরের উপর অনুভব করলাম। এইবার তার ঠোঁটটা ফাঁক হতেই সোনার দাঁতটা ঝলমল করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মদের গন্ধ, আরো উত্তপ্ত হাওয়া, এবং লিণ্ডকুইষ্টের কথা—

'আমার 'ছবি'-টা কেমন বলত, শঙ্কু? বেশ নতুন ধরণের—নয় কি? লোকে ডাক টিকিট জমায়, দেশলাই-এর লেবেল জমায়, পুরানো টাকা জমায়, অটোগ্রাফের খাতায় লোকের সই জমায়—আর আমি বাছাই করে দেশ-বিদেশের বিখ্যাত লোকদের ধরে ধরে তাদের পুতুল করে কাঁচের ঢাকনা ঢেকে রেখে দিই! আমার এই অদ্ভুত শখ, এই আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির জন্য কি কেউ উপাধি দেবে? কেউ না? ···তুমি বলবে, একজন বৈজ্ঞানিক ত আমার সংগ্রহে রয়েইছে, তাহলে আর তোমাকে রাখা কেন? আসলে কী জান? বৈজ্ঞানিক বলে তোমাকে রাখছি না; রাখছি ভারতীয় বলে। বিখ্যাত ভারতীয় আর চট্ করে ঘরের কাছে কোথায় পাব বল? নরওয়েতে আর কজনই বা আসবে? আর আমার এই আস্তানায় ত সকলে সব সময়ে আসতেই চায় না—যেমন তুমি এলে।'

লিণ্ডকুইস্ট দম নেবার জন্য একটু থামল। তারপর জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বলল, 'আমার সবচেয়ে বড় গুণ কী জান? আমি খুন করিনা। এরা সব আসলে জ্যান্ত রয়েছে। দিনের বেলায় ইলেকট্রিক শক্ দিয়ে এদের অসাড় করে রেখে দিই। রাত বারোটায় আবার শক্ দিয়ে জাগিয়ে ড্রপার দিয়ে খাইয়ে দিই। প্রয়োজন হলে তখন এদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলি। তবু আফশোষ এই যে এরা এত নির্ভাবনায় থেকেও কেউই খুশি থাকতে পারছে না। জ্ঞান হলেই সব কটাই 'আমাকে বাঁচাও, আমাকে উদ্ধার কর' ইত্যাদি ব'লে চেঁচাতে থাকে। যেখানে খাওয়া পরার কোন চিন্তা করতে হচ্ছে না,

জীবন ধারণের কোন সমস্যার প্রশ্নই যেখানে উঠছে না, সেখানে পালাবার এত ইচ্ছের কারণটাই আমি বুঝতে পারছি না। তোমায় দেখে মনে হয় তুমি বেশ সহজেই পোষ মানবে—তাই নয়, শঙ্কু ?'

লিণ্ডকুইস্ট তার কথা শেষ করে আমাকে তার হাত থেকে নামিয়ে টেবিলের উপর শোয়ালো। তারপর আমার কোমরে এবং বুকের ওপর এক জোড়া স্ট্র্যাপ আটকে আমাকে বন্দী করে ফেলল।

আমি আপত্তি বা গায়ের জোর দেখানোর কোন চেষ্টাই করলাম না—কারণ জানতাম যে তাতে কোন ফলই হবে না। এখন যেটা দরকার সেটা হচ্ছে মাথাটাকে ঠাণ্ডা রাখা, এবং আমার এই খুদে অবস্থায় কেবল বুদ্ধি খাটিয়ে কী ভাবে লিণ্ডকুইস্ট্‌কে সায়েস্তা করা যায় সেইটে ভেবে স্থির করা।

লিণ্ডকুইস্ট্‌ বলেছে যে খুদে মানুষকে অসাড় পুতুলে পরিণত করতে হলে ইলেকৃট্রিক শক্‌ দিতে হয়। আমাকে কিন্তু ইলেকৃট্রিক্‌ শক্‌ দিয়ে লিণ্ডকুইস্ট বিশেষ সুবিধে করতে পারবে না, কারণ আমার গেঞ্জীর নীচে আমার সেই কার্বোথানের পাতলা জামাটা রয়েছে। সেবার গিরিডিতে ঝড়ের মধ্যে আমার বাগানে গাছের চারাগুলো বাঁচাতে গিয়ে কাছাকাছি একটা তালগাছে বাজ পড়ায় আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। তারপরেই এই জামাটা আবিষ্কার করি এবং ২৪ ঘণ্টা পরে থাকি।

লিণ্ডকুইস্ট আমাকে শোয়ানো অবস্থায় রেখে ঘরের অন্যদিকে চলে গিয়েছিল। এবারে দেখলাম ঘরের আলোটা হঠাৎ নিভে গেলো। তারপর একটা কাঠের টেবিল টানার শব্দ পেলাম। তারপর কাঁচের ঠুংঠাং আওয়াজ। তারপর একটা সুইচ জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গেই আবার গায়ের উপর একটা তীব্র আলো এসে পড়ল। তারপর দেখলাম লিণ্ডকুইস্টের চশমার ঝলসানি। লিণ্ডকুইস্ট আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

এবার তার দৈত্যের মত হাতটা নেমে এলো আমার দিকে—তাতে একটা ইলেক্‌ট্রিকের তার। লক্ষ্য করলাম লিণ্ডকুইস্টের ঠোঁটের কোনে একটা বিশ্রী হাসি।

এবারে তার ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে আবার সোনার দাঁতটা দেখা গেলো, আর চাপা কর্কশ স্বরে কথা এলো—'এসো বাছাধন, আমার সাত নম্বরের পুতুল ! এসো—'

ইলেক্‌ট্রিকের তার সমেত লিণ্ডকুইস্টের ডান হাতটা আমার সমস্ত শরীরটাকে আচ্ছাদন করে ফেলল। আমার স্নায়ুর ভিতর একটা সামান্য শিহরণে বুঝতে পারলাম যে লিণ্ডকুইস্ট তারটা আমার গায়ে ঠেকিয়েছে। প্রায় পাঁচ সেকেণ্ড সে তারটাকে এইভাবে ঠেকিয়ে রেখে তারপর সেটাকে সরিয়ে নিল।

আমি মট্‌কা মেরে মড়ার মত পড়ে রইলাম।

ঘরের বাতি জ্বলে উঠল। লিণ্ডকুইস্ট আমার স্ট্র্যাপগুলো আলগা করে দিয়ে আমাকে হাতে তুলে নিল। আমি হাতপাগুলোকে টান করে রইলাম—যেন পুতুল হয়ে গেছি।

লিণ্ডকুইস্ট আমাকে একটা নতুন টেবিলের উপর একটা নতুন কাঁচের খাঁচার মধ্যে রেখে খাঁচার দরজায় চাবি দিয়ে চলে গেলো। ঘরের বাতি নিভে গেলো। তারপর ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ভারী পায়ে উঠে যাওয়ার শব্দ পেলাম। গুপ্ত দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ।

এবার আমি হাতপা আলগা করলাম।

ঘরে দুর্ভেদ্য অন্ধকার—কিছু দেখা যায় না। আমি হেঁটে একটু এগিয়ে যেতেই কাঁচের দেওয়ালের সামনে পড়লাম। হাত দিয়ে ঠেলে দেখি সেটা রীতিমত ভারি; এক চুলও নড়ানো সম্ভব নয়। কাঁচের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে ভাবতে আরম্ভ করলাম। নরউইজীয় বুনো শেয়ালের ডাক শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। কাঁচের ঢাকনা আর টেবিলের মাঝখানে সামান্য যে ফাঁক রয়েছে সেইখান দিয়েই এই শব্দ আসছে, এবং এই চুল পরিমাণ ফাঁক দিয়েই যে হাওয়া ঢুকছে সেটাই আমার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের পক্ষে যথেষ্ট।

ওপরে বৈঠকখানা থেকে কুকু-ক্লকের শব্দ শুনলাম— কুক্কু! কুক্কু! কুক্কু!

তিনটে বাজল। রাত, না দিন, তা বোঝার কোন উপায় নেই। আধো আধো ঘুমের আমেজ অনুভব করলাম। পা দুটোকে সামনে ছড়িয়ে দিয়ে গা টাকে এলিয়ে দিলাম। নিজের অবস্থার কথা ভাবতে হাসি পেলো। আমি ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু—সুইডিশ অ্যাকাডেমি অফ সায়ন্স কর্তৃক সম্মানিত বিশ্ববিখ্যাত বাঙালী বৈজ্ঞানিক—আজ একজন নরউইজীয় পাগলের হাতে পুতুল অবস্থায় বন্দী। গিরিডির কথা মনে পড়ছে—উশ্রী নদী, খাণ্ডলি পাহাড়। আমার বাড়ি, আমার বেড়াল নিউটন, চাকর প্রহ্লাদ। আমার ল্যাবরেটরি। আমার বাগানের উত্তর দিকে সেই গুলঞ্চ গাছ, আমার কত অসমাপ্ত কাজ, কত গবেষণা, কত—

টুং টুং টুং!

ওটা কিসের শব্দ? একটা দীর্ঘশ্বাস বুকের ভিতর থেকে উঠে আসতে গিয়ে থেমে গেল। আমি পা-দুটোকে টেনে নিয়ে সোজা হয়ে বসলাম।

টুং টুং—টুং টং টুং—টুং টং!

আমি উঠে দাঁড়াবাম। আমার পাশের খাঁচা থেকে শব্দটা আসছে। অ্যাক্রয়েডের খাঁচা।

টুং টুং—টুং টুং টুং—টুং টুং টুং

একী! এ যে মর্স কোড—টেলিগ্রাফের টরেটক্কার ভাষা! আর এ ভাষা যে আমিও জানি!

আমিও কাঁচের গায়ে হাত ঠুকে জানালাম—'আবার বলো।'

আবার টুং টুং শব্দ হল। আমি মনে মনে তার মানে করতে লাগলাম। অ্যাকরয়েড বলল, 'আমারও কার্বোথানের পোষাক। আমি পুতুল সেজে আছি। তুমি যেদিন এলে—দেখে আনন্দ হল, ভয় হল প্রকাশ করিনি।'

আমিও টুং টুং করলাম—'দ্বিতীয় দিন? যখন একা ছিলাম?'

'একা এসেছিলে? দেখিনি। বোধ হয় ঘুমিয়েছিলাম। দাঁড়িয়ে ঘুমানো অভ্যাস করেছি। সেদিন রাত্রে আর থাকতে পারলাম না—চেঁচাতে বাধ্য হলাম।'

'কদিন আছ এখানে?'

'দুবছর। আমার মৃত্যুর সময় থেকেই। অনেক দেখেছি দুবছরে, অনেক জেনেছি, অনেক

ভেবেছি। এবার বোধহয় পালাবার সুযোগ এসেছে।'

'মানুষ হয়ে? না, পুতুল?'

'মানুষ। ওষুধ আছে। কাল রাত্রে খাবার সময় প্রস্তুত থেকো। আজ ক্লান্ত। হাত অবশ। ঘুমোব। গুড নাইট!'

আমি ধীরে ধীরে কাঁচে টোকা মেরে গুড নাইট জানিয়ে দিলাম। অ্যাক্রয়েড বেঁচে আছে—আমারই মত। কার্বোথানের ফরমুলা আমিই ওকে দিয়েছিলাম। কিন্তু পালানোর কী উপায় ও আবিষ্কার করেছে? জানিনা। আবার মানুষ হয়ে গিরিডিতে ফিরতে পারব? অক্ষত দেহে? জানি না। কপালে কী আছে কিছুই জানি না।

ভাবতে ভাবতে আমারও জানি কখন ঘুম এসে গিয়েছিল। ঘুম ভাঙার পরেও বাকি সময়টা অন্ধকারেই কাঁচে ঠেস দিয়ে বসে কাটিয়েছি। কুকু-ক্লকটা অনেকবার বেজেছে। প্রথমে সময়ের খেয়াল রেখেছিলাম, তারপর আর রাখিনি। অবশেষে এক সময় রাত বারোটা যে বাজল সেটা গুপ্ত দরজা খোলার শব্দ থেকেই বুঝলাম। শব্দ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি সোজা হয়ে পুতুলের ভঙ্গী নিয়ে দাঁড়ালাম।

লিণ্ডকুইস্ট ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো। একটা গুন্ গুন্ শব্দ শুনে বুঝলাম সে গান গাইছে। তারপর খুট্ শব্দ করে ঘরের বাতিটা জ্বলে উঠল। আমি মাথা না ঘুরিয়ে আড় চোখে যতদূর দেখা যায় তাই দেখার চেষ্টা করলাম।

লিণ্ডকুইস্ট্ কিন্তু আমাদের টেবিলের দিকে এলো না। সে ঘরের পিছন দিকে আরেকটা দরজা খুলে পাশের ঘরে চলে গেলো এবং সেখানেও একটা বাতি জ্বলে উঠল। আমি এবার আরেকটু সাহস করে অ্যাক্রয়েডের দিকে চাইলাম।

অ্যাক্রয়েড আমায় দেখে একটু হাসল। তারপর ডান পকেটে ঢোকানো হাতটা আস্তে আস্তে বার করল। তারপর হাতটা আমার দিকে তুলে ধরল। দেখি তার হাতে একটা ছোট্ট আধ ইঞ্চি লম্বা ইঞ্জেকশন দেওয়ার সিরিঞ্জ।

অ্যাক্রয়েডের এর পরের কাজ আরো বিস্ময়কর। সে সিরিঞ্জটা পকেটে পুরে তার খাঁচার দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে চাবির গর্তের মধ্যে হাত ঘুরিয়ে একটু নাড়াচাড়া করতে দরজাটা খুলে গেলো। অ্যাক্রয়েড দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। আমার ত দম বন্ধ হবার জোগাড়। লিণ্ডকুইস্ট্ যদি ফিরে আসে? অ্যাক্রয়েড যেন সে বিষয়ে কোন চিন্তা না করেই টেবিলের পাশ দিয়ে হেঁটে খাঁচার পিছন দিকটায় এসে এদিক সেদিক দেখে টেবিল থেকে শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। লোকটা আত্মহত্যা করছে নাকি? না তা নয়। একটা ইলেকট্রিকের তার টেবিলের পিছন দিয়ে গিয়ে মাটীতে ঠেকেছে—অ্যাক্রয়েড টেবিলের থেকে অব্যর্থ লক্ষ্য করেই ঝাঁপটা দিয়েছে এবং তারটা ধরে সে মেঝের দিকে নামছে। অ্যাক্রয়েড যে বেশ সুস্থ সবল লোক ছিল সেটা আমি জানতাম—কিন্তু এই দুরূহ জিম্‌নাস্টীকের কাজটাও যে তার আয়ত্তে থাকতে পারে সেটা আমার জানা ছিল না।

তার বেয়ে মাটিতে নেমে অ্যাক্রয়েড খোলা দরজা দিয়ে একবার উঁকি মেরে অন্য ঘরটায় চলে গেলো। ঘরটা থেকে যে একটা অদ্ভুত আওয়াজ আসছে সেটা আমি এতক্ষণ খেয়াল করিনি—এবার শুনতে পেলাম। এটাত মানুষের গলার শব্দ নয়। তবে এটা কী? আমার পক্ষে এ শব্দ চেনা অসম্ভব।

শব্দটা বন্ধ হবার পর লিণ্ডকুইস্টের পায়ের আওয়াজ পেলাম। সে বাতি নিভিয়ে আমাদের ঘরটায় ফিরে এলো। দরজাটার সামনেই এক নম্বর খাঁচা। লিণ্ডকুইস্ট চাবি বার করে খাঁচার দরজা খুলে ইতালীয় গায়ক বাত্তিস্তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি কাঠের মত দাঁড়িয়ে আড়চোখে একবার লিণ্ডকুইস্টের দিকে, একবার পাশের ঘরের দরজাটার দিকে চাইতে লাগলাম।

যথারীতি বাত্তিস্তার চীৎকার শুরু হল। অ্যাক্রয়েড পাশের ঘরে কী করছে না করছে ভেবে ঠাহর করতে চেষ্টা করছি এমন সময় হঠাৎ পাশের ঘরের দরজাটা খুলে গেলো, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ছফুট লম্বা দেহ নিয়ে ঝড়ের মত প্রবেশ করে আমার বন্ধু অ্যাক্রয়েড লম্ফ দিয়ে এগিয়ে এসে লিণ্ডকুইস্টের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি খাঁচার মধ্যে বন্দী, তার উপর দৈর্ঘ্যে মাত্র ছ ইঞ্চি—অ্যাকরয়েডকে যে সাহায্য করব তার কোন উপায় নেই।

কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বুঝলাম যে অ্যাক্রয়েডের সাহায্যের কোন প্রয়োজন নেই। লিণ্ডকুইস্টের সাধের একনম্বরের পুতুল হাতে থাকাতে প্রথমত সেইটিকে পাশে সরিয়ে রাখতে রাখতেই অ্যাক্রয়েড তাকে জাপটে ধরে ফেলল।

লিণ্ডকুইস্ট কিছু করতে পারার আগেই দেখি অ্যাক্রয়েড একটা সিরিঞ্জ নিয়ে নরউইজীয়ের বাঁ হাতের কোটের আস্তিনের উপর দিয়েছে প্রকাণ্ড খোচা।

তারপর? তারপরের দৃশ্য আরো ভয়াবহ, আরো অবিস্মরনীয়। কয়েক মুহূর্ত আগেই অ্যাক্রয়েডকে দেখেছিলাম তারই সমান একটি জোয়ান লোককে জাপটে ধরতে—আর এখন দেখলাম অ্যাক্রয়েডের বাঁ হাতের মুঠোয় লিণ্ডকুইস্টের ছ ইঞ্চি লম্বা একটি পুতুল সংস্করণ।

অ্যাক্রয়েড অবজ্ঞাভরে পুতুলটিকে টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে তার গায়ে বৈদ্যুতিক তারটা ঠেকিয়ে সেটাকে অসাড় করে দিল।

তারপর আমার খাঁচার দিকে এগিয়ে এসে কাঁচের ঢাকনা তুলে ফেলে তার পকেট থেকে সেই ছোট্ট আধ ইঞ্চি সিরিঞ্জটা বার করে আমায় দিয়ে বলল, 'এত ছোট জিনিসটা তুমিই ভালো হ্যাণ্ডল করতে পারবে। এটা নিয়ে ফেলো।'

আমি আর দ্বিরুক্তি না করে ইঞ্জেকশনটা নিয়ে নিজের আয়তনে ফিরে এলাম। কিন্তু এই ওষুধ অ্যাক্রয়েড পেলো কী করে?

প্রশ্ন করতে অ্যাক্রয়েড আমার কাঁধে হাত দিয়ে আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেলো। সুইচ টিপতেই ঘরে আলো জ্বলে উঠল।

ঘরের মাঝখানে প্রায় ছাত অবধি উঁচু একটা বিরাট কাঁচের খাঁচা। পাশের ঘরের পুতুলের

খাঁচার মতই দেখতে কিন্তু ভিতরে বিখ্যাত মানুষের বদলে রয়েছে একটি অতিকায় ইঁদুর জাতীয় জানোয়ার।

আমি পরম বিস্ময়ে অসাড় জন্তুটির দিক থেকে অ্যাক্রয়েডের দিকে চাইতেই সে বলল—'বোধহয় অনুমান করতে পারছ জানোয়ারটা কি। এটা লেমিং-এর একটা অতিকায় সংস্করণ; আসল লেমিং-এর চেয়ে দশগুণে বড়। কিছুদিন থেকেই লিণ্ডকুইস্ট্ এই নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট করছে—বড় জিনিসের ছোট সংস্করণের মত ছোট জিনিসের বড় সংস্করণ জমিয়ে রাখার শখ হয়েছিল বোধ হয়। সফল যে হয়েছে সেটা কালকেই জানতে পেরেছিলাম হান্স-এর সঙ্গে লিণ্ডকুইস্টের কথাবার্তা থেকে। এবং ওই ওষুধই যে আমাদের আসল চেহারায় ফিরিয়ে আনতে পারবে, এটা তখনই আন্দাজ করেছিলাম।

আমি অন্যান্য পুতুলগুলো দেখিয়ে বললাম—'এদের কী হবে?'

অ্যাকরয়েড মাথা নেড়ে বলল, 'এদের ত আর কার্বোথীনের জামা ছিল না, তাই এরা মানুষ অবস্থায় আর বাঁচতে পারবে না। এদের মৃত বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। ··চলো, যাওয়া যাক।'

আমরা ঘোরানো সিঁড়ির দিকে রওনা দিলাম। অ্যাক্রয়েডকে গম্ভীর দেখে কেমন জানি সন্দেহ লাগল। জিজ্ঞেস করলাম—'তুমি কি দেশে ফিরে যাবে?'

অ্যাক্রয়েড দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আমার স্মৃতি সভা হয়ে গেছে তা জান? আমার স্ত্রী বিধবার পোষাক পরছে। আমার নামে আমার টাকা থেকে একটা স্কলারশিপ পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে। এই অবস্থায় দেশে ফিরে যাওয়া একটু বেখাপ্পা হবে না কি?'

'তাহলে তুমি কী করবে?'

'একটা কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেছে। লেমিংদের সঙ্গে এখনও ভালো পরিচয় হয়নি। আর কয়েক দিন পরেই ওদের সমুদ্রযাত্রা শুরু হবে। আমিও সেই দলে ভীড়ে পড়ব ভাবছি। একটা সামান্য প্রাণী যদি নির্ভয়ে সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে ত আমি পারব না কেন?'

১২ই জুন।

গিরিডিতে ফেরার চার ঘণ্টা পর এ ডায়ারি লিখছি। একটা কথা লেখা দরকার—কারণ সেটা এর আগের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। ফিরে আসার পর থেকেই লক্ষ্য করছিলাম আমার চাকর প্রহ্লাদ আমার দিকে বার বার কেমন যেন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখছে। এখন তার কারণটা বুঝতে পেরেছি। আমার যে জুতোটা গিরিডিতে রেখে গিয়েছিলাম, সেটা পরতে গিয়ে দেখি পায়ে ছোটো হচ্ছে। তারপর কালো কোটটা পরতে গিয়ে দেখি আস্তিনটা সামান্য ছোট। তখন আমার হাইটটা মাপতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হল।

লিণ্ডকুইস্টের ওষুধ আমাকে ঠিক আগের আয়তনে ফিরিয়ে না এনে আমাকে আগের চেয়ে দু' ইঞ্চি লম্বা করে দিয়েছে।

বন্দী-দশায় দিন কাটতে যে চায় না!
'ফাইলে'তে শিক কেটে পালান কি যায় না?

কার্টুন—অমল চক্রবর্তী

কাটাকাটি

বীরভদ্র

(সুবীর চট্টোপাধ্যায়)

মারামারি, কাটাকাটি, ছেলে বুড়ো জব্দ,
কথা কাটাকাটি সুরু, খট্ খট্ শব্দ।
কুট, কুট, কুট্ কুট, বই কাটে পোকারা,
বাজারেতে কাটে বই, কেনে সব বোকারা।
খদ্দের, খদ্দের, সাবধান ভাইরে।
দোকানী কাটবে গলা, চলে এসো বাইরে।
মাথা কাটে লজ্জায়, সে আওয়াজ শুনেছি।
সময় কাটে না তাই এক, দুই, গুণেছি।
সেই তুমি খাল কেটে, কুমীরটা আনলে,
শেষকালে জিব কেটে, সব দোষ মানলে।
জাবর কাটছে গরু, একমনে গোয়ালে,
সাঁতার কাটছে ভজা, কষে বেঁধে তোয়ালে।
সবেতে ফোঁড়ন কাটা ? এবারেতে থামবি ?
ছড়া কেটে গান গেয়ে একেবারে ঘামবি !
সিঁদ কেটে রাত্তিরে চুরি হলো, হায়রে।
তোর গানে রোজ রোজ তাল কেটে যায়রে।
আজে বাজে কথা বলে ঠোঁটকাটা ছেলেটা
একমনে সুতো কাটে ওপাড়ার কেলেটা।
আকাশেতে ঘুঁড়ি কাটে ভোকাটা এই তো,
ছুটে গিয়ে ধরবে কি, বড় দাদা নেই তো।
দুধটুকু কেটে গিয়ে হয়ে গেল ছানা যে,
ছোট বউ কোথা গেলে, কাটো সব আনাজে।
তোর মতো ঠোঁট কাটা আমি ভাই নই তো,
জাহাজটা জল কেটে, চলে গেল ঐ তো।
খস্ খস্ দিন কাটে, আসে বুঝি রাত্রি,
টিকিট কাটছে সব ট্রাম বাস যাত্রী।
ঝড়-জল থেমে গেলো মেঘ কাটে ভাইরে,
রবি মামা এলো বুঝি, কেটে পড়ি বাইরে।

রাবণ

উপেন্দ্রকিশোর রায়

একবার রাবণ মানুষ তাড়াইয়া ফিরিতে ফিরিতে দেখিল যে মেঘের উপর দিয়া নারদ মুনি হরিনাম গান করিতে করিতে আসিতেছেন। রাবণ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিল, 'ঠাকুর মহাশয় মঙ্গল ত? কি জন্য আসিয়াছেন?'

নারদ বলিলেন, 'আসিয়াছি সে বাপু, একটা কথা আছে। এই সব মানুষ যখন মৃত্যুর বশ, তখন এরা ত মরিয়াই রহিয়াছে; ইহাদিগকে মারিবার জন্য তুমি আবার এত পরিশ্রম কেন করিতেছ? ইহারা আপনা আপনিই একদিন যমের বাড়ি যাইবে! বাস্তবিক যমই যত নষ্টের গোড়া। অতএব, সেই বেটাকে যদি জব্দ করিতে পার, তবে সকলকেই জয় করা হইবে।'

রাবণ বলিল, 'বড় ভাল কথা বলিয়াছেন, ঠাকুর মহাশয় আমি এখনি যাইতেছি।' বলিয়াই আর এক মুহূর্তও দেরি নাই, অমনি রাবণ যমপুরীর পথ ধরিয়াছে। তখন নারদ ভাবিলেন, 'এবারে মজাটা হইবে ভাল। যাই, একবার দেখিয়া আসি।'

নারদ রাবণের আগেই গিয়া যমের নিকট উপস্থিত হইলেন। যম বিচারাসনে বসিয়া অগ্নি সাক্ষী করিয়া সকলের পাপ পুণ্যের বিচার করিতেছিলেন, নারদকে দেখিয়া ব্যস্তভাবে উঠিয়া নমস্কার-পূর্বক বলিলেন, 'মুনি ঠাকুরের আজ কি চাই?'

নারদ বলিলেন, 'সাবধান হও বাছা, রাবণ তোমাকে জয় করিতে আসিতেছে। মুস্কিল হইতে আটক নাই কিন্তু বেটা বড় বেখাপ্পা লোক।'

বলিতে বলিতেই রাবণের ঝকঝকে পুষ্পক রথও আসিয়া দেখা দিল! রথ হইতে নামিয়াই সে দেখিল যে নরকের কুণ্ডে দলে দলে পাপী সকল যমদূতগণের তাড়নায় চীৎকার করিতেছে। অমনি আর কথা বার্তা নাই,—সে যমদূতগুলিকে বিধিমতে ঠ্যাঙ্গাইয়া সকল পাপীকে ছাড়িয়া দিল। সে বেচারারা হঠাৎ ছাড়া পাইয়া যে কি আশ্চর্য আর খুসি হইল, তাহা আর বলিবার নয়। তখন যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, সে বড়ই ভয়ঙ্কর। যমপুরীতে অসংখ্য সিপাহী সান্ত্রী থাকে, তাহাদের এক একজন ভয়ানক যোদ্ধা। তাহারা রাবণ আর তাহার লোকগুলিকে মারিয়া রক্তারক্তি করিল। মার খাইয়াও কিন্তু রাবণ যুদ্ধ করিতে ছাড়ে না, শূল শক্তি প্রাস গদা গাছ পাথর কত যে ছুঁড়িল তাহার লেখা জোখা নাই। তখন যমের লোকেরা আর রাক্ষসকে ছাড়িয়া কেবল রাবণের উপরেই এমন ভয়ানক অস্ত্র বৃষ্টি করিতে লাগিল যে, তাহাতে পুষ্পক রথ অবধি ডুবিয়া গিয়া রাবণের দম আটকিয়া মরিবার গতিক। দুর্দশার একশেষ! রক্ত ধারায় দেহ ভাসিয়া গেল; কবচ কোথায় গিয়াছে তাহার ঠিক নাই। তখন কাজেই তাহাকে রথ হইতে নামিয়া আসিতে হইল।

এতক্ষণে আর রাবণের বুঝিতে বাকি রহিল না যে এবারে একটু বেগতিক, একটা বড় রকমের অস্ত্র না ছাড়িতে পারিলে আর চলিতেছে না। কাজেই সে তখন ধনুকে পাশুপত অস্ত্র যুড়িয়া যমের লোক-দিগকে বলিল, 'দাঁড়া বেটারা, এবারে তোদের দেখাইতেছি।' এই বলিয়া সে সেই ভয়ঙ্কর অস্ত্র ছাড়িবা মাত্রই, তাহার তেজে যমের সকল সিপাহী ভস্ম হইয়া গেল। তখন রাবণের আর রাক্ষসগণের সিংহনাদে ব্রহ্মাণ্ড ফাটে আর কি?

সেই সিংহনাদ শুনিয়াই যম বুঝিতে পারিলেন যে রাক্ষসদিগের জয় হইয়াছে। তখন কাজেই রথে চড়িয়া তাঁহাকে স্বয়ংই বাহির হইতে হইল। সে যে কি ভয়ঙ্কর রথ সে কথা আমি বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। তাহার উপর আবার স্বয়ং মৃত্যু প্রাস আর মুদ্গর লইয়া ভীষণ বেগে যমের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, কালদণ্ড প্রভৃতি ভয়ঙ্কর অস্ত্রসকল ধূ-ধূ করিয়া জ্বলিতেছে।

সেই রথ আর তাহার ভিতর মৃত্যুকে দেখিয়াই রাবণের লোকেরা 'বাপরে। আমাদের যুদ্ধে কাজ নাই' বলিয়াই উর্দ্ধশ্বাসে চম্পট দিল। কিন্তু রাবণ তাহাতে ভয় না পাইয়া যমের সঙ্গে খুবই যুদ্ধ করিতে লাগিল। অস্ত্রের ভয় ত তাহার নাই, কারণ সে জানে সে ব্রহ্মার বরের জোরে সে মরিবে না! কাজেই অনেক খোঁচা যেমন খাইল, খোঁচা দিলও ততোধিক। খোঁচা খাইয়া যম রাগে অস্থির হইয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখ দিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল।

তখন মৃত্যু যমকে বলিল, 'আমাকে আজ্ঞা করুন আমি এই দুষ্টকে মারিয়া দিতেছি। আমি ভাল করিয়া তাকাইলে আর ইহাকে এক মুহূর্তও বাঁচিতে হইবে না।' যম বলিলেন, 'দেখ না, আমি ইহাকে কি সাজা দিই।' এই বলিয়াই তিনি রাগে দুই চোখ লাল করিয়া তাঁহার সেই ভীষণ 'কালদণ্ড' হাতে নিলেন। সে দণ্ড যাহার উপর পড়ে তাহার আর রক্ষা থাকে না।

যমকে কালদণ্ড তুলিতে দেখিয়া ভয়ে সকলের প্রাণ উড়িয়া গেল, কে কোন দিক দিয়া পালাইবে তাহার ঠিক নাই, দেবতাদের অবধি বুক ধড়াস ধড়াস করিতেছে। তখন ব্রহ্মা নিতান্ত ব্যস্তভাবে ছুটিয়া যমকে বলিলেন 'সর্বনাশ, কর কি? এই কালদণ্ড তুমি ছুঁড়িলেই যে আমার কথা মিথ্যা হইয়া যাইবে। কালদণ্ডত আমিই গড়িয়াছি রাবণকেও আমি বর দিয়াছি। আমিই বলিয়াছি যে কালদণ্ড কিছুতেই ব্যর্থ হইবে না। আবার আমিই বলিয়াছি যে রাবণ কোন দেবতার হাতে মরিবে না। এখন এই অস্ত্রে যদি রাবণ মরে, তাহা হইলেও আমার কথা মিথ্যা হয়, যদি না মরে তাহা হইলেও আমার কথা মিথ্যা হয়। লক্ষীটি আমার মান রাখ, এ অস্ত্র তুমি ছুঁড়িয়ো না।'

কাজেই যম তখন আর কি করেন? তিনি বলিলেন 'আপনি হইতেছেন আমাদের প্রভু সুতরাং হুকুম মানিতেই হইবে। কিন্তু যদি এ দুষ্টকে মারিতেই না পারিলাম, তবে আর আমার এখানে থাকিয়াই কি ফল?' এই বলিয়া যম সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া রাবণ হাত তালি দিয়া নাচিতে নাচিতে বলিল 'দুয়ো! দুয়ো! হারিয়া গেলি।' ততক্ষণে অন্য রাক্ষসদেরও খুবই সাহস হইয়াছে, আর তাহারা আসিয়া 'জয় রাবণের জয়।' বলিয়া আকাশ ফাটাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

ব্রহ্মার কথায় যম যুদ্ধ ছাড়িয়া দিলেন। রাবণ ভাবিল, সেটি তাহার নিজেরই বাহাদুরী। তখন আর তাহার গর্বের সীমাই রহিল না। সে বাছিয়া বাছিয়া বড় বড় যোদ্ধাদের সহিত বিবাদ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বরুণের পুত্রগণ তাহার নিকট হারিয়া গেলেন, বরুণ নিজে ব্রহ্মার বাড়িতে গান শুনিতে যাওয়ায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, তাই তাঁহার মান বাঁচিল। সূর্য যুদ্ধ না করিয়াই বলিলেন, 'আমি হার মানিতেছি।' রাবণের ভগ্নিপতি বিদ্যুজ্জিব বেচারিও তাহার হাতে মারা গেল।

কিন্তু সকল জায়গায়ই যে রাবণ বাহাদুরী পাইয়াছিল তাহা নহে। বলির বাড়িতে গিয়া সে অনেক বড়াই করিয়াছিল। বলি তাহাকে ধরিয়া নিজের কোলে বসাইয়া বলিলেন 'কি চাও বাপু?' রাবণ বলিল, 'শুনিয়াছি বিষ্ণু নাকি আপনাকে আটকাইয়া রাখিয়াছেন। আমি আপনাকে ছাড়াইয়া দিতে পারি।'

একথা শুনিয়া বলির ভারা হাসি পাইল। তারপর তিনি কথায় কথায় তাহাকে বলিলেন, 'ঐ যে ঝকঝকে চাকাটি দেখিতেছ ওটি আমার কাছে লইয়া আইস ত।' এ কথায় রাবণ নিতান্ত অবহেলার সহিত গিয়া সেই জিনিষটি উঠাইল, কিন্তু কিছুতেই সেটিকে লইয়া আসিতে পারিল না। সে লজ্জিত হইয়া প্রাণপণে টানাটানি করিতে করিতে শেষে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল।

খানিক পরে রাবণের জ্ঞান হইয়াছে, কিন্তু তখন আর লজ্জায় বেচারা মাথা তুলিতে পারে না। তখন বলি তাহাকে বলিলেন, 'এই চাকাটি আমার পূর্বপুরুষ হিরণ্যকশিপুর কুণ্ডল।'

আর একবার রাবণ পশ্চিম সমুদ্রে গিয়া একটি দ্বীপে আগুনের মত তেজস্বী এক ভয়ঙ্কর পুরুষকে দেখিল। তাঁহাকে দেখিয়াই রাবণ বলিল, 'যুদ্ধ দাও।' তারপর সে তাঁহাকে কত শূল, কত শক্তি, কত ঋষ্টি, কত পট্টিলের ঘা মারিল, কিন্তু তাঁহার কিছুই করিতে পারিল না। তখন সেই ভয়ঙ্কর পুরুষ রাবণকে টিকটিকিটির মতন ধরিয়া দুহাতে এমনি চাপিয়া দিলেন যে তাহাতেই তাহার প্রাণ যায় যায়। তারপর তিনি তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া পাতালে চলিয়া গেলেন। কিঞ্চিৎ পরে রাবণ উঠিয়া রাক্ষসদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, 'সেই ভয়ঙ্কর লোকটা কোথায় গেল?' রাক্ষসেরা একটা গর্ত দেখাইয়া বলিল, 'সে ইহারই ভিতরে ঢুকিয়া গিয়াছে।' অমনি রাবণও তাড়াতাড়ি সেই গর্তের ভিতর ঢুকিল। তারপর পাতালের মধ্যে খুঁজিতে খুঁজিতে এক জায়গায় গিয়া দেখিল সেই মহাপুরুষ একটা খাটের উপর ঘুমাইয়া আছেন। সেখানে গিয়া রাবণ সবে দুষ্ট ফন্দি আঁটিতেছে, এমন সময় ভয়ঙ্কর পুরুষ হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন, আর তাহাতেই রাবণ কানে তালা লাগিয়া মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। তখন ভয়ঙ্কর পুরুষ তাহাকে বলিলেন, 'আর কেন? এই বেলা চলিয়া যাও। ব্রহ্মা তোমাকে অমর হইবার বর দিয়াছেন। কাজেই তোমাকে বধ করা হইল না।' সেই ভয়ঙ্কর পুরুষ ছিলেন ভগবান কপিল।

আর একবার রাবণ গিয়াছিল মাহিষ্মতীর রাজা অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে। মাহিষ্মতীতে

গিয়া সে অর্জ্জুনের মন্ত্রীদিগকে বলিল 'তোমাদের রাজা কোথায়? আমি তাহার সহিত যুদ্ধ করিব।' মন্ত্রীরা বলিলেন তিনি বাড়ি নাই।

এ কথায় রাবণ সেখান হইতে বিন্ধ্য পর্বতে চলিয়া আসিল। বিন্ধ্য অতি সুন্দর পর্বত। সেই পর্বতের নীচ দিয়া নর্মদা নদী বহিতেছে, তাহার শোভা দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। এমন নির্মল জল, এমন শীতল বায়ু, এত রকমের ফুল আর অতি অল্প স্থানেই আছে। রাবণ মনের সুখে সে জলে নামিয়া স্নান করিল।

ঠিক সেই সময়ে একটা ভারী আশ্চর্য ঘটনা ঘটিতেছিল। নর্মদার জল স্বভাবতই পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে বহিয়া থাকে, কিন্তু সেদিন দেখা গেল যে তাহা এক একবার হঠাৎ উঁচু হইয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে ফিরিয়া আসিতেছে। ইহাতে রাবণ যারপরনাই আশ্চর্য হইয়া শুক সারণকে বলিল, 'দেখ ত ব্যাপারটা কি।'

শুক সারণ তখনই পশ্চিম দিকে চলিয়া গেল, আর, খানিক পরেই ব্যস্ত ভাবে ফিরিয়া আসিয়া বলিল মহারাজ, প্রকাণ্ড শাল গাছের মত উঁচু একটা লোক নর্মদায় নামিয়া স্নান করিতেছে। উহার এক হাজারটা হাত। সেই হাজার হাতে সে এক একবার নদীর জল আগলাইয়া ঠেলিয়া দিতেছে, আর তাহাতেই সে জল এত উঁচু হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

এ কথা শুনিয়া রাবণ বলিয়া উঠিল—'অর্জ্জুন'। তার পর আর এক মুহূর্তও বিলম্ব না করিয়া অমনি গদা ঘুরাইতে ঘুরাইতে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে চলিল। অর্জ্জুনের লোকেরা তাহাকে আটকাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু রাক্ষসেরা তাহাদিগকে মারিয়া ধরিয়া গিলিয়া খাইয়া নাকাল করিয়াছিল।

অর্জ্জুন এ কথা শুনিতে পাইয়া বিশাল গদা হাতে ছুটিয়া আসিলেন। রাক্ষসেরা তাঁহাকে বাধা দিয়াছিল, কিন্তু সেই গদার সম্মুখে তাহারা কিছুতেই টিকিতে না পারিয়া শেষে ছুটিয়া পালাইল। তখন রাবণ আর অর্জ্জুনের যে যুদ্ধ হইল, সে বড়ই ভয়ানক। দুজনেরই যেমন বিশাল দেহ, হাতে তেমনি ভীষণ গদা। রাবণ ভয়ানক তেজের সহিত অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু শেষে অর্জ্জুনের গদার ঘায়ে অস্থির হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বসিয়া পড়িল। অর্জ্জুন ও অমনি তাহাকে ধরিয়া এমনি বাঁধন বাঁধিলেন যে সে কথা আর বলিবার নয়; তাহা দেখিয়া দেবতাগণের কি আনন্দই হইল। তাঁহারা যে যত পারিলেন, অর্জ্জুনের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করিলেন।

এদিকে রাক্ষসেরা আসিয়া অর্জ্জুনের হাত হইতে রাবণকে ছাড়াইয়া নিতে কত চেষ্টাই করিল, কিন্তু সে কি তাহাদের কাজ? অর্জ্জুন তাহাদিগকে বিধিমতে ঠেঙ্গাইয়া রাবণকে লইয়া ঘরে চলিয়া গেলেন।

এখন রাবণের ত আর সঙ্কটের সীমাই নাই, এ সঙ্কট হইতে তাহাকে কে বাঁচায়? বাঁচাইবার লোক একটি মাত্র আছেন, তিনি হইতেছেন উহার পিতামহ পুলস্ত্য মুনি। মুনি ঠাকুর নাতির মায়া এড়াইতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন, 'বাছা, আমার

নাতিটিকে ছাড়িয়া দাও। উহাকে যে সাজা দিয়াছ তাহাতেই তোমার খুব নাম হইবে, আর উহাকে রাখিয়া লাভ কি?'

এ কথায় অর্জুন খুসি হইয়া তখনই রাবণকে ছাড়িয়া দিলেন; সে লজ্জায় মাথা হেট করিয়া চোরের মত সেখান হইতে চলিয়া আসিল। কিন্তু দুষ্ট লোকের লজ্জা আর কতকাল থাকে? দু দিন পরেই দেখা গেল যে, রাবণ আবার রাজাদিগকে খোঁচাইয়া ফিরিতেছে—

সমাপ্ত
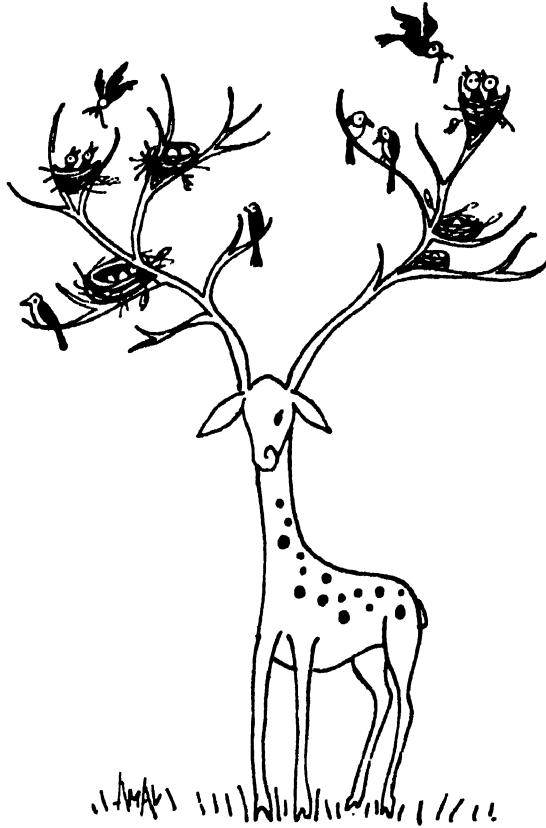
ছড়াছড়ি

গৌরী চৌধুরী

মাচার ওপর কুমড়ো লতা
উচ্ছে গাছে ফুল।
লাল টুকটুক ধানি লঙ্কা
ওলকপি ধুঁধুল।
তিন কুড়ি ছয় ঝুলছে ঝিঙে
সজনে গাছে নাচছে ফিঙে।
পল্‌তা-পাতা পটোল-পুঁই
কাগজি লেবু হাজার দুই।
পাড়ার ছেলে বেড়ার ধারে
আঁকশি দিয়ে আমড়া পাড়ে।
বরবটি-সিম-ট্যাড়স-বিন
মুটোচ্ছে লাউ দিন-কে-দিন।
বেগুনপাতা খসখসে
কাঁঠালগুলো থসথসে
পড়ছে ডুমুর
টাপুর-টুপুর
আলু মুলো
ফুলো ফুলো
হচ্ছে ঢ্যাঙা
ঐ চিচিঙ্গা
বাড়ছে শুঁটি
গুটি গুটি
পেঁপের কাঁদি
গাদাগাদি
দিচ্ছে উঁকি
ফুলকপি কি?

কাঁচকলা-থোড়-মোচার ঝাঁক
একটি গাছে তিনটি থাক।

করমচা আর কামরাঙা
তোমরা নিও, আমরা না।

টমেটোর টেবো গাল টিপেটুপে দেখ্ না
বাঁধাকপি এইবেলা বেঁধে-বুঁধে রাখ্ না।

খুরপিতে ধার দে
বুঝে-সুজে সার দে
পোকাদের মার দে।

আর কেঁদ না আর কেঁদ না
গাছে গাছে ফলবে সোনা।
তুমিও খাবে, আমিও খাব
সবাই মিলে বেড়াতে যাব॥

(পূর্বপ্রকাশিত অংশের চুম্বক)

পৃথিবীর আসন্ন প্রলয়ের সম্ভাবনায় কয়েক লক্ষ লোক মহাকাশ যান করে অন্য এক সূর্যমণ্ডলীতে অনেকটা পৃথিবীর মত এক গ্রহে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। এই ঘটনার ছশো বছর পরে সেই গ্রহের চারটি ছেলে প্রশান্ত, চিয়েন মরিশ ও ফিসার প্রফেসার সোমোরেনের সঙ্গে এক অভিযানে যোগ দিয়ে মহাকাশ যানে পুরোনো পৃথিবীতে ফিরে এল। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সূর্যের তেজ কমে যাওয়াতে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণের হিম অঞ্চল অনেক বেশি বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। নিচে অনেক জায়গায় সহরের ধ্বংসাবশেষ ও অগ্ন্যুৎপাতের চিহ্ন দেখা গেল। তবে মরিশ আর ফিসার আশা করছে যে মাটিতে নামলেই তারা এ জগতের অধিবাসীদেরও দেখতে পাবে।

১৬

সমস্তক্ষণই চারপাশের বাতাসের রাসায়নিক পরীক্ষা চলছে, বিপজ্জনক কোনো কিছুর আভাস মাত্রও পাওয়া যায় নি, তবে এই পঞ্চাশ মাইল উচুতে মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাসের উপযোগী বাতাস অবশ্য থাকে না। ডাক্তার প্যাপেন, ডাক্তার রোমানভ, প্রফেসার সোমোরেন, প্রফেসার হ্যারল্ড ও অন্যান্য অনেকেই এখন শুধু একটা বিষয় নিয়েই আলোচনা করছেন—নিচের পৃথিবীতে এখনও মানুষ বেঁচে আছে কি না আর বেঁচে থাকলে কি অবস্থায় বেঁচে আছে।

এঁদের কারোর কারোর মতে এখন এখানে মানুষ যদি বেঁচে থাকত তাহলে এই রকম একটা অচেনা অজানা যান আকাশে ঘুরছে দেখেও নিচ থেকে এর সন্ধান নেবার কোনো চেষ্টারই চিহ্ন এখন পর্যন্ত কারোর-নজরে পড়েনি কেন। দুএকজন বললেন এও হতে পারে যে যারা বেঁচে আছে, তাদের সভ্যতা এত

নিচু স্তরের হয়ে পড়েছে যে তারা পঞ্চাশ মাইল উপরে আকাশে যে নতুন একটা কিছু হচ্ছে তার সন্ধানই পায় নি।

প্রফেসার হ্যারল্ড তখন বললেন—আরও ২৫।৩০ মাইল নিচে নেমে এই পৃথিবীর বিষুবরেখার কাছাকাছি না গেলে প্রশ্নের মীমাংসা হবে না, কারণ খুব সম্ভবই উত্তর দক্ষিণের এই ভীষণ ঠাণ্ডার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য, মানুষ এখন বিষুবরেখার কাছাকাছি অঞ্চলগুলিতে বাস করে।

প্রফেসার সোমোরেন বললেন—যদি বা দক্ষিণের পার্বত্য অঞ্চলে মানুষ থেকে থাকে, তাহলে এমনও হতে পারে যে শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্য পাহাড় কেটে মাটির তলায় সহর বানিয়ে থাকে আর বাইরে থেকে জানা না থাকলে, তাদের অস্তিত্বই বোঝা যায় না। মাটির নিচ থেকে হয়ত ওরা আমাদের খবর ঠিকই রাখছে, আমরা কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। এ রকম হলে অবশ্য মাটিতে না নেমে এখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে আলাপ হবার কোনোই সম্ভাবনা নেই। কাজেই আমারও মনে হয় আরও নিচে নেমে আরও বিষুবরেখার কাছ বরাবর যানটি চালালে নিশ্চয়ই আমরা এখানকার লোকদের সন্ধান পাব।

কাজেই এঁদের সবার পরামর্শে আমাদের যানটিকে আরও নিচে নামানো হল, এবার মাটি থেকে মোটে দশ মাইল উপরে যানটিকে রাখা হল। তখন আরও বিষুব রেখার কাছ বরাবর এনে ৩৭°৩০′ অক্ষাংশের উপর দিয়ে ভূপৃষ্ঠের সমান্তরাল ভাবে যানটি চালানো হল। প্রফেসার সোমোরেন আবার একটা পুরা পাক দেবেন ঠিক করেছেন। এবারও কিছু দেখতে না পেলে সুবিধা মতন জায়গা দেখে যানটিকে মাটিতে নামানো হবে আর তখন চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখা হবে।

নিচেই সমুদ্র দেখা গেল, অল্পক্ষণ পরেই সমুদ্র উপকূল থেকে কিছুটা ভিতরে একটা বড় সহরও দেখা গেল আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের টেলিভিসোফোন বেজে উঠল। নানা রকম সংকেত আসতে লাগল, কিন্তু কোনো সাংকেতিক ভাষাই আমরা বুঝতে পারলাম না। আমরাও কয়েকবার সংকেত করলাম কিন্তু আমাদের চেষ্টাও বিফল হল।

আমাদের যানটির গতিবেগ আর কমানো হল না, নিচে নামা হবে কিনা চিন্তা করা হচ্ছিল, এমন সময় নিচে থেকে কয়েকটি উড়োজাহাজ আমাদের কাছে এসে গেল আর আমাদের নিচে নামতে ইঙ্গিত করে একটা নেমে গেল, অন্যগুলি থেকে কয়েকবার নানারকম সংকেত আসতে লাগল।

ছোট ছোট যান, পাঁচ ছ জনের বেশি এক একটায় চড়তে পারে বলে মনে হয় না আর উপরে ওঠার গতিবেগ দেখে বোঝাই গিয়েছিল এগুলির গতিবেগ আমাদের কাছে একেবারে নগণ্য।

প্রফেসার সোমোরেন তখন নামতে সুরু করলেন। নিচেই ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ড্ দেখা যাচ্ছে, সেটাতে আমরা খাড়া নেমে এলাম। ইতিমধ্যে পুরোনো মানচিত্র দেখে ডাক্তার প্যাপেন সাব্যস্ত করেছেন যে নিচের সহরটি খুব সম্ভবই পুরাকালের সানফ্রান্সিকো সহর। যে উড়োজাহাজগুলি এতক্ষণ আমাদের কাছাকাছি ঘুর ঘুর করছিল সেগুলি অল্প দূরে নামল।

এতক্ষণে প্রথম উড়োজাহাজের লোকেরা তাদের যানটি থেকে বেরিয়ে এসেছে। তাদের চেহারা

আমাদেরই মতন দেখে, প্রফেসার সোমোরেনের কথামত প্রফেসার হ্যারল্ডের সঙ্গে হ্যারিশ, নিকলসন, মরিশ, ফিসার ও আরও কয়েকজনের সঙ্গে আমিও আমাদের যানটি থেকে মাটিতে নেমে পড়লাম।

এতদিন পরে পায়ের তলায় মাটির স্বর্গ পেয়ে কি আনন্দ হল কি বলব। এইবার বুঝতে পারলাম কবিরা মাটি নিয়ে কেন এত মাতামাতি করেন। আজ তাঁদের কোনো কথাই অবাস্তব বলে মনে হচ্ছিল না, তবে অবাক হয়ে ভাবছিলাম যে চিরটাকাল মাটির উপরে থেকে, মাটির স্পর্শ থেকে বঞ্চিত না হয়েও তাঁরা এমন করে এর মাধুর্য কি করে অনুভব করলেন।

যানটি থেকে নেমে ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ডের পাশে একটা বড় বাড়ি দেখতে পেয়ে তার কাছে এসে দাঁড়ালাম। সামনে তাকিয়ে দেখি বেশ কয়েক শ' লোক জমে গেছে বাড়িটার চারপাশে। এদের মধ্যে থেকে দিব্য লম্বা চওড়া একজন ভদ্রলোক আমাদের কাছে এগিয়ে এসে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন বলেই মনে হল।

ভাষাটাও জানা বলেই মনে হচ্ছিল কিন্তু উচ্চারণের জন্যই অথবা অন্য কোন কারণের জন্যই হোক প্রথমটা যখন তাড়াতাড়ি কথা বলছিলেন তখন কিছুই বুঝতে পারছিলাম না, তবু কেন জানি মনে হচ্ছিল এ ভাষাটা বোঝা উচিত ছিল। এর পরে যখন তিনি আবার আস্তে আস্তে কথা বলতে আরম্ভ করলেন, তখন দেখলাম কিছু কিছু কথা বুঝতে পারছি আর এটা আমার জানা ভাষা।

প্রফেসার হ্যারল্ড আমাদের মুখপাত্র হয়ে এগিয়ে গিয়ে কথা বলতে সুরু করলেন। আমি লক্ষ্য করলাম ওঁরা দুজনেই বেশ থেমে থেমে কথা বলছেন। নিকলসন আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিল ও আমাকে বলল—শোন ভাল করে আমার, মরিশের, হ্যারিশের বা প্রফেসার হ্যারল্ডের মাতৃভাষার সাবেক রূপ। এই হ'ল পুরাকালের ইংরাজী, অবশ্য গত ২০০ বছরে এখানেও এর রূপ অনেকটা বদলিয়ে গিয়েছে। তাছাড়া আমাদের জগতেও এই ২০০ বছরে কথ্য ভাষার রূপ আরো অনেক বেশী বদলিয়ে গিয়েছে, তাই প্রথমটা কথাবার্তা বলতে আর বুঝতে একটু কষ্ট হচ্ছে।

মরিশের সঙ্গে ওদের বাড়িতে কতবার গিয়েছি, ওদের নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা কত শুনেছি। আমি নিজেও ওদের ভাষায় কত কথাবার্তা বলেছি, কাজেই ইংরাজী ভাষাটা আমার বেশ জানা আছে। তবে এখানকার উচ্চারণ অন্য রকম, তাই প্রথমটা ঠিক বুঝতে না পারলেও ভাষাটা জানা বলে মনে হচ্ছিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের সবার পরিচয় দেওয়া হয়ে গেল, এদের দলপতি কর্ণেল লিস্টার ও আরও দুতিন জন লোক প্রফেসার হ্যারল্ডের সঙ্গে আমাদের যানটির ভিতর ঢুকে গেলেন, বাদ বাকি আমাদের সেই বড় বাড়িটার ভিতরে একটা বড় ঘরে নিয়ে গেলেন।

সেখানে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই নানারকম খাবারের গন্ধ নাকে আসতে লাগল আর সামনে সরু লম্বা দু সারি টেবিল আর তার দুপাশে চেয়ারের সারি দেখেই বুঝতে পারলাম খাবার ঘরে এসে পৌঁছেছি। তক্ষুনি যেন রাক্ষুসে খিদে জেগে উঠল, বছর খানেক ধরে খেয়েছি শুধু বড়ি আর বড়ি, এইবার খানা খাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে।

আমাদের সেখানে বসতে বলার সঙ্গে সঙ্গেই এক পেয়ালা করে কফি সামনে এসে হাজির হল। আমরা যে রকম কফি খেয়ে অভ্যস্ত তা থেকে অনেকটা কড়া আর আলাদা ভাবে দুধ আর চিনি দিয়ে গেল, যে যার পছন্দ মতন নাও।

কফি খাওয়া শেষ হবার আগেই দেখি প্রফেসার সোমোরেন আর অন্যান্য সকলেই কর্ণেল লিস্টারের সঙ্গে এসে হাজির। কর্ণেল লিস্টার ঘরে ঢুকেই একজনকে ডেকে বললেন, দেখ, এঁরা, সবাই এক বছর ধরে খালি বড়ি খেয়ে কোটি কোটি মাইল দূরের অন্য এক জগত থেকে আমাদের এখানে এসে পৌঁছেছেন। আমাদের এখনকার খাবার ভাল করে খাইয়ে দাও, নইলে এই পুরোনো পৃথিবীর নিন্দে হবে। এই বলে তিনি প্রফেসার সোমোরেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বললেন 'একটা অত্যন্ত জরুরী কাজের জন্য আমাকে এখুনি চলে যেতে হচ্ছে, তা না হলে এই রকম একটা ঐতিহাসিক মিলনী সভা ছেড়ে আমি কখনই যেতাম না। এই কাজের জন্য অন্য একটা সহরে যেতে হবে আর সেখানকার সমস্ত ব্যবস্থা অনেক দিন আগে থেকে আমিই উদ্যোগী হয়ে করিয়ে রেখেছি সেজন্য সেখানে না গেলেই নয়। আমি অনেক আগেই চলে যেতাম তবে আপনাদের যানটি নজরে পড়ে যাওয়াতে এতক্ষণ এখানে আটকা পড়েছিলাম। গিয়ে অন্যান্য লোকদের উপর সব কাজের ভার চাপিয়ে দিয়েই চলে আসব। ইতি মধ্যে আপনাদের খবর চারিদিকে রটে যাবে, কাজেই আমার ফিরে আসাটা সোজা হবে।'

এই বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন, কিন্তু অন্য যাঁরা রইলেন তাঁদের আদর আপ্যায়নে প্রায় হাঁপিয়ে উঠতে হল। সে সমস্ত খাবারদাবার সামনে এনে হাজির করতে লাগলেন তার সদ্ব্যবহার যে খুব ভাল ভাবেই হল সে কথা বলা বাহুল্য। এতদিন পরে বড়ির বদলে এই সব খাওয়া, তার উপর রান্নাটাও নতুন ধরণের, খুব সুস্বাদু আর দু একটা খাবার জিনিস ত একেবারে নতুন। যাঁরা সঙ্গে ছিলেন তাঁরা সব কিছু বলে বলে দিচ্ছিলেন, আরও খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন।

বাইরে থেকে একটা চাপা গুঞ্জন কানে আসছিল, এতক্ষণ খেতে ব্যস্ত ছিলাম বলে অন্য কোনো দিকে নজর দেবার অবকাশ হয় নি। খাওয়া শেষ করে এবার খোলা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে চক্ষুস্থির হয়ে গেল—ওরে বাবা, যেদিকে তাকাই শুধু মাথা আর মাথা।

চমক ভাঙলে পর বুঝতে পারলাম আমাদের আগমনের খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং আমাদের দেখতেই সবাই এখানে এমন ভিড় করছে। অল্পক্ষণ পরেই একজন ভদ্রলোক এসে প্রফেসার সোমোরেনকে বললেন 'আপনি সকলকে নিয়ে যদি বাইরে না আসেন, তাহলে আমরা ভিড় সামলাতে পারব না। কয়েক হাজার লোক জড় হয়েছে, সকলেই আপনাদের দেখতে চাইছে। এরোড্রোমের কর্মচারীরা কিছুতেই তাদের আটকিয়ে রাখতে পারছেন না, সকলেই খাবার ঘরে ঢুকে আসতে চাইছে।'

এই কথা শুনে আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। খোলা মাঠে না গিয়ে এঁরা আমাদের একটা উঁচু বারান্দায় নিয়ে গেলেন। সেখানে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই চারদিকের লোকজনেরা হৈ হৈ করে উঠল। প্রফেসার হ্যারল্ড রেডিও ভিসোফোনের মতন দেখতে একটা যন্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে সকলকে

শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন 'সেই দুশ' বছর আগে যাঁরা এই পৃথিবী ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন আমরা তাঁদেরই বংশধর ; তখনকার তৈয়ারী একটি যানে চড়েই আবার আমরা এখানে এসেছি। নতুন জগতে গিয়ে সব কিছুই একেবারে নতুন করে গড়ে তুলতে হয়েছিল বলে, এতকাল কেউ এখানে আবার আসবার চেষ্টা করতে পারেন নি। এতদিনে সেখানে জীবন যাত্রার প্রয়োজনীয় সব কিছুর ব্যবস্থা হয়ে যাওয়াতে আমরা এখানে আসবার চেষ্টা করি আর ভগবানের আশীর্বাদে আমাদের প্রথম চেষ্টাই সফল হয়েছে। যখন আমরা এখানে এসে পৌঁছেছি, তখন এখানকার যা কিছু দর্শনীয় আছে সব কিছু দেখে ফিরে যাবার ইচ্ছা আছে। তার আগে আমাদের দিয়ে যদি আপনাদের কোন কাজের সাহায্য হয় তাহলে নিজেদের ধন্য মনে করব'।

এই ক'টি কথা বলে প্রফেসার সরে দাঁড়ালেন আর চারদিক থেকে হাততালির শব্দে কানে তালা লাগার অবস্থা হল—কত ফটোগ্রাফার যে এসে আমাদের ফোটো তুলল তার ঠিক ঠিকানা নেই। আস্তে আস্তে ভিড় কমতে লাগল, তখন দেখতে পেলাম যে আমাদের যানটির চারপাশে পাহারা মোতায়েন রয়েছে যাতে তার কোন ক্ষতি না হয়।

এর কিছুক্ষণ পরেই কর্ণেল লিস্টার ফিরে এসে খবর দিলেন 'এই সহরের বিশেষ সম্মানিত অতিথি হিসাবে আপনাদের এখানকার একটা হোটেলে থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে এবং আপনাদের সকলকে সেখানে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি এসে গেছে, আপনারা আমাদের সঙ্গে চলুন। দেখতেই পাচ্ছেন যানটির জন্য পাহারার ব্যবস্থা রয়েছে, নিশ্চিন্ত মনে হোটেলে চলুন'।

একটা বড় গাড়ি করে আমরা তাঁর সঙ্গে চললাম, রাস্তাগুলির দুধার লোকে ঠাসা, সকলেই আমাদের দেখে হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাতে লাগল। প্রকাণ্ড এক হোটেলের সামনে এসে গাড়ি থামল, এই রকম বিরাট হোটেল আমাদের দেশে একটাও নেই।

পাঁচতলার উপর আমাদের থাকবার ব্যবস্থা, সে এক রাজসিক ব্যাপার। আমাদের জগতে এর থেকে অনেক সাধারণ ভাবেই আমরা থাকতে অভ্যস্ত। একটুক্ষণ বিশ্রাম করার পর আমরা কয়েকটা দলে ভাগ হয়ে পড়লাম আর এক একটা দল যে যে বিষয়ে পারদর্শী সেই বিষয়ের গবেষণাগারে কাজ দেখতে চলে গেলেন। শুধু আমরা কয়েকজন অন্য কোথাও না গিয়ে সহরটা ঘুরে দেখতে লাগলাম।

চারদিক ঘুরতে ঘুরতে শেষে সমুদ্রের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। এদিকটায় লোকজনের বসবাস নেই বললেই হয়। বেশির ভাগ বাড়িই ভাঙ্গাচোরা অবস্থায় পড়ে আছে দেখে আশ্চর্য হওয়াতে যিনি আমাদের নিয়ে সব দেখাচ্ছিলেন তিনি বললেন—'২০০ বছর আগে সেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ২০০।২৫০ ফুট উঁচু সমুদ্রের ঢেউ বারবার এসে এদিকটাকে ভেঙ্গে একেবারে তছনছ করে ফেলে আর হাজার হাজার লোক মারা যায়। এর সঙ্গে আবার ঘন ঘন ভূমিকম্পও হয়েছিল, তার ফলে এদিককার সব ঘর বাড়ি ভেঙ্গে ধসে পড়ে। সহরের এদিকটা আমরা আর নতুন করে না গড়ে সেই দুর্যোগের স্মৃতি হিসাবে রেখে দিয়েছি।'

তারপর আরো বললেন, 'এই সহরের শ' দেড়েক মাইল দূরে উত্তর-পূব অঞ্চলে একটা সুপ্ত

অগ্নেয়গিরি ছিল, সেটাও হঠাৎ সক্রিয় হয়ে ফেটে গেল, সেখান থেকে ভীষণ লাভা স্রোত বেরিয়ে আশেপাশের কয়েক শ' বর্গমাইল জমি চাপা দিয়ে ফেলল। কয়েক মাস ধরে এই রকম তাণ্ডব প্রায় সারা পৃথিবী জুড়েই চলেছিল। তারপর এল শীতের পালা, সুর্যের চারদিকে একটা ধুলোর আবরণ পড়ে যাবার জন্য রোদের তেজ অনেক কমে গেল ; উত্তর থেকে হিমবাহ নেমে এসে দেখতে দেখতে উত্তর আমেরিকার অর্ধেকের উপর বরফে ঢেকে ফেলল। প্রচণ্ড শীতের হাত থেকে উদ্ধার পাবার আশায় অনেক লোক দক্ষিণে বিষুব রেখার কাছাকাছি অঞ্চলে চলে গেল। প্রথম প্রথম কাজ করার লোকের অভাব হয়ে পড়েছিল, যাঁরা বেঁচে ছিলেন তাঁরাও সেই প্রচণ্ড দুর্বিপাকে পড়ে একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন। ক্রমে ক্রমে সবই সহ্য হয়ে গেল, মানুষ আবার ভালোভাবে বাঁচবার চেষ্টা করতে লাগল। অনেক কিছুই নতুন করে গড়ে নিতে হল, অনেক বছর কেটে গেল। এখনও মাঝে মাঝে ভূমিকম্প হয়, তবে সে সব আগের মতন ভীষণ রূপ আর নেয় না।

এঁরা আমাদের প্রায় শ' দেড়েক মাইল দক্ষিণ পর্যন্ত বেড়িয়ে আনলেন। এদিকে ঠাণ্ডা অনেক কম, ফুলে ফলে ক্ষেত খামারে, চাষ আবাদে ভরা। উত্তরে ঐ বরফের দেশ দেখার পর এদিকটা বড় ভালো লাগল। সন্ধ্যাবেলা আমরা হোটেলে ফিরলাম।

হোটেলে ফিরে দেখি মস্ত বড় ভোজ সভার ব্যবস্থা হয়েছে, সহরের সব গণ্যমান্য লোকেরা এসেছেন। খুব ঘটা করে খাওয়া হল, এ রকম ইলাহি ব্যাপার জীবনে এই প্রথম দেখলাম। খাবার পরে একটা ঘরোয়া বৈঠকে ঠিক হল পরদিন এই অঞ্চলের বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে এক আলোচনা সভা হবে।

সেই সভায় কর্ণেল লিস্টার সকলের সঙ্গে প্রফেসার সোমোরেনের পরিচয় করিয়ে দেবার পর, সভাপতি এখানকার প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ ডাক্তার জোহানসন বললেন, 'প্রথম যখন আপনাদের যানটি আমাদের টেলিস্কোপের নজরে এল, তখন আমরা ধারণাই করতে পারি নি যে ওটা মানুষের তৈরী একটা যন্ত্র আর ওটাতে করে অন্য জগত থেকে মানুষ আমাদের এই পৃথিবীতে আসছে। আমাদের ধারণা হয়েছিল ওটা একটা নতুন ধরণের উল্কাপিণ্ড, কাছে আসার পর ভুল যখন ভাঙ্গল তখন আবার নানারকম দুশ্চিন্তা জাগল—এরা কারা, কোথা থেকে আসছে আর কেনই বা আসছে? আমাদেরই পূর্বপুরুষদের কর্মদক্ষতার এমন একটা চিহ্ন দেখে আমরা খুবই আশ্চর্য হয়েছি আর এঁরা আমাদেরই জাতি জেনে খুব গর্ব অনুভব করছি।'

তারপর বললেন, 'প্রফেসার সোমোরেনের বক্তৃতার আগে আমি গত দুশ'বছরের পুরা ইতিহাস বলতে চাই না বটে, তবুও সেই প্রলয়ংকর দুর্যোগের প্রারম্ভিক ইতিহাস একটু বলা দরকার মনে হচ্ছে কারণ আমাদের মাননীয় অতিথিদের কাছে সেটা একটু নতুন হতে পারে।'

এই ভূমিকার পর তিনি বললেন, 'সেই দুশ'বছর আগে যখন এখান থেকে মহাযাত্রা সুরু হয়, তার কিছু পরেই দুতিনটি ছোট যান করে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক শনি আর সেই ধূমকেতুর সংঘর্ষের ফলাফল লক্ষ্য করার জন্য মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথ পর্যন্ত গিয়েছিলেন। সেখান থেকে এই সংঘর্ষ দেখে

সব হিসাব করে যখন তাঁরা নিশ্চিত বুঝলেন যে যদিও শনিগ্রহ কক্ষচ্যুত হয়ে গেছে আর তার ভাঙ্গা টুকরাগুলি ধুমকেতুর ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে পৃথিবীর দিকেই চলেছে তবুও অল্পের জন্য পৃথিবী সংঘর্ষ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যাবে, তখন তাঁরা আবার পৃথিবীতে ফিরে এলেন। এঁদের ফিরে আসার পর পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের একটা সভা হয়—এই সভার আলোচনার বিষয় ছিল যে যদিও শনির সঙ্গে সোজাসুজি সংঘর্ষের ভয়টা কেটে গেছে, তবু শনি এত কাছ দিয়ে যাবে যে তার আকর্ষণের ফলে আর ধুমকেতুর চুর্ণ-বিচুর্ণ ধ্বংসাবশেষের ভিতর দিয়ে যাবার ফলে পৃথিবীতে যে সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটবে তার হাত থেকে বাঁচতে হলে মানুষের কি করা উচিত। এই সভায় ঠিক হয়েছিল যে সমুদ্রের উপকূলের কাছাকাছি সমস্ত নিচু এলাকাগুলি থেকে মানুষের বসবাস সরিয়ে উচু ডাঙ্গা জমিতে নিয়ে যেতে হবে আর সমস্ত আগ্নেয়গিরিগুলির কাছ থেকে যত দূর সম্ভব বসবাস সরাতে হবে, কারণ বৈজ্ঞানিকরা আশঙ্কা করেছিলেন যে সমুদ্র থেকে প্রচণ্ড ঢেউ এসে সমস্ত নিচু অঞ্চল ডুবিয়ে ফেলবে আর সমস্ত আগ্নেয়গিরিগুলি (সুপ্তই হোক বা সক্রিয়ই হোক) ভীষণ ভাবে সক্রিয় হয়ে উঠে, চারদিক জ্বলন্ত লাভাস্রোতে ভাসিয়ে জ্বালিয়ে দেবে। এই প্রলয়ের সঙ্গে যোগ দেবে আকাশ থেকে ঘন ঘন উল্কাবৃষ্টি, প্রচণ্ড ঝড় আর বজ্রাঘাত। এঁদের সাবধান বাণী মেনে নেওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ দেশের লোকেরা এ সবে বিশেষ কান দেন নি তার কারণ প্রথমতঃ অধিকাংশ লোকেরাই নিজেদের বাসভূমি ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যেতে অনিচ্ছুক আর তাদের অনেকেরই নতুন জায়গায় চলে যাবার মত সঙ্গতি বা সামর্থ্যও ছিল না। দ্বিতীয়তঃ তাঁরা অনেকেই ভেবেছিলেন যে বৈজ্ঞানিকরা অনর্থক এত বেশী ভয় দেখাচ্ছেন। কিন্তু সত্যি সত্যিই যখন ব্যাপারটা ঘটল, তখন দেখা গেল এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পূর্ণরূপ কি সাংঘাতিক হবে বৈজ্ঞানিকরা তার শতাংশও অনুমান করতে পারেন নি। এই দুই কারণে কোটি কোটি লোক মারা যায়। প্রচণ্ড আঘাতে সারা পৃথিবীতে একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হল। যাঁরা বেঁচে ছিলেন, তাঁরা এই প্রলয়ের তাণ্ডব মূর্তি দেখে প্রথমটায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন, পরে আস্তে আস্তে চারদিকের ধ্বংসাবশেষ থেকে নতুন করে সব গড়ে তুলতে সুরু করলেন। দুশ'বছর কেটে গেছে, কিন্তু এখনও সেই প্রলয়ের চিহ্ন সারা পৃথিবী জুড়ে নানান জায়গায় পড়ে আছে। প্রলয়ের পর সূর্যের চারপাশে শনি বুধ আর সেই ধুমকেতুর চুর্ণগুলি যে আবরণীর সৃষ্টি করল, সেটা ভেদ করে সূর্যের তাপ আর আগের মতন আসতে না পারার ফলে, পৃথিবীতে হিমযুগ এসে গেল। উত্তর দক্ষিণ গোলার্ধের বেশীর ভাগ এই হিমবাহের তলায় চলে গেল, যদিও কোনো কোনো জায়গায় ঐ দুর্জয় শীতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানুষ আজও বসবাস করছে। সবে মাত্র গত একশ'বছর থেকে আমরা আবার দেশ দেশান্তরের সঙ্গে ভাল ভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারছি, কিন্তু আবার মহাকাশে চলাচল করা আমাদের এখনও সুরু হয় নি। বছর কয়েক থেকে এই বিষয়ে কিছু কিছু কাজ হচ্ছে, সূর্যের আবরণী দূর করবার কথাও আমরা চিন্তা করতে সুরু করেছি। প্রফেসার সোমোরেন অন্য জগত থেকে এসে আমাদের এই সব কাজে অনুপ্রাণিত করবেন আশা করছি।'

ক্রমশঃ

বায়না

ক্ষিতীশ সাঁতরা

চিরুণী আর আয়না
চায়না খোকন চায়না।
শেলেট দাও, আর খড়ি,
ধারাপাতটি পড়ি,
এই তো তাহার বায়না।
খেলনা নিয়ে কোন দিন তো
মানুষ হওয়া যায় না
খেলনা খোকন চায় না।

(পূর্ব প্রকাশিত অংশের চুম্বক)

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার গৃহযুদ্ধে অবরুদ্ধ রিচমণ্ড সহর হইতে বেলুনে চড়িয়া পলায়ন করিতে গিয়া পাঁচটি অসম সাহসী ব্যক্তি প্রচণ্ড ঝটিকার প্রকোপে একবস্ত্রে ও শূন্য হস্তে একটি নির্জন দ্বীপে পরিত্যক্ত হন। তাঁহারা হইলেন ক্যাপটেন সাইরাস হার্ডিং, গিডিয়ন স্পিলেট, পেন্‌ক্রফ্‌ট্, হারবার্ট ও নেব। হার্ডিংএর কুকুর টপও ছিল।

একেবারে প্রথম অবস্থা হইতে তাঁহাদের সমস্ত কাজ সুরু করিতে হইল। লোহা গালাইয়া কুড়ুল, কোদাল হইল, ক্রমে স্টিল প্রস্তুত হইল।

লেকের একধারে নাইট্রোগ্লিসারিনের সাহায্যে উড়াইয়া দেওয়াতে সেই পথে অনেক জল বাহির হইয়া গেল এবং একটি বিশাল গহ্বর বাহির হইয়া পড়িল। সমুদ্রের দিকে দরজা-জানালা ফুটাইয়া তাঁহারা গহ্বরের পথটি বন্ধ করিয়া দিলেন। দড়ির সিঁড়ি ঝুলাইয়া আসা-যাওয়ার ব্যবস্থা হইল।

গহ্বরটির নাম দেওয়া হইল গ্র্যানিট হাউস। ইঁট গাঁথিয়া বিশাল গহ্বরটিকে কয়েক ভাগে ভাগ করিয়া লওয়া হইল।

॥ দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ॥

জুন মাসের আরম্ভ হইতেই শীত পড়িল। ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি, তার পরেই কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস—সারাদিন এরূপ ভাবেই যায়। এই সময়ে গ্র্যানিট হাউসের অধিবাসিগণ ভাল বাড়ির সুবিধাটা বেশ অনুভব করিতে লাগিলেন। এ সময়ে চিম্‌নীতে থাকিলে দারুণ কষ্ট হইত। জোয়ারের সময় চিম্‌নীতে জল প্রবেশ করিবার

আশঙ্কাও ছিল যথেষ্ট। জুন মাসটা নানারকম কাজে কাটিয়া গেল। মাছ ধরা প্রভৃতিও বাদ পড়িল না। পেন্‌ক্রফট্ লতার তৈরি ফাঁদ পাতিয়া অনেকগুলি খরগোস ধরিল। নেব্ প্রচুর মাংস শুকাইয়া, নুন দিয়া ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিল। এখন আর খাদ্যের জন্য ভাবনা নাই। এখনকার প্রধান চিন্তা হইল পোষাক পরিচ্ছদের জন্য। বেলুন হইতে পড়িবার সময় যাহার যাহা পোষাক ছিল, তাহাতেই এতদিন কাজ চলিয়া গিয়াছে। সকলেরই পোষাক ভাল কাপড়ের তৈরি এবং বেশ গরম ছিল। এতদিন সকলে খুব যত্নের সহিতই তাহা ব্যবহার করিয়াছে, কিন্তু তাহাতেও আর চলিবে না, নূতন পোষাকের আবশ্যক হইবে। দ্বীপে বেশী শীত পড়িলে সকলের কষ্টের সীমা থাকিবে না। পোষাকের ব্যাপারের মীমাংসা সাইরাস্ হার্ডিংও করিতে পারিলেন না। শীতকালটা পুরাতন পোষাকেই কাটাইতে হইবে। শীতের পর মাউণ্ট ফ্র্যাঙ্কলিনে গিয়া, সেই ভেড়ার মত লোম-ওয়ালা জন্তু (মুস্‌মন্) শিকার করিয়া, তাহার লোম দিয়া গরম কিছু প্রস্তুত করা যাইতে পারে কি-না—সেটা হার্ডিং পরে ভাবিয়া দেখিবেন।

প্রায়ই দেখা যায়, সমুদ্রের মধ্যে যে সব দ্বীপ থাকে তাহাতে শীতের তেমন বাড়াবাড়ি হয় না—হয়ত লিঙ্কন্ দ্বীপেও সেইরূপ ঠাণ্ডাই হইবে। পেন্‌ক্রফট্ বলিল, "শীত বেশী হোক্ কম হোক্ তাতে বিশেষ কিছু এসে যায় না। একটা বিষয় বেশ বুঝতে পারছি—আজকাল দিনটা বেজায় ছোট হয়ে গিয়েছে আর রাতটা যেন শেষই হতে চায় না। তাই বলি, শীতের কথা ছেড়ে দিয়ে এখন আলোর ব্যবস্থার কথা ভাবা দরকার। হার্ডিং বলিলেন—ভাব্‌বার দরকার কি, আলোর ব্যবস্থা করলেই হলো।"

পেন্‌ক্রফট্ বলিল—"কি করে ব্যবস্থা হবে? সেটা কবে করবেন?" হার্ডিং বলিলেন—"কালই আরম্ভ করা যাক্। আবার কতগুলি সিল শিকার করা চাই।"

পেন্‌ক্রফট্ বলিল—"মোমবাতি বানাবেন?"

হার্ডিং বলিলেন—"হাঁ সেজন্য সিলের চর্বি চাই। মোমবাতি প্রস্তুত করা তেমন মুস্কিল কিছু নয়। চুণ ত আছেই সাল্‌ফিউরিক্ অ্যাসিডও আছে—এখন সিল্ শিকার করিলেই চর্বি পাওয়া যাইবে যথেষ্ট।"

হাপর তৈরি করিবার জন্য সেই যে ছোট্ট দ্বীপটিতে সিল্ শিকার করা হইয়াছিল, সেই দ্বীপে সকলে আবার গিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেরই হাতে বল্লম তাহার ডগায় চোঁখা লোহা পরান। দ্বীপে যাইবামাত্র দেখা গেল অসংখ্য সিল্ ডাঙ্গায় উঠিয়া রৌদ্রে পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিতে দেখিতে শিকারীর দল ছয়টা সিল্ বধ করিলেন। নেব্ ও পেন্‌ক্রফ্‌ট্ সেগুলির চামড়া ছাড়াইয়া সেই চামড়া ও চর্বি গ্র্যানিট্ হাউসে লইয়া আসিলেন। চর্বি লাগিবে মোমবাতি বানাইতে, আর চামড়া দিয়া পরে বুট জুতা প্রস্তুত হইবে।

সাইরাস হার্ডিং মোমবাতি প্রস্তুত করিলেন, শাক সবজির আঁশ দিয়া পলিতা করা হইল। যন্ত্র নাই পাতি নাই, হাতে গড়া বাতি—দেখিতে পরিষ্কার এবং সুন্দর হইল না বটে কিন্তু কাজ বেশ চলিয়া যাইবে। গ্র্যানিট হাউসের লোকদের নিকট এই বাতিই মহামূল্য বোধ হইল। সন্ধ্যার পর এই বাতি যখন জ্বলিল, তখন সকলের আনন্দ আর ধরে না।

জুন মাসে কাজ হইল, অনেক। পুরাতন যন্ত্রপাতিগুলি ঘষিয়া মাজিয়া সুন্দর করা হইল, কতকগুলি নূতন যন্ত্রও প্রস্তুত হইল তাহার মধ্যে একটা হইল কাঁচি। সকলের চুল-দাড়ি সন্ন্যাসীর মত গজাইয়াছে, এখন কাটিয়া ছাঁটিয়া লইতে পারা যাইবে। একটি হাত-করাত প্রস্তুত করিতে খুব বেগ পাইতে হইয়াছিল। করাতটি দেখিতে বিশ্রী হইলেও, জোরে ঘষিলে উহার দ্বারাই কাজ চলিবে। এই করাত দিয়া টেবিল, স্টুল্, ঘরের সেল্‌ফ্, খাট, রান্নার বাসনপত্র রাখিবার জন্য তাক্—সবই করা হইল।

দ্বীপবাসীদিগকে এখন দুইটি সেতু প্রস্তুত করিতে হইবে। প্লেটো আর সমুদ্রতীরের মধ্যখানে জল। দ্বীপের উত্তর ভাগে যাইতে হইলে, এই জল পার হওয়া দরকার। এতদিন দ্বীপবাসিগণকে রেডক্রীকের উৎপত্তিস্থান ঘুরিয়া সেখানে যাইতে হইত। সুতরাং, সমুদ্রতীর হইতে প্লেটো পর্যন্ত ২০।২৫ ফুট চওড়া পোল বানাইলে ভারি সুবিধা। বড় বড় গাছ কাটিয়া, ডালপালা ছাড়াইয়া পরিষ্কার করিতে কিছুদিন কাটিয়া গেল। ক্রমে পোলও প্রস্তুত হইতে বাকি রহিল না।

বালির ঢিবির কাছে এক জায়গায়, পূর্বে রাশি রাশি ঝিনুক দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। পোল প্রস্তুত হওয়ামাত্র, নেব ও পেন্‌ক্রফট্ হাজার হাজার শামুক ও ঝিনুক গ্র্যানিট হাউসে আনিয়া বোঝাই করিল।

এ পর্যন্ত দ্বীপবাসিগণের সকল অভাবই লিঙ্কন্ দ্বীপ কোন না কোন রকমে পূর্ণ করিয়াছে। মাংসের জন্য ভাবনা নাই, শাক সবজিও অনেক রকমের পাওয়া গিয়াছে। এক রকম গাছের শিকড় পাওয়া গিয়াছে, সেগুলিকে গাঁজাইয়া লইলে একটু টক সরবৎ হয়, ঠাণ্ডা জলের বদলে তাহা বেশ লাগে। যে সকল স্থানে শীত গ্রীষ্ম সমান, সেখানে ম্যাপ্‌ল জাতীয় গাছ জন্মায়। লিঙ্কন দ্বীপেও এই গাছ যথেষ্ট আছে। তাহার রসে চিনির কাজ বেশ চলে। খরগোসের আড্ডার কাছে এক রকম ঘাস পাওয়া গিয়াছে, তাহার পাতার রস ঠিক যেন চায়েরই মত। নুন আছে অপর্যাপ্ত। এখন রুটির বদলে কোন রকমের ব্যবস্থা করিতে পারিলেই আর ভাবনা কি?

দ্বীপের সকল ভাগ এখনও সন্ধান করিয়া দেখা হয় নাই। হয়ত বা দক্ষিণ ভাগের বনে সাগু কিংবা "ব্রেডফ্রুট" গাছের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। যাহা হউক, দ্বীপবাসিগণের পরম সৌভাগ্য রুটির সম্বন্ধে ভগবান্ তাহাদিগকে একটু সাহায্য করিলেন। সাহায্যটুকু নিতান্তই সামান্য, কিন্তু যে বস্তুটি সাইরাস্ হার্ডিং তাঁহার অসীম জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও কিছুতেই পাইতে পারিতেন না, সেই জিনসিটি হারবার্ট তাহার ওয়েস্ট কোট মেরামত করিবার সময় তাহার লাইনিং-এর মধ্যে পাইল। সকলে গ্র্যানিট হাউসের হলটিতে আছেন, বাহিরে দারুণ বৃষ্টি, এমন সময় হারবার্ট বলিয়া উঠিল—ক্যাপটেন্ হার্ডিং। এই দেখুন একদানা গম পেয়েছি। এই বলিয়া একদানা গম সকলকে দেখাইল—তাহার ওয়েস্ট কোটের লাইনিংএর মধ্যে ছিল।

রিচ্‌মণ্ড সহরে থাকিবার সময় পেন্‌ক্রফট্ হারবার্টকে কতকগুলি পায়রা কিনিয়া দিয়াছিল। হারবার্ট পায়রা গুলিকে রোজ গম খাওয়াইত, তাহারই একটি দানা কেমন করিয়া জানি ওয়েস্ট্ কোটের লাইনিং-এর মধ্যে ঢুকিয়াছিল।

'একদানা গম'—একথা শুনিয়াই হার্ডিং লাফাইয়া উঠিলেন। বলিলেন—ভগবান্‌কে ধন্যবাদ। এই দানাটি দিয়ে আমরা রুটি বানাব।'

হারবার্ট বলিল—'একটি দানা দিয়ে রুটি হবে কেমন করে?' দানাটি হাতে লইয়া হার্ডিং বলিলেন—এটি বেশ আছে দেখছি। তবে আর কথা কি? এটি পুঁত্‌লে এক ছড়া হবে, সেগুলি পুঁতলে অসংখ্য ছড়া হবে। তাহলে, আমার মনে হয়, বছর দুয়ের মধ্যে আমরা লিঙ্কন দ্বীপে রীতিমত গমের চাষ ক'রে ফেলতে পারব।

জুন মাসের বিশ তারিখ—গম্ রোপণের ঠিক উপযুক্ত সময়। আকাশ পরিষ্কার হইলে, সকলে গ্র্যানিট্ হাউসের উপরে প্লেটোতে গিয়া, একটি ভাল জায়গা দেখিয়া লইলেন হাওয়া না লাগে অথচ রৌদ্রের তেজটা পূর্ণ মাত্রায় পাওয়া যায়। সেই স্থানটি ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া, চুণ মিশান ভাল মাটি ফেলা হইল। স্থানটির চারিদিকে বেড়া দিয়া, তাহার ঠিক মধ্যখানে, ভিজা উর্বর মাটিতে গমের দানাটি পুঁতিয়া দেওয়া হইল।

॥ ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ॥

এখন হইতে পেনক্রফটের প্রধান কাজ হইল, প্রতিদিন একবার করিয়া সেই শস্যক্ষেত্রটি দেখা। সেটিকে সে গম্ভীরভাবে শস্যক্ষেত্র বলিতে দ্বিধাবোধ করিত না। ক্ষেতের আশে পাশে পোকা মাকড় দেখিতে পাইলে পেনক্রফট্ তখনই মারিয়া ফেলিত।

জুনের শেষে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পর, দারুণ ঠাণ্ডা পড়িল। ক্রমে মার্সিনদীর মুখে বরফ জমিল। দেখিতে দেখিতে সমস্তটা লেকের জল জমাট বাঁধিয়া গেল। গ্র্যানিট্ হাউসের জ্বালানি-কাঠ, কয়লা প্রভৃতি স্তূপাকার। এই দারুণ ঠাণ্ডার সময় কয়লার আগুন জ্বালাইবার জায়গা (fire place) করা হইল। সেখানে বসিয়া সকলে নানারকম কাজকর্ম করিতেন। সাইরাস, হার্ডিং লেকের জল গ্র্যানিট হাউসে আনিবার ব্যবস্থা করিয়া অতি উত্তম কাজই করিয়াছিলেন। ভাঁড়ার ঘরের পিছনে চৌবাচ্চায় সে জল জমিত। অতিরিক্ত জল কুয়ার ভিতর দিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িত। গ্র্যানিট হাউসের ভিতরটা গরম এবং অনেক নীচে সেজন্য সেখানকার জল জমিয়া যাইত না।

এই সময়ে ঝড় বৃষ্টি থামিল, বাতাস খট্‌খটে শুক্‌না। দ্বীপবাসীরা ভাবিলেন, যথাসম্ভব গরম কাপড় পরিয়া, মার্সিনদী আর ক্ল-কেপের মধ্যখানের স্থানটা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন। এই স্থানটী খুব বড় একটি জলা-ভূমি (বাদা)। এখানে প্রচুর পরিমাণে পাখি পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা। হিসাব করিয়া দেখা গেল, জায়গাটা ৮।৯ মাইল দূরে যাওয়া আসায় সমস্ত দিন কাটিয়া যাইবে। অজানা জায়গা সুতরাং সকলে মিলিয়া একসঙ্গে যাওয়াই ভাল। ৫ই জুলাই প্রাতঃকালে, সাইরাস্ হার্ডিং, স্পিলেট্, হারবার্ট পেনক্রেফট্, নেব, সকলে বল্লম, তীরধনু, ফাঁদ প্রভৃতি শিকারের সরঞ্জাম এবং খাদ্যদ্রব্য সহ, গ্র্যানিট্ হাউস হইতে যাত্রা করিলেন—টপ্ চলিল সকলের আগে।

মার্সিনদী পার হইয়া গেলে রাস্তা কম। এখন নদীর জল জমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং পার হওয়া সহজ। কিন্তু ভবিষ্যতে এখানে পোল দেওয়া দরকার—স্পিলেট্ ভবিষ্যৎ কাজের লিস্টের মধ্যে এই কথাটি লিখিয়া লইলেন। মার্সিনদীর দক্ষিণ পারে দ্বীপবাসিগণ এই প্রথম পা দিলেন। প্রায় আধ মাইল পথ যাইতে না যাইতেই, টপের তাড়নায় একটা ঝোপের ভিতর হইতে একদল চতুষ্পদী জন্তু ছুটিয়া পলাইল। হারবার্ট চেঁচাইয়া উঠিল—'শেয়াল, শেয়াল।' শিয়ালেই বটে, কিন্তু বড় সাইজের শিয়াল। টপ্ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, ততক্ষণে সেগুলি একেবারে অদৃশ্য হইয়া পড়িল।

খানিক পরে, একটা বাঁক ঘুরিয়াই সকলে দেখিলেন সম্মুখে লম্বা সমুদ্র তীর চলিয়াছে। তখন বেলা আটটা, আকাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পথ চলিয়া সকলেরই শরীর গরম হইয়াছে। খোলা সমুদ্র তীরের ঠাণ্ডা বাতাসে বেশ আরাম বোধ হইল। এখানে তীর খাড়া উঠিয়াছে, পাহাড় পর্বত কিছুই তীরের উপর নাই। পিছনে, প্রায় চার মাইল দূরে দ্বীপের পশ্চিমভাগের বনের উঁচু গাছগুলি দেখা যাইতেছে। এইখানে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য সকলে থামিলেন। আহারের সময় সকলে দ্বীপের চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে গল্প করিতে লাগিলেন। লিঙ্কন্ দ্বীপের এই ভাগটা অত্যন্ত অনুর্বর। স্পিলেট্ বলিলেন—লিঙ্কন্ দ্বীপটি ছোট্ট হলেও এর মধ্যে নানা রকমের জমি দেখতে পাচ্ছি—জমির এরূপ ভিন্ন ভিন্ন রকমের অবস্থা মহাদেশের পক্ষেই সম্ভব।

হার্ডিং বলিলেন—ঠিক কথাই বলেছে, স্পিলেট। এ বিষয়টা আমারও খেয়াল হয়েছে। লিঙ্কন্ দ্বীপের গঠন ও প্রকৃতি বাস্তবিকই একটু অদ্ভুত ধরনের; হয়ত বা এক সময়ে এই দ্বীপটা মহাদেশের অংশ ছিল। পেনক্রফট অবাক্ হইয়া বলিল—'কি, প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যখানে মহাদেশ, এটা কি সম্ভব?'

হার্ডিং বলিলেন—'অসম্ভবটা কি? আমার মনে হয়, সমুদ্রে যত দ্বীপ আছে তার সবই মহাদেশের চূড়া—এক সময়ে হয়ত সমস্ত দেশটাই জলের উপরে ছিল, এখন শুধু চূড়াটি জেগে আছে।' পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—আমাদের লিঙ্কন, দ্বীপটাও তা'হলে মহাদেশের চূড়া?'

হার্ডিং বলিলেন—খুব সম্ভব তাই, এবং মনে হয়, সেজন্যই দ্বীপটা ছোট হলেও এর জমির অবস্থা এরূপ নানা-রকমের, দেখ্‌ছ না, এরই মধ্যে আমরা কত রকমের গাছ-গাছড়া জীবজন্তু সব দেখ্‌তে পেয়েছি। এখনও ত তবু সবটা দ্বীপ দেখাই হয়নি। তাই বল্‌ছিলাম—লিঙ্কলন্ দ্বীপ এক সময়ে মহাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। অন্য সব অংশ ডুবে গিয়ে এখন শুধু চূড়াটি জেগে আছে।

পেন্‌ক্রফট্ মহা আশ্চর্য হইয়া বলিল—তা'হলে ক্রমে সাগরে সব দ্বীপ ডুবে গিয়ে, আমেরিকা এবং এশিয়ার মাঝখানে সমুদ্রটা একেবারে ফাঁকা হয়ে যাবে?

হার্ডিং বলিলেন—হাঁ, তা হতেও পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার নূতন দেশও জলের উপর মাথা ভাসিয়ে উঠবার সম্ভাবনা আছে। ক্রমশঃ

কাগজের নৌকো

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

কাগজের নৌকো
গ'ড়ে চার চৌকো
ব'লে জগদম্বা
ছেড়ে দাও লম্বা ।
পিঁপড়ে বা পক্ষী
তা'তে চ'ড়ে মক্ষী
বহু ক্রোশবর্গ
পাড়ি দিক স্বর্গ ॥

বালী সুগ্রীব কথন

লীলা মজুমদার

১ম দৃশ্য

প্রস্তাবনা

কিষ্কিন্ধ্যার বালী রাজা সুগ্রীবেরি ভাই,
সুখে করে প্রজাপালন কোনো চিন্তা নাই।
মায়াবী অসুর আসি যুদ্ধে দেয় ডাক,
সুগ্রীবেরে বলে বালী, হেথা রক্ষী থাক্!
এই বলে শত্রু সাথে ঢোকে গর্ত মাঝে,
বারো মাস খাড়া সেথা ভ্রাতা ভাবিয়াছে,
গর্তে কেন রক্ত বয়, বালী গেছে মরে!
কাঁদিতে কাঁদিতে তাই, ফিরিয়াছে ঘরে।
মন্ত্রীরা মিলিয়া তারে করিয়াছে রাজা,
পুণ্যবানে দয়া করে, দুষ্টে দেয় সাজা।
প্রজাগণ দেখিবারে আসে সবে রোজ,
সুগ্রীবের প্রাসাদেতে নিত্য লাগে ভোজ
তারপরে কি হইল শোন মন দিয়া,
সুগ্রীব কাহিনী শোনে বেবাক দুনিয়া!
(ভোজের বাদ্য)

১ম দৃশ্য

স্থান—সুগ্রীবের ভোজসভা (উচ্চাসনে সুগ্রীব, হনুমান, তারা, রুমা, মন্ত্রী ও অনুচরবৃন্দ। নিচে সারি সারি বেঞ্চিতে প্রজারা বসে কলা খেতে ব্যস্ত। চারজন গ্রাম্য বাঁদরের প্রবেশ।)

১ম গ্রাম্য বাঁদর—ঐ যে, ঐ ছাখ্, ঐ ভোঁদাটা হল গিয়ে রাজা। নমো কর। পায়ের গুলিটা দেখেছিস্?

২য়—কই রে কোন্‌টা? ও, ঐ সোনার ছাতা-ধরাটা বুঝি? বাঃ, কি ভালো দেখতে!

১ম—দূর বোকা, ওটা তো ছত্রধারী, রাজার চাকর। আর ঐ যে হাঁড়িপানা কালো মুখ, ঐটা হল হনুমান, রাজার পেয়ারের বন্ধু।

৩য়—আর বেঁড়ে বাঁদরটা কে রে? ঐ যে ল্যাজ ঝুলিয়ে উঁচু কেদারায় বসে ঠ্যাং দোলাচ্ছে, ওটা অত চ্যাচাচ্ছেই বা কেন?

১ম—স-স-স-চুপ-চুপ। এইটাই তো রাজারে, ওর নাম সুগ্রীব, নমো কর, নমো কর।

৪র্থ—দুর, কি যে বল মোড়ল, তার ঠিক নেই। গত বছর তো আরেকটাকে দেখিয়ে রাজা বলেছিলে আরো বড়, আরো মোটা, আরো ভালো। এটা তো একেবারে থার্ড ক্লাস্, দ্দুঃ দ্দুঃ!

৪র্থ—আর সেটার নাম বলেছিলে 'মাটি,' না 'সোরা,' না কি একটা যেন। আমাদের এবার ভাঁওতা দিচ্ছ নাকি, মোড়ল?

১ম—আরে, না রে না। তার নাম ছিল বালী। তোরা এখন চুপ কর দিকি, সেপাইরা শুনতে পেলে আস্ত রাখবে না।

২য়—আমার জল তেষ্টা পাচ্ছে।

৩য়—আমি বাড়ি যাব।

১ম—এই গেলে যা! তোরা চুপ করবি কি না, বল্।

৪র্থ—আচ্ছা, বাবা, আচ্ছা, এই চুপ করলুম। —কিন্তু গয়নাপরা শাঁখচুন্নির মতো বিশ্রী দেখতে ও দুটো কে? ঐ যে সোনার ছাতার নিচে বসে সোনার পাখার হাওয়া খাচ্ছে, কে ওরা?

১ম—আহা ঐ বড়টা হল বালীর বৌ তারা আর ছোটটা সুগ্রীবের বৌ রুমা। বিশ্রী দেখলি কোথায়? রাণীরা বুঝি কখনো বিশ্রী হয়? নমো কর, নমো কর।

(সকলের নমস্কার)

২য়—কিন্তু সেই বালীটা গেল কোথায়?

১ম—স-স-স তার নাম করিস্ নি, তার ছোট ভাই সুগ্রীব এখন রাজা হয়েছে, তাই ভোজ দিচ্ছে, সে ব্যাটা তো অক্কা পেয়েছে।

৩য়—(চেঁচিয়ে) অঁ্যা! কি বললি? আমি আবার কানে কম শুনি কি না—বালী মরে গেছে বলে সুগ্রীব ভোজ দিচ্ছে?

(সভাস্থ সকলে)—স্-স্-চুপ-চুপ-শোন্-শোন্।

সুগ্রীব—কে ওটা? বালীর নাম কে কচ্ছে? পটল-তোলাদের আবার ডাকা কেন?

হনু—চুপ, রাজা, চুপ। ইতর লোকরা কে কোথায় কি বলল, তাতে অত কান দিচ্ছ কেন? রাজাদের কি সেটা শোভা পায়?

সুগ্রীব—কান দেব কেন? বিরাশী সিক্কার এক চড় দেব। কই, কথা বলছ না যে বড়? বালীর নাম কে করেছে?

সভাস্থ সকলে—কেউ না, রাজা, কেউ না, বালী বলিনি, কালী বলেছি। তাতেও দোষ আছে নাকি?

সুগ্রীব—বেশ করেছি রাজা হয়েছি। তাছাড়া আমি তো আর নিজে সেধে রাজা হই নি। তোমরা পাঁচজনেই একরকম ধর পাকড় করে আমার মাথার ওপর রাজছত্র চাপালে—(উপরে তাকিয়ে) অ্যা! এ কি! রাজছত্রে ফুঁটো কেন? ওখান দিয়ে যদি একটা পায়রা উড়ে যেতে যেতে— নাঃ, এ ভয়ানক খারাপ—এতে কি আমার অসম্মান করা হয় না? ছত্রধারী—ই—ই—!

(ছাতা ফেলে ছত্রধারীদের পলায়ন। সঙ্গে সঙ্গে গায়কদের স্তব)

(গায়কদের গান)

সুগ্রীব রাজা
দিও না সাজা।
বালীর নাম আর কেউ করে না।
কোথায় বালী,
দেখছি খালি,
তব রূপে গুণে কারো কথা সরে না!
হেথায় বসে
খাচ্ছি কষে,
বালী যাক যেন সুগ্রীব মরে না।

(বাইরে কোলাহল)

সুগ্রীব—বাইরে অত চ্যাঁচাচ্ছে কে? তার আস্পর্ধা তো কম নয়। আমি একটা রাজা, আমার সামনে গোলমাল করা—

হনুমান—সামনে নয়, রাজা, বরং পেছনে বলতে পারো—

(রেগেমেগে বালীর প্রবেশ)

বালী—কই সেই রাস্কেলটা কোথায়? তাকে একটু শিক্ষা না দিলে তো চলছে না, কোথায় সে?

সুগ্রীব—কে? ও কে?

বালী—(এক লাফে সুগ্রীবের কান ধারণ) আমি কে তাও ভুলেছিস্ ব্যাটা লক্ষ্মীছাড়া! আমার মুকুট পরে, আমার সিংহাসনে চেপে আমাকেই মনে পড়ছে না! বাঃ! বেড়ে বলেচিস্!

সুগ্রীব—উ হু হু! আমি—আমি—আমি—

বালী—হ্যাঁ—তুই—তুই—তুই। বলিনি তোকে গর্তের মুখে দাঁড়িয়ে থাক? কেন থাকিস্‌নি?

সুগ্রীব—তাইতো ছিলুম; একটা বছর ছিলুম; তুমি এলে না। পায়ে শেকড় গজিয়ে গেছল, কানে মাকড়সারা জাল বুনেছিল। তারপর গর্তে সে কি গর্জন আর ফেনা আর রক্ত! আমি ভাবলুম আর কি সে ফিরবে, নির্ঘাৎ পটল তুলেছে। তাপ্পর গর্তের মুখে এই বড় পাথর ঠুসে, কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি এসে মহা ধুমধাম করে তোমার ছেরাদ্দ শান্তি করে, লুচি, ক্ষীর, দই, কলা—

বালী—অ্যা! জ্যান্ত মানুষের ছেরাদ্দ করেছিস্, হতভাগা! নাঃ, আর তো পারা গেল না। (প্রচণ্ড চপেটাঘাত)

সুগ্রীব—উহুহু! লাগে না বুঝি। বলছি ভুলে করেছি। এই ছাখ, তোমার পায়ে পড়ছি! তুমি রাজা হও, আমি তোমার মন্ত্রী হই, মাইনেটা কিন্তু—।

বালী—আহা! মরে যাই। উনি আমাকে গর্তে ঠুসে, দিব্যি আমার সিংহাসনে চেপেছেন, এখন আমি

হব রাজা আর উনি হবেন আমার পেয়ারের মন্ত্রী ! ওসব হবেটবে না বলে রাখলাম ! ভালো চাস তো এক্ষুণি বেরো আমার রাজ্য থেকে—! (কীল মারণ ও সুগ্রীবের চ্যাঁচানো)

সভাসদরা—হাঁ—হাঁ—হাঁ—ওকি !—ওকি ।

বালী—কেন ? কারো কিছু বলবার থাকে তো পেছন থেকে ওরকম হাঁহাঁহাঁ না করে, বেরিয়ে এসে বল। আমারো অনেক বলবার আছে। (আস্তিন গুটিয়ে) অকৃতজ্ঞ বাঁদর সব ! কই, কেউ এগুচ্ছে না যে ? সবকটাকে ধরে—

সভাসদরা—না স্যার, না স্যার, ইয়ে, আমরা আপনার সামান্য কিঞ্চিৎ প্রজা, আপনার ল্যাজের ডগা ছোঁবারও আমাদের সাহস নেই—

বালী—ঢের হয়েছে, এবার থামো দিকিনি। সুগ্রীব !

হনুমান—বালীরাজা, সুগ্রীবের কোনো দোষ নেই। ও সত্যি ভেবেছিল তুমি পটল তুলেছ। কত সম্মান দেখিয়েছিল তোমাকে, ক্যায়সা ঘটা করে শ্রাদ্ধ করল, কি খাওয়াদাওয়া, গোরু দান, কাপড় দান, সাতদিন ধরে নাচ গান, ক্যাণ্ডি থেকে থিয়েটার পার্টি এসেছিল।

বালী—চোপ ! আমি মরে গেছি বলে মোটে সাতদিন নাচ গান ? কেন, পনেরো দিনের কি খরচ কুলোত না ? যত সব কেপ্পনের জাসু ! আবার দাঁত কেলিয়ে সে কথা বলতে এসেছিস্ ! যা হতভাগা, সুগ্রীবের সঙ্গে সঙ্গে তুইও এক্ষুনি বিদেয় হ' আমার রাজ্য থেকে।

হনু—আহা, এক্ষুনি আবার কি ? আমার সুটকেস গুছুতে হবে না ? ধোপার বাড়িতে কাপড়—

বালী—না, কিচ্ছু গুছুতে হবে না, যেমন আছিস্ তেমনি যাবি সব। এই সুগ্রীব, ঐ মুকুট-ফুকুট ছেড়ে যা। দে, রাজদণ্ডটা আমার হাতে দে —।

সুগ্রীব—কিন্তু আমার পরিবার—

বালী—ন্যাকা ! পরিবার আবার কি রে, একি পিকনিক করতে যাচ্ছিস্ নাকি ? এখন বলে পরিবার, তাপ্পর বলবে টিপিন ক্যারিয়ার, তাপ্পর বলবে মটরগাড়ি ! ওসব হবেটবে না, এক্ষুনি বেরো বলছি ! এই তোরা দাঁড়িয়ে আছিস কেন, এদের রওনা করে দে ! আর জনা তিনেক সঙ্গে যা, যদি কোনো অসুবিধায় পড়ে !!

(সভাসদদের লাঠিসোঁটা সহকারে এগিয়ে আসা, সুগ্রীবের পশ্চাতে বালীর লাথি মারণ, হনুমানের ল্যাজ ধরে, মাথা নিচু করে সুগ্রাবের প্রস্থান)

বালী—এইবার সিংহসনটাকে ভালো করে ঝাড়পোঁছ করে দে দিকি। ব্যাটা অর্ধেক দিন চান করে না ! তার ওপর আস্পর্ধাটা দেখলি। চুল না আঁচড়ে আমার মুকুট মাথায় পরে ! ছিঃ !

(ফুঁ দিয়ে মুকুট ঝেড়ে, মাথায় স্থাপন)

২য় দৃশ্য

স্থান—পম্পাতীর

নেপথ্যে সুগ্রীবের গান

ও হনু চাচা
আমায় বাঁচা
বল না কি যে করি!
ঐ দুষ্টু বালী
আমায় খালি
দিচ্ছে নাকে দড়ি!
প্রাণের পাখি,
কোথায় রাখি,
মরছে ধড় ফড়ি!

(গাইতে গাইতে হনুমান ও তার ল্যাজ ধরে সুগ্রীবের প্রবেশ)

হনু—কি, দিনরাত কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর কর, রাজা। কি সুন্দর জায়গা একবার চেয়ে ছাখ; ঐ যে মতঙ্গবন, ওখানে হাতিরাও যায় না। ঐ ঋষ্যমুক পাহাড়ের চুড়োয় ঘুমুলে যত ধনের স্বপ্ন দেখবে, জেগে উঠে তত ধন পাবে—

সুগ্রীব—তাই না আরো কিছু! কাল রাত্রে সোনা পাওয়ার স্বপ্ন দেখলে, আজ সকালে পেলে এক কাঁদি পাকা কলা! তুমি থামো দিকি নি।

হনু—ওমা, কি বলে গো! সোনাতে আর পাকা কলাতে তফাৎটা কি হল শুনি? (কোঁচড় থেকে কলা বের করে কামড়-দান)—বরং কলাই ভালো, সোনা কখনো খাওয়া যায়?

সু—কিন্তু এখন উপায়টা কি হবে?

হনু—কি আবার উপায় হবে? মতঙ্গমুনির শাপে এই জায়গায় বালী এলেই অক্কা পাবে, কাজে কাজেই তোমার কোনো ভয় নেই। (আরেকটা কলা খাওন) তবে হ্যাঁ, কিষ্কিন্ধ্যা থেকে ব্যাটাকে তাড়াতে হবে। আমার ধোপার কাপড় আনতে দিল না, এত বড় পাজি! নাঃ, ওকে ছাড়া নয়, তুমি ওকে তাড়াবে।

সু—তা তাড়াতে পারি, কিন্তু ওর কাছেটাছে যেতে পারব না। বড় জোর দূর থেকে ঢিল মারতে পারি। বাবা! হাত পায়ের গুল দেখেছ ব্যাটার? রোজ সন্ধ্যে বেলায় পাহাড় নিয়ে লোফালুফি খেলে, বড় বড় গাছ উপড়ে দাঁতন করে! ঢের হয়েছে বাবা, ওর কাছে আর নয়, এই নাকে খৎ দিলাম! (নাকে খৎ দেওন)

হনু—ছি ছি ছি ছি এই কি রাজার মতো কথা হল? তাড়ানো-খেদানো কানমলা খাওয়া হলেও রাজা তো বটে। নাকি নও?

সু—ঈ—শ্, রাজা নই তো কি? জানো, এক ঐ বালী ছাড়া পৃথিবীতে আমি কাউকে ভয় পাই না! আসুক না একবার আমার কাছে, তা সে যত বীরই হোক না কেন, এমনি করে বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলে করে—ও হনু! ও দুটো আবার কে? বালীর গুপ্তচর নয় তো?

(একটু দূরে রাম লক্ষ্মণের প্রবেশ ও সুগ্রীবের হনুমানের পেছনে গিয়ে দাঁড়ানো)

হনু—কোথায় বালীর চর? (উঠে দাঁড়িয়ে) এঁরা বালীর চর? তা হলেই হয়েছে!

সু—চর নয় কি করে জানলে?—ঈশ্, পরেছে তো গাছের ছাল, তার ফাঁক দিয়ে গা থেকে ক্যায়সা ছটা বেরুচ্ছে দেখেছ?—নাঃ, ওরা বালীর চর না হয়ে যায় না। কিম্বা স্বয়ং বালী। একটাতে কুলিয়ে ওঠে না তাই দুটো দুটো মানুষ সেজে এসেছে, অত বড় শরীরটা তো:

হনু—চুপ কর, রাজা। মতঙ্গমুনির শাপে মলয় পাহাড়ে পা দিলেই বালী মরে যাবে। তা ছাড়া অমন দিব্য চেহারা ধরা বালী বাঁদরের কম্ম নয়। এঁরা আর কেউ।

সু—বেশ, তা হলে আমি আগে ঐ গাছটার পেছনে লুকোই, তারপর তুমি গেঁয়ো লোক সেজে ওদের পরিচয় নাও, কেমন?

হনু—কেন, ভয় পাচ্ছ নাকি?

সু—দুঃ, দুঃ, সে কি একটা কথা হল! তবে আমি একটা রাজা, আমি কি আর যারতার সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা কইতে পারি? (গাছের পেছনে লুকোনো)

হনু—বলি, ও মশাই!

রাম—আরে! কি বলে বাঁদরটা?

হনু—কে বট তোমরা? মাথায় জটা, তীর ধনু হাতে কি খুঁজছ? এখানে কিছু হবে টবে না।

লক্ষ্মণ—তুই কে রে?

হনু—ওমা, তাও জান না? কোথায় থাকো? কিষ্কিন্ধ্যার বালীরাজা যে তার ভাই সুগ্রীবকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সে মনের দুঃখে এই ঋষ্যমূক পাহাড়ে বনবাস করছে, আমরা চারজন অনুচর সঙ্গে থাকি, কলা পাড়ি, রুটি পাকাই।

রাম—সুগ্রীবের অনুচর? আমরা তো তাকেই খুঁজছি!

হনু—অ্যাঁ! ও রাজা, পালা, পালা!—(নেপথ্যে হুড়মুড় শব্দ) বালী তোমাদের পাঠিয়েছে বুঝি? আশ্চর্য! আমি তো অন্য রকম ভেবে ছিলাম। তা বালী এখানে কোনো সুবিধে করতে পারবে না বলে রাখলাম। নাকটুকু সেঁদিয়েছে তো এক্কেবারে আলু পটল! মতঙ্গমুনির শাপ চাট্টিখানি কথা নয় বাবা!

লক্ষ্মণ—না, না, তোমাদের কোনো ভয় নেই, আমরা বালীর লোক নই, অযোধ্যার দশরথ রাজার ছেলে, উনি রাম, আমি লক্ষ্মণ। আমরাও বনবাসে আছি। একটা দুরন্ত রাক্ষস রামের স্ত্রী সীতাদেবীকে চুরি করে নিয়ে গেছে, তাঁকেই আমরা খুঁজছি, দেখেছ তাঁকে?

হনু—না, ঠিক দেখি নি তাঁকে, তবে এখান দিয়ে রাক্কসটাক্কস হামেসাই যাওয়া আসা করে। তাঁর খবর পাওয়াটা খুব শক্ত হবে না।

লক্ষ্মণ—আহা তাই যেন হয়। ক্রৌঞ্চবনের কবন্ধ আমাদের সুগ্রীবের সাহায্য নিতে বলেছে।

হনু—নিশ্চয়, নিশ্চয়। না জেনে কটু কথা বলেছি, মাপ করবেন স্যার। দাঁড়ান, সুগ্রীবটাকে ডাকি—ও সুগ্রী ——— ব, সুগ্রী ——— ব রে——এ! এদিকে এসো——ও——ও! এঁরা বালীর লোক ন———ন্।

সু—(প্রবেশ করে) স—স—স—আস্তে আস্তে, বালী যদি শুনতে পায়।

(হনুমান ও সুগ্রীবের কানে কানে কথা)

সু—অ, তাই বল! ও রাম, এই মুহূর্ত থেকে আমি তোমার বন্ধু হলাম; সীতাদেবীকে ফিরিয়ে এনে দেব কথা দিলাম।—এই হনুমান, মনে করিয়ে দিস্—কিন্তু তার আগে বালীটার একটা ব্যবস্থা করে দাও।

রাম—বেশ, বেশ, এক্ষুণি বালীকে পঞ্চত্ব পাইয়ে দিয়ে কেমন তোমার রাজ্য উদ্ধার করে দিই, দ্যাখ! কিন্তু তারপর সীতাকে খুঁজে দিতে হবে।

সু—বিলক্ষণ, বিলক্ষণ। আরে এখন আমার মনে পড়ছে তাঁকে আমি দেখেওছি। আচ্ছা, তাঁর কি এই রকম অবধি টানা টানা চোখ আর কালো কোঁকড়া চুল? তাঁর কি ছুটি করে পদ্মফুলের মতো হাত পা?

রাম—হ্যাঁ, হ্যাঁ,

সু—তা হলে বোধ হয় দেখেছি তাঁকে। আচ্ছা, কাঁদলে কি তাঁর চোখ দিয়ে এই বড় বড় মুক্তোর মতো জলের ফোঁটা পড়ে?

রাম—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বল, কোথায় দেখেছ?

সু—গলার আওয়াজটা কি বাঁশির মতো?

রাম—কোথায় তিনি, সুগ্রীব, কোথায় দেখলে?

সু—ঠিক দেখি নি তাঁকে, তবে একদিন আমরা পাহাড়ের ওপর রোদ পোয়াচ্ছিলাম এমন সময় রাবণ বলে একটা দুষ্টু রাক্কস একজন কাকে ধরে নিয়ে রথে করে আমাদের মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছিল কি না, আর সে হা রাম হা লক্ষণ বলে বেদম চ্যাঁচাচ্ছিল আর গা থেকে ভালো ভালো গয়না খুলে খুলে ফেলে দিচ্ছিল, তাই ভাবলুম হয় তো ঐ বুঝি সীতা মা।

লক্ষণ—কোথায় সেই সব গয়না?

সু—(পকেট থেকে গয়না বের করে)—এই তো।

রাম—তাই তো, এই তো বটে! কোন দিকে গেল রাবণ—ওঠ লক্ষণ, চল, তাকে ধরতে হবে।

সু—পাগল নাকি? সে কোন কালে তার বাসায় পৌঁছে গেছে, দক্ষিণ দিকে তো যাচ্ছিল। তা ছাড়া ও সব চালাকি চলবে না, আগে আমার রাজ্য উদ্ধার করে দাও, তারপর বলেছি তো লক্ষ লক্ষ

বাঁদর চর চারদিকে পাঠাব, সে পাতালেই থাক আর আকাশেই উড়ুক, ঠিক ধরে নিয়ে আসব। তুমি কিচ্ছু ভেবো না।

রাম—(উঠে দাঁড়িয়ে) বেশ, তাহলে দেরি করা কেন? চল, বালীটাকে তাড়িয়ে আসি।

সু—কিন্তু তা পারবে কি, ব্রাদার? ঐ তো কাঁকলাশের মতো শরীর তোমাদের। বালীই না শেষটায় দু আঙ্গুলে ধরে রামচন্দ্রকে পট্‌কে দেয়। তার গায়ে পাঁচশো হাতির বল, তা জানো? নাঃ, তার কাছে তোমাকে পাঠাবার আগে একটা পরীক্ষা করা দরকার।

লক্ষ্মণ—এ সব কি বলছ, বন্ধু? কি পরীক্ষা করতে চাও কর।

সু—ও কি, রাগ করলে নাকি ভাই? না, না, সে রকম শক্ত পরীক্ষা নয়, এতে নল দিয়ে জল বেরুনোর অঙ্ক কষতে হবে না। আচ্ছা, ঐ দূরে পাহাড়ের চূড়োয় আরেকটি ছোটখাটো পাহাড়ের মতো দেখতে পাচ্ছ?

লক্ষ্মণ—তা পাচ্ছি; কি ওটা?

সু—ও হোল গিয়ে মহিষমুখো দুন্দুভির হাড়গোড়ের স্তূপ। দুন্দুভিকে মেরে বালী ওটাকে ওখানে ছুঁড়ে ফেলেছিল। কেউ উটিকে এক চুল নড়াতে পারে না। রাম যদি ওটাকে এক ঠ্যাঙে উঠিয়ে আটশো হাত দূরে ফেলতে পারে তবেই বুঝব।

লক্ষ্মণ—আলবৎ পারবে।

সু—হ্যাঁ! তাই না আরো কিছু!! আমার দাদা বালীর মতো এক আমি ছাড়া—

রাম—এবার থামো বাছা। চুপ করে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছাখ কেমন বাঁ পায়ের কড়ে আঙ্গুলে করে ওটাকে দশ যোজন দূরে ফেলি! (রামের প্রস্থান)

লক্ষ্মণ—হ্যাঃ! কাকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছে, চাঁদ? ওটাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছাখ!

সুগ্রীব—ঈ—শ্, কত বড় বড় বীররা সব মুখ চুণ করে—(নেপথ্যে সাংঘাতিক শব্দ) ওকি, কি ওটা?

হনু—ঐ—ঐ—ঐ—ফেলেছে তো ঠিক! জয় রামের জয়! (দু হাত তুলে নৃত্য)

সুগ্রীব—চোপ, অত নাচের কি হল বুঝলাম না! ওটা নিশ্চয় এতদিনে শুকিয়ে সোলার মতো হয়ে গেছে তাই পেরেছে। তাছাড়া তুমি না আমার অনুচর, বড় যে অন্য লোকের জয়গান কচ্ছ, লজ্জা করে না?

হনু—ভাবছি ট্র্যান্সফার নেব স্যার!

(রামের প্রবেশ)

হনু—আহা! শ্রীঠ্যাঙের কি বল গো। চাট্টি চরণরেণু দাও, বাপ। (সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ও রামের দু হাত তুলে আশীর্বাদ)

রাম—কি হে সুগ্রীব, এবার নিশ্চিন্ত হলে তো?

লক্ষ্মণ—বলছিল নাকি হাড় শুকিয়ে সোলা হয়েছে, তাই পেরেছ।

রাম—(হেসে) বটে, বটে ! তা হলে আর কি কত্তে হবে, বল।

সুগ্রীব—ছাখ, এটা হাসির কথা নয়, বালীকে মারাও চাট্টিখানি কথা নয়। তোমার ভালোর জন্মই বলছি। আচ্ছা ঐ যে সামনে সাতটা শালগাছ দেখছ, বালী এখানে দাঁড়িয়ে একেক তীরে একেকটাকে ফুঁড়ে দিত। পারো তুমি ?

রাম—এই ছাখ ! (তীর ছোঁড়া)

হনু—ঐ—ঐ—ঐ—। এক তীরে সাতটা ফোঁড়া ! জয় রামের জয় ! (ছু হাত তুলে নৃত্য)

সুগ্রীব—(রামের পায়ে পড়ে) রাম, তোমার মতো বাহাদুর আর কে বা এক আছে ! বালীটাও তোমার সঙ্গে পারবে না, কি মজা !

রাম—তা হলে চল কিষ্কিন্ধ্যায় !

হনু—কিষ্কিন্ধ্যা চল ! কিষ্কিন্ধ্যা চল !

ক্রমশঃ

জঙ্গল

উজ্জ্বল চৌধুরী

বয়স—৯, গ্রাহক নং ২২৫৯

পুজোর ছুটিতে আলিপুর দুয়ারে মাসীর বাড়ী গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ঠিক হল জলদপাড়ায় যাব। একদিন দুপুরে আলিপুর দুয়ারের স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে উঠলাম। যে জায়গায় ট্রেন থেকে নামলাম সেই জায়গাটার নাম হাঁসিমারা। সেখানে জীপ ঠিক করা ছিল। জীপে করে একটা কাঠের বাংলোয় পৌছলাম। সেখানে খিচুড়ি রান্না করে রাত্রে খেলাম। পরদিন ভোর চারটায় আবার একটা জীপ এল। তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নিয়ে রওনা হলাম। পাঁচটার সময় ঐখানকার অফিসে পৌঁছলাম। ওখানে তিনটে হাতি। আমাদের জন্য তিনটেই ঠিক করা ছিল কিন্তু দুটোতেই হয়ে গেল। ওখানে প্লাটফর্ম নেই, হাতি বসলে তার পিঠে উঠতে হয়। ওখান থেকে গিয়েই চোখে পড়ল একটা ঝরণা তার পাড়ে জন্তুরা জল খেতে আসে বলে নানারকম পায়ের ছাপ রয়েছে। অনেক ঘোরাঘুরির পর কতগুলো হরিণ দেখতে পেলাম। বাবার কাছে ক্যামেরা ছিল ওদের ফটো তুলে নিলেন।

হঠাৎ বনের মধ্যে থেকে একটা দুর্গন্ধ এল। গিয়ে দেখি বাঘ গরু মেরে গেছে তাই এত গন্ধ। আর এমন চালাক বাঘ যে কেউ যাতে বুঝতে না পারে তাইজন্য গরুটাকে বাঁশঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে। আর বিশেষ কিছু চোখে পড়ল না। কেননা তখন সাধারণতঃ জন্তু জানোয়ার বেরোয় না। দেখলাম লোকরা মাটিতে জায়গায় জায়গায় নুন পুঁতে দিচ্ছে এগুলো নোনা মাটি হয়ে গেলেই জানোয়ার খেতে আসবে আর তাদের নির্বিবাদে দেখা যাবে। এইভাবে অনেকক্ষণ ঘুরে ৯টার সময় 'রিজার্ভ ফরেস্টের' অফিসে এসে গেলাম। সেখান থেকে জীপে করে বাংলো। বাংলো থেকে স্টেশন। আর স্টেশন থেকে বেলা তিনটায় আলিপুর দুয়ারে মাসীর বাড়ী।

খসা তারা (নেহেরুকে)

ভাস্বতী গুহ, বয়স—১০, গ্রাহক নং ৬০৩

আকাশ থেকে একটি তারা পড়েছিলো খসে,
আবার সেথায় চলে গেল, মোদের ভালবেসে।
চুয়াত্তরটি বছর ধরে রইল হেথায় শেষে,
কি কথা তার পড়ল মনে, চলে গেল দেশে।
বিশ্বজোড়া খ্যাতি তাহার, বাসতো ভালো সবে,
নাম যে তাহার ইতিহাসে অমর হয়ে রবে।
কোথায় তুমি আজকে আছ মোরা জানি না কো,
ভক্তিপূর্ণ প্রণাম মোদের চরণেতে রাখো।

'চশমা'

শাশ্বতী দত্ত ; বয়স—১১ ; গ্রাহক নং ৫৭

ভাই সন্দেশ পড়ুয়ারা। তোমরা কি কেউ চশমা দেখেছ ? আমার প্রশ্ন শুনে তোমরা হয়ত বলবে এ আবার কিরকম প্রশ্ন ? চশমা কে না দেখেছে ? কত লোকই তো চশমা পরে। কিন্তু না। আমি সে চশমার কথা বলছি না। আমি যে চশমার কথা বলছি, সে চশমা তোমরা অনেকেই দেখনি। শুনতে চাও সে চশমার কথা ? তবে শোনো, বলি।

গত গরমের ছুটির সময় আমরা দেরাদুন গিয়েছিলাম। সেখানে যাবার পরদিন আমরা 'চশমা' দেখতে গেলাম। সেখানে গিয়ে যা দেখলাম, তার সঙ্গে, তোমরা যা ভাবছো, সে চশমার এতটুকুও সাদৃশ্য নেই। গিয়ে দেখি একটা ছোট পাহাড়। তার ওপর একটা কৃত্রিম জলাধার। আর সেই জলাধারের নিচ দিয়ে একটা নল পাহাড়ের গায়ে এসেছে। সেই নল দিয়ে দিবারাত্রি জল পড়ে। দেখলে মনে হয় যেন জলাধারটি ফুটো হয়ে গেছে, এবং সেই ফুটো দিয়ে জল পড়ছে। আগে যখন জলাধারটা তৈরী হয়নি, তখন পাহাড়ের গা বেয়ে, পাহাড়ের ভেতর থেকে জল পড়ত। কখনও সে জল পড়া থামেনি। তারপর লোকে দেখলো যে জলটা খুব ভাল। তখন তারা এই জলাধারটা তৈরী করল। তারপর সেই জল পাইপ দিয়ে শহরে পাঠাল। এখন, নল দিয়ে যে জল পড়ে, সেই জলে সেখানকার লোকে স্নান করে এবং সেই জল লোকে খায়ও।

তারপর বাকি জলটা, একটা নালা দিয়ে পাশের নাহারে চলে যায়। নাহার কি জিনিস জান ? জলসেচের জন্য যে খাল ব্যবহার করা হয়, তাকে সেখানকার লোকে 'নাহার' বলে। এখন শুনলে তো চশমার কথা। জিনিসটা আশ্চর্য নয় কি ?

রসবড়া

অভিজিৎ ভট্টাচার্য: বয়স—১২ ; গ্রাহক নং ২৭৩

এক।
আমি খাই, তুই বসে ছাখ!
দুই!
তুমি বোস, আমি শুই,
তিন।
পিঠে কুলো বেঁধে নিন,
খেতে হবে মার
এক দুই তিন চার।
তিন চার পাঁচ।
ঐ তাল গাছ
ছোট খাটো নয়—।
চার পাঁচ ছয়
লম্বায় হবে হাত
পাঁচ ছয় সাত।
আট।
মার মার কাট্ কাট্
কিবা আছে ভয়?
সাত আট নয়।
আট নয় দশ।
রসবড়া ফেলে দিয়ে
খেয়ে যাও রস।

নেড়ার পটল তোলা

প্রদীপ মজুমদার—গ্রাহক নং ৫৫০ বয়স ১২ বছর

'এই শোন্ ভন্টা' খান্ত মাসী ডাকলেন, মাসার ডাক শুনে আমি একেবারে আমৃসি। তবু মাসীর কাছে আসতে হল, ফাঁসিকাষ্ঠের আসামীর মতো হয়ে।

এই, নেড়া কোথায়?—মাসী বললেন। আমি মাথায় হাত দিয়ে দেখি সে নিজের জায়গাতেই আছে, মাসীকে তাই দেখালাম, মাসা হেসে বললেন—না রে, আমার নাতি নেড়া।

আমার ভয়ে হাত পা সেঁধিয়ে গেল। তবু বললাম—'আর বলেন কেন, নেড়া বললে—আজ আমার লাক্ ভাল, তাই মাসীর কাছ থেকে আট আনা বাগিয়েছি। আট আনা শুনে আমিও ওকে পাকাবার চেষ্টা করি, আমি বললাম—সজল-মামার রেষ্টুরেণ্টে আট আনায় দুই জন দুটো মামলেট্ খাওয়া যাবে। মামার দোকানে গেলাম, খেলাম মামলেট্, তারপর মামাকে লেট্ করতে দেখে আমরা কেটে পড়লাম।'

'কেটে পড়লে কি গো ? তুমিত আমার সামনেই আছ। তাহলে নিশ্চয়ই নেড়া—ওগো আমার কি হোল গো'—বলে মাসী কাঁদতে লাগলেন, আমি যতই বলি আমরা দুজনেই কেটে পড়লাম। মাসী ততই কাঁদে। আমি ত হতভম্ব তারপর আমি যখন বললাম—'আমরা দুইজনেই ওখান থেকে চলে গেলাম।' 'আ—মর তাই বলবিত।' খান্ত মাসী খান্ত হলেন। খান্ত মাসীকে খান্ত করে আমি আবার আরম্ভ করি' তারপর অনেক ঘুরে অমুদের দোকান থেকে আবার আম্‌লেট্ খেলাম। এখানে অবশ্য অমু লেট করল না। দামটা তাকে দিতে হল।'

আমি একটা ঢোক গিলে আবার আরম্ভ করি—'বাইরে এসে নেড়া বলল 'যাক্ ডবল ডিম খাওয়া গেল একটার দামে।' নেড়ার এতক্ষণে ডবল ডিমের তেজ বেরুল, ও এক লাফে একেবারে রাস্তায় সেখান থেকে, না ফুটপাত নয়, একেবারে ডবল ডেকারের তলায়।' 'অঁা অঁা আমার নাতি বা···বা··· বাসের তলায় প···প···পড়ল ?'

আমি খান্ত মাসীকে আ আ থেকে খান্ত করে বললাম—'না না তখন বাস্‌টা থেমে ছিল।' 'তাই বল, তোরা কথাগুলোকে এমন পাকিয়ে পাকিয়ে বলিস যে তোদের মতো পাকা ছেলে ছাড়া কেউ বুঝতে পারবে না'—খান্ত মাসী বললেন।

আমি আবার আরম্ভ করি···

আসছিল ভালই, কিন্তু হঠাৎ পড়ে গেল। পড়তেই পটল তুলল, তা না হলেই রক্তারক্তি হত। 'প···প পটল তু তু তুল ল কি কি বলছিস রে'—মাসী বললেন।

আমি আমার ভুল বুঝতে পেরে হাসতে হাসতে বললাম না গো আমার বন্ধু পটল ওকে তুলেছিল, বুঝলে ?

মন

স্বপন দে

গ্রাঃ নং—এন্ ১২৯৪ বয়স—১৩

কেন ওই বনের মাঝে।
গাছের ধারে॥

আগুনের শিখা জ্বলে
মন আমার ॥
স্বপন ভরে ওঠে।
বলতে পার আমায় ॥
মনের ভাবনা দূরে ফেলে।
এলাম বনে চলে ॥
বনের পাতা নড়ে ওঠে।
আগুনের শিখা জ্বলে ওঠে ॥

ছোট নদী

সুপ্রিয়া ভট্টাচার্য

গ্রা: নং এন ১৭৯৫ বয়স—১৪ বছর

ছোট নদী এঁকে বেঁকে
কোথায় তুমি যাও ?
আমিও যাব তোমার সাথে
সঙ্গে নিয়ে নাও ॥
তোমার কোলে ভেসে ভেসে
দেখব কত দেশ,
কত নদী কত গ্রাম
নাইরে তার শেষ।
ছোট ছোট মাছের সাথে
করব আমি খেলা,
স্নান করতে খেতে আমি
করব নাকো বেলা।
লক্ষ্মী হয়ে থাকব আমি
সঙ্গে নিয়ে নাও,
এঁকে বেঁকে কুলকুলিয়ে
যেথায় তুমি যাও।

তারার আয়ু

এনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

অনেকদিন আগে এক সবজান্তা ব্যক্তি ছিল বলে একটি গল্প শোনা যায়, তার কাজই ছিল সকলকে ঠকিয়ে বেড়ানো, পৃথিবীতে এবং তার বাইরেও হেন জিনিস নেই যা তার অজানা—তার এই বড়াই শুনে একদিন সে দেশের রাজা তাকে ডেকে পাঠালেন। রাজা তাকে বললেন আমি তোমাকে তিনটি প্রশ্ন করব, উত্তর দিতে পারো ভাল, না দিতে পারলে তোমার মাথা কেটে নেওয়া হবে। সবজান্তা তাতেই রাজি। প্রশ্নগুলির মধ্যে একটি ছিল আকাশে কত তারা? উত্তর শুনে রাজা মশায়ের আর কিছু বলার থাকে না। সবজান্তা বলে তিন কোটি চুরাশী লক্ষ কুড়ি হাজার তিনশো পাঁচ— বিশ্বাস না হয় গুণে দেখুন।

একথা শুনে রাজামশাই যে বিলক্ষণ বিপদে পড়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। যদিও এটা গল্প, কিন্তু এমন একটা সংখ্যা বিশ্বাস করার মত কিনা জিগেস করলে অনেকেরই ভ্যাবাচাকা লেগে যাবে। মেঘশূন্য পরিষ্কার রাতে আকাশের দিকে তাকালে খালি চোখে কত তারা দেখা যায় তার একটা মোটামুটি হিসেব অবশ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন, যদিও তার সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিসীমানার বাইরে যে সব নক্ষত্র আছে তাদের সংখ্যার কোন তুলনা হয় না। এর মধ্যে আবার আর একটা ব্যাপার আছে। পৃথিবীর এই পিঠ থেকে আকাশের যতগুলো তারা একজন লোকের নজরে পড়ছে পৃথিবীর ওপিঠের অপর একজনের নজরে সেগুলো পড়ছে না। পৃথিবী থেকে সাদা চোখে প্রায় ছয় হাজারের মত তারা দেখতে পাওয়া যায়। ছোট দুই ইঞ্চি লেন্স-ওয়ালা টেলিস্কোপ দিয়ে দেখলে এই সংখ্যা বেড়ে হবে তিন লক্ষ। প্রথম টেলিস্কোপ তৈরী করেছিলেন গ্যালিলিও, ১৬১০ সালে। সেই যন্ত্রে তিনিই প্রথম দেখলেন জ্বলন্ত বাষ্পের মত ছায়াপথ বস্তুটি আসলে অনেকগুলো তারার সমষ্টি। আজকাল অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে এতদূর পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে শুনলে হয়তো সেকালের সেই সবজান্তা ব্যক্তিরও মাথা ঘুরে যেত। শুধু দেখেই নয়, আজকাল ছবি তোলা হচ্ছে এমন সব তারার, যেগুলো আমাদের থেকে যে কত কোটি কোটি মাইল দূরে আছে তা চিন্তা করলে স্তম্ভিত হতে হয়। এই সমস্ত তারার সংখ্যা হিসেব করে দেখা হয়েছে দশ হাজার কোটি।

এই যে আকাশ ভরা অসংখ্য তারা সমস্ত ক্ষণ জ্বলছে নিবছে—এরা কি সত্যি সত্যিই একদিন নিবে যেতে পারে? কোনো কোনো তারা অবশ্য স্থির আলোর শিখার মত জ্বলজ্বল করে, কিন্তু যে সব তারা মিটমিটে, খালি চোখে এই দেখা যায় এই দেখা যায় না, মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় তারা সত্যি সত্যি আছে নাকি—এদের ভেতরের রহস্যটা কি? একালের সবজান্তারা বলেন সূর্যের ভেতরে যেমন করে প্রচণ্ড চুল্লীতে পারমাণবিক শক্তি তৈরী হচ্ছে, যার নকল করে পৃথিবীতে তৈরী হয়েছে হাইড্রোজেন বোমা—তারাদের ভেতরেও ঠিক সেই জিনিসই ঘটছে। নিজেদের শরীরের উপাদানের মধ্যেই আছে এদের অকল্পনীয় শক্তির উৎস। হিলিয়ম বা হাইড্রোজেনের অ্যাটম ভয়ঙ্কর উত্তাপের প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে ঘুরতে নিজেদের মধ্যে ধাক্কা খেয়ে সংযোজিত হচ্ছে—প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সঙ্গে দুটি অ্যাটমের কেন্দ্র জুড়ে হচ্ছে এক—এই এক হবার প্রক্রিয়ার সময় খানিকটা উপাদান উড়ে যাচ্ছে—শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে—সংক্ষেপে এই হল 'থার্মোনিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্সন'। বাংলায় একে বলে তাপকেন্দ্রীণ বিক্রিয়া। এই বিক্রিয়া চলেছে যুগ যুগ ধরে, কিন্তু অনন্তকাল ধরে চলবে সেকথা বুকে হাত দিয়ে কোনো তারাই বলতে পারে না। বরং সাক্ষ্যপ্রমাণ নিয়ে আজকালকার সর্বজ্ঞ বিজ্ঞানীরা বলছেন যে তারাদেরও আয়ুষ্কাল আছে। হতে পারে মানুষের জীবনের মাপকাঠিতে সেটা অনন্তকাল, কিন্তু বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের খেলাঘরে তা কিছুই নয়। ক্রমাগত পুড়তে পুড়তে তারাদের শরীর ছোট হয়ে আসছে—যেমন হচ্ছে সূর্যের। এতে আমাদের ভয় পাবার কারণ নেই। কোটি কোটি বছর পরে পৃথিবী শীতে জমুক বা গরমে পুড়ুক, তাতে আমাদের কী-ই বা ক্ষতিবৃদ্ধি!

কোটি কোটি বছর ধরে ক্রমাগত জ্বলবার পর তারা-দেহ ক্রমে সঙ্কুচিত হয়ে আসবে, জ্বালানীও কমতে থাকবে সঙ্গে সঙ্গে। এই ভাবে লক্ষ লক্ষ বছর কেটে যেতে কোনো বাধা নেই। তারার মৃত্যু দু-একদিনের ব্যাপার নয়।

বাইরে থেকে লোকে কি করে বুঝবে যে তারার মরণকাল ঘনিয়ে এসেছে? বোঝার একটা প্রধান উপায় হল, তারার জ্বলজ্বল করা বা মিটমিট করার ধরণটি। পরিধি যেমন ছোট হয়ে আসবে তেমনি আলোর বিকীরণ প্রতিদিন হবে এক একরকম, কখনো হঠাৎ বেশী হয়েই একেবারে কম—এই করতে করতে তুবড়ী ফেটে যাওয়ার মতো সমস্ত তারাটি একদিন আলোর ফুলকি হয়ে ধ্বংস পেয়ে যাবে—কি বিচিত্র বর্ণের ঝলকানি দেখা যাবে সে সময় ভাবতে গেলে আমাদের কল্পনাও হার মেনে যেতে বাধ্য।

যে তারা যত বড়, তার ঔজ্জ্বল্য সেই অনুপাতে অনেক বেশী। একটা অঙ্কের হিসাব কষে দেখা গেছে যদি কোনো তারার দেহ হয় সূর্যের দ্বিগুণ, তবে তার দীপ্তি হবে দুগুণ বেশী না হয়ে আটগুণ বেশী, তেমনি যে তারা সূর্যের চেয়ে তিনগুণ বড়, তার দীপ্তি সূর্যের চেয়ে সাতাশ গুণ বেশী। পৃথিবী থেকে এই ঔজ্জ্বল্য যে দূরত্ব অনুযায়ী কম বেশী মনে হবে, সেকথা না বললেও চলে। একটি তারা অন্য একটির চেয়ে বেশী জ্বলজ্বলে হওয়ার কারণ কি? দূরত্বের কথা না হয় এখানে বাদ দেওয়া গেল। যে তারা যত বেশী হারে তার জ্বালানী পুড়িয়ে খরচ করছে তার দ্যুতিও হবে তত বেশী; কিন্তু

সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার যে সেটা হচ্ছে নেহাত মূর্খের মত বেহিসেবী কাজ। কেননা জ্বালানী ফুরিয়ে গেলেই তো তারারও আয়ু খতম !

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই রকম, যে তারা আকারে যত বড় সে জ্বলছে তত বেশী পরিমাণে এবং ফুরিয়েও আসছে তাড়াতাড়ি। সৃষ্টির আদি যুগে এমনি করে কত প্রকাণ্ড তারা তৈরী হয়েছে আর বিনষ্ট হয়েছে তার হিসেব নেই। তাদের চেয়ে অনেক ছোট আকারের একই সময়ে তৈরী হওয়া তারা, হিসেব করে জ্বালানী পুড়িয়ে পুড়িয়ে এখনও বেঁচে আছে, আমাদের চোখে তাদের আলো ধরা দিচ্ছে এখনও।

আমাদের ছায়াপথে কিছু এমন তারা আছে যাদের ঔজ্জ্বল্য দেখে আশঙ্কা হয় এরা দশ কোটি বছরের বেশী টিঁকে আছে কি করে। কিন্তু টিঁকে যখন আছে তখন একটা জিনিসই প্রমাণ হয়, সেটি হল এরা নবাগত, অনেক পরে এদের জন্ম হয়েছে। তা না হলে এদের যা জ্বলার হার, তাতে বিলয় পেতে খুব বেশী বিলম্ব নেই ; বিলম্ব মানে অবশ্য মহাকাশের ক্যালেণ্ডারে।

ইংরেজ জ্যোতির্বিদ ও দার্শনিক সার আর্থার এডিংটন একবার বলেছিলেন, 'তারার মতো সহজ ব্যাপার আর কিছু নেই। এদের আদ্যোপান্ত বুঝে ফেলা মোটেই শক্ত নয়।' শুনলে অবাক হবার মতো কথা বৈকি। তারার মতো সহজ ব্যাপার আর কিছু নেই—তারা সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞাতব্য সব আমাদের নখদর্পণে—এসব কিন্তু মোটেই বৈজ্ঞানিকের বাজে বড়াই নয়। তারা সম্বন্ধে কি কি জানা গেছে দেখাই যাক। প্রথমতঃ জানা গেছে সূর্যের ভেতরের যা তাপ, তার চেয়ে বহুগুণ বেশী উত্তপ্ত এদের বাইরে ও ভেতর। এমনই প্রচণ্ড গরম যে তাতে কোনো পদার্থই কঠিন হয়ে থাকতে পারে না, গলে গ্যাস হয়ে যায়। খুব খুঁতখুঁতে বিজ্ঞানের ছাত্র অবশ্য বলবেন পদার্থের এই অবস্থা হল না কঠিন, না তরল, না গ্যাসীয়—এ এক চতুর্থ অবস্থা, একে বলে প্লাজ্‌মা। নামটা যাই হোক না কেন, মানেটা বুঝতে সুবিধে হবে, যদি বলি যে লোহার মত কঠিন দ্রব্য গলিয়ে গ্যাস বানাতে লাগে তিন হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের তাপ, এ হেন লোহাও সেখানে প্লাজ্‌মা হয়ে বিচরণ করছে। তবেই ভেবে দেখ কি ভয়ানক অবস্থা সেখানকার। আমাদের যখন এই বিকট উত্তাপের কথা ভেবে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, বিজ্ঞানীরা কিন্তু সেদিক দিয়ে মোটেই চিন্তা করছেন না, তাঁরা বলবেন, তবে তো ব্যাপারটা বেশ জলবৎ তরলম (কিম্বা প্লাজমাবৎ তরলম) হয়ে গেল। একবার গ্যাস হয়ে গেলে, পদার্থের নড়াচড়া সম্বন্ধে যে সব প্রাকৃতিক নিয়ম জানা আছে, তার মধ্যে ধরা পড়ে গেল সব—লোহাই বল, আর হিলিয়ম বা অন্য কোনো মৌলিক পদার্থ যা দিয়ে তারাদের দেহ তৈরী, যাই বল না কেন।

কিন্তু সহজ বললেই তো হল না, সহজ কথা আবার অনেক সময় খুব সহজে বলা শক্ত। তারাদের সম্বন্ধে জানবার এত জিনিস আছে যে মাত্র কয়েক পাতায় তা আঁটানো অসম্ভব। তোমরা কৌতূহলী হলে, পরে এ বিষয়ে আরো চর্চা করে দেখতে পার। আমাদের দেশের মেঘনাদ সাহা খুবই অল্প বয়সে পৃথিবী বিখ্যাত হয়েছিলেন, সূর্য-তারা সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের জন্য। তোমরা বড় হয়ে সে সব বুঝে দেখো—ভারী আশ্চর্য লাগবে।

চিঠিপত্র

সৌম্যেন্দুবিকাশ সরকার

তোমার ম্যাজিক কবিতা ভালো লেগেছিল শুনে খুসি হলাম। আমাদেরও ভালো লেগেছিল। তবে সব সময় একই লেখকের একই ধরণের লেখা না ছেপে, মাঝে মাঝে মুখ বদল করা ভালো নয় কি? অবিশ্যি ভবিষ্যতে আরও ম্যাজিক কবিতার ব্যবস্থা করবার ইচ্ছা আছে।

অম্বালিকা লাহিড়ী—৬৫৯

চৈত্র মাসে আগামী বছরের চাঁদা পাঠিও।

(৩) **প্রত্যুষ দাশগুপ্ত ও ভাস্কর দাশগুপ্ত—**

মাভৈঃ, মাননীয় সম্পাদক মশাই তোমাদের জন্য বড় বড় গল্প লিখতে ব্যস্ত আছেন।

(৪) কিশলয় নন্দী, এন্ ১৫১৭

গ্রাহক কার্ড যথা সময় পেয়ে যাবে, ভাবনা নেই। যে সব লেখা ও ছবি চেয়েছ, তার কথা মনে রাখব। তবে নানান লেখকের রচনা ও নানান শিল্পীর ছবি দিলে কি আরও ভাল হয় না?

(৫) বন্দন কুমার হালদার—১৭০৬

সন্দেশের প্রতি সংখ্যার দাম '৭৫ পয়সা, আমাদের আপিশে চিঠি লিখে ভি-পিতে, কিম্বা পয়সা দিয়ে লোক পাঠিয়ে আনিয়ে নিয়ো।

পত্রবন্ধু চাই (ক) অম্বালিকা লাহিড়ী—৬৫৯, বয়স ১৪ ; শখ বই পড়া, সেলাই।

(খ) বন্দনকুমার হালদার ১৭০৬, বয়স ১০ ; শখ, গল্পের বই, খেলাধুলো, ডাক টিকিট সংগ্রহ।

(গ) সুশান্ত সাহা ১২৬৯, বয়স ১৫ ; শখ, নাচ, গান, ছবি আঁকা।

(ঘ) অঞ্জন মুখার্জি এন্ ১২৭১, বয়স দেয় নি ; শখ, ডাকটিকিট সংগ্রহ, গান।

সম্পাদকীয়

সন্দেশের প্রিয় গ্রাহক গ্রাহিকাদের ১৯৬৫ সালের শুরুতেই অনেকগুলি কথা মনে করিয়ে দিই। প্রথম হল, যখনি চিঠি লিখবে, বা ধাঁধার উত্তর কিম্বা হাত পাকাবার আসরের জন্য লেখা পাঠাবে, নিজের নাম, ঠিকানা, গ্রাহকসংখ্যা, ও বয়স স্পষ্ট করে লিখে পাঠাবে। পাথরঘাটা, পাকুড় থেকে মণ্টু বলে যে চিঠি দিয়েছে সে এসব কিছুই দেয় নি, উত্তরও পায় নি।

দ্বিতীয় কথা হল, আমাদের আপিশে একেক জনের উপর একেকটি কাজের ভার থাকে। সেই

জন্য যখনি একই খামে ধাঁধার উত্তর, হাত পাকাবার আসরের লেখা ও চিঠি দেবে, আলাদা কাগজে দিও আর খামের বাঁ দিকের উপরের কোণে লিখে দিও কোন কোন বিষয়ে লিখেছ, যথা ধাঁধা, চিঠিপত্র, হাতপাকাবার আসর। পোস্ট কার্ডে লিখলে, কার্ডের মাথায় ১, ২, ৩ করে বিষয়গুলি লিখে দিও। তা না দিলে হয়তো একটা বিষয়ে উত্তর পাবে না, তখন আবার আমাদের উপরেই রাগ হবে!

আরো কয়েকটি পুরোনো কথা নতুন করে বলি। কপি রেখে লেখা পাঠিও, কারণ অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠাবার আমাদের ব্যবস্থা নেই। ডাকটিকিট দিলেও সময় ও কর্মীর অভাবে এটা সম্ভব হয় না, কাজেই ডাকটিকিট দিও না। লেখা মনোনীত হলে তো হাত পাকাবার আসরের পাতায় দেখতেই পাবে। সম্পাদক বেচারাদের চিঠি লিখে বকাবকিও ক'র না, গত বছর তিনটে কবিতা পাঠালাম, তার কি হল ইত্যাদি! বিশ্বাস কর, ভালো লেখা হলেই আমরা খুসি হয়ে প্রকাশ করি। যথেষ্ট ভালো না হলে আমরাই বা ছাপি কি করে আর তোমরাই বা পড়বে কেন?

১৯৬৫ সালটি তোমাদের ভালোভাবে কাটুক।

ইতি—
স—স

ধাঁধার উত্তর

পিয়নের ডাক শুনি 'ডাক এল' বলি,
গলি পানে গেল ভোলা আনন্দেতে গলি।
'বৃক্ষশাখে পত্র নাহি' পত্র দিল বাপে,
'পুর্ব দেশে অনাবৃষ্টি, পুর্ব জন্ম পাপে।
শূন্য ঘটে ফিরি, কত কি ঘটে কপালে,
বহু কাল পরে কাল ভাত দিনু গালে।'
পত্র পড়ি ভূমে পড়ি নাহি সরে কথা,
ক্ষণ পরে কহে পরে কি বুঝিবে ব্যথা।
পরের মনের বোঝা বোঝা যাবে কিসে?
সর্ব লোকে জ্বলে লোকে নিজ চিন্তা বিষে।
বেশি নয় ছিল সবে নয় বিঘা ভূমি,
তাও কিনা হরি খুড়ো হরি নিলে তুমি!

বেশ ভূষা বিলাসেতে বেশ আছে পাপী,
খোলা ঘরে খোলা গায়ে আমি শীতে কাঁপি।
রাজর্ষি জনক তুল্য জনক আমারি,
তবু কেন তারে নাহি তারে গিরিধারী!
এই ভাবে যত ভাবে রাগে দেহ জ্বলে।
তেড়ে বলে পাপিষ্ঠেরে মারি নিজ বলে।
আর কেন বাজে কথা বাজে সাড়ে চারি।
দণ্ড দিব আজি তারে এই দণ্ড মারি।
করে লয়ে বংশ-যষ্টি করে আস্ফালন।
না মানে বারণ যেন উন্মত্ত বারণ।
মত্ত গজ সম বেগে শত গজ গিয়া,
'কার লাগি দ্বন্দ্বে লাগি'—কহে সে ফিরিয়া
'মরিল ভায়েরা সবে, আমি সবে বাকি।
পিলেজ্বরে ছেলেপিলে সবই দিল ফাঁকি।
ঝঞ্ঝা বাতে ভুগি বাতে কাঁপে মাতা শীতে,
সহিতে না পারি মরে গৃহিণী সহিতে।
কে পারে বর্ণিতে দুঃখ বসি নদী পারে,
'জল দেহ' বলি পিতা দেহ বুঝি ছাড়ে
পথ পাশে কাঁদে ভোলা পড়ি মোহ পাশে,
রয়েছি কুটির বাসে শতছিন্ন বাসে।
ভাঙ্গিল সুখের ঘোর ঘোর দুঃখ সয়ে,
অদৃষ্টের ফেরে লোকে ফেরে অন্ধ হয়ে।'
শূন্যে চাহি কহে 'আর কি চাহি সংসারে
বাঁচিবে কি বংশ মম বংশ মারি তারে?
যে বিধি করিল বিধি সহিব তাহারে,
বলি পথ ধারে বসে মুছি অশ্রু ধারে।
হরি নামে দুঃখ ভুলি নামে গিয়া জলে,
জল পানে শান্ত হয়ে গৃহ পানে চলে।

এ ছাড়াও গ্রাহকদের পাঠান অন্য কয়েকটি উত্তর ঠিক বলে ধরা যেতে পারে, যেমন পঞ্চম লাইনে 'করে', ষোড়শ লাইনে 'বল', একবিংশ লাইনে 'মেলা' অথবা 'কাল' ইত্যাদি।

কিন্তু যারা এমন দুটি শব্দ ব্যবহার করেছে যার অর্থ একই, সেখানে নম্বর দেওয়া হয়নি, যেমন

চতুর্দশ লাইনে 'ভিজা' অথবা 'খালি'। তাছাড়া ছন্দ কাটলে বা অর্থ না হলে তো ধরাই হয় নি। দ্বাবিংশ লাইনে ছাপার ভুল ছিল তাই, সেখানে সকলের উত্তরই ঠিক বলে ধরা হয়েছে।

তোমরা ঠিকই বলেছ, পৌষ মাসের ধাঁধা সত্যিই একটু বেশি কঠিন হয়ে পড়েছিল। তবু দেখছি কেউ কেউ খুব ভাল উত্তর দিয়েছ। যাদের অল্প ভুল হয়েছে তাদের নামও এবার ছাপা হল।

নির্ভুল উত্তর দিয়েছে—৫১১ প্রতুল, প্রদীপ, প্রণব ও প্রবীর কুণ্ডু, এন্ ১৯৩৮ লীনা মিত্র।

একটি মাত্র ভুল অথবা বাদ—১০৯৭ ঝুমকা সেন, ২৭৭৩ মৌসুমী সেন। **দুটি ভুল**—৪২৪ অশোক ও অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, এন্ ১৩৭৪ কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, **তিনটি ভুল**—১৯১৯ মাধুরী রক্ষিত, ২৭৭৫ গোপা পাল, **চারটি ভুল**—২৪৬৭ পার্থ মিত্র ঘোষ, ২৮৮৯ রণজিৎ দে, **পাঁচটি ভুল**—নতুন গ্রাহক মুকুর দাশগুপ্ত, নতুন গ্রাহক সোনালী সরকার, **ছয়টি ভুল**—১৩৯২ শংকর গুপ্ত, **সাতটি ভুল**—এন্ ১০৩৮ কাবেরী মণ্ডল, ১১৯০ অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২১৬২ কাজল দত্ত ২৪৯৩ বাণী, নচিকেতা ও অনিরুদ্ধ, ২৭০১ মধুশ্রী ব্যানার্জি, ২৭০২ অঞ্জন সেনগুপ্ত।

নতুন ধাঁধা

(উত্তর পাঠাবার শেষ দিন ৩০শে মার্চ)

(১)

কেহ রাখে সাবধানে, কত যত্ন করে তায়,
কেহ বা ফেলিয়া দেয়, অবজ্ঞার ভরে হায়।
যতই তাড়াও তারে, ফিরে আসে অমনি,
সহজে বঞ্চিত তাহে শিশু আর রমণী।

(২)

চার খণ্ড অভিধান পাশাপাশি পর পর সাজানো রয়েছে, প্রত্যেক খণ্ডের পাতাগুলি ৩½ ইঞ্চি এবং এক এক দিকের মলাট ⅛ ইঞ্চি মোটা।

প্রথম খণ্ডের প্রথম পৃষ্ঠা থেকে চতুর্থ খণ্ডের শেষ পৃষ্ঠার দূরত্ব কত ইঞ্চি?

(৩)

(নিচের গল্পটির মধ্যে কতগুলি ফলের নাম লুকোন আছে—বার কর তো!)

আমাদের বাড়িতে মিস্তিরি খাটছে, রাতদিন মেরামতের ঘসঘস, পেটানোর ধপ ধপ শব্দ শুনছি। আজ সুরু হল চুণকাম। রাঙাদার সঙ্গে আমরা তাই মামাবাড়ি এসেছি— আমি, রাজা, মদন, মিলি আর ছোট খুকু ডালি। মজা করেছি সারাদিন আর খেয়েছি সন্দেশ, রসগোল্লা, দানাদার। রাজা যা বাচাল, তাক থেকে পেড়ে নিয়ে টপাটপ মিষ্টি খাচ্ছে আর বলছে—এরই দাম চার আনা! রসগোল্লা, না এ রসমুণ্ডি!

মিলি চুপ করে ছিল, কিন্তু মদন হাঁড়িটা নিয়ে এক লাফে দূরে গিয়ে বলল—সবাই খাবে দানাদার আর তুমি একা রসগোল্লা সাবড়াবে—এ কেমন আবদার! জানোই তো দুজনে কি রকম লাগে।

রাজা বলল—বাঃ—এতো মামাবাড়ির আবদার!

বিশেষ দ্রষ্টব্য, উত্তর দাতারা ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে নতুন বছরের চাঁদা পাঠাতে ভুলো না কিন্তু।

শ্রীঅরবিন্দ দাশগুপ্ত

রোভার্স কাপ:

রোভার্স কাপ ভারতবর্ষের তিনটী প্রধান ফুটবল প্রতিযোগিতার অন্যতম। এ বৎসরের প্রতিযোগিতায় কলকাতার শক্তিশালী তিনটি দল অংশ গ্রহণ করেছে। যথা মোহনবাগান্ ইস্ট্ বেঙ্গল ও বি্ এন্ রেলওয়ে। এ তিনটী দলই এখনও অপরাজিত আছে। মোহনবাগান, ই, এম, ই সেন্টারকে ৩—০ গোলে ও নারামুর ইন্টিগ্রাল কোচ ফাক্টরীকে ২—১ গোলে পরাজিত করে সেমি ফাইনেলে উন্নীত হয়েছে। ইস্ট্ বেঙ্গল দল বম্বে ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ে (Bombay Western Railway) কে ১—0 ও বি্ এন্ আর দল টাটা স্পোর্টস্ ক্লাব (Tata Sports Club) কে ২—০ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনেলে উন্নীত হয়েছে। তিনটি কলিকাতা দলের এরকম সহজ গতিতে এগিয়ে যাওয়াটা প্রমাণ করছে কলকাতার ফুটবল খেলার মান অন্যান্য প্রদেশ থেকে অনেক উঁচু।

গত সংখ্যায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ফুটবল খেলোয়াড় স্যার স্টান্‌লী ম্যাথুস সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা হয়েছিল। গত ২রা ফেব্রুয়ারী তিনি তাঁর জীবনের ৫০ বৎসর পুর্ণ করলেন। ৫০ বৎসর বয়সেও উনি স্টোক সিটির একজন নিয়মিত এবং নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়। ইংলণ্ডে এক সময় ফুটবল মানেই বোঝাত স্টানলী ম্যাথুস আর স্টানলী ম্যাথুস মানেই ছিল ফুটবল। বিশ্ব ফুটবলের সাথেও তাঁর ছিল অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ। খেলোয়াড় জীবনে তিনি পেয়েছেন যত সম্মান তা বোধহয় সকল খেলোয়াড়েরই স্বপ্ন। একটানা বহুদিন আন্তর্জাতিক ফুটবলে ইংলণ্ডের পক্ষে তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন। ওদেশের ফুটবল মাঠে তাঁর মতন জনপ্রিয়তা আর কারুরই নাই। তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে ইংলণ্ডের প্রিন্স ফিলিপ বলেছেন যে জীবদ্দশতেই স্যার স্টানলী ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।

কলকাতা ফুটবলের এক কালের যাদুকর সামাদের নাম সুপরিচিত। এই সেদিন ৭৪ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তিনি বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে দলে তার ফুটবল জীবন শুরু করেন। অল্প বয়সে ফুটবল খেলা শুরু করে তিনি দীর্ঘ ৪০ বৎসর যাবৎ খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি এরিয়ান্স, মোহনবাগান, ই, বি, আর ও মহোমেডান স্পোর্টিং এর পক্ষে খেলেন। তিনি জাভা, হংকং, সিংহল, অস্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক খেলায় অপূর্ব ক্রীড়ানৈপুন্য দেখান, ১৯৬২ সালে তিনি পাকিস্থান প্রেসিডেন্টের পুরস্কার লাভ করেন।

ক্রিকেট ঃ—

ইডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত দলীপ সিংজী ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় প্রথম ইনিংসের ফলাফলে পশ্চিম অঞ্চল পূর্বাঞ্চলকে পরাজিত করে ফাইনেলে উন্নীত হয়েছেন। বিজয়ী দল শেষ খেলায় মধ্যাঞ্চলের পক্ষে দ্বিতীয় ইনিংসে পঙ্কজ রায় ও অম্বর রায় দৃঢ়তাপুর্ণ ব্যাটিং করেছিলেন।

দলীপ সিংজী অর্থাৎ যাঁর নামে এ প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়েছে তাঁর সম্বন্ধে একটু লেখা প্রয়োজন। তিনি বিখ্যাত ও অমর ক্রিকেট খেলোয়াড় রণজীর ভাইপো। তিনি অল্প কিছুদিন মাত্র ক্রিকেট খেলতে পেরেছিলেন কিন্তু তার মধ্যেই ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন তাঁদের হয়ে খেলতেন। পরে ইনি বিলাতের কাউন্টি সাসেক্স এর হয়ে খেলতে শুরু করেন ও সে দলের ক্যাপটেন নির্বাচিত হন। তাঁর খেলার ধরণটা ছিল ভারি সুন্দর আর সুন্দর খেলেও উনি প্রচুর রাণ করতেন। স্যার পেলহাম ওয়ার্ণার ওঁর সম্বন্ধে লিখেছেন যে এরকম সুন্দর স্ট্রোক খেলোয়াড় উনি কমই দেখেছেন। অস্ট্রেলিয়ার সাথে ইংলণ্ডের হয়ে তাঁর প্রথম টেস্ট্ ম্যাচে উনি সেঞ্চুরী করেছিলেন।

২ বৎসর আগে ৫৪ বৎসর বয়সে ওঁর মৃত্যু হয়। তাঁরই স্মৃতির সম্মানে দলিপসিংজী ক্রিকেট ট্রফীর সৃষ্টি।

প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর

নতুন পাঠশালা : গত ১৭ ই জানুয়ারী বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ) এবং ৩১ শে জানুয়ারী হাবড়া,শ্রীপুর গ্রামে নতুন দুটো প্রকৃতি পড়ুয়ার পাঠশালা খোলা হয়েছে। বহরমপুরে আশীষ কুমার দে আর হাবড়ায় নীহারিকা মণ্ডল এ ব্যাপারে উদ্যোগী। ওখানকার পড়ুয়াদেরও উৎসাহের সীমা নেই। নতুন পাঠশালার কাজ ও আর সব নির্দেশ সময়মত পাঠান হচ্ছে। আমি ভাবছি সমস্ত দেশ জুড়ে 'পাঠশালা' কবে হবে !

নতুন পড়ুয়া : (৯৩) ইন্দ্রজিৎ দাশগুপ্ত, বাগনান। (৯৪) অমিয় কুমার বসু, শান্তিনিকেতন। (৯৫) অংশুমান রায়, শান্তিনিকেতন। (৯৬) গৌতম দত্ত, কোলকাতা। (৯৭) জয়শ্রী চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা। (৯৮) নীহারিকা মণ্ডল, শ্রীপুর। (৯৯) লক্ষ্মী দত্ত, শ্রীনগর, হাবড়া। (১০০) মীরা বিশ্বাস, হীজলপুকুর হাবড়া। (১০১) বীজন মণ্ডল, শ্রীপুর, হাবড়া। বহরমপুর— (১০২) সন্দীপ বসু। (১০৩) দীপক সাহা। (১০৪) অমলরঞ্জন রায়। (১০৫) মনোজ চক্রবর্তী। (১০৬) নির্মল চ্যাটার্জী। (১০৭) সুভাষচন্দ্র দাস।

চতুর্দশ বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা   চৈত্র ১৩৭১ | এপ্রিল ১৯৬৫

রাজার রাজা

জয়ন্তী সেন

[বেথ্‌লেহেম শহরের একটি সরাইখানার বাগানের দৃশ্য। বিকেল শেষ হয়ে এল বলে। সোনালী রঙের আভায় চারিদিক ঝলমল করছে। এক প্রান্তে একটি উজ্জ্বল তারা চন্দনের টিপের মত যেন আকাশে কে পরিয়ে দিয়েছে।]

সারা—রাস্তায় এত ভীড় কেন জোসেফ—

জোসেফ—ওমা, তাও জানো না বুঝি। সম্রাট অগাষ্টাস ব্রঃ, যে সারা দেশে লোক গণনার আদেশ দিয়েছেন। বাবা বলছিলেন সরাইখানায় আজ আর একটি ছুঁচ ফেলারও জায়গা নেই। তাই তো আমি এখানে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছি—কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবেনা—হবেনা—হবেনা।

সারা—আহা, যারা জায়গা পাবেনা, তারা কোথায় যাবে?

জোসেফ—কেন, গাছতলায়।

সারা—যাও, তুমি ভারি দুষ্ট স্বার্থপর ছেলে। আমি তোমার সঙ্গে খেলব না। এলিজা—

এলিজা—[গলা নীচু করে] ঐ তারাটা দেখেছ সারা! আমি এখুনি গেব্রিয়েলের ঠাকুর্দার কাছে গিয়েছিলাম—ও বলল,—ও বলল—বেথ্‌লেহেম্‌ শহরে আজ একটা নতুন কিছু ঘটবে। তাই ঐ তারাটা আগুনের মত জ্বলছে।

জোসেফ—দূর যত সব বাজে কথা। আকাশে রোজইত হাজার হাজার তারা ওঠে।

[গান] লক্ষ কোটি তারায় তারায়
আকাশ আলো মাখা
অন্ধকারের বুকে দোলে
আলোক পরীর পাখা—
উৎসবে রোজ জ্বালায় কারা
হাজার বাতির উজল ধারা
মরশুমি ফুল ঝাঁকে ঝাঁকে
যেমন ভরায় শাখা!

এত তারার ভীড়ে রোজই তো ঐ সন্ধ্যা তারা উকি মারে, কই কিছুই তো হয় না। বাবা বলেছেন বুড়োর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

এলিজা—কক্ষনো না—! তোমরা কেউ কিচ্ছু জানো না। গেব্রিয়েল রোজ ওর ঠাকুর্দার সাথে ঐ দূরের পাহাড়ে ভেড়া চরাতে যায়। কত আশ্চর্য গল্প তখন বুড়ো ওকে বলে—সে তো তোমরা জান না।

সারা—[কাছে এসে] কিসের গল্প ভাই। বাঘ, ভালুক, ভূত না রাজপুত্রের?

এলিজা—সে সব কতদিন আগেকার কথা। মোজেস, সলোমন, ডেভিড তাদের কত কি বীরত্বের কাহিনী—তবে ও গুলো গল্প নয় সব সত্যি কথা। জানো সাধুসন্তরা বলেছেন আমাদের রাজা একদিন আসবেন, নতুন রাজা!

জোসেফ—আমাদের রাজা তো আছে। রাজা আবার দুটো হয় নাকি?

এলিজা—ও রাজা নয়, সত্যিকারের রাজা। বুড়ো বলেছে, আমাদের সকলের চোখের জল সে মুছিয়ে দেবে, সবাইকে ভাল বাসবে, আর—আর—

জোসেফ—সারা, তুমি রাস্তার ভিখিরিদের সঙ্গে কথা বল জানতে পারলে মা তোমায় আস্ত রাখবেন না।

এলিজা—আমি ভিখিরি নই।

জোসেফ—তুমি তবে কে?

এলিজা—আমি—আমি মানুষ।

জোসেফ—[হাসতে হাসতে] ভিখিরি আবার মানুষ হয় ? [হঠাৎ বাইরে তাকিয়ে] ঐ দেখ, আবার একদল জুটেছে। [চিৎকার করে] জায়গা নেই, আমাদের সরাইখানায় আজ একতিলও ধরবে না। দেখছ, তবুও ফটকের তালা নিয়ে টানাটানি করছে। যাই, বাবাকে ডেকে নিয়ে আসি। [ছুটে প্রস্থান]

সারা—এলিজা, তুমি ভাই জোসেফের কথায় কিছু মনে কোর না। ও এখনও ছেলেমানুষ কিনা। কই, তোমার সেই গানটি আমায় শেখাবে না ?

এলিজা—প্রার্থনার ভঙ্গিতে বোস আগে। এই যে এই ভাবে [হাঁটু গেড়ে হাত জোড় করে বসল।]

(গান) প্রভু মোর পথের ধুলায়
কবে পাব চরণ পরশ
কবে তুমি জ্বালবে প্রাণে
জ্ঞানের আলো, প্রেমের হরষ
কবে প্রভু কবে তোমায়
জীবনের ক্ষুদ্র সীমায়
বুকের আশার পরে পাব
চোখের আলোয় মিলবে দরশ।

সারা—কি সুন্দর মিষ্টি তোমার গলা ! এ গানটি কে তোমায় শেখালো, এটাও কি গেব্রিয়েলের ঠাকুর্দা নিজে বানিয়ে লিখেছে !

এলিজা—হ্যাঁ ভাই, ও ভারি সুন্দর গান লেখে। তুমি তো জানো আমরা যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করে আছি, তিনি আসবেন।

সারা—[বিস্মিত কণ্ঠে]। কে ?

এলিজা—আমাদের প্রভু। সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে নতুন জীবনের কথা শোনাতে আর ভালবাসা শেখাতে তিনি আসবেন। কিন্তু আমার গান এখনও শেষ হয়নি।

বুকের বীণায় নামটি তোমার
বাজ্‌বে প্রভু আর কতবার
কখন তুমি রিক্ত মরুর
শূন্যতারে করবে সরস।

জোসেফ—[প্রবেশ করে] ঐ দেখ, উটের পিঠে আরও দুজন। লোকটা কিছুতেই এখান থেকে নড়বে না। বাবা খুব রাগ করছেন। ওরা বলছে ঘর যদিও খালি নাও থাকে, আস্তাবলের এক কোণে পড়ে থাকবে আজকে রাতটার মতো। [হাঃ হাঃ হাঃ]

এলিজা—[অবাক হয়ে] কিন্তু ওকে ? ওরা কে ?

জোসেফ—নাজারেথ শহরের একটা ছুতোর।

সারা—[জোসেফের প্রতি] আহা, মেয়েটির মুখ দেখলে মায়া হয়। কি ভীষণ ক্লান্ত! বাবাকে একটু বুঝিয়ে বল না লক্ষ্মীটি! নিরাশ্রয় মানুষকে ঠাঁই না দিলে আমাদের পাপ হবে যে।

এলিজা—[নিজের মনে] ওড়না খানি আকাশের মত ঘন নীল, তার ফাঁকে মুখটি ঐ অনেক দূরের তারার মতই সুন্দর আর উজ্জ্বল। নিশ্চয় কোথাও দেখেছি, এ আমার ভুল হবার নয়।

সারা—কি বলছ এলিজা? ওরা ভিনদেশী পথিক, তুমি ওদের চিনবে কেমন করে?

এলিজা—[সে কথায় কান না দিয়ে] মুখের চারিদিকে যেন আলোর ফুল থরে থরে ফুটে আছে, নীল চোখ দুটি যেন গভীর সমুদ্রের উপর সূর্যের ঠিকরে পড়া জ্যোতি! আমি দেখেছি সারা—আমি ওকে দেখেছি।

সারা—[ভয় পেয়ে] কোথায়?

এলিজা—স্বপ্নে। স্বপ্নের মধ্যে ঘন কালো অন্ধকারে প্রায়ই যেন হাজার বাতির রোশনাই ঝলমল করে ওঠে। আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখতে পাই আলোর তুলি দিয়ে কে একটা ছবি আঁকছে। গেব্রিয়েলের ঠাকুর্দা আমাকে ঐ পাহাড়তলীর গাঁয়ের সীমানায় কুড়িয়ে পেয়েছিল তো। কেউ জানেনা কে আমার মা। মনে ভাবতাম আমার হারানো মায়ের মুখটিই বুঝি রোজ আঁধার রাতে চুপি চুপি অমন করে উকি দেয়।

জোসেফ—যত সব বাজে কথা। যাই, শুনে আসি বাবা তাদের কি বলছেন। [প্রস্থান]

সারা—এলিজা, যদি সত্যি করেই ও তোমার মা হোত—! আমি একটা কথা বলব, হাসবে না? [এলিজা ঘাড় নাড়ল] জানো ভাই, আমার মাও আমার জন্মের সময় মারা গেছেন। এখন যে আছে, সে হোল সৎমা। ঘুমের আগে রোজ একবার করে মায়ের মুখটি ভাবতে চেষ্টা করি, কিন্তু কিছুতেই কিছু মনে পড়ে না। আমার এখনকার মায়ের মত ভীষণ মোটা, রাগী মুখখানাই বার বার ভেসে আসে। আজ থেকে, আমি ঐ মিষ্টি সুন্দর মুখটি মনের দেওয়ালে ছবির মত করে টাঙিয়ে রেখে দেব। মুখ দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করে, তাই না?

এলিজা—আহা, ওদের না হয় আস্তাবলেই আজকের রাতটুকুর মতো থাকবার ব্যবস্থা করে দাও সারা। তোমার বাবাকে বুঝিয়ে বলা যায় না—

সারা—দেখি চেষ্টা করে। তবে বাবা কি করবে, নতুন মায়ের মনটা পাথরের মত শক্ত, কাউকে কখনো একটা মিষ্টি কথা বলতে ওর যেন গায়ে জ্বর আসে। দেখতে পাচ্ছনা, রান্না ঘরের হাতা খুন্তি নিয়ে হাত নেড়ে গালাগালি করছে।

এলিজা—তবুও এবার যাও ভাই। [সারার প্রস্থান] কিন্তু গেব্রিয়েল এত দেরী করছে কেন? ঐ তো পাহাড়ের গায়ে বিকেলের শেষ আলোয় ওদের সকলকে দেখতে পাচ্ছি। সারারাত জেগে ঐ মেষপালকের দল আলোর মশাল জ্বেলে গান করবে, আমোদ করবে। গেব্রিয়েল যে বলেছিল যাওয়ার আগে একবার দেখা করে যাবে।

[পেছন থেকে গেব্রিয়েলের প্রবেশ। হাতে একটি ছোট লাঠি ও লণ্ঠন। অন্ধকার হয়ে আসছে]

গেব্রিয়েল—এলিজা।

এলিজা—তুমি এত দেরী করলে কেন? কখন আমাকে নতুন গান শোনাবে?

গেব্রিয়েল—কেন এখুনি। ঐ দেখ, ঠাকুর্দা লাঠি ঠুকে ঠুকে তাঁর ভেড়ার পাল পাহারা দিতে পাকদণ্ডী ধরে চলেছেন। গান শুনিয়ে এক ছুটে ওখানে চলে যাব।

[গান] ওরে তোরা খুশির বাতি
জ্বালিয়ে নে আজ হাসি মুখে
আকাশে ঐ চাঁদের আলো
লুটিয়ে পড়ে ধরার বুকে

এলিজা—এত আনন্দ আজ তোমার গানে?

গেব্রিয়েল— ওরে তোরা সবাই মিলে
চলে আয় খেলার ছলে
যেখানে নাইকো কারো অশ্রু ঝরা
দহন দুখে।

এলিজা—সে মজার দেশ কোথায়?

গেব্রিয়েল—কেন, এইখানে, এই মাটির পৃথিবীতে। জানোনা, ভগবান একদিন এখানেই জন্ম নেবেন। তখন আমাদের আর কোন দুঃখ থাকবে না।

এলিজা—যার কেউ নেই, ঠাকুরই তার একমাত্র আশ্রয়। আমার তো কেউ নেই গেব্রিয়েল। তিনি কি আমার মত অনাথাকেও দেখা দেবেন?

গেব্রিয়েল— ওরে তোরা ভুলিসনে আজ
বুকে আছেন হৃদয়রাজ
মুছে নিতে সকল ব্যথা
ভরিতে পরম সুখে।

[দৃশ্য পতন]

২য় দৃশ্য

[রাত্রির অন্ধকারে এলিজা একলা পথ হাঁটছে; চারদিক নির্জন, কেউ কোথাও নেই। গেব্রিয়েলের নাম ধরে কয়েকবার ডাকা ডাকি করে এলিজা বসে হাতজোড় করে প্রার্থনার গান শুরু করল—]

যখন আমি অন্ধকারে
পথটি হারাই
ভয়ে ত্রাসে সর্বনাশে
দিশা না পাই
তুমি থেকো বুকের মাঝে

হাতটি ধরে ডেকো কাছে
যেন সদা তোমারই মুখ
দেখতে পাই।
জ্বেলে দিও একটি বাতি
অন্ধকারে
সে যেন পথটি চেনায়
অচেনারে।
ভালোবাসা যেন ঝরে
আমাদের জীবন পরে
মধুর ঐ নামটি তোমার
কেবলই গাই—

[সারা এ গেব্রিয়েলের প্রবেশ]

সারা—এলিজা—

এলিজা—[চমকে উঠে] তুমি এখানে এই অন্ধকারে ?

সারা—নতুন মা ওদের আস্তাবলে থাকতে দিতে রাজি হয়েছে এলিজা। খড় বিচালা যেখানে গাদা করে রাখা আছে, তারই একপাশে ওরা বসে রয়েছে। আমাকে বললে—একটু জল দাও। সে মিষ্টি গলার সুরে মনে হোল সমস্ত পৃথিবী গান করে উঠল। আদর করে আমার কপালে হাত ছুঁইয়ে দিলে—মনে হোল একরাশ ফুলের পাপড়ীর নরম ছোঁয়া। সব ভুলে আমি ডেকে উঠলাম—মা মাগো।

এলিজা—তারপর ?

সারা—তখন আকাশের তারার মত নীল চোখ দুটি জ্বলে উঠল, আর ঠিক যেমন ভোরবেলার আলো আকাশের গায়ে দমকা ফুটে ওঠে, তেমনি করে হাসল। এলিজা, মানুষ কি অত সুন্দর হয় !

এলিজা—তুমি কি ওদের নাম জানতে পেরেছ ?

সারা—লোকটি মুখ নীচু করে প্রার্থনা করছিল, আর বোধ হয় ঘুম নেমে আসছিল মেয়েটির ক্লান্ত চোখে। বাবা নতুন মার চোখ এড়িয়ে একটু রুটি আর জল এনে দাঁড়াল। লোকটি একটু হেসে হাত বাড়িয়ে বলল—আমি নাজারেথ শহরের ছুতোর জোসেফ, আর আমার স্ত্রী মেরী—আমরা এই আশ্রয়টুকুর জন্য তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। বাইরে বরফের মতো শীতের হাওয়া বইছে, এখানে আস্তাবলের এই গরম ছোট কোণটি আমাদের চিরকাল মনে থাকবে। বাবা চলে যাওয়ার পর আমি জানলার কপাটের এক চিলতে ফাঁক দিয়ে আর একবারটি যেই তাকিয়েছি একটা আশ্চর্য আলোয় আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল।

গেব্রিয়েল—আমি তোমাকে খুঁজতে গিয়েছিলাম এলিজা। আস্তাবলের পিছনে দরজার ফাঁক দিয়ে ঢেউএর মত আলো কাঁপতে আমিও দেখেছি।

সারা—তাই তো তোমাকে ডেকে নিতে আমরা ছুটে এলাম।

এলিজা—সেই আলোয় তুমি আর কি দেখতে পেলে!

সারা—প্রথমে কিচ্ছুটি দেখিনি। তারপর মনে হোল কারা যেন মুঠো মুঠো আলোর ফুল ছড়াচ্ছে—মায়ের মত সুন্দর সেই মুখটিকে ঘিরে। চারদিকে অনেক দূরের থেকে শোনা নদীর ঢেউএর শব্দের মতো ভেসে উঠছে স্তব গানের সুর। আমি কি করব, কি ভাবব কিছু বুঝে পেলাম না। ছুটে চলে এলাম তোমাদের খুঁজতে। কিন্তু এলিজা, ঐ শোন, সেই গান আবার শোনা যাচ্ছে। সেই আলো দেখা যাচ্ছে আকাশের গায়ে। ঐ দেখ, মেষপালকের দল ভয় পেয়ে ছুটোছুটি করছে ওধারে।

[স্তব গান]

জয় জয় জয় জগত জন
জগত দেবতা তোমারই জয়
ধন্য এ ধরা, ধন্য মানব
নিখিল ভুবন আলোকময়
জগত দেবতা তোমারই জয়।
হে দেবতা তব অমৃত ছন্দ
ফলে দিল মধু ফুলে সুগন্ধ
হৃদয়ে সুখের মধুর স্পন্দ
নতুন প্রাণের ইশারা বয়
জগত দেবতা তোমারই জয়!

গেব্রিয়েল—তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে থাকো কোথাও যেওনা! আমি দেখে আসি কি হচ্ছে ওখানে—

[ছুটে প্রস্থান]

এলিজা—তুমি কি ভয় পেয়েছ সারা?

সারা [ভীত কণ্ঠে] কে—কে ওখানে? [জোসেফের প্রবেশ] জোসেফ! তুমি এখনও জেগে আছ?

জোসেফ—আমার শিয়রের কাছে জানলায় যেন লাল নীল আলো দপ্ দপ্ করে জ্বলছিল। মাকে খুঁজে পেলাম না। বাবাকেও না। বুড়ো এব্রাহাম বললে তুমি চুপি চুপি উঠে গেব্রিয়েলের সঙ্গে এধারে চলে এসেছ। কি হয়েছে এখানে? ভিনদেশী মানুষেরা কি বাজি তামাসা দেখাচ্ছে?

এলিজা—চুপ্ চুপ—কথা বোলনা। শোন, ঐ শোন

[নেপথ্যে গান]

[সমবেত] আমরা এনেছি সুখের বারতা জগতবাসীর তরে

নাই ভয় নাই, আনন্দরাশি ঝরিছে ভুবন পরে
তিনি এসেছেন, জগতের ত্রাতা তোমাদেরই ছোট ঘরে।

[১ম কণ্ঠ] এ নগরী পরে, জন্ম নিয়েছে
স্বর্গের দেব শিশু
জগতের ব্যথা হরিতে পলকে
আমাদের প্রভু যিশু—

[২য় কণ্ঠ] দেখো দেখো তাকে খুঁজে
অনাদরে শুধু ছিন্ন ভূষণে সেজে
রাজার রাজা যে ঘর আলো করে আছে
পুণ্য হলো যে তাহারই পরশে আস্তাবলের মেজে।

[সমবেত] দেবতা ভক্ত মানব প্রাণেতে শান্তির সুধা পায়—
প্রণমি তোমার চরণে যে গায়—ঈশ্বর তব জয়—
নিখিল ধরায় শান্তি ছড়ায়, আনন্দ শিহরায়।

জোসেফ—কি বলছে ওরা গানের সুরে সুরে। আমি যে একটি কথাও বুঝতে পারছি না।

সারা—আমিও না।

এলিজা—আকাশের তারাগুলো যেন নেমে এলো মাটির কাছাকাছি সোনালী রুপোলী আলোর ফুলকি ছড়িয়ে। আমরা কি জেগে আছি, না স্বপ্ন দেখছি?

গেব্রিয়েল—[ছুটতে ছুটতে এসে] ওরা সবাই দেবদূতের গান শুনে বেথলেহেম নগরীর দিকে ছুটেছে। চল, আমরাও যাই।

এলিজা—দেবদূত তুমি সত্যি বলছ গেব্রিয়েল?

গেব্রিয়েল—আমাদের প্রভুর জন্মের খবর তো ওরাই দিলো, শুনতে পেলে না, যখন অত আলো অত সমারোহ দেখে ওরা ভয়ে ছুটোছুটি করছে, তখন কে যেন ডেকে বলল—ভয় পেও না দেখ, আমরা যে সুখবর জানাতে এসেছি, তা পৃথিবীর সমস্ত লোকের আনন্দের কারণ হবে। আজ এই ডেভিডের নগরী বেথলেহেমে বিশ্বত্রাতা জন্ম নিয়েছেন এবং তিনিই সেই প্রভু যিশুখৃষ্ট। একটি ছোট্ট নিশানা তোমাদের দিয়ে যাচ্ছি, যাতে করে তোমরা তাঁকে চিনতে পারবে এখনও আস্তাবলের পশুদের খড় বিচালী খাওয়ার গর্তে কাপড়ে জড়ানো শিশুটি শুয়ে আছে।

সারা—আস্তাবলে। কোন আস্তাবলে!

গেব্রিয়েল—বেথলেহেম নগরীর প্রতিটি আস্তাবল ওরা খুঁজে বেড়াবে। আমার ঠাকুর্দা বুড়ো হয়ে নুয়ে পড়েছে, চোখের ছানির আড়ালে দেখতে পায়না ভালো করে। তবু সেও লাঠি ভর করে পাগলের মত ছুটে গেল। আমি বললাম ওকি করছ ঠাকুর্দা পড়ে যাবে যে। আমার কথা কানেই গেল

না যেন। শুনলাম নিজের মনে বলছে—এ চোখ দুটোয় অন্ধকার নেমে আসার আগে শেষবারের মত আলোর উজ্জ্বল জ্যোতি দেখে নিই।

সারা—এলিজা! আমার মনে হচ্ছে আমাদের সরাইখানার আস্তাবলেই হয়তো—হয়তো—

জোসেফ—যতসব আজগুবী কথা। জগতের ত্রাতা ঈশ্বরের পুত্র জন্ম নেবেন আমাদের ঐ নোঙরা আস্তাবলের ভেতরে গরু ভেড়ার পালে! এসব ভেল্কী বাজী ছাড়া আর কিছু নয়। [সারার প্রতি] রাত্রিবেলা না বলে ঘরের বাইরে আসার জন্যে তোমাকে বকুনি খেতে হবে মায়ের কাছে—

এলিজা—তুমি যা বলছ—তা হতে পারে। দেবী মূর্তির মত মুখটি ঘিরে আমি যে আলোর আভাস দেখতে পেয়েছিলাম—ঈশ্বরের পুত্র হয়তো ঐ মায়ের কোলেই নেমে এসেছেন। চল চল আমরাও দেখে আসি—

দৃশ্য পতন।

তৃতীয় দৃশ্য

[সরাইখানার আস্তাবলের এক পাশে বারান্দায় সারা, গেব্রিয়েল ও এলিজা উকি মেরে দেখছে। জোসেফ একা একধারে পায়চারী করছে।]

জোসেফ—আচ্ছা, এমনওতো হতে পারে, ঐ জংলী রাখালগুলো গাঁজা খেয়ে সেদিন এলোমেলো স্বপ্ন দেখছিলো—তারপর আমাদের আস্তাবলে একরত্তি ছেলেটাকে নিয়ে অত মাতামাতি।

সারা—জোসেফ, ছিঃ, এরপরেও তুমি অবিশ্বাস করবে?

জোসেফ—তবে কি তোমাদের মত সব কাজকর্ম ফেলে ওখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখব? চললাম আমি।

গেব্রিয়েল—সারা, কেঁদনা তুমি। মানুষের মধ্যে ভালো মন্দ দুটো দিকই আছে। আর সত্যকে অস্বীকার করা বা সন্দেহ করা এতো যুগে যুগে চলেই আসছে।

এলিজা—সত্যি, বলছি ভাই, আমার যেন দেখে দেখে আশ মেটেনা। সূর্যের, চাঁদের, আকাশ-ভরা তারার সব আলো যেন জমা হয়ে আছে ঐ ছবিটির রেখায় রেখায়। মা আর শিশু, দুই যেন আলোর তুলিতে আঁকা।

গেব্রিয়েল—ঐ দেখ, তিন চারটি বুড়ো মানুষ এধারেই আসছে মনে হচ্ছে—! কই, ওদের তো এই শহরে আগে দেখিনি। এই এত বড় বড় সাদা দাড়ি, পাকা চুল, পিঠে বড় বড় ঝোলা!

এলিজা—হয়তো ওরাও কিছু দৈববাণী শুনেছে। মন্দিরে কাল কি হয়েছে জাননা!

গেব্রিয়েল—না তো। কাল সারাদিনই যে ঠাকুর্দাকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। সে রাতের পর থেকে বুড়ো কেমন পাগল পানা হয়ে গেছে। দিনরাত আপন মনে বকে!

সারা—মন্দিরের বুড়ী অ্যানার কথা বলছ তো এলিজা।

এলিজা—শুধু অ্যানা কেন, সাইমনের কথা শুনেও অবাক হয়ে যাবে তোমরা। ওর বিশ্বাস ছিল খৃষ্টকে

একবার চোখে না দেখে ও কিছুতেই মরবে না। মন্দিরে যিশুকে দেখে ও চিৎকার করে বলে উঠল—এই সেই আলো, যা সকলের অন্ধকার দূর করবে। বুড়ী অ্যানাও সেই একই কথা বলল।

জোসেফ—আমি এসব কিছু বিশ্বাস করি না।

গেব্রিয়েল—ঠাকুর্দা এত কাল ধরে বলছে সত্যিই ইস্রেইলের একজন পরিত্রাতা জন্ম নেবেন—যাঁর পায়ে একদিন সমস্ত পৃথিবীর লোক অন্তরের ভক্তি জানাবে।

জোসেফ—সে কথা তো সবাই জানে। কিন্তু ঐ নাজারেথ শহরের ছুতোরের পরিবারেই যে সে জন্মেছে তার প্রমাণ কি?

এলিজা—তর্ক করে লাভ নেই জোসেফ। আমি ঠিক জানি এই সেই।

[পরিশ্রান্ত চারজন বুড়োর একে একে প্রবেশ] ও বাবা, এরা আবার কে? ছেলেধরা নয়ত।

১ম বুড়ো—আমরা পুব দেশের বাসিন্দে। অনেক দূর থেকে সেই তারাটা দেখতে পেয়েছিলাম।

২য় বুড়ো—তারা দেখেই তো জানতে পেরেছি ইস্রেইলের নতুন রাজা জন্ম নিয়েছে। তাই হেরড রাজার কাছে খোঁজ খবর করতে ছুটে এসেছি।

৩য় বুড়ো—হেরড রাজা বললেন—'বেথ্‌লেহেম শহরে গিয়ে খুঁজে বার কর সেই নতুন রাজাকে।'

৪র্থ বুড়ো—তারাটা যেন আমাদের সাথেই ভেসে ভেসে আসছিলো। পথ চিনতে একটুও অসুবিধে হয়নি। দেখো দেখো—এই ঘরের ছাতের মাথায় এখনও কেমন জ্বল জ্বল করছে। এখানে কি কোন ছোট ছেলে কয়েকদিন আগে জন্মেছে?

এলিজা—হ্যাঁ গো। দেবদূতেরা বলে গেছে ঐ শিশুই এই জগতের উদ্ধার কর্তা প্রভু যিশুখৃষ্ট। এসোনা আমার সঙ্গে—পথ দেখিয়ে নিয়ে যাই।

১ম বুড়ো—[এদিক ওদিক তাকিয়ে] কিন্তু একটা কথা আছে যে খোকা খুকুরা। আমরা হলাম পুব দেশের জ্ঞানী বুড়োর দল—অনেক কিছুই জানতে পারি। আমরা যে এখানে এসেছি তোমাদের রাজাকে দেখতে, খবরদার, সে কথা যেন কেউ টের না পায়।

সারা—কেন, কেন?

২য় বুড়ো—সে সব তোমরা নাই বা শুনলে বাছা। একান ওকান হলেই সর্বনাশ।

৩য় বুড়ো—একটা কথা কেবল মনে রেখো—ভালোকে ধ্বংস করতে মন্দ সর্বদাই এগিয়ে আসে।

৪র্থ বুড়ো—কালো মেঘ যেমন সূর্যকে ঢেকে অন্ধকার করে দেয়।

এলিজা— কিন্তু মেঘই তো সরে যায় শেষ পর্যন্ত। সূর্যকে বেশিক্ষণ ঢেকে রাখে তার সাধ্যি কি।

১ম বুড়ো—[হাত তালি দিয়ে] বাঃ, ভারি সুন্দর বলেছো। যা সত্যি, তাই চিরকাল থাকবে। মিথ্যা টিকবে না কিছুতে।

জোসেফ—তোমাদের ঐ ঝুলিতে কি আছে?

২য় বুড়ো—[গম্ভীর গলায়] তুমি তো কোন কিছুই বিশ্বাস করতে না। আমরা জানি, তোমার মত আরও অনেক লোক আছে, আরও অনেক লোক থাকবে, যারা অন্যায়কে মেনে সত্যিকে আড়াল

করতে চায়। কিন্তু কোন দুঃখ নেই। যে বিশ্বাসী তারই শেষ পর্যন্ত জয় হবে।

[সবাই মিলে জোসেফের দিকে কটমট করে তাকাতে সে ভয়ে ভয়ে পালালো]

৩য় বুড়ো—এবারে চল লক্ষ্মী ছেলেমেয়েদের দল। চুপি চুপি তাকে একবার দেখে আসি।

৪র্থ বুড়ো—তোমরা নিশ্চয় জানতে চাও, এই ঝুলি বোঝাই কি নিয়ে এসেছি।

১ম বুড়ো—আমাদের কাছে সোনাদানা—

২য় বুড়ো —মণিমুক্তা—

৩য় বুড়ো—হীরে জহরত—

৪র্থ বুড়ো—আতর সুগন্ধি—

সবাই মিলে—আমাদের রাজাকে উপহার দেব।

গেব্রিয়েল –[ইতস্ততঃ করে] কিন্তু লোকে বলে হেরড আমাদের রাজা।

১ম বুড়ো—আর এযে আমাদের রাজার রাজা। চল, চল আর দেরী নয়। ঘুর পথ দিয়ে তারপর আমাদের দেশে ফিরতে হবে। কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে। [সকলের প্রস্থান]

গেব্রিয়েল—রাজার রাজা। এসো আমরা সকলে মিলে সেই প্রার্থনার গানটি গাই।

আমাদের রাজার রাজা
প্রাণের প্রভু প্রণাম নিও
ভালবাসার পরশ মণি
বুকের পরে ছুঁইয়ে দিও।
জ্বেলে দিও আশার বাতি
মুছে দিও আঁধার রাতি
ধরণীর ধুলোর পরে
স্বরগের সুখ ঝরিও।
দিয়েছ কত স্বপন
শিশুর চোখে
ঢেলেছ সান্ত্বনা তার
দুঃখে শোকে।
এনে দাও ভক্তি প্রাণে
যেন চাই তোমার পানে
এ জীবনে খেলার শেষে
তোমার কোলে টেনে নিও।

এলিজা—ঈশ্বর যাকে আমাদের রাজা করে পাঠিয়েছেন, তাঁর মহিমা জানুক বড় ছোট, জ্ঞানী, মুর্খ সকলে। এসো আমরা সবাই মিলে আর একবার তাঁকে দেখে আসি।

[হাত ধরাধরি করে প্রস্থান]

যবনিকা
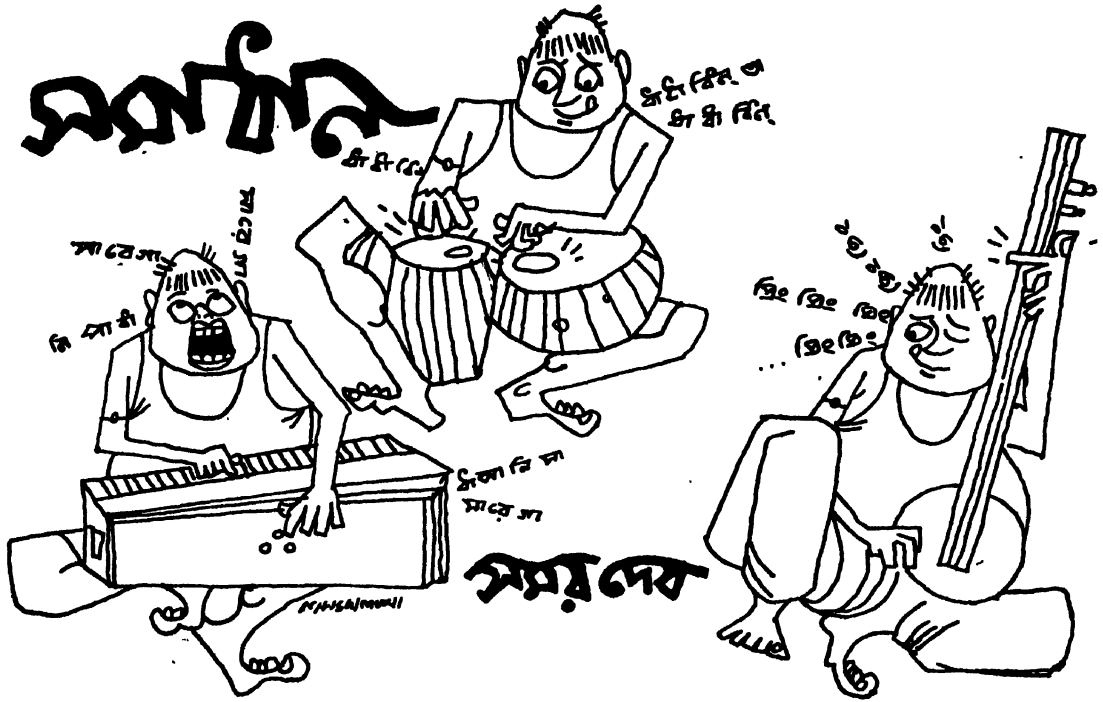
গান শিখে বড় হবে ভেবেছিলো কেষ্টা
বহু টাকা ব্যয় করে করেছিলো চেষ্টা।
ভোরবেলা চলত যে গলা সাধা নিত্যি
প্রতিবেশী সকলের জ্বলে যেত পিত্তি।
বুঝল কেষ্টা শেষে গান শেখা শক্ত
গান ছেড়ে সেতারেতে হল অনুরক্ত।
দিনরাত সেতারেতে 'প্রিং প্রিং' চালিয়ে—
আশেপাশে মানুষের প্রাণটাকে জ্বালিয়ে।
বুঝল যখন শেষে হবে নাকো সিদ্ধি
ভাবল তবলা শিখে করবে শ্রীবৃদ্ধি।
তবলাটা শিখবে যে হল যেই চিন্তা
দিনরাত বাজালো সে 'তেরেকেটে ধিন্ তা'।
তবু—হায় বৃথা হল সব কিছু হেথা রে—
এল না সাফল্য গানে, তবলাও সেতারে।
বুঝল কেষ্টা শেষে ওই সব বাজনা
কিছুতেই সহজেই শেখা তার কাজ না।
কেষ্টা সময় তাই করছে না নষ্ট
'রেডিও' বাজাতে শেখে। নেই কোনো কষ্ট॥

'ডিটেক্‌টিভ'

ডিটেক্‌টিভের কাজ বলতে আজকাল আমরা যা বুঝি, তার গোড়া পত্তন ফ্রান্সের প্রধান নগর প্যারিতে হয়েছিল এ কথা বলা যেতে পারে। খুব বেশি দিন আগের কথাও নয়, উনিশ শতকের গোড়ার ব্যাপার। নেপোলিয়নের তখন ভারি বোলবোলা, কিন্তু প্যারি সহরে পর্যন্ত আইন ভঙ্গকারাদের উৎপাতে টেকা দায়। সন্ধ্যের পর রাস্তায় বেরুনো যায় না, চুরিচামারি খুনখারাবির দিনকাল; সবাই ভয়ে জুজু, কিন্তু দুর্বৃত্তদের সম্বন্ধে কিছু জানা থাকলেও কেউ সাহস করে এগিয়ে এসে পুলিশকে জানায় না। তার কারণ, তা হ'লে দুর্বৃত্তরা তাদের সপরিবারে কচুকাটা করবে।

নেপোলিয়ন বুদ্ধি করে মঁসিও অঁরি বলে একজন পুলিশ কর্মচারীর হাতে পুলিশ বিভাগের ও শান্তিরক্ষার ভার দিলেন। অঁরি পড়ে গেলেন মুস্কিলে, নাকের তলা দিয়ে দুষ্ট লোকরা তাঁর বিভাগের এক বেচারা পুলিশকে মেরে রেখে গেল, অথচ খুনেদের কোনো পাত্তাই পাওয়া গেল না। ঐ এক কথা, ভালো লোকরাও প্রাণের ভয়ে পুলিশকে সাহায্য করে না। প্যারিতে তাই দুর্বৃত্তদের রাজত্ব চলতে লাগল বলা যায়।

সরকারের দিক থেকে আর সাধারণের দিক থেকে সবাই মঁসিও অঁরিকে দোষ দিতে লাগল, কেন তিনি কিছু করতে পারছেন না। শেষটা মরিয়া হয়ে একদিন তিনি তাঁর প্রধান সহকারীকে ডেকে বললেন, 'প্যারির দুর্বৃত্তদের মধ্যে সব চেয়ে বদমাইস্‌ কে?'

তক্ষুনি জবাব এল, 'ভিডক্‌'।

'ভিডক্‌? তার বিষয় কি জান?'

'জানি যথেষ্ট স্যার, কিন্তু তাকে ধরলে কোর্টে কিছু প্রমাণ করতে পারব না।'

'তা হক গে, তার বিষয়ে কতখানি জানা গেছে, তাই বল।'

'ব্যাটা একটা জালিয়াৎ, চোরা-কারবারি, জোচ্চোর।'

'আর কি?'

'হতভাগা ভালো মানুষদের ফুসলে মন্দ কাজ করায়, তারপর তাদের ধরিয়ে দেয়। আস্ত একটা দু-মুখো সাপ!'

মঁসিও অঁরি মুখ তুলে বললেন, 'দু-মুখো সাপেরই আমার দরকার। দুই কেন, বিশ-মুখো হলে আমার আরো ভালো! নিয়ে এসো তাকে আমার কাছে।'

দিন দুই বাদে ফ্রাঁসোয়া ইউজিন ভিডক্‌ সত্যি সত্যি অঁরির সঙ্গে দেখা করতে পুলিশ হেডকোয়াটারে এল। মাথায় বেশি লম্বা নয়, রোগা, চকচকে সজাগ কালো চোখ, এক গোছা চুলে কপালটা প্রায় ঢাকা।

অঁরি সোজাসুজি বলে বসলেন, 'আমার সাহায্য দরকার ভিডক্‌, তুমিই আমাকে সাহায্য করতে পার।'

ভিডকের বোধ হয় হাসি পেল। 'সে কি স্যার, আপনার গোটা পুলিশ দিয়ে হল না, আমি একা কতটুকু করতে পারি ?'

অঁরি বললেন—'না ভিডক্‌, আমার লোকদের সবাই চেনে। সামনের দরজায় তারা দেখা দিলেই, দুষ্টু লোকরা অমনি পেছনের দরজা দিয়ে, ছাদের ওপর দিয়ে পালায়। কিন্তু তোমাকে দেখে তো আর দুষ্টু লোকরা পালাবে না !'

ভিড্‌ক বললে, 'তা সত্যি।'

'আচ্ছা, তুমি তো ফ্রসারের গুণ্ডার দলের কথা জান, ওদের ধরতে হলে তুমি কি করতে ?'

'কেন। ওদের দলে ঢুকে, সব জেনে নিয়ে, ওদের একেবারে হাতেনাতে ফাঁসিয়ে দিতাম।'

অঁরি খুসি হয়ে গেলেন, 'বেশ ভিড্‌ক, তাই কর। অনেক বকসিস পাবে।'

ভিডক বললে, 'আর যদি না পারি ?'

'হয় ফ্রসারের নয় আমার দল তা হলে তোমাকে ঝোলাবে। কাজেই কাজ হাসিল কর।'

হলও তাই, ভিডকের সাহায্যে ফ্রসারের গুণ্ডার দল ধরা পড়ল। এর পর থেকে ভিডক অঁরির সঙ্গে কাজ করতে লাগল। সে হল অঁরির গুপ্ত গোয়েন্দা ; হাজার রকম ছদ্মবেশ ধরে, দুর্বৃত্তদের দলে মিশে, একে একে তাদের ধরিয়ে দিতে লাগল।

ভিডকের কাজ দেখে সন্তুষ্ট হয়ে ১৮১২ সালে অঁরি প্যারি-র সরকারি গুপ্ত-গোয়েন্দা বিভাগের পত্তন করে, তাকে করলেন তার কর্তা। অনেকে আপত্তি করেছিলেন, এককালে যে নিজে দুষ্টলোক ছিল, তার হাতে কি এত ক্ষমতা থাকা উচিত। কিন্তু অঁরির বিশ্বাস টলে নি, ভিড্‌কও কখনো বিশ্বাস-ঘাতকতা করে নি, চারজন সহকারী নিয়ে সে প্রাণ দিয়ে খাটতে লাগল। এরাই হল প্রথম সরকারি গোয়েন্দা ; দেখতে দেখতে অন্যান্য দেশেও পুলিশের কাজে সাহায্য করবার জন্য একটি করে ডিটেক্‌টিভ বিভাগ হল। পুলিশের কাজের সঙ্গে এদের কাজের অনেক তফাৎ। এরা খুঁজে খুঁজে, বুদ্ধি খাটিয়ে, প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে, কত সময়ে কোনো হাতিয়ার সঙ্গে না নিয়ে, অন্যায়কারীদের শুধু খুঁজে বের করে দেয় না, তাদের অপরাধের যথেষ্ট প্রমাণও সংগ্রহ করে দেয়, যাতে পুলিশ বিভাগ তাদের বিরুদ্ধে মামলা আনতে পারে।

অনেক দিন আগেই ভিডক মারা গেছে, কিন্তু তার কাজ সার্থক হয়েছে। তার বিষয়ে কত যে সত্যি মিথ্যা গল্প শোনা যায় তার ঠিক নেই, তার মধ্যে থেকে একটি সত্যি ঘটনা বলি।

ফন্টেন নামে একজন কসাই কুর্তিল বলে একটী ছোট সহরে থাকত, আর আশেপাশের গ্রামে যত মেলা বসত, সেখানে গিয়ে সস্তা দামে গোরু ভেড়া কিনত। একবার এইরকম চলেছে, পকেটে ১৫০০ ফ্রাঙ্ক। পথে একটা সরাইখানায় খানাপিনা করতে গিয়ে দুজন অচেনা লোকের সঙ্গে ভারি ভাব জমল। খাওয়া দাওয়ার পর তারাও সঙ্গে চলল।

বিকেল হয়ে এসেছে, মহা স্ফুর্তিতে গান গাইতে গাইতে তারা চলেছে, এমন সময় একটা নির্জন গলি দেখে লোক দুটো বললে, এখান দিয়ে গেলে অনেক আগে পৌঁছনো যাবে। যেই না গলিতে

ঢোকা অমনি লোক দুটো ছোরা লাঠি নিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর তাকে আধমরা করে ফেলে রেখে টাকা নিয়ে পালাল। ভাগ্যিস একজন দয়ালু লোক ঐ পথ দিয়ে যেতে যেতে ফন্টেনকে পড়ে থাকতে দেখে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল, নইলে সে যাত্রাই তার দফা শেষ হত।

কথাটা ভিডকের কানে গেল, ফন্টেনের সঙ্গে দেখা করে সে ঐ গলিটাকে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করল। কয়েকটা বুটের ছাপ, তার ছাঁচ তোলা হল। কয়েকটা কোটের বোতাম আর ঝোপের মধ্যে ছেঁড়া এক টুকরো কাগজ, তাতে কারো নাম ঠিকানার অর্ধেকটা লেখা।

মঁসিও রাউ—
মদের ব্যবসায়া
বার—
রোস—
—ক্লি—।

অনেক মাথা ঘামিয়ে, ভিডক ঠিক করলেন পুরো নাম ঠিকানাটা এইরকম হওয়া উচিত ঃ—

মঁসিও রাউল
মদের ব্যবসায়ী,
বারিয়ের রোস-স্নুয়ার
সসে দ্য ক্লিনিয়াঁকুর।

ব্যস্, আর কথা নেই, উত্তর প্যারিতে গিয়ে রাউল আর তার স্যাঙাৎ কুর-কে ধরতে তার খুব বেশি কষ্ট হল না। একটা খুনের তদন্তে পুলিশ এদের দুজনকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিল। এদের দলের তৃতীয় ব্যক্তির নামও পাওয়া গেল, জেরার। তাকে গ্রেপ্তার করবার ওয়ারেণ্ট পকেটে নিয়ে, চোরা-কারবারি-সেজে ভিডক্ তার বাড়ি গিয়ে হাজির। দেখে রাউল আর কুর-কে ধরার জন্য ভিডকের ওপর তার ভারি রাগ, তেজ দেখিয়ে সে বললে—'একবার ঐ ভিডকটাকে সামনে পেলে দেখে নেব!'

ভিডক্ বলল 'নাও না দেখে, এই তো সে তোমার সামনেই রয়েছে!'

জেরার তার গলা টিপে ধরবার আগেই ভিডক্ তার হাতে হাত-কড়া পরিয়ে দিল। মামলাতে অন্য খুনটার জন্য রাউল আর কুরের প্রাণদণ্ড হল আর জেরার তার বাকি জীবনটার প্রায় সবখানিই জেলে কাটাল।

শেষ মুহূর্তে রাউল ভিডকের সঙ্গে দেখা করতে চাইল, পরিবারের জন্য কি সব ব্যবস্থা করে চিঠি-পত্র দিল আর বলল—'একমাত্র তোমাকেই আমরা বিশ্বাস করতে পারি।'

তখন ভিডকের মুখের ভাবটা কেমন হয়েছিল কল্পনা করা যায়!

সমন্বয়
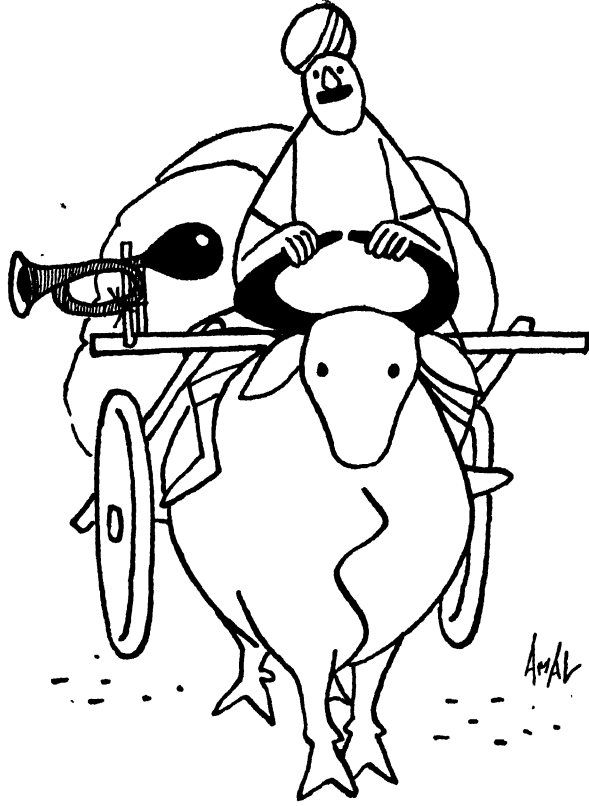
কার্টুন—অমল চক্রবর্তী

শহর থেকে

রণজিৎ মুখোপাধ্যায়

আমার যেতে ইচ্ছে করে সেই নদীটির পারে
জল যেখানে উর্মি হয়ে হাওয়ার ভারে ভারে
যায় বয়ে যায় বনের পথে তেপান্তরের পারে ;
সেইখানেতে কিনার ঘেঁসে সোনাই মাঝির ঘর
দেখ্‌লে পরে আদর ক'রে বল্‌বে না'য়ে চড়,
তেপান্তরের মাঠ ছাড়িয়ে সেই না'য়েতে ভেসে
সপ্তসাগর পাড়ি দিয়ে ফিরব আবার দেশে

সাগর জলের বাঘ

জীবন সর্দার

তক্তা-ঘাট কলকাতার কাছে, গঙ্গার ধারে। সেখানে সাগর থেকে ফেরা জাহাজ বাঁধা থাকে আর থাকে গঞ্জের ঘাট থেকে ফেরা ন মাল্লার বড় বড় নৌকো ক'খানা। এদেরই কাছে কাছে ভাসত রমজানের ছোট্ট ডিঙ্গি।

রমজান মিঞা এই ঘাটের কাছে মাছ ধরত। জাল ফেলে নয়, লম্বা সুতোয় বড়শী বেঁধে তাতে ছোট্ট মাছ গেঁথে জলে ফেলত। কি মাছ সে ধরত কে জানে। একদিন ধরা পড়ল একটা হাঙর! কাগজে বেরল খবরটা। তারপর, আর একদিন আরও একটা।

কাগজে এই খবর পড়ে, আমি এই জেলে আর তার ডিঙ্গির খোঁজে থাকতুম। ইচ্ছে ছিল হাঙর ধরার ব্যাপারটা চোখে দেখব। দিনের পর দিন কাটল। হাঙর ধরা পড়ল না। নদীর সেই ঘাটের কাছে যাওয়া ছেড়ে দিলাম একদিন। ঠিক সেদিনই রাতে তার বড়শীতে আরও একটি হাঙর আটকাল।

ভোর রাতে মরা হাঙরটিকে নিয়ে সে এল কয়লাঘাট থানায়। খবর পেয়ে আমিও গেলাম দেখতে। হাঙরটি উজান ঠেলে এত পথ কি করে আর কেন এল তা নিয়ে সকলের আলোচনার শেষ ছিল না, আমি তাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হাঙরটির নাক মুখ চোখ দাঁত লেজ মাথা দেখছিলাম।

আমার কাঁধে কার নিশ্বাস পড়ল। তাকিয়ে দেখি নীলাঞ্জন। কখন এসে পাশে দাঁড়িয়েছে দেখিনি।

মিষ্টি হেসে সে বললে, ডাঙ্গায় এই মরা হাঙর দেখে কি জলের হাঙরের হাবভাব বুঝতে পারা যাবে?

কিছু পারা গেলেও, জানি সব পারা যাবে না। আমি উত্তরে বললাম।

সব জানতে পারা যাবে, সব চোখে দেখা বিবরণ,—যদি ত্রিবান্দ্রামের ডঃ শঙ্করন্‌কে চিঠি লেখা যায়।

ডঃ শঙ্করণ সাগর-বিদ্যার অধ্যাপক। ত্রিবান্দ্রামে ওঁর সাথে আমাদের পরিচয় হয়। সমুদ্রের অনেক কিছুই আমাদের পক্ষে চোখে দেখে জানা সম্ভব নয়। উনি বলেছিলেন চিঠি লিখলেই যা দেখেছেন যা জানেন পড়ুয়াদের জন্য সব জানাবেন। তাঁর কথা এতদিনে মনে পড়ল।

হাঙরটিকে ভাল করে দেখে তাঁকে (ডঃ শঙ্করণকে) ছোট্ট এক চিঠি লিখলাম—'হাঙর সাগর-

জলের মাছ কিন্তু আঁশ নেই গায়ে, বদলে ছোট ছোট কাঁটা রয়েছে। লেজের দিকে বাঁকানো। আর কিছু নয়, তার দাঁতের সারি দেখলেই ভয় হয়। উপর নীচের দুই মাড়িতে দুই দুই করে চার সারি।
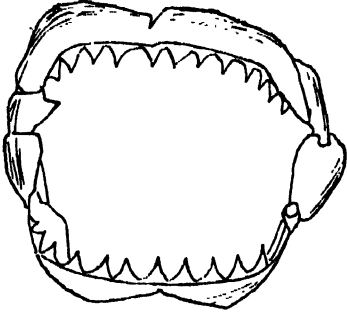
হাঙরের দাঁত
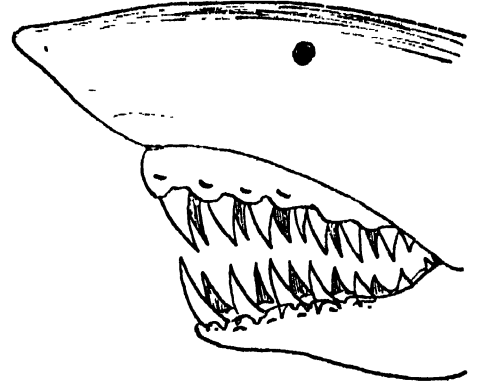
হাঙরের মুখ

হাঙর শ্বাস নেয় কি করে? কানকো দেখলাম না। তার বদলে সেই জায়গায় জানালার খড়খড়ির মত গোটা পাঁচেক কাটা দাগ। আপনার অভিজ্ঞতা থেকে আরো কিছু।—'

কদিন বাদে তাঁর বড় একটা চিঠি পেলাম। তাতে লিখেছেন, 'বিবর্তনের স্রোতে কত প্রাণী কত বদলেছে কিন্তু হাঙর বদলেছে নাম মাত্র। প্রাগৈতিহাসিক এই জলের প্রাণীটির দেহের গড়ন আর স্বভাব তেমনি রয়ে গেছে। তাতে তার কোন অসুবিধা নেই। মানুষ যেদিন নোনা জলে জীবিকার জন্যে নেবেছে সেদিনই তাকে হাঙরের মুখোমুখি হতে হয়েছে। বনে যেমন বাঘের ভয়, মানুষের কাছে, সমুদ্রে তেমনি হাঙরের ভয়। মনে ভয় থাকলে অনেকেরই ধারণা জোরে জোরে পা দাবড়ালে বা নাকে এক ঘুষি মারলে হাঙর বেচারা কাছে আর ঘেসবে না। কথাটা ঠিক নয়।

'সমুদ্রতীরের কোন জেলের অভিজ্ঞতা থাকলে, তাকে জিগগেস করলে সে বলবে—রক্তের গন্ধ একটু পেলেই ঢেউয়ে ঢেউয়ে হাঙরের ছায়া দেখা দেবে, পিঠ-পাখনা ভেসে উঠবে, তারপর সুযোগ বুঝে তীরবেগে ধেয়ে আসবে শিকারের দিকে। এক কামড়ে খুবলে নেবে খানিকটা, ফিরে গিয়ে তক্ষুনি ঘুরে আসবে। আবার আঘাত, খুবলে নেওয়া ফিরে যাওয়া ঘুরে আসা চলবে যতক্ষণ শিকার শেষ না হয়।

সব হাঙর একই স্বভাবের নয়। সাগর জলে শ' আড়াই জাতের হাঙর আছে। সবচেয়ে বড় তিমি হাঙর—লম্বায় প্রায় ষাট ফুট। খাবারের জন্যে সে হন্যে হয়ে বেড়ায় না। তার খাবার সমুদ্রের খুদে খুদে প্রাণী আর গাছপালা—যাকে বলে প্ল্যাংটন্।

প্ল্যাংটন্ খাবার জন্যে তিমি-হাঙরের গলার ভেতর ঝাঁঝরি রয়েছে। পোকামাকড় গাছপালা সব সমেত সে জল মুখে পুরে দেয়। তার খাবারগুলো ঝাঁঝরিতে আটকে গিয়ে জলটা কানকো দিয়ে বেরিয়ে আসে।

'হাঙরের কানকো মাছের মত একটা নয় কম করে পাঁচটা। জানালার খড়খড়ির মত বটে। মাছের মত হাওয়ায় ভরা পটকা ওদের নেই। তাই ডুবতে ভাসতে সব সময়ই ওদের সাঁতরে বেড়াতে হয়।

'ওদের সাঁতরে বেড়ান মানেই খাবার খুঁজে বেড়ান। খাবারের খোঁজেই দু'একটি হাঙর কখন কখন নদীতে ঢুকে পড়ে। হানা দেয় সমুদ্রতীরে স্নানের ঘাটে। ভয় তখনই।

'তিমি হাঙর বা ছোটখাট দু'এক হাত লম্বা হাঙর হয়ত ততটা ভয়ের নয় যতটা পাঁচ থেকে পঁচিশ হাত লম্বা সেই হাতুড়ি-মুখো, নীল, বাঘা, ম্যাকো বা সাদা বিন্দু হাঙর গুলোকে। ওদের নজরে পড়লে আর রক্ষে নেই।
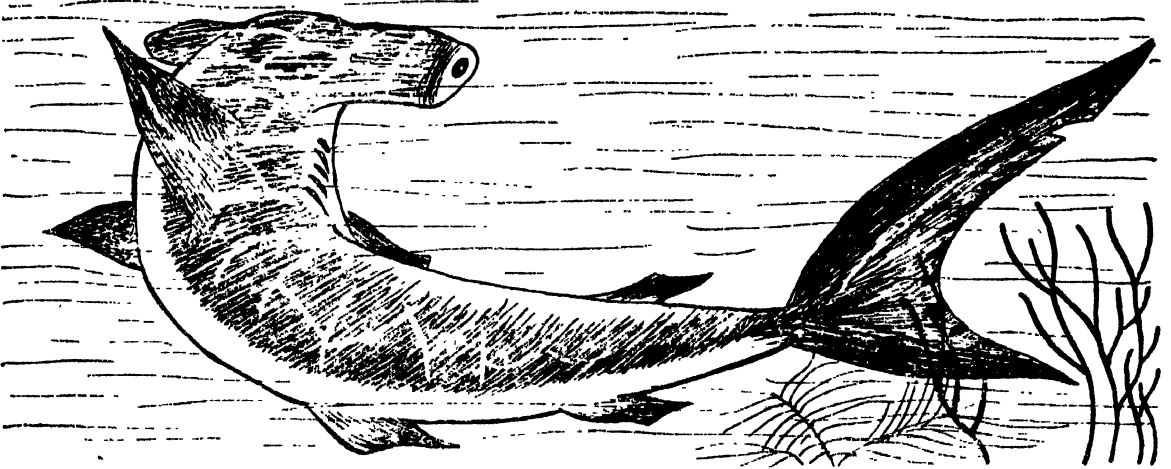
হাতুড়ি-মুখো হাঙর

'সাগর জলের আবছা অন্ধকারে হাতুড়ি-মুখো হাঙরের মত ভয়ানক আর কিছু নেই। হাতুড়ির মত মাথা, দু ধারের ঠোকার জায়গায় দুই চোখ। ছোট মুখে ছোট্ট হাঁ। ছোট্ট মাথায় অল্প মগজ। কিন্তু মাথা বোঝাই স্নায়ুতন্ত্রের জটিল জাল।

'ভোজের খবর সবার আগে সে পায়। সেখানে সবার আগে হাজির থাকে। অনেক দূরের সামান্য নড়াচড়া, সামান্য শব্দও সে বুঝতে পারে সহজে।

'হাঙরের স্বভাব নিয়ে, কি তার ভাল লাগে কি ভালো লাগে না, তার শক্তি বুদ্ধি আর সকল ইন্দ্রিয়ের সকল ক্ষমতা জানার জন্যে গবেষণার শেষ নাই।

'কদিন আগেও বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল গন্ধ পেয়েই বুঝি হাঙর তার ইচ্ছা অনিচ্ছা ঠিক করে। কথাটা সব সত্যি নয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে চোখ বন্ধ হাঙর দিক ঠিক করতে পারেনা সহজে। শুধু নাক দিয়ে তার কাজ চলে না। হাঙরের মুখ থেকে ডুবুরিদের, ডুবে যাওয়া জাহাজের নাবিক আর যাত্রীদের

বাঁচাবার জন্যে বিজ্ঞানীরা নানা রংয়ের রং বের করবার চেষ্টা করছেন। সে রং জলে গুললে হাঙর তার ভেতরকার কিছু দেখতে পাবে না। আর রং এর গন্ধে পালাবে। কিন্তু সাগরের জলে সে রং কতক্ষণ গাঢ় থাকবে? রং যখন হাল্কা হবে তখন?'

ডঃ শঙ্করণের চিঠি এখানেই শেষ। এর সাথে তিনি সমুদ্রে সাঁতার কাটতে যাবার আগে কটি নিয়ম মনে রাখতে বলেছেন। পড়ুয়াদের কাজে লাগবে ভেবে সেগুলো তুলে দিলাম:

অজানা সমুদ্রতীরে একা সাঁতার কাটতে যেওনা। রাতে সাঁতার কেট না। হাঙর দেখলে বেশী তাড়াতাড়ি না করে আস্তে তীরে উঠে আসবে। শরীরের কোথাও কাটা থাকলে বা রক্ত বেরলে জলে থেক না—রক্তের গন্ধে হাঙর আসে।
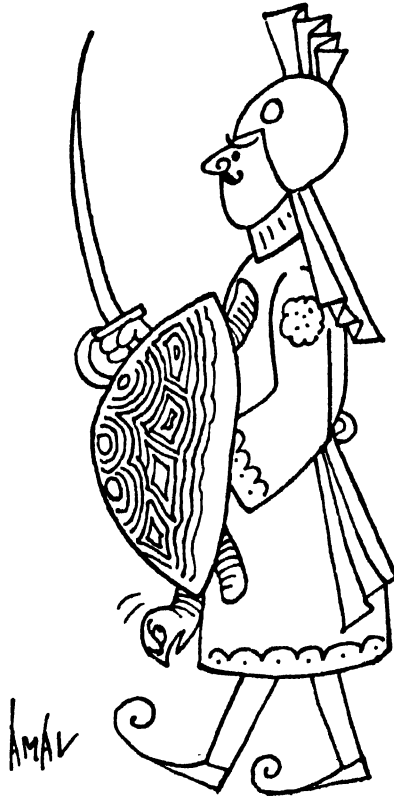
নাচের নামতা

উমা দেবী

এক—

ধবধবে ঐ বাছুর কেমন লাফাচ্ছে তা ছাখ।

একের পরে দুই—

ওর জন্যে সবুজ কাঁচা দুর্বো তুলে আনগে—যা না তুই,

কিংবা মাচায় লতানো ঐ নধর নধর পুঁই।

দুয়ের পরে তিন—

কী চমৎকার ল্যাজ তুলে রে নাচছে তাধিন্ ধিন্,

বাসছি ভালো যেমন বড়ো হচ্ছে দিনের দিন—

দে পিঠে ওর লাল মখমল সাচ্চা জরির জিন।

তিনের পরে চার—

ঘুরছে কেমন বেঁকছে কেমন লাফাচ্ছে আবার!—

গলায় পরা আদর করে একশ' কড়ির হার,

শিঙ গজালে জড়িয়ে দিস সোনারুপোর তার—

কালো চোখে খুশির আলো খুলবে কী বাহার!

চারের পরে পাঁচ—

চলনে ওর লাগছে কেমন পক্ষীরাজের ধাঁচ,

নাকের ডগা গোলাপ-গোলাপ, খুরে ক্ষীরের ছাঁচ

চাউনি সরল স্বচ্ছ শীতল ঝক্‌ঝকে দুই কাঁচ—

খাওয়া ওকে ছোলা-মটর, গুড় জলে ওর দে ভরে দে চাঁচ,

ঘুঙুর বেঁধে চারপায়ে ওর সঙ্গে সঙ্গে নাচ।

পাঁচের পরে ছয় এবং ছয়ের পরে সাত—

একটা বাছুর সকালবেলা করলো বাজিমাৎ,

মেঘের রুমাল চোখে চেপে হাসির চোটে সুজ্যিমামা কাৎ।

সবাই বেবাক বনলো বোকা নাচ দেখে নির্ঘাৎ,

উনুনশালে ধরল তলায় সাড়ে-আটটার ভাত।

নাচছে বাছুর কায়দা দেখে সবার গালে হাত—
এবার ওকে খাওয়া এনে লাল-সোনালি নরম-কচি টাটকা কলাপাত।
সাতের পরে আট—
দৌড়চ্ছে ও লাফাচ্ছে ও কতরকম ঠাট,
হালকা খুরের ছোবল খেয়ে শিউরে ওঠে মাঠ,
হার নামলো উদি-পুরি মণিপুরির নাট।
আট পরে নয়—
সকাল বেলার রোদ্দুরে কি নেশার মতন হয়,
ঘুরছে মাথা—ঘুরছে আকাশ—জগৎ ঘূর্ণিময়।
নয়ের পরে দশ এবং দশের পরে—যাঃ!
ঐ দেখ না থরথরিয়ে থরথরিয়ে গা
রোদ্দুরকে পিছলে ফেলে করছে কুপোকাৎ।
শূন্যে ছুঁড়ছে কায়দা-মাফিক পেছন দিকের পা—
যা ভাবিস তা না—
এখনো ওর গজায় নিকো ওপর পাটীর দাঁত!
ধবধবে ঐ বাছুরটাকে ভাই,
কী দেবো নাম ভাবছি বসে তাই।

মধ্যরাতের ঘোড়সওয়ার

নলিনী দাশ

একটা নিদারুণ আতংকের অনুভূতিতে অমলের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে বুঝতে পারলো না যে সে জেগে আছে না ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে।

কোথায়? সে কোথায়?

দুরন্ত ঝড়ের বেগে শোঁ শোঁ শব্দে গাছপালা আর বাঁশবন নুয়ে পড়ছিল। মাঠের ওপর বড় বড় ঢেউ আছড়ে পড়ছিল, ঘন ঘন মেঘের গর্জন, আর সমস্ত শব্দকে ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছিল ডাকাতদলের বিকট চিৎকার।

একটা দমকা বাতাসের সঙ্গে স্পষ্ট শোনা গেল ঘোড়ার খুরের শব্দ—খট খট—খট খটা খট—সাজোরে ঘোড়া ছুটিয়ে কে যেন চলে গেল অনেক দূরে জমিদার বাড়ি ছাড়িয়ে, আমবাগান, বাঁশবন পেরিয়ে।

জমিদার বাড়ি? না কি স্কুলবাড়ি?

কেমন যেন সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল অমলের মনে।

বিদ্যুতের আলোতে সে একমুহূর্ত চারিদিকে দেখে নিল। ঘরের আর সব ছেলেরা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। এত দুর্যোগেও তাদের সুনিদ্রার কোনও ব্যাঘাত হচ্ছে বলে মনে হল না।

এইবার বিছানার উপর সজাগ হয়ে উঠে বসল অমল। এর আগে তাহলে সে স্বপ্নই দেখছিল। ঝড়বৃষ্টি অবশ্য সত্যিই হচ্ছে। কিন্তু বাকিটা হল তার সেই বহুবার দেখা স্বপ্ন, সেই ছোটবেলা থেকে শতবার শোনা আর সহস্রবার চিন্তা করা ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

না না—চুপ—আস্তে!—অমল কান পেতে শুনল ঝড়ের শব্দ ছাড়াও তো আরো শব্দ আছে। খস্ খস্—ফিস্‌ফিস্—কারা যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে—কারা যেন কথা বলছে! এখন তো সব ছেলেদেরই ঘুমিয়ে থাকবার কথা—যেমন ঘুমোচ্ছে আর ঘরের ছেলেরা।—কারা তাহলে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে?

আচমকা একটা দমকা হাওয়া দিল। এবার অমল স্পষ্ট আবার শুনতে পেল ঘোড়ার খুরের শব্দ—খট খটা খট—খট খট খট—শব্দটা ক্রমে যেন সুদূরে মিলিয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে কে যেন কোথায় চাপাস্বরে বলে উঠলো—ঐ শোন্—শুনলি তো?

এটা তো স্বপ্ন নয়, কল্পনা নয়। এ কার গলার আওয়াজ? এ যে খুব চেনা গলার আওয়াজ। কিন্তু অমল ভাল করে তা মনে করতে পারল না। নাঃ—আর দেরী করা নয়, ব্যাপারটার একটা কিনারা করতেই হবে। সম্ভব হলে কাল থেকেই অনুসন্ধান করতে হবে।

আপাততঃ আপাদমস্তক লেপ মুড়ি দিয়ে আবার শুয়ে পড়ল অমল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমিয়ে পড়ল আর আবার স্বপ্ন দেখতে সুরু করল। মশালের আলোতে বিশ পঁচিশ জন মিশ কালো জোয়ান ভূতের মত সেজে সড়কি বাগিয়ে তেড়ে আসছে আর বিকট চিৎকার করছে। তাদের সামনে খোলা তলোয়ার হাতে রুখে দাঁড়িয়েছে একা এক দীর্ঘকায় পুরুষ।

তারপর? তারপরেই স্বপ্নটা কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত যে কি হয় অমল কখনই ঠিক করে বুঝতে পারে না। কিন্তু কে যেন ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যায়। ঘোড়ার খুরের শব্দ যেই দূরান্তরে মিলিয়ে যায় তখনই অমলের মনের আতংকের ভাবটাও কেটে যায়—নাঃ—আর কোনও ভয় নেই। আবার সে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়ে।

ঢং ঢং—ঢং ঢং—ঢং ঢং।

জোড়ায় জোড়ায় দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজতে না বাজতেই ছেলের দল প্রাতঃকৃত্য শেষ করে ব্যায়ামের জন্য প্রস্তুত হল। রাত্রের ঝড়জলে মাঠের অবস্থা যে শোচনীয় সে তো জানা কথাই। বরাবরের ব্যবস্থার মতন তারা নতুন স্কুলবাড়ির ছাদে গিয়ে যে যার শ্রেণী অনুসারে দাঁড়িয়ে পড়ল।

একাদশ শ্রেণীর নায়ক ছেলেরা নাম ডাকতে সুরু করল, নবম আর দশম শ্রেণীর দুটি করে ছেলে তাদের সাহায্য করতে লাগল। বিশেষ করে নবম শ্রেণীর ছেলেদের ভারি গুরু গম্ভীর ভাব, কারণ তাদের নায়ক হবার শিক্ষানবিশি এই সবে সুরু হয়েছে।

সর্বাধিনায়ক শ্যামল সেন একধারে দাঁড়িয়ে সবাইকে লক্ষ্য করতে লাগল।

অষ্টম শ্রেণীর নাম ডাকছে নায়ক বীরেন বোস আর ছেলেরা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিচ্ছে।

বনমালী ঘোষ—উপস্থিত, অমলকুমার রায়—উপস্থিত, রজত চক্রবর্তী—উপস্থিত। একি? এখানে ফাঁক কেন? ছেলেরা চুপ করে রইল।

বীরেন আবার জিজ্ঞাসা করল—এরপরে তো থাকবে অরিজিৎ চৌধুরী—কোথায় অরিজিৎ ?

অনেক দূর থেকে বিকৃত গলায় উত্তর এল—'উপ........স্থিত' কয়েকটি ছেলে হেসে ফেলেই বীরেনের গম্ভীর মুখ দেখে তক্ষুনি সামলে নিল।

বীরেন জিজ্ঞাসা করল—ঠিক সময়ে আসনি কেন ? সিঁড়ির দিক থেকে গদাই লস্করি চালে নিজের জায়গায় আসতে আসতে অরিজিৎ বলল—আমি সেই কখ···ন থেকে মাঠে দাঁড়িয়ে আছি ! আজ আবার এখেনে কেন ? তার মুখচোখ আর এলোমেলা চুল দেখে কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে সে এক্ষুনি ঘুম থেকে উঠে এসেছে।

সর্বাধিনায়ক এগিয়ে এল—কি হয়েছে ? এত দেরী কেন ? সমস্ত ছোট ছেলেরা প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অষ্টম শ্রেণীর ছেলেদের কাছ থেকে কি আরো কিছুটা নিয়মানুবর্তিতা আশা করতে পারি না ?

শ্রেণীর অন্য ছেলেদের কান গরম হয়ে উঠেছে লজ্জায়। অরিজিৎ কিন্তু নির্লজ্জের মতন কি একটা জবাব দিতে গিয়েছিল, কিন্তু তখনই সে সামলে নিয়ে সুবোধ ছেলের মতন নিজের জায়গায় দাড়াল। তার নামে এ মাসে এর মধ্যেই তিনটে কালো দাগ পড়ে গেছে। দিনকতক একটু চুপচাপ থাকতে হবে।

পনের মিনিট সম্মিলিত ব্যায়ামের পরে পনের মিনিট বিশ্রাম। ছটার সময়ে জলখাবারের ঘণ্টা, গরমের দিনে সাড়ে পাঁচটায়। সাড়ে ছটার সময়ে পড়বার ঘণ্টা পড়ে। তার আগে একদল নায়ক ঘরে ঘরে ঘুরে দেখে আসে সব ঠিক ঠাক এবং গোছাল আছে কিনা, দরকার হলে ছেলেদের ডেকে ঘর ঠিক করায়।

অমলের অঙ্ক কষা বাকি ছিল, সাড়ে ছটার ঘণ্টা পড়বার আগেই সে তাড়াতাড়ি ক্লাসরুমে গিয়ে বইখাতা খুলে বসল। আর কেউ আসেনি তখনও কেবল তার পাশের চেয়ারে বসে কমল নিবিষ্টমনে অঙ্ক কষছিল। অমলকে দেখে সে হাসল কিন্তু অঙ্ক করেই চলল।

কমলের খুব বুদ্ধি কিন্তু সে পড়াশুনা করবার সময় পায় কম। অমলের ধারণা যে কমল যদি ভাল করে পড়ত তাহলে আর কোনও ছেলেই তার সঙ্গে পেরে উঠত না।

ক্রমে ক্রমে ছেলেরা আসতে আরম্ভ করল। কেউ কেউ সোজা নিজেদের জায়গায় গিয়ে বসে বই খুলল, কেউ বা আগে বন্ধুদের সঙ্গে জটলা সুরু করল।

ঘণ্টা পড়বার পরে খুব জোরে শব্দ করতে করতে ঘরে এসে ঢুকল অরিজিৎ, ভূতনাথ, সব্যসাচী আর দীপঙ্কর।

ঘটাং করে নিজের ডেস্কের ডালাটা খুলে অরিজিৎ বলল— ওঃ — ওঠবোস করে আজ গায়পায় ব্যথা হয়ে গেছে রে ভুতো— এর চেয়ে ঘর ঝাঁট দেওয়া অনেক সহজ। আড়চোখে কমলের দিকে একবার তাকিয়ে নিল সে, কিন্তু কমল তাকাল না, নিবিষ্টমনে অঙ্ক করেই চলল।

ভূতনাথ ন্যাকা ন্যাকা সুরে উত্তর দিল—আমি ভাই খুব ভাল ময়দা মাখতে পারি। ব্যায়াম করার বদলে আমি হলুদ বাটতেও রাজি আছি।

দু একটি ছেলে তার কথার ধরণে হেসে উঠল।

কমল অঙ্ক করতে লাগল কিন্তু অমল লক্ষ্য করে দেখল যে তার কানের ডগাদুটো লাল হয়ে উঠেছে ঠিক সেই সময়েই ক্লাসের ঘণ্টা পড়ল, ছেলেরা চুপ করে গেল, ক্লাস-টিচার শশাঙ্কবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন। নামডাকা শেষ করে তিনি বললেন—তোমাদের সারাবছরের পড়াশুনা আর কাজকর্ম তো আগেই বুঝিয়ে দিয়েছি, আজ কয়েকটি পুরস্কার আর প্রতিযোগিতার খবর বলব।

ছেলেরা উৎসুক হয়ে শুনবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল, কেবল অরিজিৎ চাপা স্বরে বলল—এ আবার কি গ্যাঁড়া-কল রে বাবা!

—কিছু বলছিলে? জিজ্ঞাসা করলেন শশাঙ্কবাবু।

—আজ্ঞে না স্যর, কি খবর আছে জানতে চাচ্ছি।

—বেশির ভাগ খবরই তোমাদের জানা, তবু আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি। তোমরা মনে রেখো যে সারা বছর তোমাদের পড়া, খেলা, কাঠের কাজ, ড্রিল, গান ছবি আঁকা—সব কিছুর উপর নম্বর আছে। তাছাড়া নিয়মানুবর্তিতা, দায়িত্ব, এ সবেও নম্বর আছে।

—দুত্তোর—ছাতার নম্বর!—প্রায় অশ্রুতস্বরে বলল ভূতনাথ।

শশাঙ্কবাবু শুনতে পেলেন না, কিম্বা শুনেও উপেক্ষা করলেন। তিনি বলে চললেন—তাছাড়া কতগুলি ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা আছে আর তার জন্য ভাল ভাল পুরস্কার আছে—যেমন আবৃত্তি, গান, অভিনয়, সাঁতার, নৌকা বাওয়া, ফুটবল খেলা ইত্যাদি। তোমরা নোটিস বোর্ডে দেখে নিও কি কি আছে।

ছেলেরা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

—আমি চাই যে আমার শ্রেণী সমস্ত বিষয়ে খুব ভাল ফল দেখাবে—যেমন পরীক্ষার খাতায়, তেমনি খেলার মাঠে। এখন থেকে তোমরা ঠিক কর—তোমাদের এবার চ্যাম্পিয়নশিপ্‌ শিল্ডটি নিতে হবে—কেমন পারবে না?

—হ্যাঁ স্যর, নিশ্চয় চেষ্টা করব।

নতুন ছেলে অমল বেশ উৎসাহিত বোধ করছিল। নীহার, রজত, বনমালী, সুভাষ আর আরো কয়েকটি ছেলে শশাঙ্কবাবুকে প্রশ্ন করে করে প্রতিযোগিতার বিষয়ে আরো খবর সংগ্রহ করল।

ভূতনাথ ফিসফিস করে বলল—যানা সব ছাতাপড়া পেরাইজ—তার জন্য আবার—যতসব ইয়ে!

দীপঙ্কর উঠে দাঁড়িয়ে কি একটা বলতে যাচ্ছিল—কিন্তু অরিজিৎ তার হাত ধরে তাকে বসিয়ে দিল—ক্যাবলামি করিস না দীপু। বাচ্চা ছেলের মতন আবার পেরাইজ নিতে যাবি নাকি?

শশাঙ্কবাবু এবার সোজা জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কিছুতে নাম দিলে না অরিজিৎ?

—আজ্ঞে না স্যর—আমার ব্রেনটা একটু দুর্বল কিনা—তাই ডাক্তারবাবু মাথা খাটাতে নিষেধ করেছেন।

বিরক্ত হলেও শশাঙ্কবাবু আর কিছু বললেন না, পড়াতে সুরু করে দিলেন।

অমলের ভারি রাগ হচ্ছিল। সব বিষয়েই অরিজিৎরা কয়েকটি ছেলে এমন দুষ্টুমি আর অসভ্যতা করে যে তাদের সমস্ত ক্লাসের দুর্নাম হয়। কেন যে ছেলেরা তাদের সহ্য করে—দাবড়ি দিয়ে জব্দ করে না, সে তো অমল বুঝতেই পারে না।

অরিজিতের একটা বিশেষ দল আছে, সেই পাঁচছটি ছেলের প্রত্যেকেরই কোনও না কোনও গুণ আছে। ভূতনাথ চমৎকার ফুটবল খেলে, সুন্দর আবৃত্তি আর অভিনয় করে সব্যসাচী, দীপঙ্কর রচনা লেখে ভাল, অঞ্জন ছবি আঁকে। অরিজিৎ নিজে বেশ বুদ্ধিমান—ভাল করে পড়লে সে হয়তো পড়াশুনার প্রাইজ দুএকটা পেতে পারত।

কিন্তু তা তো না, এরা কেবল ঘুমোবে, দুষ্টুমি করবে আর নিয়ম ভাঙবে, আর এদের জন্য শ্রেণী হিসাবে তাদের সকলের নম্বর কমে যাবে! ভারি রাগ হয় অমলের।

সাড়ে দশটা অবধি ক্লাস চলল। যে সব ছেলেরা সকালে স্নান-পর্ব সেরে নেয়নি তারা ঘণ্টা পড়ামাত্র স্নানের ঘরের দিকে ছুটল। ঠিক এগারোটার সময় খাবার ঘণ্টা পড়ল। ততক্ষণ খিদেটাও বেশ চনচনে হয়েছে সকলের। খাবার পরে ছেলেরা কিছুটা সময় হাতে পায়। তখন ক্লাসরুমে বা লাইব্রেরিতে বসে পড়াশুনা করা যায়। কমনরুমে বসে গল্পগুজব করা বা ক্যারম খেলা যায়। আর্টরুম, মিউজিকরুম বা ওয়ার্কশপে কাজ করা যায়। আবার শোবার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করতেও বাধা নেই।

অমলের ইচ্ছা হচ্ছিল দীপঙ্কর, সব্যসাচী আর অঞ্জনকে ডেকে প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার বিষয়ে আলোচনা করে—তাদের বোধহয় কিছুটা উৎসাহ আছে, কেবল অরিজিৎ আর ভূতনাথের ঠাট্টার ভয়ে যাচ্ছে না। কিন্তু ভূতনাথ খাবার ঘর থেকে বেরিয়েই গা মোড়ামুড়ি দিয়ে, লম্বা একটা হাঁই তুলে, তুড়ি দিতে দিতে বলল—চল্‌রে ছেলেপুলেরা, ঘুমোবি চল্। ভোর না হতেই ওঠবোস, একটু জিরুতে না দিতেই অঙ্ক কষ্—একটু ঘুমিয়ে না নিলে বাঁচবি কি করে বাছারা!

আশ্চর্য ঘুমোতে পারে এই ছেলেগুলি! দুপুরে খাবার পরে রোজ এরা ঘুমোয় তার পরে ক্লাসে গিয়েও হাঁই তুলতে থাকে।

অমল খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে প্রথমে ক্লাসরুমে গেল, কিন্তু সেখানে কাউকে পেল না। কিছুক্ষণ এ-বই সে-বই নাড়াচাড়া করবার পরে সে উঠে কমনরুমে গেল—অন্য ছেলেদের সঙ্গে পরামর্শ করতে। এক কোণায় বসে রজত, নীহার আর বিজন চুপিচুপি কথাবার্তা বলছিল, তার দুএক টুকরো অমলের কানে এল ....। *স্পষ্ট শুনলাম সেই ঘোড়ার খুরের শব্দ।* আবার শুনতে পেল ......। চৌধুরীবংশের সেই অভিশাপের ফলেই এরকম ......।

তাহলে কি কাল রাত্রে সকলেই ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনেছিল? কই? তখন তো তার মনে হল সবাই অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সত্যি সত্যিই কি কেউ ঘোড়া ছুটিয়ে স্কুলবাড়ির কাছে বেড়ায়? কে? কেন বেড়ায়? ছেলেরা কি জানে এ বিষয়ে?

অমলকে দেখেই ছেলেরা কিন্তু অন্য কথা সুরু করে দিল। অমল নতুন ছেলে বলে কি তারা চৌধুরী বংশের কথা তার সামনে বলল না? যদি তারা অমলের পরিচয় জানত তাহলে কি করত?

অমলকে দেখেই রজত বলে উঠল—আমরা ভাবছি এবার দল বেঁধে সব প্রতিযোগিতায় নাম দেব, দেখি কে কটা প্রাইজ পেতে পারি।

নাহার বলল—গত বছর আমাদের ক্লাসের ছেলেরা নিজেদের ক্লাসের প্রাইজ গুলি ছাড়া একটাও পুরস্কার পায়নি। এবার তার শোধ তুলতে হবে।

সাঁতার কাটা আর নৌকা বাওয়াতে কমলের জুড়ি সমস্ত স্কুলে নাই। গতবছর সে যোগ দেয়নি, এবার তাকে রাজি করাতে হবে।

অমল বলল—আমি তো দীপঙ্কর আর অঞ্জনকে ডেকে এ বিষয়ে কথা বলতে চেয়েছিলাম—কিন্তু তারা সবাই এখন ঘুমোতে গেল।

বিজন বলল—ঐ শোবার ঘরটায় কি রহস্য আছে বলতো? ও ঘরে যে ছেলেরা শোয় তারাই বেদম কুঁড়ে হয়ে যায়। পড়াশুনা করে না আর কেবল ঘুমোয়। গত বছর দেখিস নি?

— ভাগ! রহস্য না আরো কিছু। গতবছরেও তো এই ছেলেগুলিই ঐ ঘরে শুতো। অরি আর ভুতো নিশ্চয় রাত জেগে ফাজলামি করে তাই দলশুদ্ধ সবাই সারাদিন সব কাজের মধ্যে হাঁই তোলে।

— নে নে, এখন কাজের কথা বল্—তাড়া লাগালো নীহার। ততক্ষণে সুভাষ, সুবিমল, বসন্ত আর বনমালীও তাদের আলোচনায় যোগ দিয়েছে এসে। তারা সবাই মিলে স্থির করল যে এবার তারা সব কাজ আর পড়া খুব ভাল করে করবে, ক্লাসের সুনাম আবার ফিরিয়ে আনবে। নীহার বলল—ঐ ভুতারির দলটা ভাঙতে পারিস না? ওদের আওতা থেকে দীপু আর সব্যসাচীকে সরাতে পারিস না?

—ভুতারির দল! বেড়ে নামটি দিয়েছিস তো।

সবাই হেসে উঠল।

অমলের মনে হল যে মাত্র মাসখানেক আগে সে যখন এই স্কুলে ভর্তি হয়েছিল তখন অরিজিৎ আর ভূতনাথের যেরকম প্রতিপত্তি দেখেছিল, এখন তার চেয়ে কিছুটা কম দেখা যাচ্ছে।

আজ সে জিজ্ঞাসা করেই ফেলল—ওদের তোরা এত খাতির করিস কেন বল্ তো? সমীহ করে চলিস কেন?

সুভাষ থতমত খেয়ে বলল—সমীহ ঠিক নয় তবে—অমল আবার জিজ্ঞাসা করল—ওদের দলের ছেলেরা ওদের অত মেনে চলে কেন? ভয় পায় কেন?

নীহার বলল—কি জানি, সেখানে হয়তো কিছু একটু ব্যাপার আছে। ওরা তো সব বড়মানুষি চালে চলে—জামা-কাপড়-ঘড়ি-কলম সবই দামী দামী। অথচ অরিজিৎ আর ভূতনাথ ছাড়া কেউ বড় লোকের ছেলে নয়।

অমল জিজ্ঞাসা করল—তাহলে ওরা অত টাকা পায় কোথায়?

—হয় তো অগ্নিজিৎই ওদের উপহার দেয়—তাই ওরা তার কথা মেনে চলে—অত বড়লোক আর বড় বংশের ছেলে।

নীহার বলল—আমি ওসব বড় লোক টোক বুঝি না বাবু। রাজা মহারাজা যার ছেলেই হও না কেন—স্কুলে যখন পড়তে এসেছ, স্কুলের নিয়ম মেনে চলতে হবে।

ভুতারির বড়মানুষি চাল আর জাঁক দেখে অমলের বরাবরই রাগ হত। এতদিনে অন্য ছেলেদেরও মোহ কেটে যাচ্ছে দেখে সে খুব খুসি হল।

দেড়টার থেকে সাড়ে তিনটা পর্যন্ত আবার ক্লাস হয়। বিকালে, জলখাবারের পরে, পালা করে বিভিন্ন ক্লাসের ছেলেদের খেলার ক্লাস থাকে। অন্য ছেলেরা তখন ইচ্ছামতন খেলে, বাগান করে, গরমের দিনে পুকুরে সাঁতার কাটে, ফুলবাগানে, ফলবাগানে বেড়িয়ে বেড়ায়, কিন্তু,এই সময়ে বাড়ির ভিতর যাবার নিয়ম নাই। সন্ধ্যার সময়ে একঘণ্টা স্টাডি, আর তার পরেই খাবার ঘণ্টা। ছোট ছেলেরা খাবার পরেই শুতে চলে যায়। সপ্তম অষ্টম শ্রেণীর ছেলেরা আর এক ঘণ্টা পড়াশুনা করে। বড় ছেলেরা ইচ্ছা করলে তার পরেও আরো একঘণ্টা পড়তে পারে। কিন্তু সাড়ে দশটার মধ্যে সকলকেই শুতে যেতে হয়, তারপরে শোবার ঘর আর পড়বার ঘরের সব বাতি নিভিয়ে দেওয়া হয়।

ছোটছেলেরা কলরব করতে করতে শুতে যায়, বেশি গোলমাল করলে অবশ্য তারা নায়কদের কাছে বকুনি খায়। সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীর ছেলেরাও কিছু কথাবার্তা বলতে বলতে আসে। তাদের শোবার ঘর পুরোনোবাড়ির দোতলায়—বাড়ির পিছনের ফলবাগানের দিকে—নায়কদের ঘর থেকে অনেকটা দূরে।

বড় ছেলেরা নিঃশব্দে শুতে আসে কারণ তাদের শোবার ঘর ছোটছেলেদের ঘরের কাছে, নতুন বাড়িতে কিছুক্ষণ পরে তারাও ঘুমিয়ে পড়ে, চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে যায়।

সব ছেলেরা যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখম কারা জেগে ওঠে? কারা ফিস ফিস করে কথা বলে আর খসখস শব্দে নড়ে চড়ে বেড়ায়?

একদিন অমল পা-টিপে টিপে একটু অনুসন্ধান করতে গিয়েছিল, কিন্তু ঘরে ঘরে উঁকি মেরে তা: মনে হল যেন সব ঘরের সব ছেলেই অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তার কেমন যেন গা-ছমছম করতে লাগল—সত্যিই কি এটা কোনও মানুষের চলাফেরার শব্দ? নাকি অতীতের কোনও প্রেতাত্মা এই সাবেক জমিদারবাড়িতে ঘোরাফেরা করে? যতদিন না এই রহস্যের কোনও কিনারা হচ্ছে, ততদিন অমল শান্তি পাবে না মনে। অথচ, কি ভাবে সে অনুসন্ধান করবে ভেবেই পায় না। তার কথাকে ছেলেরা কোন গুরুত্ব দেবে, নাকি সব কথা হেসে উড়িয়ে দেবে? কোনও কথা কারো কাছে বলতে তার সঙ্কোচ হয়, নিজের পরিচয়টাও সে আপাতত: গোপন রাখতে চায়।

কেন যেন তার মনে হয়েছিল যে তার উপযুক্ত সহকারী হতে পারত কমল। তারা দুইজনে মিলে নিশ্চয় পুরাতন চৌধুরী বাড়ির রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারত। প্রথম যেদিন কমলের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল সেদিনই মনে হয়েছিল যেন সে তার কত দিনের পুরোনো বন্ধু, তখনও অবশ্য অমল এই স্কুলে

ভর্তি হয়নি। এই স্কুলে কেন, কোনও স্কুলে পড়েনি কখনও। ছোটবেলা থেকে সে একা একা বাবা-মার কাছে থেকেছে আর গৃহ-শিক্ষকের কাছে পড়েছে। ছোটবেলা থেকেই বাবা-মার আর বড় ঠাকুমার কাছে চৌধুরী বংশের সব গল্প শুনেছে। এই চৌধুরীবাড়ি নিয়ে কত কল্পনা-জল্পনা করেছে। বাবা-মার সঙ্গে গত পুজোয় সে কাছাকাছি একজনদের বাড়ি এসেছিল। ছুটিতে স্কুল বন্ধ ছিল তখন। হেড মাস্টার মশাইয়ের অনুমতি নিয়ে তারা বাড়িটা একবার দেখে গিয়েছিল।

চৌধুরী বংশের বিরাট সাবেক বাড়ির সঙ্গে আধুনিক কতগুলি ঘরবাড়ি যোগ দিয়ে এই বিখ্যাত আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে পঁচিশ বছর আগে। অনেকেই এই স্কুল দেখতে আসেন।

হেড মাস্টার মশাই অবশ্য বুঝতে পারেননি যে অমলরা আসলে এসেছিল বিলুপ্ত চৌধুরী বংশের সাবেক বাড়িটা দেখে যেতে।

পাঁচিলের ধারে গঙ্গার ঘাটের বেদীতে একটা বই হাতে নিয়ে বসেছিল কমল। অমলদের দেখে সে এগিয়ে এসে আলাপ করেছিল, তাদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সমস্ত স্কুলবাড়ি ভাল করে দেখিয়েছিল, পুরোনো বন্ধুর মতন গল্প করেছিল।

বেলা হয়ে যাচ্ছে তবু তাদের গাড়ি আসছে না দেখে সে তাদের তার ঠাকুরমার খাবারের দোকানে নিয়ে গিয়েছিল। পাকা-চুল ওয়ালা হাসি খুসি দাদাকে অমলের ভারি ভাল লেগেছিল।

কত যত্ন করে তিনি তাদের লুচি, আলুর দম আর মাছের চপ খাওয়ালেন। আবার তাদের সঙ্গে দিয়ে দিলেন নারকেলের নাড়ু, কিছুতেই তার দাম নিলেন না। সমস্ত খাবারই অপূর্ব খেতে। পরে অমল জেনেছিল যে এইগুলিই স্কুলের ছেলেদের সব চেয়ে প্রিয় টিফিন। স্কুলের জন্য জলখাবার তৈরী করে আর ছেলেদের কাছে খাবার বিক্রি করেই দাদী বহু কষ্টে সংসার চালান আর বাপ-মা-মরা কমলকে লেখাপড়া শেখান। স্কুলকর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতিক্রমে কমল তাঁর সঙ্গেই থাকে। তাঁর কাজেও কিছুটা সাহায্য করে আবার স্কুলেও পড়ে। ছেলেরা যেমন ভারি ভালবাসে দাদীকে, তিনিও তেমনি হাসিমুখে তাদের নানা আবদার শোনেন, বর্ষার দিনে গরম পেঁয়াজি-বেগুনি, শীতের দিনে ঝালমুড়ি আর গরমের সময়ে ঘোলের সরবৎ আর কুলপি মালাই সরবরাহ করেন। ছেলেরা লুটে পুটে খায়।

কেবল অরিজিৎ আর কয়েকটি উন্নাসিক ছেলে বলে যে ময়রানীর আবার অত বাড়াবাড়ি কি? পয়সা ফেলব—খাব—ব্যস! তবে স্কুলকর্তৃপক্ষের ভয়ে দাদীর সঙ্গে কোনও অভদ্রতা করতে পারে না তারা—কেবল আড়ালে কমলকে বিদ্রূপ করে।

পুরোনো চৌধুরী বাড়ির নতুন স্কুল দেখে অমলের এত ভাল লেগেছিল যে বাড়ি ফিরে সে আবদার ধরেছিল জানুয়ারি মাস থেকে ওই স্কুলেই সে ভর্তি হবে। তার মা প্রথমে আপত্তি করেছিলেন—তুই তো কখনও স্কুলে পড়িস নি, বাইরের ছেলেদের সঙ্গে মিশিসনি, একেবারে বোর্ডিং স্কুলে গিয়ে থাকতে পারবি?

—পারব, পারব মা—খুব পারব—একা একা কখনও পড়া শুনা হয়? স্কুলে ভর্তি দেখ না।

অমলের বাবা-মার মনেও ইদানীং ধারণা হয়েছিল যে একা একা থেকে অমল অতিরিক্ত কল্পনা প্রবণ হয়ে যাচ্ছে, তাই তাঁরা সহজেই রাজি হয়ে গেলেন। হেড মাস্টার মশাই অমলকে পরীক্ষা করে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি করলেন। জানুয়ারির প্রথমে সে পাকাপাকি ভাবে স্কুলে এল। অমলের বাপ-মা যদি জানতেন যে চৌধুরীবাড়ির স্কুলটা দেখে কল্পনাপ্রবণ-অমলের মনে এক বৃহৎ পরিকল্পনা জেগেছে তাহলে অবশ্য তাঁরা এত সহজে তাকে এখানে পাঠাতে রাজি হতেন কিনা সন্দেহ!

প্রথম দিনেই হেডমাস্টার জনার্দনবাবু যখন এসে তাকে কমলের পাশে বসিয়ে দিয়েছিলেন, তখন সে ভারি খুসি হয়েছিল। কিন্তু দিনটা কাবার হতে না হতেই সে বুঝেছিল যে কমল আর সেরকম সহজ বন্ধুভাবে মিশতে চায় না, কেবল ভদ্রতা রক্ষার জন্যে কথা বলে। তার এই নিস্পৃহ ভাব সব ছেলে সম্বন্ধেই।

ক্রমে যখন অমল কমলকে কেন্দ্র করে অরিজিৎদের বেয়াড়ারকম ঠাট্টা তামাশা শুনতে পেল, তখন সে কমলের ব্যবহারের অর্থ কিছুটা বুঝল। অন্য ছেলেরা অবশ্য অভদ্র কথা বলে না, কিন্তু অরিজিতদের কথায় হাসে কেন তারা?

এই তো সেদিন অরিজিৎ ক্লাসে ঢুকেই বলল—ছিদাম মুদীর ছেলেটা এবার এই স্কুলে ভর্তি হল—বুঝলি দীপু?

দীপঙ্কর কিছু বলবার আগেই ভূতনাথ নাটকীয় ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলে উঠল—আসুক-আসুক চাকর—মুদী—মেথর—মুদ্দোফরাস—সবাই স্বাগতম্।

এই বাজে রসিকতাতেও কয়েকটি ছেলে খিলখিল করে হাসতে লাগল।

পরে অমল রেগে কমলকে বলল—কি করে তুই এসব কথা সহ্য করিস? ওরা এমন ছোটলোক! ম্লান হাসি হেসে কমল উত্তর দিল—ছোটলোক কিরে? ওরাই তো শুনি মস্ত বড়লোক!

কমল বলেছিল—দরকার নেই অমন বড়লোক হয়ে। তোর দাদার পায়ের ধুলো পেলেও ওদের উপকার হবে!

সেইদিনই অমল মনে মনে বুঝে নিয়েছিল যে কমলের কাছে তার পরিচয় দেওয়া চলবে না, তাহলে সে নিজেকে একেবারে গুটিয়ে নেবে। মুখে সে কেবল বলেছিল—তুই ভাল করে পড়াশুনা কর দেখি কমল—ভুতারির দল তোর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না কখনই।

'ভুতারির দল!'—তার কথা শুনে কমলও একটু হেসে না ফেলে পারেনি!

ক্রমশঃ

বালী-সুগ্রীব কথন

লীলা মজুমদার

(পূর্ব প্রকাশিত অংশের চুম্বক)

কিষ্কিন্ধ্যার রাজা বালীকে মৃত অনুমান করে রাজ্যের লোকে তার ছোটভাই সুগ্রীবকে তার সিংহাসনে বসিয়েছিল।

বালী ফিরে এসে ভয়ানক রেগে গিয়ে সুগ্রীব ও তার বন্ধু হনুমানকে নির্বাসন দিয়ে সিংহাসন পুনরধিকার করেছে।

রাম ও লক্ষ্মণ সীতার সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে সুগ্রীব আর হনুমানের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। বানর অনুচরদের সাহায্যে সুগ্রীব সীতার সন্ধান এনে দেবে জানতে পেরে তাঁরা তাকে কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসন ফিরিয়ে দিতে সাহায্য করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

(তৃতীয় দৃশ্য)

স্থান—কিষ্কিন্ধ্যার বাইরে বনভূমি।

বালীর প্রাসাদ থেকে উৎসব সঙ্গীত শোনা যাচ্ছে।

জুড়ির গান

ওঠ্ না বালী
মুখে কালি!
তুই কি বুঝিস্ না তোর বিপদ ভারি,
খাচ্ছ দাচ্ছ, গান বাজাচ্ছ, সুখে নাচছ হায়!
(ঐ যে) রাম লক্ষ্মণ হনুমান আসছে সারি সারি!
(আর) সুগ্রীব তোকে সেই সুযোগে পিটিয়ে করবে মাত্থর!
বাচ্চি থামা,
যুদ্ধে নামা,
কোথায় রে তোর গয়—গবয়!
রামের সনে যুদ্ধে জেতা,
একলা তোমার কম্ম নয়!
(আরে দূর!)
(শেষে) কপাল ফেরে যুদ্ধে হেরে হায়রে গাইবি
অন্য সুর!

(আগে আগে রাম লক্ষ্মণ, তার পেছনে হনুমানের ও সুগ্রীবের পরস্পরের পেছনে লুকোবার চেষ্টা করতে করতে প্রবেশ।)

হনু—ও রাজা, বলি দেরী কেন? যাও, বালীটাকে ধরে আনো। আমার খোপার কাপড় আটকে রেখেছে, আমার যে ভারি অসুবিধা হচ্ছে!

সুগ্রীব—ধরে আনব ?—ইয়ে—কি—বল, বড় ভাই, বেশি হাঁকডাক করাটা কি ভালো দেখাবে ? তাছাড়া ওর মেজাজটাও যেমনি খারাপ, গায়েও তেমনি জোর !

হনু—তাছাড়া এ তো আর ঋষ্যশৃঙ্গ পর্বত পর্বত নয় যে বালী এসেছে কি অমনি মরেছে ! দেখো বাবা, শেষটা তোমাকেই না—(গলা কাটার ইঙ্গিত)

সুগ্রীব—আমি বলি কি থাকৃগে আজ। বন্ধু রামলক্ষ্মণ অনেক দূর থেকে হেঁটে এসে ক্লান্ত, আমার পেটটাও একটু ব্যথা—ব্যথা করছে—

হনু—খিক্—খিক্—খিক্—খিক্—

সুগ্রীব—এতে অত হাসির কি হল, শুনি ? নাঃ, দিনে দিনে তুমি বড় বে-আদব হয়ে উঠছ !

রাম—বাছা সুগ্রীব, এখন পেছপাও হলে চলবে না। বালীকে যুদ্ধে আহ্বান কর।

সু—ইয়ে—মানে—তোমরা করলে ভালো হয় না ? আমি বয়সে ছোট—

লক্ষ্মণ—না, সে হয় না। বালীর সঙ্গে আমাদের তো ব্যক্তিগত ঝগড়া নেই।

সু—এঁ্যা, ঝগড়া নেই ? (বসে পড়ে) তবে—তবে আমার কি হবে ? এতো মহা গেরো রে বাবা !

রাম—বন্ধুকে রক্ষা করতে আমরা সর্বদাই প্রস্তুত।

হনু—আহা, কিন্তু সেতো বালীর হাতে বেদম পেট্নাই খাবার পর, সুগ্রীব যখন হাত পা ছুঁড়ে, চিৎপাত হয়ে পড়ে, চক্ষু মুদে, জিব বের করে—

সু—চোপরাও ! তা হলে বন্ধু, আমি এগুচ্ছি। কিন্তু যদি বে-কায়দায় পড়ি—

হনু—বিলক্ষণ, বিলক্ষণ, সে বিষয়ে একটুও ভেবো না। তুমি মলে আমরা স—ব ব্যবস্থা করে ফেলব ! তোমার কলমটা কিন্তু আমি নেব। এবার মালকোঁচা মেরে এগোও দিকি নি, নইলে তুমি ডাকবার আগেই হুড়মুড় করে বালী তোমার ঘাড়ে না চাপে !

(সুগ্রীবের মালকোঁচা মারণ)

রাম—বৎস, এবার আমাদের আশীর্বাদ নিয়ে হাঁক দাও দিকিনি।

(সুগ্রীবের অগ্রসর হওন)

হনু—দাঁড়াও, দাঁড়াও।

সু—আঃ, পেছু ডাকিস্ কেন ?

হনু—তোমার ট্যাকঘড়িটা বরং এখনি আমাকে দিয়ে যাও। তুমি পটল তুললে বালী যদি না দেয় ?

সু—এই নে ধর ! এক ফোঁটা চোখের জল নেই, খালি এ দাও, সে দাও !

হনু—আর অমন ভালো কলমটা পেটনাই খেয়ে যদি ভেঙ্গে যায়—(খুলে লওন)

রাম—বাছা হনুমান, তুমি একটু আমার পেছনে এসে দাঁড়াও দেখি।

হনু—কেন ? কেন ? বালী আসছে বুঝি ? (তথাকরণ)

সু—তা হলে সত্যি ডাকব ?

সকলে—ডাকো, ডাকো।

সু—(মুখের সামনে হাত দিয়ে চোঙা বানিয়ে)

ও বা—লী—ই—ই—ই—ই !

বা—আ—আ—আ—লী !

বালী রে—এ—এ—এ—এ !

(অবিকল সুগ্রীবের মতো চেহারা ও সাজ নিয়ে বালীর দৌড়ে প্রবেশ, রাম লক্ষ্মণ হনুর ঝোপের আড়ালে গোপন হওন)

বালী—ওরে রাস্কেল, এখনো তোর শিক্ষা হয়নি বুঝি ! আয় ব্যাটা, তোকে পিটে আলু-ভর্তা বানাই !

(ধাঁইধপাধপ বেধড়কা পিটন, সুগ্রীবের চীৎকার ও হাতপা ছোঁড়া। আড়াল থেকে মুণ্ডু বের করে হনু)

হনু—ওয়া, ভাই ! লেগে যাও, লেগে যাও ! কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ ! ওরে একটা উল্টো বাজি ঝাড়্ রে এবার !

(ক্রমে সুগ্রীবের পিছু হটন)

হনু—ও কি হল, স্যার ? গতিক তো ভালো বুঝি নে। একটা বাণ লাগাবেন নাকি এবার ?

রাম—সেই রকমই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু দুটোকে যে অবিকল একরকম দেখা যাচ্ছে, এখন কোনটাকে মারতে কোনটাকে মারি, সেই হল গিয়ে সমস্যা।

হনু—ঐ তলারটাকেই ঘ্যাঁচ দিন স্যার, ঐটাই নিশ্চয় সুগ্রীব।

লক্ষ্মণ—না হে, হনুমান, ওটার হাতের গুলিটে দেখেছ ? পাহাড় নিয়ে লোফালুফি না খেলে কি অমনি অমনি হয়েছে নাকি ? ওপরেরটাকেই ছেত্‌রে ফেল, দাদা।

রাম—না, বৎসগণ, কিছুই তো মালুম দিচ্ছে না। ঐ ছাখ, তলারটা এবার উপরে উঠেছে !

হনু—আরে, আরে, আরে, ক্যায়সা আছাড় দিল দেখলেন স্যার ? ওয়া, ওয়া ! অ্যাট্টাবয় !

(সুগ্রীবকে আছড়ে ফেলে, হাতের ধুলো ঝেড়ে)

বালী—হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ !

(হাসতে হাসতে প্রস্থান, রাম লক্ষ্মণ হনুর আরো কাছে আগমন)

হনু—কি রকম মারামারিটা হল, এ্যা ? ওয়া, ওয়া, অনেকদিন এমন মজা দেখিনি।

সু—(উঠে দাঁড়িয়ে) মজা ? অকৃতজ্ঞ ! আমি ভুলোধুনো হচ্ছি আর ওঁরা কিনা মজা দেখছেন ! এই কি বন্ধুর কাজ হল ? তবে না গতিক মন্দ দেখলে বালীকে উত্তম-মধ্যম কষবে ?

লক্ষ্মণ—রেগো না, ভাই, কোনটি তুমি কোনটি বালী চিনতে পারা যাচ্ছিল না যে।

রাম—আমি তো ভাবছিলাম ওটা বালীই বুঝি ঠ্যাঙা খাচ্ছে।

হনু—হ্যাঁ, শেষটা ওটাকে মারতে এটা না বধ হয়ে যায় !

সু—বধ তো হয়েইছিলাম আরেকটু হলেই।

লক্ষ্মণ—যাই বল, এক মুখ, এক চোখ, এক কান, ল্যাজ পর্যন্ত অবিকল এক ! তাজ্জব বনে গেলাম !

রাম—তা হলে এখন কি কর্তব্য ?

সু—কি আবার কর্তব্য ? খষ্যমুক পর্বতে ফিরে আইডিন ফাইডিন লাগাই ! উঃ ! ব্যাটা বাঁদর না কেউটে সাপ, সর্বাঙ্গে জ্বলে মলুম !

রাম—না সুগ্রীব, ওকে ছেড়ে দেওয়া নয়। এখন ঘেমে নেয়ে ক্লান্ত আছে, এখনি পিটিয়ে ঠাণ্ডা করা দরকার। তুমি আবার হাঁক দাও।

সু—আহা মরে যাই ! আমি আবার হাঁক দিই, বালী আবার আমাকে পিটিয়ে লাস বানাক, আর ওঁরা সব ঝোপের পেছন থেকে মজা দেখুন ! আমি ওর মধ্যে নেই !

লক্ষ্মণ—বেশ, তবে বালী রাজত্ব করুক, তুমি ঋষ্যমূকে মশার কামড় খাও আমরা পথ দেখি। বুঝতেই পারছি সীতা উদ্ধারে তোমার মন নেই।
(গমনোদ্যত)

হনু—(কাপড় চেপে ধরে) ওকি ব্রাদার ! সীতা উদ্ধার না হোক, নিদেন আমার ধোপার কাপড় উদ্ধার কর। (হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে) বড় কষ্টে আছি, স্যার !

সু—শ্রীরাম লক্ষ্মণ, হনু ঠিকই বলছে। বালীকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে তবে অন্য কথা ! না হয় আবার তাকে ডাকি।

লক্ষ্মণ—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবার তোমাকে যথেষ্ট সাহায্য করা হবে, কিন্তু তার আগে যাতে তোমাকে চিনতে পারা যায়, তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

হনু—ওর ল্যাজে গেরো বেঁধে দেওয়া হোক।

লক্ষ্মণ—না হে, হ্যাঁচকা টানে পাঁচ মিনিটে সে খুলে যাবে।

হনু—তাছাড়া হয়তো ল্যাজ ধরে বাঁই বাঁই করে ঘোরাতে লাগবে, চক্ষু চড়কগাছ, ল্যাজ পটাং, সুগ্রীব খতম।

সু—বাঁদরামি ছাড় দিকি।

হনু—বেশ, তা হলে ওর গলায় আমার গামছাটা বেঁধে দিলে কেমন হয় ?

লক্ষ্ম— শেষটা ঐ গামছা ধরে টেনেই না নিয়ে যায়।

হনু—ঠিক হয়েছে, ঐ লতাগাছিটা দিয়ে বেল্ট বানিয়ে কোমরে পরিয়ে দিই, চেনাও যাবে, দেখতেও খাসা হবে।

রাম—উত্তম প্রস্তাব। লক্ষ্মণ, ঐ গজপুচ্ছী লতা খানিকটা ছিঁড়ে মালা বানিয়ে ওর গলায় পরিয়ে দাও দিকিনি।
(লক্ষ্মণের তথাকরণ, হনুর সর্দারি)

হনু—এঁ্যা ! এই ঠিক হয়েছে ! এবার একটা হাঁক পাড়ো তো রাজা।

সু—বালী—ই—ই—ই—ই।
ওরে বালী বাঁদ—ও—ও—ও—ও— র !

(বালীর লাফ দিয়ে প্রবেশ)

বালী—ফের চ্যাঁচাচ্ছিস ব্যাটা অলপ্পেয়ে ! দাঁড়া, তোর তেড়িবেড়ি বের কচ্ছি।

(বে-ধড়কা মারণ, সুগ্রীবের হাঁচড় পাঁচড় ও পতন)

সু—ওরে বাবারে, গেলুমরে, তোরা কোথা গেলিরে !

হনু—এই যে আমরা আছি রাজা, নিরাপদে গাছের আড়ালে, বালী যদি দেখতে পায় ! —হেই রাম, এবার ছাড়ো বাণ !

(রামের বাণ মারা ও বালীর পতন)

হনু—গেল, গেল গেল গেল ! রামরাজার টিপটা কি ভালো। হেই, রাজা সুগ্রীবের জয়। কিন্তু আজকে থেকে হলাম আমি রামের চ্যালা ! (যবনিকা পতন)

মিল

অনুপম দত্ত

এক
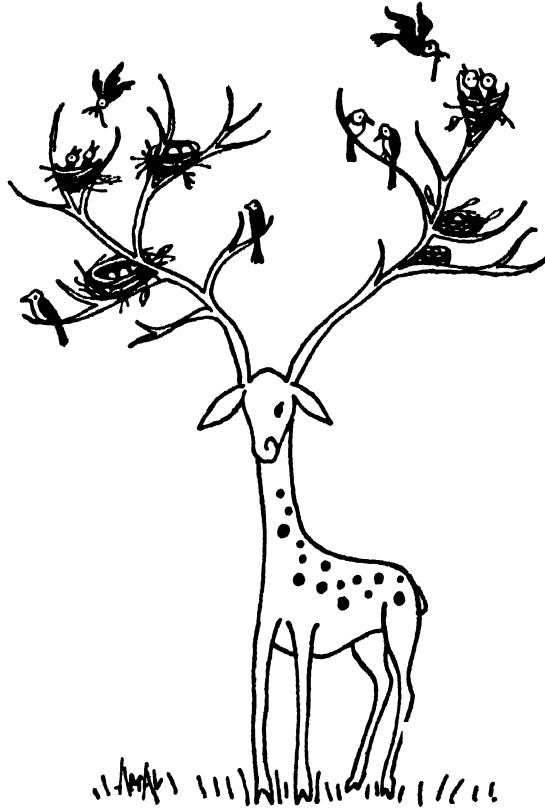
আকাশ নীল মাঝের বিল
চিলের ডানা সোনার খিল
রোদের রঙ খুকুর ঢঙ
যাচ্ছে মিলে সঙ্গে সঙ্গ।

দুপুর বেলা ঠিক দুপুর
ডাকছে জোরে এক কুকুর
একলা বুড়ো বাঁধছে চুড়ো
মুখের ভেতর দোক্তা গুঁড়ো
মিলিয়ে দিলে সকল সব
খুকুর মুখে নাইক' রব।

সকালবেলা আলোর খেলা
নদীর জলে মাছের মেলা
সুরের টান পাখির গান
যাচ্ছে মিলে সব সমান।

দুই

একটি ফুল গাছের ডালে
চাঁদের টিপ খুকুর ভালে
সোনার রঙ আকাশ গায়ে
গভীর ঘুম মধুর বায়ে
হঠাৎ যদি পেয়েই যাও
খুকুর মুখে মিলিয়ে নাও।

সাতটা তারা পথিক তারা
আকাশ পথে যাচ্ছে কারা
হাজার ফুলে গন্ধ হারা
আলোর স্রোত নদীর ধারা
দেখতে পেলে চোখের পরে
মিলিয়ে নিও মুখটি ধরে।

চড়ুই পাখি — চালের ফাঁকে
ালী — কোথায় থাকে
স্বপ্নদেখা — নিঝুম রাতে
রূপোর চুড়ি — নিটোল হাতে
মিলিয়ে দিলে — একাকার
খুকুর গলায় — চন্দ্রহার।

তিন

একটি নদী ঝরঝরিয়ে বইছে সারা বেলা
খুকুর মতো কথা তাহার বোঝাই বড় ঠেলা।
তবু তো দেখ একলা বক তাহার ধারে চুপ
কাশের ঝোপ মিষ্টি মুখের যেন খুকুর রূপ।
আকাশটাকে রাখলে চোখে দেখেই নিও ঠিক
যেন খুকুর সুনীল চোখ জাগছে অনিমিখ।
এমন মিল পাবে কোথায় ভুবন খুঁজে সারা
খুকু যেন সন্ধ্যামাণিক একলা রাতে তারা।

নদীর ধারে নয়ানজুলি সবুজ মেঘে কত
মানুষজনের যাওয়া আসা চলছে অবিরত।
তাহার পরে সোনার গ্রাম খড়ের চালে ঢাকা
রঙ লাগিয়ে বুলিয়ে তুলি কাহার যেন আঁকা।
এসেই যদি পড় হঠাৎ দেখেই নিও তবে
খেলছে যে ওই আপন মনে সেই সে বুঝি হবে।
তাহার মুখে শান্তিছায়া সোনার আভা খানি—
মিলিয়ে দিতে বিশ্বকে আজ নিয়ে এলাম টানি।

(পূর্ব প্রকাশিত অংশের চুম্বক)

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার গৃহযুদ্ধে অবরুদ্ধ রিচমণ্ড সহর হইতে বেলুনে চড়িয়া পলায়ন করিতে গিয়া পাঁচটি অসম সাহসী ব্যক্তি প্রচণ্ড ঝটিকার প্রকোপে একবস্ত্রে ও শূন্য হস্তে একটি নির্জন দ্বীপে পরিত্যক্ত হন। তাঁহারা হইলেন ক্যাপটেন সাইরাস হার্ডিং, গিডিয়ন স্পিলেট, পেন্‌ক্রফট্, হারবার্ট ও নেব। হার্ডিংএর কুকুর টপও ছিল।

একেবারে প্রথম অবস্থা হইতে তাঁহাদের সমস্ত কাজ সুরু করিতে হইল। লোহা গালাইয়া কুড়ুল, কোদাল হইল, ক্রমে স্টিল প্রস্তুত হইল। আমেরিকার প্রধান নামগুলি লইয়া তাঁহারা বিভিন্ন স্থানের নামকরণ করিলেন।

লেকের একধার নাইট্রোগ্লিসারিনের সাহায্যে উড়াইয়া দেওয়াতে সেই পথে অনেক জল বাহির হইয়া গেল এবং একটি বিশাল গহ্বর বাহির হইয়া পড়িল। সমুদ্রের দিকে দরজা-জানালা ফুটাইয়া তাঁহারা গহ্বরের পথটি বন্ধ করিয়া দিলেন। দড়ির সিঁড়ি ঝুলাইয়া আসা-যাওয়ার ব্যবস্থা হইল।

গহ্বরটির নাম দেওয়া হইল গ্র্যানিট হাউস। ইঁট গাঁথিয়া বিশাল গহ্বরটিকে কয়েক ভাগে ভাগ করিয়া লওয়া হইল।

হার্বার্টের ওয়েস্ট্‌ কোটের লাইনিংএর মধ্যে একদানা গম পাইয়া তাঁহারা সেটিকে উপযুক্ত স্থানে রোপন করিলেন।

দ্বীপের বিভিন্ন স্থান তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে বাহির হইলেন।

ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া তাঁহারা বিশ্রাম করিতে বসিলেন। ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে দ্বীপটির বিচিত্র প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে লাগিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

পেনক্রফ্‌ট বলিল—'আপনি কি মনে করেন, লিঙ্কন দ্বীপটাও প্রবাল কীটের তৈরি?'

হার্ডিং বলিলেন—'না, তা মনে করি না। লিঙ্কন দ্বীপের সৃষ্টি অগ্ন্যুৎপাত থেকে হয়েছে।'

পেনক্রফ্‌ট বলিল—'তাহলে দ্বীপটা কোনোদিন নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে পারে?

হার্ডিং বলিলেন—'তার খুবই সম্ভাবনা আছে।'

পেনক্রফ্‌ট ব্যস্ত হইয়া বলিল—'দোহাই ভগবানের! সে সময়ে আমরা যেন এখানে না থাকি।'

হার্ডিং বলিলেন—'ব্যস্ত হোয়োনা পেনক্রফ্‌ট! এখানে প'ড়ে মরতে কারও ইচ্ছা নাই। আমার খুবই রসা আছে, তার আগেই এখান থেকে আমরা চলে যেতে পারব।'

স্পিলেট বলিলেন—'এসব কথা এখন থাক। উপস্থিত এই দ্বীপেই ভবিষ্যৎ কাজের জন্য আমাদের প্রস্তুত তে হবে।'

এইরূপে আহার এবং আলোচনা সবই শেষ হইল। পুনরায় অনুসন্ধান যাত্রা আরম্ভ হইয়া, সকলে লাভূমির প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত। জলাভূমিটি প্রায় কুড়ি বর্গমাইল ব্যাপিয়া। জমিতে কাদামাখানো ্যুৎপাতের পাথর, পচা ঘাস, লতা পাতা, মধ্যে মধ্যে কার্পেটের মত পুরু ঘাসের চাপড়া, আবার স্থানে স্থানে ও আছে—জায়গাটা যেন ম্যালেরিয়ার আড্ডা! জলে বুনো হাঁস, টিল, স্নাইপ প্রভৃতি পাখি রহিয়াছে, কাছে লেও তাহারা ভয় পায় না।

বন্দুক থাকিলে এক গুলিতেই বোধ হয় ডজনে ডজনে পাখি মারা যাইত, যাত্রীদল তীরধনু দিয়া এক ডজন খি মারিলেন। পাখিগুলির শরীর সাদা, মাথা সবুজ, ডানা কালো, সাদা এবং লাল, ঠোঁট চ্যাপ্টা—হারবার্ট লল—'এগুলির নাম ট্যাডরন্‌।' তখন জলাভূমিটিরও নামকরণ হইল 'ট্যাডরন্‌ মার্স'।

বিকালে পাঁচটার সময় হার্ডিং দলের সহিত ফিরিয়া চলিলেন, এবং রাত্রি আটটার সময় সকলে গ্র্যানিট উসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

আগস্ট্‌ মাসের পনের তারিখ পর্যন্ত শীতের দারুণ প্রকোপ রহিল। যখন বাতাস থাকে না, তখন শীতে তেমন কষ্ট হয় না কিন্তু বাতাস চলিলে, তেমন গরম পোষাক নাই বলিয়া সকলের অত্যন্ত কষ্ট হয়।

পেনক্রফ্‌ট দুঃখ করিয়া বলিত—'হায়রে! লিঙ্কন দ্বীপে শেয়াল, খরগোশ ও সিল মাছের সঙ্গে সঙ্গে মওয়ালা ভাল্লুকও যদি থাকত, তবে তাদের গরম চামড়ার জামা বানিয়ে প'রে বাঁচতাম।'

নেব হাসিয়া বলিত—'ভাল্লুক থাকলেও বুঝি তাদের চামড়াগুলো এনে তোমাকে দিয়ে যেত—কোট নয়ে পরবে বলে?' ইহার উত্তরে পেনক্রফট খুব জোরের সহিত বলিল—'ইচ্ছা করে কি আর দিত? দিতে ্য করতাম।'

লিঙ্কন দ্বীপে ভাল্লুক নাই। অন্ততঃ যতদূর সন্ধান করা গিয়েছে, তাহার মধ্যে ভাল্লুক কোনোদিন চক্ষে ড় নাই।

প্রসপেক্ট হাইটের উপরে এবং বনের প্রান্তে জন্তু ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়া রাখা হইত। ফাঁদ আর কিছুই —জন্তুর পায়ের চিহ্ন দেখিয়া সেখানে মাটিতে গর্ত খুঁড়িয়া রাখা এবং সেই গর্তের মুখ লতাপাতা দিয়া এমন বে ঢাকিয়া দেওয়া—যাহাতে জন্তুরা গর্তের অস্তিত্ব বুঝিতে না পারে। গর্তের ভিতর খাদ্য রাখা হইত, তাহার র জন্তু আকৃষ্ট হইত।

প্রতিদিন ফাঁদের সংবাদ নেওয়া হইত। প্রথম কয়েকদিন ফাঁদে কেবল শিয়ালই পড়িল! পেনক্রফ্‌ট রাগিয়া আগুন—'লক্ষ্মীছাড়া দ্বীপে কি শেয়াল ছাড়া আর কোন জন্তু নাই?' স্পিলেট বলিলেন—"তা হোক, শেয়ালেও কাজ দিবে। এখন থেকে শেয়ালটাকেই খাদ্য হিসাবে ফাঁদের গর্তে রেখে দেব।"

আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে ফাঁদে মধ্যে মধ্যে শূকর জাতীয় "পিকারি" পড়িতে লাগিল। এই জন্তুর মাংস সুস্বাদু—তাহা ইতিপূর্বেই দেখা গিয়াছে।

এই সময়ে হঠাৎ একদিন আকাশ এবং বাতাসের পরিবর্তন হইল। কয়েকদিন যাবৎ ক্রমাগত বরফ পড়িতে লাগিল। ক্রমে প্রায় দুই ফুট পুরু হইয়া বরফ জমিয়া গেল! বাতাসের বেগ খুব বাড়িল, গ্র্যানিট হাউসের মধ্যে থাকিয়া সকলে শুনিতে পাইলেন—সমুদ্রের ঢেউ প্রবল বেগে তীরের পাহাড়ের গায়ে আঘাত করিতেছে। বাতাস বরফ লইয়া খেলিতে আরম্ভ করিল—বরফের স্তম্ভের মতন হইয়া শূন্যে ঘুরপাক খাইতেছে, ঠিক যেমন সমুদ্রে জলস্তম্ভ হয়। যাহা হউক, ঝড় উত্তর পশ্চিম দিক হইতে বহিয়া দ্বীপের উপর দিয়া চলিয়া যায় তাহাতে গ্র্যানিট হাউসে তেমন জোরে লাগে না।

২০এ আগস্ট্‌ হইতে ২৫শে আগস্ট্‌ পর্যন্ত পাঁচদিন দ্বীপবাসিগণ ইচ্ছাসত্ত্বেও বাহির হইতে পারিলেন না। গ্র্যানিট হাউসের মত এরূপ সকল বিষয়ে নিরাপদ আশ্রয়টি পাইয়া দ্বীপবাসিগণের কত যে উপকার হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। তাহারা সকলে ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

এইরূপে বন্ধ থাকিয়াও দ্বীপবাসিগণ বৃথা সময় নষ্ট করিলেন না। গ্র্যানিট হাউসে কাঠ মজুত করা ছিল যথেষ্ট, কাঠ চিরিয়া তক্তাও করা হইয়াছিল। পেনক্রফ্‌ট ও নেব্‌ তক্তা দিয়া মজবুত টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি আসবাব বানাইয়া ফেলিল। লেকের তীর হইতে বেতের মত একরকম গাছের ডাল সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছিল। সেই ডাল দিয়া নেব্‌ ও পেনক্রফ্‌ট কতকগুলি ঝুড়ি বানাইল। দেখিতে সুন্দর না হইলেও ঝুড়িগুলি খুব কাজে লাগিবে।

আগষ্টের শেষ সপ্তাহে আকাশ আবার পরিষ্কার হইল, ঝড় থামিয়া গেল, সকলে তখনই বাহির হইয়া পড়িলেন। সমুদ্রতীরে তখন দুই ফুট বরফ জমিয়া আছে, তাহার উপর দিয়া চলিতে কষ্ট হইল না। সাইরাস হার্ডিং সকলকে লইয়া প্রসপেক্ট হাইটে চড়িলেন।

চারিদিকে কি পরিবর্তন! পূর্বে যে দিকে সবুজ রং ভিন্ন কিছুই দেখা যাইত না, এখন সেদিকে কেবলই সাদা ধপ্‌ধপে—গাছের উপর বরফ পড়িয়া ডালপালা সমস্তই সাদা হইয়া গিয়াছে! ফ্রাঙ্কলিন পাহাড়ের উপর হইতে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বন, ময়দান, লেক, নদী সমস্তই বরফে সাদা।

স্পিলেট, হারবার্ট ও পেনক্রফ্‌টকে লইয়া ফাঁদের সন্ধানে গেলেন। ফাঁদ খুঁজিয়া বাহির করা কি সহজ কাজ? আবার ভয়ও আছে, নিজেদের ফাঁদে পাছে নিজেরাই পড়িয়া যান! সমস্ত বরফে ঢাকা, ফাঁদ খুঁজিয়া বাহির করিতে সময় লাগিল। দেখা গেল ফাঁদে কোন জন্তু পড়ে নাই, কিন্তু ফাঁদের চারিদিকে নখ-ওয়ালা জন্তুর পায়ের দাগ বিস্তর রহিয়াছে। দাগগুলি দেখিয়াই হারবার্ট বলিল, 'এগুলি বিড়ালজাতীয় জন্তু।' ইহাতে প্রমাণ হইল হার্ডিং যে বলিয়াছিলেন দ্বীপে মারাত্মক জন্তুও আছে, সে কথা সত্য। দ্বীপের একেবারে পশ্চিম ভাগের বনে এগুলি থাকে, কিন্তু ক্ষুধার জ্বালায় প্রসপেক্ট হাইট পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে! হয়তো বা গ্র্যানিট হাউসের লোকেদের গন্ধ পাইয়াও আসিয়া থাকিতে পারে। এই বিড়ালজাতীয় জন্তু কি তবে বাঘ? লিঙ্কন দ্বীপের মত স্থানে বাঘ থাকাটাও বিচিত্র নয়!

গরম পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের বরফ গলিয়া গেল। বৃষ্টি আরম্ভ হইল, তখন বরফের অস্তিত্বের

চিহ্নটুকুও রহিল না। দিনের দুর্যোগ সত্ত্বেও দ্বীপবাসিগণ পাইন-বাদাম, মেপ্‌ল্ গাছের সরবৎ, অ্যাগুটি, খরগোশ, ক্যাঙ্গারু প্রভৃতি খাদ্যবস্তু দ্বারা ভাঁড়ার পূর্ণ করিল। এই সব কাজের জন্য অনেকবার বনে যাইতে হইয়াছিল। বনে দেখা গেল, ঝড়ের সময় বড় বড় গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। নেব ও পেনক্রফট ঠেলা গাড়ি বোঝাই করিয়া সব কাঠ লইয়া আসিল। আসিবার কালে পথে দেখিল ঝড়ে মাটির বাসন তৈরী করিবার উনানটির (kiln) দারুণ ক্ষতি হইয়াছে।

চিমনীটির অবস্থা দেখিয়া মনে হইল—বড় ভাগ্য যে, ঝড়ের সময় সেখানে থাকিতে হয় নাই! হার্ডিং দেখিলেন, ঝড়ের সময় সমুদ্রের জল আসিয়া চিমনীর দুর্দশার একশেষ করিয়াছে। কিন্তু সুখের বিষয়—কামারের কাজ করার জায়গাটির এবং হাপরটির বিশেষ কিছু হয় নাই। কারণ সেগুলিকে প্রথম হইতেই স্তূপাকার বালি দিয়া ঢাকিয়া রাখা হইয়াছিল।

শীতের প্রকোপ তখনও একেবারে কমিয়া যায় নাই। ২৫এ জুলাই আবার বরফ পড়ার পরই বৃষ্টি হইল. বাতাস বদ্‌লাইয়া দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বহিতে লাগিল—সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ ভীষণ ঠাণ্ডা! আবার সকলে গ্র্যানিট হাউসে বন্ধ হইলেন, বাতাস ঢুকিবার পথগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়াতে, আলোর জন্য মোমবাতি জ্বালাইতে হইল অতিরিক্ত। সুতরাং, বাতির খরচ কমাইবার জন্য, বেশী সময় গহ্বরের জলন্ত উনানের (hearth) আগুনেই কাজ চালাইতে হইত।

মধ্যে মধ্যে কেহ কেহ সমুদ্রতীরে বরফের মধ্যে নামিয়া যাইত—বরফগুলি ভাঁটার সময় তীরে আসিয়া জড় হইয়াছিল। সেখানে তাহারা বেশীক্ষণ থাকিতে পারিত না। সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় ধাপগুলি ধরিতে গিয়া মনে হইত যেন আঙুলগুলি পুড়িয়া গিয়াছে—এমনই ভীষণ ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল।

এই সময় গ্র্যানিট হাউসে বসিয়া থাকিয়া একটা কাজ হইল ভাল। প্রচুর পরিমাণে মেপ্‌লের রস জালার মধ্যে জমান ছিল। উনানের আগুনের উপর মাটির পাত্রে বসাইয়া, এই রস জাল দিলে পর, বেশ জমাট চিনির ডেলার মত হইল। একটু লাল্‌চে রং হইল বটে, কিন্তু স্বাদ হইল ভাল।

গ্র্যানিট হাউসে বন্ধ থাকিয়া সকলের চাইতে অস্থির হইয়া পড়িল টপ। বেচারী গহ্বরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত খালি ছুটিয়া বেড়ায়। কখনো কখনো সেই কুয়ার মুখের কাছে গিয়া গোঁ গোঁ করে, আর যেন কুয়ার মুখের ঢাকনাটা খুলিবার চেষ্টা করে। হার্ডিং খুব মন দিয়া টপের এই কাণ্ড দেখেন আর মনে মনে ভাবেন—'টপ আশ্চর্য বুদ্ধিমান, কুয়ার কাছে গিয়া মিছামিছি গর্জন করে ব'লে তো মনে হয় না! নিশ্চয় কোন জন্তু কুয়ার তলায় ব'সে বিশ্রাম করতে আসে, তারই গন্ধ পায় বলে টপ রেগে চিৎকার করে।' যাহা হউক হার্ডিং তাঁহার এই ধারণার কথা মনে মনেই রাখিতেন।

অবশেষে শীত চলিয়া গেল। ক্রমে সমস্ত বরফ গলিয়া গিয়া দ্বীপটি আবার সজীব ভাব ধারণ করিল। এই বসন্ত ঋতুর আগমনে দ্বীপবাসিগণের মনে খুবই আনন্দ হইল। এখন আর তাঁহারা আহারের সময় ভিন্ন গ্র্যানিট হাউসে থাকেনই না।

এখন হইতেই হার্ডিংএর মনে পোষাক পরিচ্ছদের জন্য ভাবনা হইল। উপস্থিত পোষাক পর বৎসরের শীত পর্যন্ত কিছুতেই থাকিবে না, ইহার মধ্যে যেরূপে হউক লোম-ওয়ালা জন্তুর চামড়া যোগাড় করিতেই হইবে। দ্বীপে মুস্‌মন্ অনেক আছে, ইহাদের চামড়ায় চমৎকার গরম জামা হইবে। সুতরাং, এই মুসমন্ পুষিবার ব্যবস্থা করা চাই। মোট কথা, গৃহপালিত পশু ও পাখির জন্য, একটা জায়গা ঘিরিয়া বাড়ি বানাইয়া দিতে হইবে। সকল বিষয়ের জন্যই ব্যবস্থা করিতে হইবে ক্রমে ক্রমে এবং পূর্ণমাত্রায় বসন্তকাল আসিলে। বসন্ত কালে সকলের আগে

দ্বীপের নূতন নূতন স্থানগুলিতে সন্ধান করিয়া দেখা দরকার।

এই সময় একটি ঘটনা হইল, যাহাতে দ্বীপবাসিগণের মনে এই অনুসন্ধানের প্রবল বাসনা না জাগাইয়া ছাড়িল না।

অক্টোবরের ২৪ তারিখে, পেনক্রফট্ গেল ফাঁদের সন্ধান লইতে। গিয়া দেখিল—ফাঁদে দুইটি বাচ্চা সমেত একটা পিকারি আটকা পড়িয়াছে। এই শিকার লইয়া মহা আনন্দে পেন্‌ক্রফট গ্র্যানিট হাউসে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—'ক্যাপ্‌টেন্! আজ মহা ভোজ হবে। এই দেখুন কি শিকার করেছি।'

নেব্ চমৎকার খানা রাঁধিল—পিকারির বাচ্চা দুটি রোস্ট, কেঙ্গারুর স্যুপ্, শূকরের মাংস, পাইন-আমণ্ড আর অসউইগো টি। ইহার মধ্যে সকলের চাইতে উপাদেয় হইল পিকারির মাংস।

আহারের সময় সকলেই পিকারির মাংসের খুব প্রশংসা করিলেন। পেনক্রফট বড় বড় মাংসের টুকরা লইয়া মুখে দিতেছে—এমন সময় দারুণ এক চিৎকার!

'ব্যাপার কি? কি হয়েছে পেন্‌ক্রফ্‌ট?'

পেনক্রফ্‌ট বলিল—হবে আবার কি ছাই—আমার একটা দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছে!!!

স্পিলেট বলিলেন—'তোমার পিকারির মাংসে কি পাথর ছিল? পেনক্রফ্‌ট মুখ হইতে সেই দন্তভাঙ্গা জিনিষটা বাহির করিয়া আনিলে সকলে মহাবিস্মিত হইয়া দেখিলেন—সেটা পাথর নয়, বন্দুকের একটা গুলি!!

ক্রমশঃ

চুঁচড়ো সংবাদ

নৃপেন্দ্রমোহন বিশ্বাস

যেতে গিয়ে চুঁচড়োর ঘড়ি ঘর
পা' মুচ্ড়ে পড়েছিল হরিহর।
তে-মাথায় বাস এসে থামতে
দৌড়ে সে গিয়েছিল নামতে।
পকেটের টাকা যায় ছড়িয়ে
শোকে হরিহর ডাকে, 'হরি হে।'
কে যেন বললে—এটা চুঁচ্ড়ো
আগে সামলাই যত খুচ্রো।
বলতেই দেখে ছেলে-বুড়োতে
খুচ্রো লেগেছে সবে কুড়োতে!
এদিকে মচ্কে গিয়ে পা'টা তার
খতম হয় বা বুঝি হাঁটা তার।
রিক্সায় চ'লে যায় গঙ্গায়,
জলে পা ডুবিয়ে বসে গান গায়।
গায়ে লাগতেই জল ঠাণ্ডা
নিমেষেই চাঙা হয় প্রাণডা,
তখন এসেছে কেন চুঁচড়োয়
ভাবে বসে আর গোঁফ মুচ্ড়োয়।
মনে পড়তেই ঘোরে মুণ্ডু
শুয়ে পড়ে হরিহর কুণ্ডু!
সে যে ছিল মামলার সাক্ষী
উকিলের যা মধুর বাক্যি!
মনে পড়তেই ওঠে দাঁড়িয়ে,
ভাঙা পা'টা পথে দেয় বাড়িয়ে,
জি, টি, রোডে বাস ধরে হরিহর।
নামে এসে ফের সেই ঘড়ি ঘর,

কোর্টমুখো ছোটে আর ল্যাংচায়,
নিজেরেই গাল পাড়ে, ভ্যাংচায়।
ভাঙা পার দিকে নাই দৃকপাত
ভুলে যায় কোমরের ফিক্‌বাত।
কাছারাতে যেতে এক আমলা
বলে ডিস্‌মিস্‌ তার মামলা
আর বলে—১নং সাক্ষী
নাই দেখে উকিলের রাগ কি!
সরে পড়ে হরিহর ত্রাসেতে,
বটতলা যেয়ে বসে বাসেতে।
স্টেসনের পথে গালে দিয়ে হাত
ভাবে আজ দিনটাই বরবাদ,
কোথায় কাটত তার রগড়ে
বিকেলটা চন্দননগরে,
এখন ফিরতে পেলে বাঁচে সে।
দাঁড়াতে ইস্টিসনে বাস এসে,
ছুটে হরিহর চাপে গাড়িতে
দিন-ভর ভুগে ফেরে বাড়িতে।

(পূর্ব প্রকাশিত অংশের চুম্বক)

পৃথিবীর আসন্ন প্রলয়ের সম্ভাবনায় কয়েক লক্ষ লোক মহাকাশ যান করে অন্য এক সূর্যমণ্ডলীতে অনেকটা পৃথিবীর মতো এক গ্রহে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। এই ঘটনার দুশো বছর পরে সেই গ্রহের চারটি ছেলে প্রশান্ত, চিয়েন, মরিশ ও ফিসার প্রফেসার সোমোরেনের সঙ্গে এক অভিযানে যোগ দিয়ে মহাকাশ যানে পুরোনো পৃথিবীতে ফিরে এল। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সূর্যের তেজ কমে যাওয়াতে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণের হিম অঞ্চল অনেক বেশি বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। নিচে অনেক জায়গায় সহরের ধ্বংসাবশেষ ও অগ্ন্যুৎপাতের চিহ্ন দেখা গেল।

পৃথিবীর লোকে তাদের অত্যন্ত সমাদর করে ডেকে নিল। গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এক সভায় কর্ণেল লিস্টার দুশো বছর পূর্বেকার সেই দুর্যোগের কথা বললেন। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ ডাক্তার জোহানসনও বললেন কেমন ভাবে পৃথিবীটা ধ্বংস হতে হতে বেঁচে গিয়েছিল।

১৮

ডাক্তার জোহানসনের এই ভূমিকার পর প্রফেসার সোমোরেন সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাদের এখানে আসার প্রস্তুতির আর যাত্রাপথের বিবরণ দিয়ে বললেন 'নতুন জগতে গিয়ে সব কিছু নতুন করে গড়তে হয়েছিল বলে এর আগে আমাদের জগতের লোকদের এই ছেড়ে-আসা পৃথিবী সম্বন্ধে বিশেষ কোনো চিন্তা করার অবকাশ ছিল না। এই কিছুদিন থেকে আমাদের কারোর কারোর আবার এখানে এসে, এখানকার অবস্থা কি হয়েছে দেখবার ইচ্ছা খুব প্রবল হয়েছিল। এর ফলেই আমাদের এবারকার যাত্রা। কিন্তু একবার যখন আমাদের দুই জগতের মধ্যে যোগাযোগ হয়েছে তখন আমার মনে হচ্ছে আমরা একে অন্যকে সাহায্য করতে পারব আর সেটাতে আমাদের দু জগতের লোকেরাই লাভবান হবে। ছোট ছোট শক্তিশালী অনেক রকম যন্ত্রপাতি আমাদের জগতে তৈরী হয় সেগুলি এখানে খুবই কাজের

হবে। এখানে নানা রকম খাদ্যশস্যের উদ্ভাবন হয়েছে যা আমাদের ওখানে খুবই কাজে লাগবে। অনেক রকম ফুল ও ফলের গাছ এখানে আছে যা আমাদের কাছে একেবারে অজানা। দু জগতেই ডাক্তারী আর ওষুধ সম্বন্ধে গবেষণা যেমন প্রায় একই পথে চলেছে, তেমনই আবার কয়েকটা বিষয়ে দুয়ের মধ্যে অনেকটা প্রভেদও আছে, এ ব্যাপারে দু জগতের মধ্যে লেনদেন হলে দুজনেরই অনেক উপকার হবে। প্রায় সমস্ত বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে আমরা একে অন্যের সম্পূরক। কাজেই এই সভায় আমি প্রস্তাব করতে চাই যে এখন থেকে এ দু'জগতের মধ্যে নিয়মিত ভাবে যাতায়াত সুরু হক আর গবেষকরা একে অন্যকে সাহায্য করে গবেষণার কাজ আরও দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যান।'

বিপুল আনন্দধ্বনির সঙ্গে এই প্রস্তাবটি সর্ববাদীসম্মতি ক্রমে সভায় গৃহীত হল আর প্রফেসার দু'জগতের গবেষকদের সম্মিলিত দলের সভাপতি মনোনীত হলেন।

এর পর প্রফেসার সোমোরেন সকলকে অনুরোধ করলেন 'আপনারা সকলেই খোঁজ নিয়ে দেখুন সারা পৃথিবীতে আমাদের যানটির মতন আরও যান পাওয়া যায় কি না। সেই দু'শো বছর আগে যে সব জায়গায় এই যান তৈরী করার কারখানা ছিল তার কোনো খবর পাওয়া যায় কি না। যদি আমাদের যানটির মতন আরেকটি যান পাওয়া যায় তাহলে আমাদের ফিরবার সময় এখানকার একদল বৈজ্ঞানিক তাতে করে আমাদের সঙ্গে যেতে পারবেন আর যাত্রাপথটি তাঁদের কাছেও পরিচিত হয়ে যাবে।'

তখনই এই খোঁজ করার ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেল। এর কিছু পরেই সভা ভেঙ্গে গেল আর আমরাও হোটেলে ফিরে এলাম।

বংশ পরিচিতি দিয়ে আমাদের প্রত্যেকের খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, ফলে দূর দূরান্তর থেকে কারো কারো নিমন্ত্রণ আসছে, সেই আদিবংশের আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করার জন্য। প্রফেসার সোমোরেনের কাছে দেশ দেশান্তর থেকে বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণও আসছে।

প্রফেসার সোমোরেন এখানে মাস কয়েক কাটাবেন ঠিক করেই এসেছিলেন, কাজেই এবার ঘুরে ঘুরে এক সহর থেকে আরেক সহরে, এক দেশ থেকে আরেক দেশে গিয়ে মনের সুখে বক্তৃতা দিতে লাগলেন আর আমরা অনেকেই তাঁর সঙ্গে ঘুরতে লাগলাম।

আমাদের দলের একজন দুজন করে এক একটা গবেষণাগারে রয়ে গেলেন, নতুন অনেক কিছু শেখার আশায়। ঘুরতে ঘুরতে শেষকালে আমার পূর্বপুরুষদের পুরোনো জন্মভূমি বাংলা দেশে পৌঁছলাম। সেই প্রাকৃতিক দুর্যোগে তার সাবেক চেহারা একেবারে বদলিয়ে গেছে, মধ্য বাংলা আর দক্ষিণ বাংলা নামে যে বিরাট সমতল অঞ্চল ছিল তার সমস্তটাই এখন সমুদ্রগর্ভে। উত্তর বাংলার আর পশ্চিম বাংলার পার্বত্য অঞ্চল ছাড়া বাংলা দেশের আর কোনো অস্তিত্বই নেই। মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল সেই সাবেক পৈতৃক জন্মভূমি দেখতে পেলাম না বলে, তবে আমাদের বংশের অনেকের সঙ্গেই আলাপ হল, তাঁরা এসেছিলেন আমার খোঁজে।

ফিসার, মরিস, হ্যারিশ, নিকলসন এরা সবাই নিজেদের দু চারজন আত্মীয়ের সন্ধান পেয়েছে। কিন্তু বেচারা চিয়েন, ওর খোঁজে কেউ আসে নি আর খোঁজ নিয়ে যতটুকু জানা গেছে তাতে বোঝা গেছে

যে যে অঞ্চলে ওদের সাবেক জন্মভূমি ছিল সে অঞ্চলে এখন কারো বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, সে সমস্ত জায়গা এখন এক বিরাট হিমবাহের তলায় চাপা পড়ে রয়েছে।

ইতিমধ্যে একটি সুখবর পাওয়া গেছে যে সারা পৃথিবী খুঁজে গুটি ছয় ছোটবড় যানের সন্ধান মিলেছে আর সবগুলিকেই সানফ্রান্সিস্কো সহরে পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু যে সমস্ত জায়গায় এই যানগুলি তৈরী হয়েছিল তার অধিকাংশেরই কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় নি, কারণ হয় ঐসব অঞ্চলে অগ্ন্যুৎপাত খুব বেশী হয়েছিল, নয়তো সে সবের উপর দিয়ে হিমবাহ চলেছে।

পৃথিবী পাক দিয়েই ফেললাম আমরা, আবার সকলে সেই সানফ্রান্সিস্কো সহরে এসে পৌঁছলাম। সেই আগের মতন থাকার ব্যবস্থা—আমরা দু একজন ছাড়া সবাই কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

প্রফেসার সোমোরেন তাঁর দল নিয়ে ছ'টি যানের প্রত্যেকটিকে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে দেখেছেন আর প্রফেসারকে সাহায্য করার জন্য এখানকার সমস্ত ইঞ্জিনীয়াররা আর গবেষকরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। এই পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে প্রত্যেকটি যানই খুব ভাল অবস্থায় আছে, তবে সব কটিতেই ইন্ধনের অভাব।

ইন্ধন প্রস্তুত করার সূত্র আমাদের কাছে আছে, কাজেই আবার চারদিকে লোক ইন্ধন তৈয়ারীর প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যগুলির খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। দু এক জায়গায় অল্প পরিমাণ দ্রব্যের খবর পাওয়া গেল বটে, কিন্তু সেগুলি থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ইন্ধন তৈরী করতে অনেকটা সময় লাগবে। পুরাকালে যে সব জায়গায় এগুলি বেশী পরিমাণে পাওয়া যেত, সে সব জায়গা এখন হিমবাহের নিচে পড়ে আছে, ফলে সেখান থেকে কিছু সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য।

একটু ভাল খবর অবশ্য ছিল—এই ছটি যানের সমস্ত ইন্ধন একসঙ্গে জমা করে দেখা গেছে যে সেটা দিয়ে একটি যান অনায়াসে আমাদের জগতে গিয়ে, ফিরে আসতে পারবে; আর একবার সেখানে পৌঁছাতে পারলে ত কোনো ভাবনাই নেই কারণ সেখানে ইন্ধন প্রস্তুতের কোনো অসুবিধাই নেই। ঠিক হল আপাততঃ একটি যানই এবার আমাদের সঙ্গে যাবে।

পরে যখন দুই জগতের মধ্যে নিয়মিতভাবে যাতায়াতের ব্যবস্থা হবে তখন আমাদের জগতে যে সব বড় বড় যান আছে, সেগুলিকে কাজে লাগানো যাবে আর এক এক বারে হাজার হাজার লোক যেতে পারবে।

এবার আমাদের ঘরমুখো ফেরার পালা। প্রফেসার হ্যারল্ডের নেতৃত্বে ডাঃ প্যাপেন, হ্যারিশ, নিকলসন ও আরও কয়েকজন কর্মী এখানকার একটা নামকরা বৈদ্যুতিক গবেষণাগারে নতুন যানটির জন্য টেলিভিসোফোন ও স্বয়ংক্রিয় ক্যালকুলেটার তৈরী করাতে ব্যস্ত।

প্রফেসার সোমোরেন আর ডাক্তার রোমানফ, এঁরা দুজন এখানকার জনকয়েক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে কি একটা গোপনীয় গবেষণা করছেন। চিয়েন আর আমি এদেশের প্রচলিত ভাষার বৈজ্ঞানিক বই সংগ্রহ করছি, কয়েকটা ভাষার অভিধানও নেওয়া হয়েছে, এই দুই জগতের নিত্যব্যবহার্য হাজার কয়েক কথা অনুবাদ করতে হবে!

দ্বিতীয় যানের যাত্রীদের জন্য সেই খাবার বড়ি তৈরী করা হয়েছে। এখান থেকে যাঁরা আমাদের সঙ্গে যাবেন তাঁদের আমাদের মতন পরীক্ষা করে নেওয়া হয়েছে আর সকলের ট্রেণিংএর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

যে যানটি করে তাঁরা যাবেন তার প্রত্যেকটি অংশ খুব ভাল করে পরীক্ষা করার পর, সেটিকে সান ফ্রান্সিকো সহরেই নিয়ে আসা হয়েছে, ইন্ধনও নেওয়া হয়েছে। একটি টেলিভিসোফোন আর একটি স্বয়ংক্রিয় ক্যালকুলেটার যানটিতে বসানো হয়েছে।

এখানকার এরোড্রোমেও এই ধরনের ছুটি যন্ত্র বসানো হয়েছে। আর এগুলি সঠিক ব্যবহার সম্বন্ধে এখানকার কয়েকজন কর্মীকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। খাবার দাবার মজুত করাও শেষ হয়েছে। এবার রওনা হলেই হয়।

এমন সময় খবর রটে গেল যে সূর্যের চারপাশে যে আবরণী পড়ে আছে সেটাকে কি করে ভেঙ্গে ফেলে, আবার এই পৃথিবীতে সূর্যের তাপ বেশী করে এনে এখানকার হিমবাহের প্রকোপ কমিয়ে, আবার আগেকার মতো অনেক বেশী ভূখণ্ড মানুষের বাসের উপযোগী করে ফেলা যায়, এই নিয়েই প্রফেসার সোমোরেন এতদিন গবেষণা করে, একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন।

কদিন পরেই দেখি সেই বাকি পাঁচটি যানের ছুটিকেও এখানে আনা হল। সেগুলিকে আবার ভাল রকম পরীক্ষা করে, তার মধ্যে নানা জিনিষপত্র আর নতুন যন্ত্রপাতি বসানো হল। প্রফেসার সোমোরেন, ডাক্তার রোমানফ্ আর এখানকার কয়েকজন বৈজ্ঞানিক এই যান ছুটিকে বার বার তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করছেন। আমরা যে এতদূরে ফিরে যাচ্ছি তার জন্য প্রফেসারের বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই দেখে খুবই আশ্চর্য লাগছিল। মাত্র দশদিন পরে আমাদের যাত্রা সুরু হবে ঠিক হয়ে গেছে, অথচ প্রফেসার যেন সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন।

হ্যারিশ, নিকলসন, ফিসার ও আরও পাঁচ ছ জন এখানে থেকে যাচ্ছেন। এখানকার ছু তিনটি গবেষণাগারে কাজ করবেন। বছর ছুই আড়াই পরে আবার যখন আমাদের জগত থেকে যানটি এই পৃথিবীতে আসবে তখন তাঁরা ফিরে যাবেন।

ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ডের পাশে কণ্ট্রোল রুম, সেখানে টেলিভিসোফোন আর স্বয়ংক্রিয় ক্যালকুলেটার আগেই বসানো হয়ে গেছে। এখন আবার সেখানে কতকগুলি নতুন যন্ত্র বসানো হয়েছে। রওনা হবার কয়দিন আগে সকালবেলা প্রফেসার সদলবলে কণ্টোল রুমে গেলেন। ছোট যান ছুটিকে ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ডে আনা হয়েছিল আগের রাত্রেই। প্রফেসার একটি সুইচ্ টিপতেই যান ছুটি রওনা হয়ে গেল।

এবার আমরা খবর পেলাম এই চালকবিহীন যান ছুটি প্রচণ্ড বিস্ফোরকে ভরা আর সূর্যের আবরণীর যতটা সম্ভব কাছে পৌঁছেই এ ছুটি ফেটে যাবে। প্রফেসার আশা করছেন যে এই বিস্ফোরণে যে বিরাট কম্পনের সৃষ্টি হবে, তাতে ঐ আবরণীতে ভাঙ্গন ধরবে। একবার একটু ভাঙ্গন ধরলেই ওর ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়বে আর ক্রমে ক্রমে সমস্তটাই ভেঙ্গে গিয়ে সূর্যের আকর্ষণে সূর্য গোলকের মধ্যে পড়ে যাবে আর সূর্যও এই ছুশো বছরের রাহুর দশা থেকে মুক্ত হবে।

সূর্যের কাছ পর্যন্ত পৌঁছানর জন্য সামান্য ইন্ধন এই যানদুটিতে ছিল। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে প্রফেসার সোমোরেন এ দুটিকে রওনা করিয়ে, সূর্যকে লক্ষ্য রেখে এদের গতিবেগ আর গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করিয়ে দিয়েছেন।

দেখতে দেখতে যানদুটি মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেল, সকলেই তখন একে একে কন্ট্রোল রুম থেকে বেরিয়ে এলেন। ডাক্তার প্যাপেনের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে দিন ছ সাত না গেলে এই পরীক্ষার ফলাফল কিছুই জানা যাবে না। মনে মনে একটু আশঙ্কা হল, আমাদের এখানকার মেয়াদ ত আর নয় দিন, পরীক্ষার ফলটা শেষ পর্যন্ত না দেখেই কি আমাদের এখান থেকে রওনা হয়ে যেতে হবে নাকি।

আরও সাতদিন কেটে গেল। আমরা রওনা হবার জন্য তৈরী হয়ে রয়েছি, সব প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র নেওয়া হয়ে গেছে। দু নম্বর যানটিতে যে ১৫ জন বৈজ্ঞানিক আমাদের জগতে যাবেন, তাঁদের ট্রেনিং শেষ হয়ে গেছে। তাঁদের যানটিতেও সব রকম রসদ নেওয়া হয়ে গেছে, এবার রওনা হলেই হয়, কিন্তু সূর্যের আবরণীর ভেঙ্গে যাবার কোন চিহ্নই ত কারোর নজরে পড়ছে না।

অনেকেই বলাবলি সুরু করেছে যে প্রফেসার সোমোরেনের হিসাবে নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে, নইলে এতদিনেও কি কিছু চিহ্ন দেখা যেত না? ঠিক এমন সময় দক্ষিণ আমেরিকার রিও ডি জেনেরিও সহরের বিখ্যাত মানমন্দির থেকে খবর এল যে সেদিন সূর্যাস্তের অল্প আগে সূর্যগোলকের উপর একটা কালো দাগ দেখা গেছে।

এই খবরে আবার সহরময় একটা হৈচৈ পড়ে গেল, পরদিন সকাল থেকেই ছেলে বুড়ো সকলেই এক একটা ভুষো মাখা কাঁচ নিয়ে সূর্যের সেই কালো দাগ দেখতে চেষ্টা করতে লাগল। কেউ বলল যে দাগ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে আবার কেউ কেউ বলল 'কই, কিছুই ত দেখতে পাচ্ছি না।'

সহরময় বেশ একটা চাঞ্চল্যের ভাব এসেছে। সূর্যাস্তের ঠিক আগে, সূর্যগোলকের প্রায় অর্ধেকটা যখন ডুবে গেছে, তখন দেখা গেল যে অর্ধ গোলকটির উপর থেকে নিচ পর্যন্ত একটা সূক্ষ্ম কালো আঁচড়ের মতন দাগ পড়েছে; সকলে বললেন, কাল দুপুর না হওয়া পর্যন্ত এই ফাটলের বৃদ্ধি বোঝা যাবে না।

হোটেলে ফিরে গেলাম। এটাই আমাদের এখানে শেষ রাত। উত্তেজনায় ভাল ঘুম হল না আর পাশেই চিয়েন তার চিরকালের অভ্যাসমতন অকাতরে ঘুমাচ্ছে।

রওনা হবার দিন এসে গেল, বিকেল তিনটায় রওনা হব, সকলকেই জানানো হয়েছে। সকাল বেলা যখন সূর্য উঠল তখন মনে হল যেন অন্যদিনের থেকে সূর্যের তেজ অনেক বেশী। মনের আনন্দে আকাশের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলাম, দক্ষিণ থেকে আকাশ জুড়ে ঘনঘটা করে কাল মেঘ আসছে হয়তো প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হবে।

ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম সেদিনকার আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানতে। হোটেলের খাবার ঘরে এসে দেখি, সেখানে এখানকার অনেক নামকরা বৈজ্ঞানিক প্রফেসার সোমোরেনকে ঘিরে

বসে আছেন। এঁরা সকলেই প্রফেসারের সঙ্গে সূর্যের এই আবরণী ভাঙ্গার প্রচেষ্টায় সংশ্লিষ্ট আর পরীক্ষার ফলাফল কি হয় দেখবার জন্য এখানেই আছেন।

এঁরা সকলেই খেতে বসেছেন বটে, কিন্তু অনেকের হাতে কাগজকলম দেখে বুঝতে পারলাম যে এঁরা অঙ্ক করছিলেন। মরিশ, ফিসার ও চিয়েন এরাও খবরের আশায় ঘুর ঘুর করছে। হ্যারিশ, আর নিকলসনের সঙ্গে ফিসার এখানে থেকে যাচ্ছে। কতদিন এদের সঙ্গে দেখা হবে না, কাজেই এদের দেখতে পেয়ে আর আমার আবহাওয়ার খবর নেওয়া হল না, ওদের কাছেই বসে পড়লাম।

হ্যারিশ আর নিকলসন পাশের টেবিলে বসে চা খাচ্ছিল দেখে আমরাও চা খেতে সুরু করে দিলাম। চা খেতে খেতে মনে হচ্ছিল, এই হ্যারিশের জন্যই আজ এখানে বসে চা খাচ্ছি। নইলে কি আর এই রকম একটা অভিযানে আমাদের মতন ছেলেমানুষেরা আসতে পারত।

সবার সঙ্গে বসে চা খেলাম, এতদিন একসঙ্গে কাটাবার পর আজ ছাড়াছাড়ি হবার দিন এসেছে মনে পড়তেই মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। বাইরেটা দেখে আসার জন্য উঠতে যাচ্ছি, তাই দেখে নিকলসন একটু হেসে বলল, 'মিছামিছি বাইরে গিয়ে কি করবে, সারা আকাশটাই এখন মেঘে ঢেকে গেছে কিছুই দেখতে পাবে না।'

মেঘ আর কাটে না, আমার দুশ্চিন্তা তাহলে শেষ পর্যন্ত প্রফেসার সোমোরেনের এই পরীক্ষার ফলটা ভাল করে নিজের চোখে দেখে যেতে পারলাম না। বেলা আড়াইটা যখন বাজল তখন ফিসার, হ্যারিশ, নিকলসন ও অন্যান্যদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ল্যাণ্ডিংগ্রাউণ্ডে গিয়ে দাঁড়ালাম, তখনও আকাশ মেঘে ঢাকা।

ডাক্তার রোমানফ দ্বিতীয় যানটিতে যাচ্ছেন চালক হিসাবে আর ওঁর সঙ্গে আমাদের দলের আরও কয়েকজন যাচ্ছেন ওঁকে সাহায্য করার জন্য। এখানকার যে ৩৫ জন চলেছেন আমাদের জগতে তাঁদের জনকয়েক আমাদের যানটিতে যাচ্ছেন।

আমাদের যানে উঠবার সময় হয়ে এল, এমন সময় হঠাৎ মেঘ কেটে গিয়ে সারা মাঠ রোদে ঝলমল করে উঠল। হ্যারিশ, ফিসার নিকলসন ও অন্যান্য যাঁরা এতদিনের সাথী ছিলেন, তাঁদের সবার কাছ থেকে শেষবারের মতন বিদায় নিয়ে, একে একে যানে উঠতে লাগলাম। প্রফেসার সোমোরেন সবার শেষ যখন সবে দাঁড়িয়ে সিঁড়িতে পা দিয়েছেন এমন সময় মানমন্দির থেকে খবর এল সূর্যের আবরণীতে যে ফাটল ধরেছে সেটা পৃথিবীর সমস্ত জায়গা থেকেই দেখা যাচ্ছে, এতদিন পরে সূর্যের বন্দীদশা কাটবার পথে।

এই খবরে সমবেত জনতার মধ্যে বিরাট আনন্দধ্বনি ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, প্রফেসার যানটির ভিতর চলে এলেন, তিনটা বাজল, দরজা বন্ধ হল আর আমদের ফেরার পালাও সুরু হল।

শেষ

আমরা শিকারে গেলাম

আভা পাকড়াশী

শিকারের গল্প নিশ্চয়ই তোমাদের খুব ভাল লাগে, না? শোন তবে একটী গল্প।

সেবার আমরা কজন বন্ধু মিলে ঠিক করলাম যে মটর নিয়ে কলকাতা থেকে সোজা পাড়ি দেব হাজারীবাগ পর্যন্ত। আর হাজারীবাগে তো হাজারটা বাঘ পাওয়া যায়, সেতো জানই। শুধু কি বাঘ! ভালুক চিতা কি নেই? আমরা চার বন্ধু। চারটে বন্দুক। চারটে সতরঞ্চি, চারটে কম্বল, কিছু চাল, ডাল, আলু পিঁয়াজ, একটা স্টোভ আর প্রেসার-কুকার এই নিয়ে আমার ছোট অস্টিনে করে রওনা দিলাম।

পথে পড়ল ছোট ছোট নদী। তাতে নেমে স্নান করলাম। চাল ডাল তো সঙ্গেই ছিল, আর কোথাও জায়গা না পেয়ে গাছের তলাতেই সতরঞ্চি বিছিয়ে বসে গেলাম। খিচুড়ি আর মাংস তোফা

লাগল। মাংসটা কিসের জানো? ঐ পথে আসতে জোগাড় হয়েছে আর কি? হয় বনমোরগ, নয়তো বেলে হাঁস কিম্বা খরগোস? খরগোসের মাংস খেতে খুব ভাল। আমাদের মধ্যে একজন আছেন তাঁর নাম হীরুদা। সে যেমন মোটা, তেমনি খেতে পারে। সামনে দিয়ে ইঁদুর দৌড়ে গেলেও বলবে 'খাব'। ঐ মাংস, মাংস খেতে সে ভীষণ ভালবাসে। হীরুদা কিন্তু দারুণ ভীরু। শুদ্ধু ঐ মাংসের লোভে শিকারে আসে।

সেদিন সকাল থেকে কিছু পাওয়া যায়নি, দুপুর প্রায় হয়ে আসছে আর হীরুদা খাবো খাবো করছে। আমরা প্রায় হাজারীবাগের কাছাকাছি এসে পড়েছি। পথে একটা চওড়া নদী পড়ায়, নৌকো ভাড়া করতে তারপর সেই নৌকোর ওপর গাড়ী তুলে পার করতে যথেষ্ট সময় গেছে। সকাল থেকে আর শিকার করার সময় হয় নি। ধমকে উঠলাম—থামতো হীরুদা। রাতদিন খুঁতখুঁত কোরনা বলছি। কালকের ডিম আছে, যে কটা আছে তা তুমি একলা খেও না হয়। বলে, দুর ডিম তো যাদের দাঁত নেই তারা খায়, আমি কেন খাব? বলল বটে—কিন্তু সকালে চায়ের সঙ্গে চারটে ডিম সাঁটিয়েছে। তাছাড়া আধটিন জেলি, আধখানা পাঁউরুটি, বেশ কিছুটা মাখন তো ছিলই। বলে, যা ধকল যাচ্ছে শরীরটা রাখতে হবে তো? আমরা বললাম—তোমার শরীর দেখে শেষে বাঘের জিভে জল আসবে, দেখো। এই কদিন রাত্রে গাছের সঙ্গে দড়ির দোলনা টাঙিয়ে হয়ত বা মাঠে ঘাটেই ঘুমিয়েছি, আজ রাত্রে আর তা চলবে না। একটা আস্তানা জোগাড় না করলে বাঘের পেটেই যেতে হবে। তায় যে শীত! আমরা এদিকে গাড়ী পার করতে ব্যস্ত, এপারে নেমে রওনা হবার সময় কিন্তু আর হীরুদাকে খুঁজে পাইনা! গেল কোথায় মোটাল্লাশ। যা জঙ্গুলে জায়গা! শীতের দুপুর, এর মধ্যেই শেষ হয়ে এলো। হাড় ভাঙ্গানো বাতাস বইছে। বন্দুক গুণে দেখি, নিয়ে গেছে নিজেরটা। ওর মানে আমাদের ভরসায় না থেকে নিজেই মাংসের ধান্দায় বেরিয়ে পড়েছে।

আবার গেলাম ওপারে! হীরুদা আ, হীরুদা…আ! ঐ যে সাড়া দিয়েছে…আমি এখানে-এ। তোমরা এসো…ও। গিয়ে যা দেখলাম জীবনে ভুলতে পারব না। সাদা ময়ুর দেখেছ? গায়ে যেন তার সাদা মখমলের ফুল ফুটে আছে। একটা মস্ত উঁচু গাছের ডালে বসেছে, আর তার লম্বা লেজটা মাটি ছুঁয়েছে। ওপরে একটা সাপ গাছের ডালে জড়িয়ে জড়িয়ে উঠেছে, পাখীর বাসায় ছানা খেতে। ময়ুরে সাপ মারে জানতো? সমানে ঠোকরাচ্ছে সাপটাকে। সাপটা গাছে উঠতে পারছে না, দারুণ চটছে ময়ুরটার ওপর। উল্টে যেই ফোঁস করে তেড়ে আসে ময়ুরটা লাফিয়ে অন্য ডালে যায় আর পেখমটা একটুখানি ফুলে যায়। আঃ! কি সুন্দর পেখম, ভাবছি একবার যদি পুরোটা খুলতো? হীরুদা বলল—কি সুন্দর ময়ুরটা রে ওকে দেখেই আমার ক্ষিধে তেষ্টা চলে গেছে। কিন্তু যদি সাপটা ওকে মেরে ফেলে? দেনা ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করে ময়ুরটা উড়িয়ে, কিন্তু অতর্কিতে কি যেন হল বুঝলাম না, হঠাৎ ময়ুরটা কোঁওও করে যেন ককিয়ে উঠলো, ডাল ছেড়ে মাটিতে নেমে এলো—আর সমস্ত পেখমটা খুলে উঁচু করে সাজিয়ে ধরল। অপূর্ব শোভা সেই সাদা পেখমের। রোদ লেগে ঝকছে যেন সোনা! তারপরই ওর মাথাটা লটকিয়ে গেল। আমাদের চোখের সামনে মরে গেল অত সুন্দর ময়ুরটা। ওর

ঘাড়ে একটা তীর বেঁধা। রক্ত পড়ছে সেখান দিয়ে। ময়ূরটা মরে যেতেই কটা সাঁওতাল বেরিয়ে এলো বনের মধ্যে থেকে। আমাদের ভারী রাগ হয়েছিল—বললাম ছিঃ, অত সুন্দর একটা প্রাণী তোমরা তাকে মারলে? হাসলো ওরা, বলল—তোরাও তো জন্তু মারতে বেরিয়েছিস? খাবার জিনিস হাতের কাছে পেলে তোরাই কি ছেড়ে দিবি? একটা বাঁশের সঙ্গে ময়ূরটা বেঁধে নিয়ে চলে গেল ওরা আজ ওদের মস্ত ভোজ। শেষবারের মত ময়ূরটা তার পেখমের শোভা দেখিয়ে দিল আমাদের। হ্যাঁ, ভুলে গেছি বলতে সাপটাকেও মেরেছে, গাছের ডালেই মরে গিয়ে লটকে রয়েছে সেটা। গাছের ওপরে পাখিগুলো কিচমিচ করছে। ভয় পেয়েছে ওরা। বেলার দিকে তাকিয়ে আমাদেরও ভয় হল। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলাম!

আবার নদী পেরিয়ে এলাম। তারপর মোটর চালিয়ে দিলাম স্পিডে। আমার ওপর গাড়ির সব কিছু ভার। ভোঁদার ওপর রান্নার ভার, বিভূতি রান্নার যোগাড় দেয়, আর হীরুদা বিছানা পাতে। জল আনে। বলে তোরা আমার ভূঁড়িটা দেখছি না ধ্বসিয়ে ছাড়বি না। কিন্তু এখন তো সন্ধ্যে প্রায় হয়ে এলো। সামনের ডাকবাংলো আরও মাইল কুড়ি দূরে। পথে আবার একটা নদা পড়লেই তো গেছি। বিস্কুট পাউরুটি চলছে আজ সারাদিন, রান্না হল কোথায়? এখন রাতের মত একটা আস্তানায় পৌঁছতে পারলে হয়।

হল না। একটা টায়ার ফেঁসে গিয়ে আমাদেরও ফাঁসাল। সে কি আওয়াজ! দুম করে উঠল। যাই হোক, অতি কষ্টে আবার বদলানো হল। একজন চারদিকে টর্চ লাইট ফেলছে সমানে, বিপদ দেখলেই বলবে, অন্যজনে গুলিভরা বন্দুক নিয়ে রেডি হয়ে আছে, বিপদ দেখলেই ফায়ার করবে আর আমরা দুজন চাকা বদলাচ্ছি। ভোঁদার বুদ্ধিটা একটু কম কিন্তু রাঁধতে পারে যেমন, তেমনি এই সব কাজও বেশ জানে আর আমি তো আছিই। হল।—আবার চললাম। শেষে গিয়ে উঠলাম ডাকবাংলোয়। আহা! ডাকবাংলোই বটে। একটুখানি উঁচু ভিতের ওপর ছোট্ট ছোট্ট দুটো খুপরি। একটার মাথার অর্ধেক টালি নেই। চাঁদ তারা দেখা যাচ্ছে ঘরের মধ্যে দিয়ে। অন্য ঘরটি ওরই মধ্যে পদে আছে। তবে একটাও দরজা জানলা বন্ধ হয় না। দারওয়ান টারওয়ান কেউ নেই। জনমানবের পাত্তা নেই। বাংলোর সামনেটা একটু ফাঁকা। সেখানে গাড়ীটা রাখলাম বার করে। ওর মধ্যে তো আমাদের ছিষ্টি সংসার। খাবার দাবার টাকা কড়ি সব ওতেই রইল। বেশ রাত হয়েছে তখন। বললাম আর রান্নাবান্না থাক। সঙ্গে চিড়ে ছিল—তাই ভিজিয়ে কনডেন্স্‌ড মিল্ক আর বুনো কলা দিয়ে মেখে খাওয়া হল। এবার শোয়া।

হীরুদা বলল, না সবাই মিলে একসঙ্গে ঘুমোলে চলবে না। আর অত বিছানা কই? মাটিতে সতরঞ্চি বিছিয়ে শুলে তো হাড় কাঁপিয়ে দেবে। তার চেয়ে একজন মোটরের গদি তুলে এনে তাতে শোও, আর বাকি দুজনে একটা বিছানায়। পালা করে জাগো। বেশ বাবা তাই সই। আমিই জাগবো প্রথম রাত।

দরজা জানালাগুলো কোনরকমে ইট দিয়ে চেপে দেওয়া হল। মোটরটা নজরে রাখতে হবে।

একটা ভাঙ্গা চেয়ারে কম্বল জড়িয়ে বসে জানলার ফুটো দিয়ে মাঝে মাঝে দেখছি আর মোমবাতির আলোয় ডিটেকটিভ নভেল পড়ছি। ওদের গাঁগা করে নাক ডাকছে। বন্দুকটা হাতের কাছে রয়েছে। টোটা ভরা। ওদের বন্দুকগুলোও আমার পাশে। নিঃঝুম নিঃশব্দ চারদিক। একনাগাড়ে ঝিঁঝিঁ ডাকছে। মাঝে মাঝে গাড়ীটা দেখে নিচ্ছি। হঠাৎ কেমন চমকে উঠলাম—বেশ কিছুক্ষণ গাড়ীটা দেখিনি হয়তো একটু ঝিমিয়ে পড়েছিলাম আর নয়তো বইটাতেই জমে গিয়েছিলাম। কেমন যেন ঘড় ঘড় শব্দ হচ্ছে না? সজাগ হয়ে উঠে বসলাম—চাঁদটা সরে গেছে। গাছের ছায়া পড়েছে গাড়ীর ওপর, ভাল দেখতে পাচ্ছি না? কি ব্যাপার! বেশ কতকগুলো পায়ের শব্দ। মানুষ না জন্তু? ডাকাত না বাঘ? কি করি এখন। ডাকব নাকি ওদের? জানলার ফুটো দিয়ে দেখতে গিয়ে শীতে নাক জমে যাচ্ছে। আবার ঘড়ঘড় ঘড়ঘড়! ভাল্লুক নাকি? মানুষের গন্ধ পেয়েছে? কিন্তু শব্দটা গাড়ীর দিকে হচ্ছে—নাঃ ও নিশ্চয়ই ডাকাত। আর দেরী নয়—চুপি চুপি ওদের ডেকে তুললাম। ওরা অ্যাঁ কি ব্যাপার! কি হল! বলে ধড়মড়িয়ে উঠে বসেই কোন হ্যায় বলে বন্দুক বাগিয়ে ধরল। আমি বললাম চুপ চুপ—অমনি করে নয়। কে জানে ওরা দলে কতজন আছে? কটা বা বন্দুক আছে ওদের? আমরা কজন আছি তা ওদের বুঝতে দেওয়া নয়। এসো ভোদা টর্চলাইট ধরো—আর এক হাতে বন্দুক নাও, হীরুদা তুমিও বন্দুক নাও, বিভূতি তুই ওপাশে দাঁড়া। এইভাবে দরজার এপাশে আমরা অ্যালার্ট হয়ে দাঁড়ালাম—উদ্দেশ্য দড়াম করে দরজাটা খুলেই একেবারে ফায়ার, অবশ্য তার আগেই সার্চলাইট ফেলে চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া হবে। ভড়কে যাবে ওরা,—আর তারপর—দুম দুম ফটাস।

কান পেতে আছি আমরা—আবার খড়মড় খড়মড়, ওঃ আরও ডাকাত আসছে; গাড়ীর কাছটা একেবারে অন্ধকার। রেডি—ট্রিগারে হাত, দড়াম করে দরজা খুলে গেল—ভোঁদার সার্চলাইট চমকে উঠল—একরাশ সাদা সাদা কি! গাড়ী ঘিরে—ও কি? গাড়ী বাঁচিয়ে, দড়াম-দুম।

হীরুদার তিন দিনের খোরাক জুটে গেল—আর আমাদের হাসি। ওগুলো খরগোস। ওরা গাড়ি তো দেখেনি কখনো? তাই দল বেঁধে গাড়ি দেখতে এসেছিল। ওদেরই পায়ের শব্দ হচ্ছিল শুকনো পাতার ওপরে।

মন ভরল না, না? বাঘ নয়, সিংহী নয়, মোটে খরগোস? আবার পরে বাঘের গল্প বলব, তখন, কেমন?

এ যুগের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারক

প্রসাদ সেনগুপ্ত

নিরানব্বই ভাগ পরিশ্রম ও একভাগ অনুপ্রেরণার সমষ্টির নাম প্রতিভা।—এডিসন

এ যুগের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারক হলেন টমাস আলভা এডিসন। ছোটবেলায় হাজার সাংসারিক বিপর্যয়, শিক্ষার অভাব প্রভৃতি থাকলেও যে উৎসাহীর বড় হওয়া আটকায় না, এডিসন হলেন তারই মস্ত প্রমাণ।

আমেরিকার একটি শহরে অশেষ অভাব-অনটনের মধ্যে এডিসনের জন্ম হয়। ছেলেবেলায় কোনদিনই তাঁর লেখাপড়া করার সুযোগ হয়নি। প্রথমে দু'একটা ফাই-ফরমাস খেটে এবং আরেকটু বড় হলে ট্রেনে ট্রেনে খবরের কাগজ বিক্রী করেই দিন কাটতে লাগলো। পড়াশুনা না শিখলেও বিজ্ঞানের উপর এডিসনের আজন্ম একটা ঝোঁক ছিল এবং সাধারণ নানা জিনিস দিয়ে ছোটখাটো বিজ্ঞানের পরীক্ষা করতে তিনি খুব ভালোবাসতেন! কাগজ বিলি করার সময়ে তাঁর গলায় ঝোলান থাকত একটি বড় ট্রে। সেটার একপাশে তিনি নিতেন খবরের কাগজ আর অন্যপাশে থাকত দু'একটা অ্যাসিড্ আরও কয়েকটা ছোট ছোট শিশিতে করা কয়েকটি টুকিটাকি জিনিস। একদিন কাগজ দিয়ে একটা ট্রেন থেকে তিনি যেই নামতে যাবেন অমনি ট্রে থেকে ফস্‌ফরাসের একটা শিশি হঠাৎ লাইনের উপর পড়ে গেল। ব্যাস্, সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে গেল সেখানটায়। ট্রেনটির গার্ড কাছেই ছিলেন। তিনি এসব দেখতে পেয়ে খুবই রেগে গেলেন আর এগিয়ে এসে বালক এডিসনের কানের কাছে প্রচণ্ড এক ঘুঁষি মারলেন। এডিসন ছিটকে পড়ে গেলেন। এই ঘুঁষিতে তাঁর কানের পর্দা কেটে গিয়েছিল এবং এজন্য তাঁকে সারাজীবন অনেক দুর্ভোগ পোয়াতে হয়েছে। অবশ্য পরবর্তীকালে এডিসন এ সম্বন্ধে বলেছেন,

—'এটা আমার পক্ষে শাপে বর হয়েছে। আমি যখন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিমগ্ন থাকি তখন বাইরের গোলমাল আমার কানে গিয়ে ব্যাঘাত জন্মাতে পারে না।'—

প্রত্যেকদিনের মত সেদিনও এডিসন কাগজ বিক্রী করছেন এমন সময়ে তিনি দেখতে পেলেন

লাইনের উপর একটি শিশু পড়ে গিয়ে চীৎকার করে কাঁদছে আর সেই লাইন ধরেই একটি এঞ্জিন দ্রুত এগিয়ে আসছে। স্টেশনের এত গোলমাল ও ব্যস্ততার মধ্যে কেউই তাকে দেখতে পায়নি। এডিসন অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দিয়ে সেই চলন্ত এঞ্জিনের সামনে লাফিয়ে পড়ে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করলেন! তার বাবা একটা কি কাজ সারতে গিয়েছিলেন। তিনি এসে সব শুনে এডিসনকে অনেক ধন্যবাদ দিলেন এবং এডিসনের আর্থিক অবস্থার কথা শুনে নিজের বাড়িতে এডিসনকে স্থান দিয়ে তাকে টেলিগ্রাফ করতে শেখাতে লাগলেন। এডিসনের ছোটবেলা থেকেই এটা শিখবার ইচ্ছা ছিল। তিনি খুবই আগ্রহসহকারে শিখলেন এবং টেলিগ্রাফ অফিসে একটা চাকরিও পেয়ে গেলেন।

এরপর সামান্য অবসর পেলেই এডিসন টেলিগ্রাফ সম্পর্কে নানা চিন্তা করতেন। একদিন এরকম চিন্তা করতে করতেই হঠাৎ তাঁর মাথায় গ্রামোফোন আবিষ্কারের খেয়াল জাগে। উৎসাহের বশে তিনি জোড়া-তালি দিয়ে যন্ত্রটা তৈরী করে ফেললেন।

অবশ্য তিনি যা তৈরি করেছিলেন তাকে আজকাল কোনো বোকাই গ্রামোফোন বলে ভুল করবে না। মোমের তৈরী একটি রোলার হল রেকর্ড। সেটার সঙ্গে একটি হ্যাণ্ডেল লাগানো। আর একটি পিন্ এবং তার পেছনে লাগানো একটি টিনের চোঙ্। এডিসন একটি বিখ্যাত ছড়ার প্রথম লাইন রেকর্ড করে বাজিয়ে শুনলেন! খুব আস্তে শোনা গেলেও মূল তথ্যটা সেদিনই প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। এই লাইনটি হচ্ছে—'মেরী হ্যাড্ এ লিট্‌ল্ ল্যাম্ব্।' এডিসন তাঁর এই আবিষ্কারটি বিক্রী করতে নিউইয়র্ক যান এবং একটি কোম্পানীর মালিকের সঙ্গে দেখা করেন। মালিক এডিসনের আবিষ্কার ৩৬,০০০ ডলারের বিনিময়ে কিনে নিলেন। দরিদ্র এডিসনের বিস্ময়ের ঘোর কাটতে ক'দিন লেগেছিল বলা যায় না!

এই টাকার সাহায্যে এডিসন একাগ্রভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিজেকে নিযুক্ত করতে পেরেছিলেন। এডিসনের পরবর্তী আবিষ্কার হল ইলেকট্রিক্ বাল্ব্। চলবিদ্যুৎ আবিষ্কৃত হয়ে গিয়েছে এর অনেক আগে। কিন্তু তার সার্থক ব্যবহারের পথের সন্ধান দিলেন এডিসন। এঁর আরেকটি বিশেষ আবিষ্কার হচ্ছে চলচ্চিত্র। এডিসনের সব কটি আবিষ্কারের নাম মনে রাখাও প্রায় অসাধ্য ব্যাপার। ছোট-বড় সব আবিষ্কার মিলিয়ে এঁর মোট আবিষ্কারের সংখ্যা দাঁড়ায় এক হাজারেরও উপরে।

* * *

এডিসন আজ আর ইহলোকে নেই। কিন্তু তাঁর আবিষ্কৃত প্রত্যেকটি জিনিসই আজ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভেবে বিস্মিত হয়ে যেতে হয় সেই মহৎ মানুষটির কথা—শৈশবে ভাগ্য লক্ষ্মীর চরম অনাদর আর অবহেলাকে সহ্য করেও যিনি ধৈর্য, উৎসাহ আর অধ্যাবসায়কে মুলধন করে জীবনের যাত্রা পথে বড় হয়ে দাঁড়াতে পেরেছেন এবং বিশ্বের মঙ্গলের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করে সবার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আর অকৃত্রিম ভালোবাসা অর্জন করেছেন।

চিঠিপত্র

জ্যোতির্ময় মজুমদার, নিউ দিল্লী

মাঝে মাঝে যে জায়গা কম পড়ে গেলে ধাঁধার উত্তর কি আর, কিছু, এক মাস দেরী করে বেরোয় সে তো বোঝাই যাচ্ছে। এক আধ বারও মুখ বদলের জন্যে বড় ধাঁধা বেরুবে না, সে কি কথা?

প্রত্যেক চিঠিতে গ্রাহক সংখ্যা, বয়স, ঠিকানা দিও কিন্তু

ইন্দ্রজিৎ দাশগুপ্ত ১৮৪১, বয়স ১১

পত্র-বন্ধু চাই। শখ- -গান, ডাকটিকিট সংগ্রহ, পোকা-মাকড় পাখি দেখা, গল্প পড়া ও লেখা।

শুক্লা চট্টোপাধ্যায় ১০৯০, বয়স ১৬

সারাজীবনই তো সন্দেশের গ্রাহক থাকা যায়, তার তো কোনো বয়স নেই। তবে কি জানো প্রতিযোগিতা ধাঁধা ইত্যাদিতে ১৭ বছরের গ্রাহকদের সঙ্গে ছোটরা পারবে কেন? সাধারণত আমরা ধরে নিই যারা প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়, তারা সবাই স্কুলে পড়ে।

রঞ্জন সেনগুপ্ত, এন্ ১৭৫১ বয়স ১৩

পত্র বন্ধু চাই। শখ:—খেলাধূলা, ডাক টিকিট জমানো।

মুকুর দাশগুপ্ত, ২১৯৫, বয়স ১১

তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয়ে প্রবন্ধের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছি, যথা ইউ-এন্-ও। ধাঁধাগুলোর কথা সম্পাদকমণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করব। একটু যেন সহজ ও জানা বলে মনে হচ্ছে কিন্তু।

দেবব্রত মণ্ডল, ২৫০৭

তুমি যে প্রবন্ধ পড়তে চাও, সেটি যোগাড় করার চেষ্টা চলছে।

মলয়া পাল, এন্ ১৭৯২, বয়স ১১

কবিতা, লেখা সর্বদা পাঠাবে, ভালো হলেই ছাপা হবে। কিন্তু বানান সম্পর্কে কি ব্যবস্থা হবে?

অভিজিৎ গুহ, ২৪৬৯, বয়স ১৫

লেখাই বল, প্রতিযোগিতাই বল, ধাঁধার উত্তরই বল, ভালো হলেই আমরা ছাপি। অন্য কথা মনে হবে কেন, ভাই, বিশেষ করে যখন লিখছ যে সন্দেশ তোমার ভালো লাগে। সভ্য কার্ড পেয়েছ কি?

হৈমন্তী ও ভাস্কর মিত্র, ১৩১৭

যখন খুব কম সংখ্যক সঠিক উত্তর আসে, তখনি আমরা একটা কি দুটো ভুল উত্তরদাতাদের নাম ছাপি। এটা কি খুব অন্যায়? আমরা তো সর্বদাই চাই, ভাই, তোমাদের লেখা, প্রতিযোগিতার প্রবন্ধ, ধাঁধার উত্তর ছাপার যোগ্য হয়।

মল্লিকা চক্রবর্তী, এন্ ৫৪৪, বয়স ১৩

যদিও এবারকার কবিতাটিকে হাত পাকাবার আসরে দেওয়া গেল না, আবার আরো ভালো লেখা পাঠিও কেমন?

পুস্তক পরিচয়

কল্যাণী কার্লেকার

উপেন্দ্রকিশোর—লীলা মজুমদার রচিত উপেন্দ্রকিশোরের জন্মশতবার্ষিকী গ্রন্থ। মূল্য সাড়ে তিন টাকা। নিউস্ক্রিপট, এ-১৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ১২।

সত্যজিৎ রায়ের ঠাকুরদাদা আর লীলা মজুমদারের জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রকিশোর সন্দেশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। সন্দেশ যে কি জিনিষ তা কাউকে বুঝিয়ে দিতে হবে না, কিন্তু উপেন্দ্রকিশোর কি ছিলেন তা বলে দেবার দরকার আছে, কারণ সেদিনকার কথা অনেকেই ভুলে গেছে।

এই বইয়ের ভাষায়—'সন্দেশের প্রকাশ শিশু সাহিত্যের হাতে একটা নতুন দিনের উদ্বোধন করে দিয়েছিল। হঠাৎ যেন এক দিনের মধ্যে বাঙ্গলার শিশুসাহিত্যের সমস্ত দৈন্য ঘুচে গিয়ে সে সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠল।'—আজকের বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের হাতে পৃথিবীর যে কোনো দেশের সমান ভালো যে সাহিত্য এসেছে, যে সব সুন্দর ছবি তাদের খুসী করছে তার পথ খুলে দিয়েছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। তিনি নিজে লিখেছেন, এঁকেছেন। ভালো ছবি ছাপাবার নোতুন ধরণের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছেন আর তা ছাড়াও অনেক কিছু করেছেন। আবার কেবল যা করেছেন তাতেও তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় নয়, এক অসাধারণ বংশের অদ্ভুত সন্তান উপেন্দ্রকিশোর একজন আশ্চর্য লোক ছিলেন। এবং তিনি যে আনন্দময় পরিবার গড়েছিলেন তার ডালপালায় দেশের জন্য রেখে গেছেন প্রতিভার ফুল ফল। তাঁর বংশ, তাঁর জীবন, পরিবার ও কীর্তির যে কথা লীলা মজুমদার লিখেছেন—

'এই কাহিনী চিত্রের চেয়ে চিত্তাকর্ষক। গল্পের চেয়েও মনোহর। স্মৃতিসাহিত্যের ক্ষেত্রে অনন্য।'

এর মলাটের কল্পনা করেছেন আর ভেতরের ছবি এঁকেছেন সত্যজিৎ রায়।

সোনার কাঠি রূপোর কাঠি—সম্পাদক শ্যামাপ্রসাদ সরকার, প্রকাশক রূপম, পরিবেশক এভারেস্ট বুক হাউস, ১২এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ১২। দাম—তিনটাকা।

এটা রূপকথার বই, পুরোনো গল্প নোতুন করে বলা আর নোতুন পুরোনো ধাঁচে লেখা। নয়খানা গল্পের প্রত্যেকটাই লিখেছেন ছেলে বুড়ো সকলের প্রিয় নামকরা সাহিত্যিকেরা, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এখন আর বেঁচে নেই আর বেশির ভাগই এখনও লিখে পাঠকদের আনন্দ দিচ্ছেন।

বইটা ব্যাংগমা ব্যাংগমীকে উৎসর্গ করা ভালই হয়েছে, কেননা বাংলাদেশের এমন কোনো পুরোনো রূপকথা বোধহয় নেই যাতে ব্যাংগমাব্যাংগমী কথা বলেনি আর সেই কথা শুনে রাজপুত্র রাজকন্যাদের প্রাণ বাঁচেনি। বইয়ের প্রথম কবিতাটিতেও অন্নদাশংকর রায় ওদের নিয়ে ঠাট্টা করে আজকালকার ছেলেদের সামনে একটা 'চ্যালেঞ্জ' রেখেছেন।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্ষীরের পুতুল, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর মজন্তালী সরকার আর দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের কাজলজল, ওঁদের বই থেকে তোলা। এই গল্পগুলি যেই পড়বে সেই সে

মূল বইগুলো এবং লেখকদের অন্যান্য বইও জোগাড় করে নিয়ে পড়ে ফেলতে চাইবে তাতে সন্দেহ নেই।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘুমন্ত পুরীর রাজকন্যার কথা আজকের একটি ঘুমন্ত মেয়ের স্বচক্ষে দেখা ঘটনা। সরোজকুমার রায়চৌধুরীর জলপরীদের রাজা নেই যেমন দুঃখের, লীলা মজুমদারের মধুমালতী তেমনই মিষ্টি ও আশ্চর্য মজায় ভরপুর। মিলাডা গংগোপাধ্যায় লিখেছেন বিদেশি আর মোহনলাল গংগোপাধ্যায় দেশি গল্প—দুটো পুরোনো কথা নোতুন ধাঁচে ঢালা।

ছবিগুলোর কথাও না বলে পারা যায় না। রঘুনাথ গোস্বামী শাদায় কালোয় এমন নিপুণভাবে সুখ দুঃখ, হাসিকান্না, দেশিবিদেশি নানারূপ ফুটিয়ে তুলেছেন তা সবাইকে মুগ্ধ করবে।
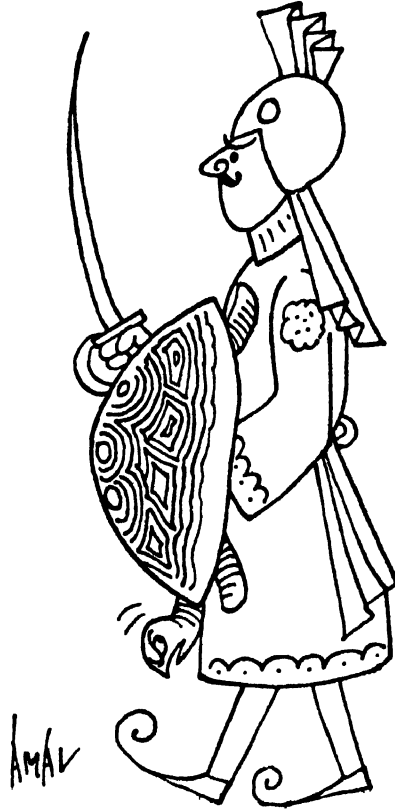
নতুন হেঁয়ালি কত বেরোল এবার,
তুমিও চেষ্টা কর জবাব দেবার।
নয়তো এখনই লেখো কলম নিয়ে,
ধাঁ করে জবাবটা দাও পাঠিয়ে।
ধাম, নাম, গ্রাহকের সংখ্যা দিয়ে।
(উত্তর দেবার শেষ দিন—১৫ই এপ্রিল)

(১)

মাথার পরে হাত তার, পায়ের দেখা নাই
জিভ করে লক লক, শব্দ হয় তাই।

(বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য)

(২)

প্রথম অক্ষর দুটি হয় পৃথিবীর সম।
শেষ দুটি প্রাণী দেহে অংশ অতি ক্ষুদ্রতম।
প্রথম ও শেষে মিলে সে প্রাণীর নাশে প্রাণ।
কোন সে বিরাট গ্রন্থ, কর দেখি অনুমান।

(বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য)

(৩)

রাজা নই কোথাকার তবু বলে রাজা
জেলে নই জেলে নাম, এ কেমন মজা!
দুই পায়ে চলি বটে মানুষ তো নই
ইংরাজি নামটার বোঝা বৃথা বই।

(গ্রাহক নং ২৫০৭ দেবব্রত মণ্ডল)

(৪)

সাগরে জনম তার লোকালয়ে বাস,
মায়ে ছুঁলে পুত্র মরে, একি সর্বনাশ!

(গ্রাহক নং ১৬১০ ঋত্বিক দত্ত)

বিশেষ দ্রষ্টব্য—উত্তরদাতারা ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে নতুন বছরের চাঁদা পাঠাতে ভুলোনা কিন্তু।

ধাঁধার উত্তর

(১)

স্নেহের পরেশ,

কাল সকালে যে কথাবার্তা হল সে বিষয়ে মামাকে তোমরা কিছু জানিও না। বরং দাদামশাইকে ও গুরুদাস কাকাকে একটু বললে ভাল হয়। পত্রে সকল ব্যাপার খুলে জানানো সঙ্গত নয়। মাসীমার কাছে সবই জানতে পার।

এ বৎসর কটক গিয়ে আমরা বেশ ভালই ছিলাম। কেবল দাদার খোকাটা পাঁচড়ার যন্ত্রণায় খুবই ভুগেছে। পরশু ব্যোমকেশ এসেছিল। বেচারার চাকরি গিয়েছে। ফেরত ডাকে তোমাদের খবর পেলে আনন্দিত হব। ইতি

শ্রীঅমূল্য চরণ* গুপ্ত।

(* অথবা পদ)

(২)

চাকরটি দোকানে গিয়ে প্রথমে ১২ টাকার ভাঙ্গানি চাইল। বাটা হিসাবে সে বাকি টাকা থেকে ১২৲ টাকার দরুণ ৩৲ টাকা দিল। ১৲ টাকা তার নিজের লাভ রইল।

(৩)

এরকম অনেকগুলি রাশি হতে পারে, যথা ৫৯,১১৯,১৭৯ ইত্যাদি।

এদের ২, ৩, ৪, ৫ আর ৬ দিয়ে ভাগ করে দেখলেই বুঝতে পারবে উত্তরটা ঠিক কি না।

উত্তর দাতাদের নাম :—

যারা তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে—

১৫ বনশ্রী দাশ, ৬৩ অনিরুদ্ধ রক্ষিত, ১৯২ অন্তরা ও ফুল্লরা সেন, ২৩১ অতীশ কুমার রায়, ২৮২ অর্চনা দত্ত, ৩৯১ অমিতাভ ও কাজল নিয়োগী, ৪২৪ অশোক ও অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, ৫০৯ শচীন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার, ৫২১ ব্রততী ও প্রকৃতি বিশ্বাস, ৫২৭ অভিজিৎ, অরিজিৎ ও বিনীতা বিশ্বাস, ৬১৮ অরুণাভ মুখোপাধ্যায়, ৬৩২ শুক্লা বক্সি, ৬৫৯ অম্বালিকা লাহিড়ী, ৭৫৭ ভোম্বল, পাপুন ও টিংকু, ৮৩৩ ভারতী ভট্টাচার্য, ৮৫৩ তপন কুমার দত্ত, ৮৬১ শিপ্রা ও মিত্রা গোস্বামী, ৮৬৯ উদয়ন কুমার মুখোপাধ্যায়, ৯৩১ কৃষ্ণা রায়, ৯৬১ অরুণাভ লাহিড়ী, ৯৭৯ গায়ত্রী মিত্র, ৯৯৪ তমাল মিত্র, ১০১৬ প্রণতা দত্ত, ১০৯৭ ঝুমকা সেন, ১১৯০ অমল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২০৪ দেবপ্রিয় ও জয়তী বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২৯৮ কল্লোল দে, ১৩২০ বিজলী ঘোষ, ১৩৯২ শংকর কুমার গুপ্ত ও অনুরাধা সেনগুপ্ত, ১৪৫৩ সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় ও জগদীশ ভট্টাচার্য, ১৪৯৭ শুভ্রা কুণ্ডু, ১৫২৮ শিবাজী রাহা, ১৫৭২ কঙ্কা ও শঙ্খ রায় চৌধুরী, ১৬৪৪ সুমিতা বাজোরিয়া, ১৬৫২ লিপিকা মজুমদার, ১৬৯৩ শ্যামল, আশীষ, সুনন্দা ও মধুচ্ছন্দা পাইন, ১৭০৬ বন্দন,

রঞ্জন ও চন্দন হালদার, ১৭১৬ অমিত কুসুম ভট্টাচার্য, ১৭২৪ অনির্বিত রক্ষিত, ১৭৪১ তাপসী সেনগুপ্ত, ১৭৪৭ ভাস্বতী ঘোষ, ১৭৪৮ অশোকা নন্দিতা ও দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, ১৭৫৩ অনিরুদ্ধ, শঙ্কর, মীনাক্ষী ও উদয়ন সেন, ১৯৩৮ লীনা মিত্র, ২১৭১ সন্দীপ কুমার ঘোষ, ২২৩৬ শ্যামলেন্দু তরফদার, ২৩০৫ অরূপ দত্তগুপ্ত, ২৪৭১ মণিদীপা সেনগুপ্ত, ২৬২১ শুভা বিশ্বাস ২৭০২ অঞ্জন প্রকাশ সেনগুপ্ত ২৭৩০ প্রদীপ দত্ত, ২৭৭৩ মৌসুমী ও মৌটুসী সেন, ২৭৭৫ গোপাপাল।

যারা দুইটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে

১২৪ দীপংকর মজুমদার, ১৩৩ সর্বানী ভট্টাচার্য্য, ১৫৮ রীণা গুপ্তা, রীতা গুপ্তা, ১৯৫ নিমাই, খুকু ও টাটা, ৩৩৫ সুমিত্রা ভাদুড়ী, ৪২৭ শমিতা মুখোপাধ্যায়, ৫৪৪ মল্লিকা ও সুবীর চক্রবর্তী, ৫৮০ চন্দ্রা দত্তরায়, ৫৮৭ সুমিত সরকার, ৬২৫ হীরক চক্রবর্তী, ৬২৬ শাশ্বতী রায়, ৬৩০ জ্যোৎস্না মুখার্জ্জী, ৬৪৪ মধুমিতা ঘটক, ৬৫৯ অম্বালিকা লাহিড়ী, ৭০৭ মন্দিরা দেব, ৭৪৮ সুমিত ও সৌমেন রায়, ৮১১ গৌতম মুখোপাধ্যায়, ৮৩৭ কল্পনা মৈত্র, ৯৮৩ জ্যোতির্ময় মজুমদার, ১০৩৮ কাবেরী মণ্ডল, ১২৪০ কৃষ্ণা ব্যানার্জি, ১২৬৯ সুশান্ত সাহা, ১৩০০ ছন্দা ও নন্দা রায়, :৩৭৪ কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, ১৩৭৬ জয়শ্রী চট্টোপাধ্যায়, ১৪৪৪ পূরবী গুপ্ত, ১৪৪৭ যুগলকান্ত ভট্টাচার্য, ১৪৬০ কেয়া বসু, ১৬১৯ অঞ্জন ও অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৬৯১ অর্চনা ও ত্রিদিবকুমার সাহা, ১৭০৫ কৃষ্ণকলি বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৭৫৯ শমীন্দ্র কৃষ্ণ দেব, ১৭৮৫ ঋতু ভট্টাচার্য্য, ১৭৮৮ পলাশবরণ পাল, ১৭৯২ মলয়া পাল, ১৮৪০ অনুরাধা ঘোষ, ১৯১৯ মাধুরী রক্ষিত, ২১৯৫ মুকুর দাশগুপ্ত, ২২৩২ অরূপ ত্রিপাঠী, ২৩৫২ উর্মিলা দাশগুপ্ত, ২৪৬৭ পার্থমিত্রা ঘোষ, ২৪৯৩ বাণী, নচিকেতা ও অনিরুদ্ধ সাধু, ২৫৪৪ ভারতী, মণিকা, সান্ত্বনা রায় চৌধুরী, ২৬০০ মঞ্জু সান্যাল, ২৭০১ মধুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৮৮৯ রণজিৎ দে।

এবারেও কয়েকজন খুব চমৎকার ধাঁধার কবিতা আর কবিতায় ধাঁধার উত্তর দিয়েছে—

১৩৭৬ জয়শ্রী চট্টোপাধ্যায়, ১৪৫৩ সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় ও জগদীশ ভট্টাচার্য্য, ১৭৪৮ অশোক, নন্দিতা ও দীপঙ্কর ভট্টাচার্য্য।

মাঘ মাসে যদিও অনেকে তিনটি ধাঁধারই নির্ভুল উত্তর দিতে পেরেছে। অনেকের আবার একটু একটু ভুলও হয়েছে। তাইজন্য এবার যারা দুটি ধাঁধার নির্ভুল উত্তর দিয়েছে তাদের নামও ছাপা হল।

আগামী মাসে আরো অনেক বেশী সংখ্যক গ্রাহকের কাছ থেকে নির্ভুল উত্তর চাই কিন্তু! ধাঁধার উত্তর পাঠাবার শেষ দিন লিখে দিতে ভুল হয়েছিল, তাইজন্য ধাঁধার পৃষ্ঠা ছাপাখানায় যাবার আগে পর্যন্ত যাদের উত্তর পাওয়া গেল, সবগুলোই নেওয়া হল।

নাচের গুণ

সুবিনয় রায়

'রাজ সরকারের জন্য একজন বিশ্বাসী খাজাঞ্চির দরকার'—এই বলে সহরের রাজপথে ঢোল পিটিয়ে দেওয়া হল। দলে দলে লোক বড় বড় প্রশংসাপত্র নিয়ে, কাজ পাবার আশায়, রাজবাড়িতে হাজির। রাজামশাই তো ঠিকই করতে পারলেন না কোন লোকটিকে রাখবেন।

তখন মন্ত্রী মশাই মাথা নেড়ে চুপি চুপি বললেন—কিছু চিন্তা নেই মহারাজ। আমি এখনই উপযুক্ত লোকটিকে বেছে বের করব। যে দু'হাত তুলে নাচতে পারবে সেই এ কাজের উপযুক্ত।

রাজামশাই ভাবলেন—এ আবার কি রকম কথা? খাজাঞ্চির নাচ দিয়ে কি দরকার? মন্ত্রীমশাই কি পাগল হয়ে গেলেন নাকি?

তবুও তিনি মুখে কিছু বললেন না, কারণ মন্ত্রীমশাই বহুকালের পুরোনো লোক, অভিজ্ঞতা অনেক তাঁর, বুদ্ধিও খুব।

মন্ত্রীমশাই সবাইকে ডেকে বললেন—মশাইরা আপনারা এই অন্ধকার গলির ভিতর দিয়ে একে একে রাজসভায় গিয়ে হাজির হবেন। সাবধানে চলবেন, পথে অনেক দামী জিনিস মাটিতে ছড়ানো রয়েছে!

সকলে সেই অন্ধকার গলি দিয়ে রাজসভায় এলে পর মন্ত্রীমশাই একে একে সকলকেই দু'হাত তুলে নাচতে বললেন, কিন্তু, একজন ছাড়া কেউই নাচতে রাজি হলেন না।

তখন মন্ত্রীমশাই বললেন—এই লোকটিই আমাদের খাজাঞ্চি হবার উপযুক্ত। যে অন্ধকার গলি দিয়ে এঁরা এসেছেন, তার মধ্যে অনেক সোনা, রুপো, মণি, মুক্তো ছড়ানো ছিল। অন্য সকলে নিজেদের পকেটের মধ্যে ঐ সব ঠেসে ভরে নিয়েছেন, কাজেই নাচতে গেলে ঐ সবের ঝনঝন আওয়াজে ধরা পড়ে যাবার ভয়ে নাচতে রাজি হন নি। এঁর পকেটে কিছু নাই, কাজেই নাচতেও কোন আপত্তি হয়নি এঁর!

এই কথা বলে যার যার পকেট থেকে সোনা, রুপো, মণি, মুক্তো বের করে নিয়ে, অর্ধচন্দ্র দিয়ে অন্য সকলকে বিদায় দেওয়া হল; আর যিনি নেচেছিলেন, তাঁকেই দেওয়া হল খাজাঞ্চির পদ।

ছোট্ট মিনি

কেয়া বসু—বয়স ৯½—গ্রাঃ নং ১৪৬০

বলছি সবাই শোনো—
আমার আছে ছোট্ট মিনি
তার জুড়ি নাই কোনো।
লেজটিতে তার কালো ডোরা
পাটি যে তার সাদা,
কোথায় ঘোরে, কোথায় ফেরে,
লাগিয়ে আসে কাদা।
ফাঁক পেলে সে টেবিল থেকে
দুধ খেয়ে যায় শুধু,
বোঝাই তারে, 'অমন করে
খায় না সোনা দুধু।
লক্ষ্মী হ'য়ে শান্ত হ'য়ে
সারাটি দিন থাকো',
ঘাড় নেড়ে সে বলে 'মিউ',
কিচ্ছু বোঝে নাকো।
লাঠি নিয়ে সবাই তারে
ফিরছে করে' তাড়া,
ছোট্ট মিনি পালিয়ে আসে
পেলেই আমার সাড়া।

বলতো ভাই কি যে করি,—
কোথায় ফেলে আসি।
ও যে আমায় ভালবাসে,
তাইতো ভালবাসি।

মিথ্যে কথা বলার বিপদ

শিখর রায়

বয়স—১০ বৎসর গ্রাহক নং—২৭০৬

প্রথম দৃশ্য

[পেঁচা গাছে বসে ঝিমোচ্ছে, ঈগল উড়ে আসছে]

ঈগল—নাঃ এত ঘুরলাম, তবু কিছু খাবার পেলাম না। যাক্ ঐ গাছটায় বসা যাক।

[ঈগল ঝটপট করে পেঁচার কাছে বসল]

পেঁচা—কে গো, আমার কাঁচা ঘুম ভাঙ্গায়?

ঈগল—বাঃ এখানে আসতে না আসতে একটা খাবার পেয়ে গেলাম। পেঁচা তুমি মরবার জন্য প্রস্তুত হও।

পেঁচা।—দোহাই ঈগল মশাই খেয়ো না। আমি একটা একটুখানি পাখি। আমার দেহে এক ছটাকও মাংস নেই। আমাকে খেয়ে তোমার লাভ হবে না। তার চেয়ে তুমি একটু অপেক্ষা কর। আমি কিছু খাবার এনে দিই।

ঈগল।—তা মন্দ বলনি। তাই আন।

[পেঁচার প্রস্থান ও কিছুক্ষণ পরে একটা পাখি নিয়ে পুনঃপ্রবেশ]

পেঁচা।—এই নাও।

[ঈগলের খাওয়া]

ঈগল।—আঃ, প্রাণটা বাঁচল। পেঁচা ভাই তুমি আজ থেকে আমার বন্ধু হলে। আচ্ছা আসি আবার এই গাছে এস। কেমন।

পেঁচা।—আচ্ছা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সেই গাছে ঈগল ও পেঁচা বসে রয়েছে]

পেঁচা।—আচ্ছা ভাই ঈগল তোমাকে একটা কথা বলব তুমি রাগ করবে না?

ঈগল।—না না।

পেঁচা।—আচ্ছা, তুমি কখনো আমার বাচ্চাদের খাবে না ?

ঈগল।—না না, তাই কি পারি। হাজার হোক বন্ধুর ছেলে তো, নিজের ছেলেমেয়েদের মত। তাদের কি খাওয়া যায়। তুমিই বল। তা ভাই তোমার বাচ্চাদের দেখতে কি রকম ?

পেঁচা।—খুব সুন্দর।

ঈগল।—তা, তোমার বাসাটা কোথায় ?

পেঁচা।—নদীর ওপারে, ওই যে, দেখতে পাচ্ছ একটা বট গাছ ?

ঈগল।—হ্যাঁ।

পেঁচা।—ঐ গাছে আমার বাসা।

ঈগল।—ঠিক আছে। আমি চলি।

পেঁচা।—আমিও যাই।

[উভয়েরই প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

[নদীর ওপারে সেই বটগাছ, ঈগলের প্রবেশ]

ঈগল—কই এত খুঁজছি তবুও পাচ্ছিনা। তবে কি পেঁচা ওর বাচ্চাকে খাবার ভয়ে আমাকে মিথ্যে কথা বলল। না, না, ঐ তো একটা বাসা। [বাচ্চাদের কিচ্‌মিচ্‌, ঈগল সেখানে আসল] নাঃ এ বাচ্চাগুলো কুৎসিত দেখতে। পেঁচাতো বলল ওর বাচ্চা খুব সুন্দর দেখতে। নাঃ এ পেঁচার বাচ্চা নয়! সেই সকাল থেকে ঘুরছি। এখন বিকেল বেলা। বড্ড খিদে পেয়েছে। এগুলো খেয়ে নিই। [খাওয়া] আঃ।

নদী থেকে একটু জল খেয়ে আসি। [এমন সময় পেঁচার প্রবেশ]

আরে ঐ তো পেঁচা আসছে।

পেঁচা—আরে ঈগল ভাই যে। [বাসা দেখিয়া] কই ঈগল ভাই আমার বাচ্চা কই।

ঈগল—ওগুলো তোমার বাচ্চা তাতো জানি না। তুমি বললে তোমার বাচ্চা দেখতে সুন্দর। এগুলো কুৎসিত দেখে আমি খেয়ে নিয়েছি।

পেঁচা—হায়, হায় ওগুলো আমার বাচ্চা। আমি তোমাকে মিথ্যে কথা বলেছিলাম। হায় হায়, আমার কি সর্বনাশ হল। হায় হায়।

[প্রস্থান]

মেলা

মলয়া পাল—বয়স ১১ বছর—গ্রাহক নং ১৭৯২

টাক্ ডুমা ডুম্ বাজে যে ঢোল
কাঁসি বাজে কাঁইরেনা
পুজোর মেলায় যতেক ছেলে
নাচে তাইরে নাইরে না।
ঘর্ ঘর্ ঘর্ চরকী ঘোরে
তুবড়ী ছোটে আকাশে,
মেলার আকাশ রাঙিয়ে যে দেয়
গন্ধ ছড়ায় বাতাসে।
বন্ বন্ বন্ নাগরদোলা
দোলায় শিশু মহলে,
আকাশ ছোঁয়ায় মাটী ছোঁয়ায়
নামায় বুঝি পাতালে।
গুম্ গুম্ গুম্ আওয়াজ ক'রে
ডাকে সার্কাস খেলা,
দিন কয়েকের জমজমাটী
ফুরিয়ে যায় যে মেলা।

ছড়া

শিপ্রা সেন—বয়স ১২—গ্রাঃ নং ৩০৫

ঘিয়ের টিনে ভরা জল।
জলের কোন নেই কো তল।
তল গিয়েছে তাল পুকুরে
ভায়ের সাথে দিন দুপুরে।
দিন দুপুরে নিয়ে হাঁড়ি
ভোঁদা যে যায় মাসির বাড়ি।
মাসির বাড়ি পুকুর পারে
মেসো সেথায় মাছ যে ধরে।
মাছ ধরে যে মদন জেলে
বঁড়সি গেঁথে ছিপটি ফেলে।

বাঘ ও বক

জয়শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

বয়স—১২ বছর—গ্রাহক নং ১৭৭০

গলায় ফুটিয়ে ফেলে মাংসের হাড়
বাঘ বলে বকভাই আয়রে এধার
ফুটেছে গলায় মোর মাংসের হাড়
কষ্ট যে পাই বড় দেনা করে বার
শুনিয়া বাঘের কথা বক বলে ভাই
বের করে দেবো হাড় তবে টাকা চাই,
টাকা দেব সব দেবো দেরে করে বার
উহুহু গেলুম ভাই করে দেরে পার !
বক দিলো বের করে বাঘের সে হাড়
বক বলে বাঘমামা টাকা দাও ভাই,
বাঘ বলে খাব তোর মাস-মজ্জাই
থাকিসনে কাছে মোর বেড়ে যাবে রাগ
বাঁচতে ইচ্ছা যদি এই বেলা ভাগ্ ॥

বোটানিকাল গার্ডেনে কয়েকঘণ্টা

ব্রততী গুহ—বয়স ১৩ বছর—গ্রাহক নং ১৫০৭

পরীক্ষার পরে বাড়ীতে একটা বৈঠক বসল ছুটিতে কোথায় বেড়ানো যায়। অবশেষে ঠিক করা হ'ল সামনের রবিবার বোটানিকাল গার্ডেনে যাওয়া যাবে। উৎসুক হয়ে রবিবারের প্রতীক্ষা করছিলাম তারপর কাছে এল সেই বহু আকাঙ্খিত রবিবার। যাবার তোড়জোড় শুরু হল, সঙ্গীও জুটেছিল অনেক। সকাল দশটার সময় খাবার দাবার প্রভৃতি সরঞ্জাম নিয়ে রাস্তায় পা বাড়ানো গেল। আমরা চৌদ্দজন ছিলাম সকলে মিলে বাসস্টপে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাস আসতে খুব একটা দেরী হল না লটবহর নিয়ে তাড়াতাড়ি বাসে উঠলাম আমাদের যাত্রা শুরু হলে।

যাত্রাপথে বিশেষ কিছু বৈচিত্র্য ছিলনা, তবে নানা রকন দোকানের মধ্যে দিয়ে আমাদের বাসটা চলছিল বেশ কিছুক্ষণ চলার পর আবার বাস বদলী করতে হল এবং বাসের টারমিনাস অর্থাৎ আমাদের গন্তব্যস্থল বোটানিকাল গার্ডেনের সামনে এসে দাঁড়ালাম।

তারপর ধীরে ধীরে সেই বিশাল বাগানের ভেতর প্রবেশ করলাম, গাছের সারি শাখা দুলিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করল। দেখলাম ছোটো ছোটো পুকুরের মধ্যে পদ্মফুল ফুটে আছে ; ঝরাপাতাবিছানো পথে খসখস আওয়াজ তুলে আমরা অগ্রসর হতে লাগলাম। ক্রমে ক্রমে আমরা অর্কিড হাউসে এসে পৌছালাম। ভারী সুন্দর ফুলের গন্ধে জায়গাটা ভরে ছিল। পাম হাউসে রকমারী পামের বাহার দেখে

বিস্মিত হলাম, আরও কিছুক্ষণ বেড়াবার পর আমরা বৃহত্তম বটগাছের বাগানের কাছে এলাম, দেখে অবাক হলাম যে একটি বটগাছের থেকে কত শত বটগাছের সৃষ্টি হয়েছে। এই বটগাছের বাগানটি নাকি ভারতের মধ্যে বৃহত্তম।

এর পর আমরা তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে বসলাম ভোজনপর্ব সারতে। পাছুটোও বিদ্রোহ করছিল, তাই কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে গঙ্গার ঘাটের দিকে চলতে শুরু করলাম। মৃদুমন্দ হাওয়ায় ও হাল্কা রৌদ্রে নদীর ধারে ঘুরতে ভারী ভাল লাগছিল। দেখলাম দু তিনটে জাহাজ দ্রুত জল কেটে অনেক দূরে চলে গেল। বাগানে লোকজন প্রচুর ছিল, সবাই গাছপালা দেখতে ব্যস্ত। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে খেয়াল হলো ফিরতে হবে, অগত্যা যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। মনটা কিছু ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। আমরা বাগান থেকে বেরিয়ে এলাম। বাস খুবই তাড়াতাড়ি পেলাম মনে হল, সময় যেন বড্ড তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে এলো।

তখন সন্ধ্যা হয়েছে। রাস্তায় আলো জ্বলে উঠেছে, অনেকেই সান্ধ্যভ্রমন করছে আর আমাদের বাস ছুটছে বাড়ির দিকে।

ভাস্কর মিত্র—গ্রাঃ নং ১৩১৭—বয়স ১৩ বছর

'দিনান্তে'
অরূপ ত্রিপাঠী—গ্রাঃ নং ২২৩২

ময়ূর
অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রাঃ নং ১৬১৯—বয়স ৭ বছর

সম্পাদকীয়

আবার একটা বছর শেষ হল, আমাদের সন্দেশের বয়সও চার বছর পূর্ণ হয়ে গেল। বৈশাখ থেকে পঞ্চম বছর শুরু। তোমরা শুনে খুসি হবে যে নানারকম বাধা ও অসুবিধা কাটিয়ে সন্দেশ এতদিন পরে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শুরু করছে। এটা সম্ভব হয়েছে অনেকখানি তোমাদেরি জন্যে। সন্দেশের গ্রাহকগ্রাহিকাদের সাহায্য, সহযোগিতা ও ভালোবাসা না পেলে এতটা হয়ে উঠত না।

এখনো সে সাহায্যের বড় দরকার। আরো গ্রাহক না করতে পারলে আমাদের আপিশের খরচ চালানো মুস্কিল যদিও এখনো কর্মীরা ও লেখকরা বিনা পারিশ্রমিকেই কাজ করেন। এখন তোমাদের কাজ হল আরো গ্রাহক করে দেওয়া, তার জন্যে একটা ফর্মতো দেওয়াই থাকে। তাছাড়া নিজেদের নতুন বছরের চাঁদাও তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিও।

নিজেদের ও অভিভাবকদের নাম, ঠিকানা, নিজেদের বয়স ও গ্রাহক সংখ্যা সর্বদা সব চিঠিপত্র ও লেখার সঙ্গে দিতে ভুলে যেও না।

'হাত পাকাবার আসরে'র জন্য পাঠানো কত ভালো লেখা ছাপানো যায় না, কারণ ওগুলি ঠিক করে দেওয়া থাকে না। তাতে তোমাদেরো যেমন, আমাদের তেমনি দুঃখ হয়।

তোমাদের সকলের কাছ থেকে আমরা চিঠি আশা করি, যদিও জানইতো সব চিঠির উত্তর দেবার জায়গা কুলোয় না, তাই বেছে বেছে উত্তর দিতে হয়।

গত বছরের কোন কোন লেখা তোমাদের বিশেষ করে ভালো লেগেছে; আগামী বছরে কি ধরনের লেখা চাও, এসব জানালেও আমরা খুসি হই। অবিশ্যি এক্ষেত্রেও সব ইচ্ছা পূর্ণ করা সম্ভব হয় না, ইচ্ছা করে নয়, ব্যবস্থা করা যায় না বলে। আমাদের কাছে তোমাদের ইচ্ছা অবহেলার জিনিস নয়, এটা নিশ্চয় জানো?

বৈশাখে কি কি দেখতে পাবে এই সংখ্যাতেই অনেকটা জানতে পারবে। শুভেচ্ছা জেনো। ইতি। স—স

ভ্রম সংশোধন

গত অগ্রহায়ণ সংখ্যার সন্দেশে, ১১০ পৃষ্ঠায় চৈতন ঠাকুর কবিতার শেষে দুটি লাইন ভুল করে বাদ পড়ে গেছে।

গ্রাহক গ্রাহিকারা নিজের নিজের সন্দেশে লাইন দুটি হাতে লিখে নিও, তাহলে কবিতাটি আরো ভাল লাগবে।

'শিশুগুলি মৈ টেনে লাগাইল হৈ হৈ
ছোট তার নাতনীটি কয় শুধু মাভৈ!'

প্রবাদ প্রতিযোগিতা

সম্পাদক মশাই সেদিন হঠাৎ বলে বসলেন—'অতি লোভে ছাগলে কিনা খায়!' সবাই হেসে অস্থির। কি মজা হয়েছে বুঝেছ তো? 'অতি লোভে তাঁতী নষ্ট' এই প্রবাদের প্রথম অংশের সঙ্গে 'পাগলে কিনা কয়, ছাগলে কিনা খায়' প্রবাদের শেষ অংশ জুড়ে একটা মজার নতুন বচন তৈরী করেছেন। এমনিতেই তো ছাগল সব কিছু খায়, তার উপর তার বেজায় লোভ হলে কি মজার কাণ্ড হবে বল তো!

তোমরা কে কে এইভাবে দুটি প্রচলিত প্রবাদের প্রথম ও শেষ অংশ জুড়ে একটা নতুন প্রবচন তৈরী করতে পার দেখি।

নিয়মাবলী

(১) একটি প্রচলিত প্রবাদের প্রথম অংশের সঙ্গে আর একটি প্রচলিত প্রবাদের শেষ অংশ জুড়তে হবে।

(২) যে—যে প্রবাদের অংশ জোড়া হয়েছে সেই সম্পূর্ণ প্রবাদগুলিও লিখে দিতে হবে।

(৩) নতুন যে বচনটি তৈরী হবে তার মানে থাকা চাই।

(৪) নতুন কথাটা খুব মজার হওয়া চাই।

(৫) খামের বাঁ দিকের কোণায় লিখে দিতে হবে প্র—প্র।

(৬) নিজের নাম, ঠিকানা, বয়স ও গ্রাহক নম্বর স্পষ্ট করে লিখবে।

(৭) যারা গ্রাহক নম্বর এখনও পাওনি তারা লিখবে 'নতুন গ্রাহক'।

তুমি কি সন্দেশের গ্রাহক ?

যদি গ্রাহক না হয়ে থাক তাহলে নিচের একটি আবেদনপত্র ভর্তি করে, কিম্বা সাধারণ কাগজে ফর্মটি কপি করে, চাঁদার টাকা সহ সন্দেশ কার্যালয়ে এখনই পাঠিয়ে দাও।

তুমি নিজে যদি গ্রাহক হয়ে থাক তাহলে তোমার দুটি বন্ধুকে নতুন বছর থেকে গ্রাহক করে দাও

নিয়মাবলী ভাল করে দেখে নিতে ভুলো না কিন্তু।

সন্দেশ সম্পাদক মহাশয়,

আমি সন্দেশের গ্রাহক হতে চাই।

এক বৎসরের চাঁদা নয় টাকা / ছয় মাসের চাঁদা সাড়ে চার টাকা

আমি পাঠিয়ে দিলাম। / জমা দিলাম

নাম—

জন্মের তারিখ—

অভিভাবকের নাম—

ঠিকানা—

* ইচ্ছা করলে সাধারণ কাগজে এই ফর্মটি কপি করে নিয়ে গ্রাহক হবার জন্য টাকা জমা দিতে পারা যায়।

অভিভাবকদের অবগতির জন্য

শিশুদের রোগমুক্ত রাখতে হলে

সময়মত প্রতিকার ব্যবস্থা করা হলে শিশুদের রোগমুক্ত রাখা সম্ভব। আজকাল ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, ধনুষ্টংকার, পোলিও, বসন্ত, যক্ষা, টাইফয়েড এবং কলেরা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সর্বত্রই সহজলভ্য করা হয়েছে।

জন্মাবার পর থেকেই রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ আরম্ভ করতে হবে এবং পরে নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট সময় অন্তর সেগুলির পুনরাবৃত্তি করতে হবে। তবেই শিশুদের শরীর নিরোগ ও সুস্থ থাকবে। আজকাল সব সরকারী ও মিউনিসিপ্যাল ডিসপেনসারীতে এ ব্যাপারে সাহায্য করা হয়ে থাকে। পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিকেও এই সব সুবিধা পাওয়া যেতে পারে। তাঁরা বিভিন্ন প্রতিষেধক গ্রহণের একটি সময় তালিকাও রচনা করে দেন।

সাধারণতঃ জন্মাবার পরে ১৪ বছর পর্যন্ত নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করতে হবে—

* জন্মাবার পরে চার সপ্তাহের মধ্যে যক্ষা প্রতিরোধক বি. সি. জি. টীকা নিতে হবে।

* তিন থেকে নয় মাসের মধ্যে বসন্তের টীকা এবং ডি. পি. টি. টীকা নেওয়া প্রয়োজন। ডি. পি. টি. অর্থাৎ ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি এবং ধনুষ্টংকার প্রতিরোধকের দুটি টীকা নিতে হবে, এক মাস অন্তর।

* সাত থেকে ১০ মাসের মধ্যে পোলিওর দুটি টীকা নিতে হবে, এক মাস অন্তর।

* পনেরো থেকে আঠারো মাসের মধ্যে আবার ডি. পি. টি. টীকা এবং পোলিওর তৃতীয় টীকা নিতে হবে।

* দুই থেকে চার বছরের মধ্যে চতুর্থ পোলিও টীকা নেওয়া আবশ্যক।

* বিদ্যালয়ে পড়াশুনা আরম্ভ করবার সময় ডি. পি. টি. শেষ টীকা এবং টি. এ. বি. দুইটি টীকা নিতে হবে, এক মাস অন্তর।

* দশ থেকে চোদ্দ বছরের মধ্যে আবার বি. সি. জি. টীকা বসন্তের টীকা এবং টি. এ. বি. টীকা নিতে হবে।

প্রত্যেক তিন বছর অন্তর বসন্তের টীকা দেওয়া দরকার। টি. এ. বি. টীকা প্রত্যেক বছর এবং সাধারণতঃ যে সময়ে কলেরা আক্রান্ত হয় তার আগেই কলেরার টীকা নেওয়া উচিত।

প্রেস ইনফর্মেশন ব্যুরো
গভর্ণমেন্ট অব্ ইণ্ডিয়া

দিলীপের দলবল
জন্মদিনের এক নিমন্ত্রণে
প্রমোদ নিশ্চয় এটা পছন্দ করবে।
করবে না? সবাই টর্চের ভক্ত।
আমরা নিশ্চয় একটা ক'রে চাখতে পাব।
তোর দেখছি বড্ড লোভ।
প্রমোদ, তোর জন্মদিনে—
আমরা সকলে মিলে তোর জন্যে এটা এনেছি।
খুব খুশী হলাম। আগে আয় একটু ক্রিকেট খেলি। তারপর চা-টা খাওয়া যাবে, কি বলিস।
বাপ রে। কত রকম খাবার।
আমার তো পেটে জায়গাই নেই।
ও মা সন্ধ্যে হয়ে গেছে। তাহলে তো আর বাইরে খেলা যাবে না।
ঘরের মধ্যে বরং পিং-পং হোক!
ঠিক বলেছ!
এ হে! বলটা যে বাইরে গিয়ে পড়ল।
এখন উপায়!
পেয়েছি, পেয়েছি—এই তো।
সব সময় যেন 'এভারেডী' টর্চ কাছে থাকে। বলা তো যায় না কখন কোন্ দরকারে লাগে!